বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

সিরাজগঞ্জ

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সিরাজগঞ্জ

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমি ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী

আবদুল ওয়াহাব

সমন্বয়কারী

নাসিম উদ্দিন মালিথা

সংগ্রাহক

মো. গোলাম সরোয়ার

মো. মনিরুজ্জামান

রেজওয়ানা রোকনী

টি. এম. মাহমুদুল হাসান

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমি
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
সিরাজগঞ্জ

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৪২১/ মে ২০১৪

বাএ ৫৩৩০

মুদ্রণ সংখ্যা
১২৫০ কপি

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
তিনশত ত্রিশ টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : SIRAJGANJ (Present state of Folklore in Sirajganj District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Managing Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan. Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : May 2014. Price : Tk. 330.00 only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5339-8

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমি তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমি থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ্ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ্ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ্ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেটএন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমির ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে

www.pathagar.com

বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমিতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements) কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমি ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির*

www.pathagar.com

বিকাশ কর্মসূচি-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।
১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।

www.pathagar.com

২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
   ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
   খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/ সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।
চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।
ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।
জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

www.pathagar.com

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন–শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে–তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে

www.pathagar.com

পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারীপুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন–গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা (চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ),

www.pathagar.com

মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাগুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, আটপাড়া, নেত্রকোনা), ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব (চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন

www.pathagar.com

ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি.), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর।

www.pathagar.com

১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)।

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক

www.pathagar.com

(মানত), ২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমির সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নির্দেশনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান, সহপরিচালক জনাব মো. গোলাম সরোয়ার এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ–Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে সিরাজগঞ্জের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান-সমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ২৩-১০১

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা
খ. ভৌগোলিক অবস্থান
গ. নৃতাত্ত্বিক পরিচয়
ঘ. ভূমিরূপ
ঙ. বিভিন্ন উপজেলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
চ. বিভিন্ন উপজেলার আয়তন ও জনসংখ্যা
ছ. বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষার হার
জ. ব্যবসা বাণিজ্য
ঝ. সিরাজগঞ্জ জেলার শিল্প
ঞ. বাঘাবড়ি নদীবন্দর
ট. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
ঠ. মুক্তিযুদ্ধ ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা
ড. রাজনৈতিক পরিমণ্ডল
ঢ. ঐতিহ্য/বিশেষত্ব
ণ. সিরাজগঞ্জ কৃষকবিদ্রোহ
ত. সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাজার ও দরগাহ
থ. সিরাজগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ১০২-১৭৮

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা
খ. লোকছড়া ও লোকবিতাগ

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ১৭৯-২০৯

লোকশিল্প (folkart)

১. মৃৎশিল্প
২. লৌহ শিল্প
৩. তাঁতশিল্পের বিবর্তন ও আধুনিকায়ন
৪. শীতল পাটি
৫. নক্‌শি পাখা

www.pathagar.com

লোকসংগীত (folk song) ২১০-৩২৫

১. মেয়েলিগীত
২. ধুয়া গান
৩. জারি গান
৪. ভাটিয়ালি গান
৫. মারফতি গান
৬. মুরশিদী গান
৭. বারাসে বা বারোমাসি গান
৮. নৌকা বাইচের গান

লোকউৎসব (folk festival) ৩২৬-৩৩১

১. ঈদ উৎসব
২. দুর্গা পূজা
৩. চড়ক উৎসব
৪. চড়ক পূজা

লোকাচার (ritual) ৩৩২-৩৩৫

১. আকিকা
২. গায়ে হলুদ
৩. বউবরণ
৪. মুখে ভাত/অন্নপ্রসান
৫. বৌভাত

লোকমেলা ৩৩৬-৩৪০

১. কোনাবাড়ির ঐতিহাসিক স্নানের মেলা
২. বউ মেলা
৩. তাড়াশের ঐতিহ্যবাহী দইমেলা
৪. দইমেলার পণ্যসামগ্রী
৫. দইমেলায় যারা আসেন
৬. দইমেলাকে ঘিরে স্থানীয়দের মন্তব্য

লোকক্রীড়া (folk games) ৩৪১-৩৫৩

১. এক এ ঋতু খেলা
২. বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে খেলা
৩. আই অ্যাম মিতা খেলা
৪. স্প্রিং খেলা
৫. কানামাছি খেলা
৬. ইঁদুর বিড়াল খেলা
৭. পেপসি পেপসি খেলা

www.pathagar.com

৮. ইচিং বিচিং খেলা
৯. ডোম ডোম খেলা
১০. ছোঁয়াছুয়ি খেলা
১১. বরফ পানি খেলা
১২. দাদু-দাদু খেলা

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) **৩৫৪-৩৫৭**
১. জেলে
২. মিস্ত্রি/ছুতার
৩. গাছি বা গাছছাটুনী
৪. রাজমিস্ত্রি
৫. খুলু বা তেলি
৬. কাঁসারি
৭. তাঁতি

লোকচিকিৎসা (folk Medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant) **৩৫৮-৩৯৩**
১. লোকচিকিৎসা
২. তন্ত্রমন্ত্র

ধাঁধা (riddle) **৩৯৪-৪২৫**

প্রবাদ প্রবচন (folk sayings & proverb) **৪২৬-৪৩২**

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) **৪৩৩-৪৪৪**

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) **৪৪৫-৪৪৮**
১. কটিখড়া বা ধর্মজাল
২. খলসুন/খালুই
৩. সড়কা/হোঁচা
৪. পলো
৫. হাত ন্যাংলা
৬. চারী
৭. ছেনি/মেনি
৮. কাড়াইল
৯. হারপাট/সারপাট
১০. গবরের প্রলেপ দেওয়া
১১. লোক ফিল্টার
১২. ঘসি
১৩. জলকান্দা
১৪. টোপা (ট্যাবারি)
১৫. কাকতাড়ুয়া

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

আদিম যুগে মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণের নিমিত্তে পশু শিকার করত। আগুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ যখন আবিষ্কারের সূত্র পেয়ে যায় তখন থেকে উৎকর্ষ সাধিত হয় মানুষের জীবনাচরণেও। জীবিকা নির্বাহের তাগিদে পশু শিকার করা ছাড়াও মানুষ ধীরে ধীরে উৎপাদন ব্যবহারের সাথে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে কৃষি সভ্যতার সাথে সাথে লোকসংস্কৃতির সূত্রপাত ঘটে। এর ফলে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে এবং তার পরিসর আজ অবধি বিস্তৃত। এরই ধারাবাহিকতায় 'লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ' ফোকলোর চর্চার আধুনিকায়ন বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রকল্পের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে এর সংগ্রহ ও লুপ্তপ্রায় বিষয়াদি উঠে এসেছে। যা কালের পরিক্রমায় অনেক ক্ষেত্রে ভঙ্গুর। তবুও মানুষ সকল ক্ষেত্রে তার শেকড়ের সন্ধানে ব্রত। এর ফলে বাংলা একাডেমির সার্বিক তত্ত্বাবধানে 'লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ' কর্ম প্রণালীর অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে আমার সার্বিক অংশগ্রহণ।

উত্তরাঞ্চলের অন্যতম নদী বিধৌত জেলা হিসেবে পরিচিত সিরাজগঞ্জ। নদীর ভয়াবহতা আর প্রাকৃতিক নৈসর্গিক রূপে এক অদ্ভূত সংমিশ্রণ। যার প্রভাব যেমন সামাজিক ও ভূপ্রকৃতির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় আবার লোকজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও প্রকাশমান। লোক সমাজের আচার, বিশ্বাস, সংস্কার, ঐতিহ্য এবং পরিবর্তনশীল পরিমণ্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছে এখানকার লোকসংস্কৃতি। তাই সার্বিক দিক বিচার করে বলা যায় যে, সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও অধিক পরিমাণে লোকজ উপাদান বিদ্যমান। কাজের সুষ্ঠু ও সঠিক তথ্যের আলোকে সংগৃহীত উপাদানগুলোর মধ্যে সংগ্রাহকদের সহযোগিতায় কয়েকটি বিষয়কে প্রধান হিসেবে বিবেচিত করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমার এ কাজে প্রথমে জেলা ও উপজেলাসমূহের পরিচিতি সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করা হয়েছে। এর পর লোকসংস্কৃতি বিষয়ক নানা উপাদানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এতে সংগৃহীত লোকসংস্কতির উপাদানগুলোর শ্রেণিবিভাগসহ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হয়েছে। শেষে আঞ্চলিক শব্দ-গুলোর মূল শব্দ দেয়া হয়েছে।

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠা

বিস্তীর্ণ হাওড়, বিলের সবুজের হাতছানী, শস্যে ভরা শ্যামল মাঠ, বুকের ওপর দিয়ে ছল্‌ছল্‌ শব্দ করে এগিয়ে চলা পাল তোলা নৌকা সমেত বিশাল বিস্তারী নদী, টুপটাপ করে জাল আর বড়শি দিয়ে মাছ টেনে তোলার অসংখ্য খাল, বিল, জলাশয় এবং পাল তোলা নৌকার গুলই-এ বসে গাঁয়ের সৌন্দর্য দর্শন কিংবা মেঠো পথে হেঁটে চলার ফাঁকে ফাঁকে গ্রামের মানুষের আন্তরিকতার ছোয়া নেয়া, এসবই অকৃত্রিম আর আদি

www.pathagar.com

হয়ে বয়ে গেছে আমাদের গ্রাম বাংলায়। সিরাজগঞ্জ জেলা এর ব্যতিক্রম নয়। হাজার বছরের ইতিহাস আর ঐতিহ্যে লালিত বাংলাদেশের মানচিত্রে সিরাজগঞ্জের অবস্থান খুব বেশি পুরাতন নয়। মাত্র কয়েক শত বছর আগেও সিরাজগঞ্জ শহরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না বৃহৎ যমুনা নদী। যমুনা ছিল তখন খাল। ইতিহাসে জানা যায় এক ধর্নাঢ্য জমিদার এই খাল নতুন করে খনন করেন। ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র যমুনা নামেই একটি ছোট্ট খালের চিত্র রয়েছে। ১৭৬২ সালে প্রবল ভূমিকম্পে ব্রহ্মপুত্র নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে। যমুনা খাল দিয়ে প্রবাহিত হলো নতুন স্রোতধারা। ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিল্টনের ম্যাপে যমুনাকে বিশাল নদীরূপে দেখা যায়। সিরাজগঞ্জ সদরে বেশ বড় বড় জমিদারের বসবাস ছিল। ১৮০৮ সাল থেকে বর্তমান সিরাজগঞ্জ সদরের জনবসতি গড়ে উঠে। নোঙ্গর করা জাহাজকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে (১৭০৩-১৭২৭) সিরাজগঞ্জ মহকুমার একটি বিরাট অংশ টাঙ্গাইল জেলার কাগমারী ও বাড়বাজু জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মোঘল আমলে বাড়বাজু পরগণার জমিদারি দেওয়া হয়েছিল পীর আফজাল মাহমুদকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কিছুদিন পূর্বেই রজব আলী বাড়বাজু পরগণার জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তার বংশধর সিরাজ আলী চৌধুরী স্বেচ্ছায় বন্দর শহর গড়তে এগিয়ে আসেন এবং দান করেন অনেক জায়গা জমি; তারই নাম অনুসারে সিরাজগঞ্জ মহকুমার নামকরণ করা হয়। (পাবনা গেজেট পৃ. ৪০৮); সিরাজগঞ্জ পূর্বে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৮ সালে পাবনা জেলার পূর্ব সীমানা যমুনা নদীর বরাবর নির্ধারণ করা হয়। যমুনা নদী গতি পরিবর্তনের কারণে ১৮৫৫ সালে সিরাজগঞ্জ থানাকে পাবনা জেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৮৯৩ সালে শহরের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত (কাটাখালী) বড়াল নদীর উপর নির্মিত হয় খুটিবিহীন ইলিয়ট ব্রিজ যা আজও কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৮৪ সনে সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সিরাজগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। তাঁতশিল্প এ জেলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে। বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা সেতু) এবং সিরাজগঞ্জ শহররক্ষা বাঁধের অপূর্ব সৌন্দর্য এ জেলাকে পর্যটনসমৃদ্ধ জেলার খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাছাড়া শাহজাদপুর উপজেলার রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি, এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, বাঘাবাড়ির মিল্কভিটা, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তের ইকোপার্ক, বাঘাবাড়ি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি নদী বন্দর ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপত্য ও শিল্পকর্মের নিদর্শন এ জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার সিরাজগঞ্জ শহরটি খরস্রোতা এবং করালগ্রাসী যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এ জেলা পূর্বদিকে সমগ্রভাবে যমুনা নদী দ্বারা বেষ্টিত। সিরাজগঞ্জ মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া এবং তারও পূর্বে পাঠান মোঘল আমলে চৌকি হিসেবে তার স্থান ছিল। পাঠান ও মোঘল আমলে এলাকাটির নাম ছিল 'পরগণা

www.pathagar.com

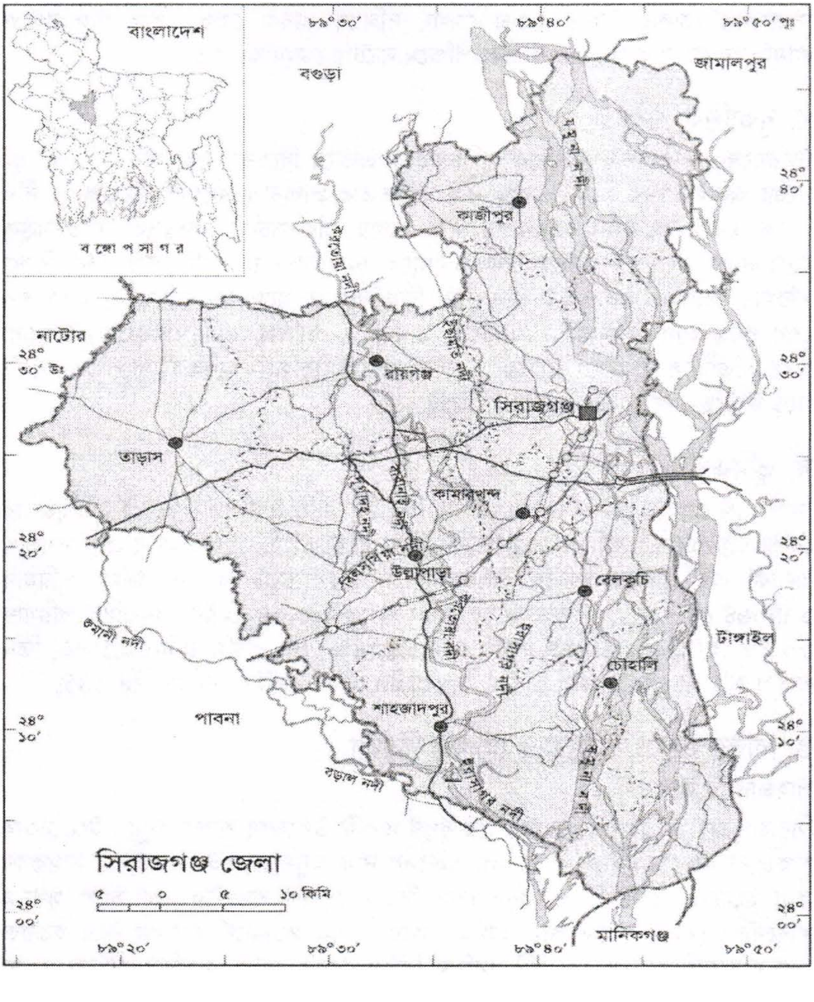

বড়বাজু' বা 'বড়বাজু সরাকর'। সিরাজগঞ্জ জেলার ৮৯°-৪২° পূর্ব অক্ষাংশে জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলা ৯৮°–৪৪° পশ্চিম অক্ষাংশে পাবনা জেলা, ২৪°–২৮° উত্তর দ্রাঘিমাংশে বগুড়া জেলা ও ২৪°–৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশে মানিকগঞ্জ জেলা। বর্তমানে সিরাজগঞ্জ শহরটি ২৪° ৎ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা ও ৮৯° ৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা থেকে সড়ক পথে এর দূরত্ব ১৪২ কি. মি.। সিরাজগঞ্জে মোট ৯টি উপজেলা রয়েছে। যথা : ১. সিরাজগঞ্জ সদর, ২. কাজিপুর, ৩. রায়গঞ্জ, ৪. উল্লাপাড়া, ৫. শাহজাদপুর, ৬. বেলকুচি, ৭. কামারখন্দ, ৮. চৌহালী ও ৯. তাড়াশ।

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জ জেলার উত্তরে বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা জেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা ও যমুনা নদী এবং পশ্চিমে নাটোর জেলা অবস্থিত।

গ. নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়টিকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যায় যে, এই ভূ-খণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ শিরস্কতার প্রাধান্য। প্রাগৈতিহাসিককালে দীর্ঘ শিরস্ক প্রোট অস্ট্রেলীয় জনগণের রক্ত ধারায় যার সূচনা, অতঃপর জাতিতাত্ত্বিক স্রোতধারায় সংমিশ্রণ ঘটেছে স্বল্প পরিমাণে ভূমধ্যসাগরীয়, দ্রাবিড়ভাষী জন বিপুল পরিমাণ গোলমুণ্ড আলপাইন জনগোষ্ঠী, কিছু সংখ্যায় মঙ্গোলীয় অধিবাসী, মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত আগন্তক মুসলিম (আরবীয়, সেমিটিক, পার্সিক, তুর্কী, আফগান) জনধারা এবং অতিবিরল পরিমাণে নেগ্রিটো (কোচ) জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের গড়ে উঠেছে এক বৈচিত্র্যময় বাঙালি জাতিসত্তা।

ঘ. ভূমিরূপ

সিরাজগঞ্জ জেলার ভূমি সমতল। জেলার কিছু নিচু জমি ও জলাশয় রয়েছে। এ জেলার বেশিরভাগ এলাকা বর্ষা মৌসুমে পানির নিচে তলিয়ে যায়। চলনবিলের প্রায় দশভাগ এলাকা এই জেলার তাড়াশ উপজেলায় পড়েছে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ ১৭৯৯৬৪.০২ হেক্টর, পতিত জমির পরিমাণ ১৫৭০১.৬৪ হেক্টর, বনভূমির পরিমাণ ৫০.৪৮ হেক্টর। এছাড়া এক ফসলি জমি ১৯.৫৪%, দো-ফসলি জমি ৫৯.১৮%, তিন ফসলি জমি ২১.২৮% এবং সেচের আওতাধীন আবাদী জমির পরিমাণ ৭৪.৩৪%।

ঙ. বিভিন্ন উপজেলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

শাহজাদপুর উপজেলা :

সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপজেলা শাহজাদপুর। ইয়েমেনের শাহজাদা হজরত মুখদুম শাহদৌলা শহীদের নাম অনুসারে এই উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুখদুম শাহদৌলা (রহ.) শাহজাদপুর আগমন করেন। ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করে হজরত মুখদম শাহদৌলা (রহ:) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বাংলা মুসলিম স্থাপত্য কলার ইতিহাসে শাহজাদপুর মসজিদ একটি অনন্য সাধারণ ঐতিহ্যের নিদর্শন। এর আয়তন ৩২৪ বর্গ কি. মি.। উত্তরে উল্লাপাড়া উপজেলা, দক্ষিণে চৌহালী উপজেলা, পূর্বে পাবনা বেড়া ও ফরিদপুর ও চাটমহর উপজেলা। জনসংখ্যা ৫,৬১,০৭৬ জন, পুরুষ ২,৮৩,৩৩০ জন ও মহিলা ২,৭৭,৭৪৬ জন। শিক্ষার হার ৩৮.৪%, পুরুষ ৪১.৬% ও মহিলা ৩৫.১%। এ উপজেলা ১৩টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা ১টি, মৌজা ২১৬টি ও ৩৪৩টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। আবাদি জমির পরিমাণ ৩০,৮৫৫ হেক্টর। প্রধান নদী যমুনা, করতোয়া এবং বড়াল।

শাহজাদপুরে নগরবাড়ি-বগুড়া মহাসড়কের পশ্চিমে বিসিক-এর একটি টেক্সটাইল মিল রয়েছে। তালগাছি ও সরিষাকোলের মাঝে নগরবাড়ি-বগুড়া মহাসড়কের পূর্ব পাশে

www.pathagar.com

যমুনা টেক্সটাইল নামে একটি মিল রয়েছে। তাঁত শিল্পের জন্য শাহজাদপুর বিখ্যাত। তালগাছি নামক স্থানে একটি বিরাট হাট আছে। এটি নগরবাড়ি-বগুড়া মহাসড়কের পূর্ব পাশে অবস্থিত। শাহজাদপুরের পোতাজিয়ায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অবস্থিত।

শাহজাদপুর থানার বাঘাবাড়ি বাংলাদেশের অন্যতম নদী বন্দর। এখানে সেতুর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বড়াল নদীর তীরে মিল্কভিটা নামক দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ একটি কারখানা রয়েছে। উল্লাপাড়া থানার লাহিড়ী মোহনপুরে ১৯৪২ সালে প্রথম এ কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে ডেনিশ ক্রেডিট কোং-এর সহযোগিতায় আধুনিক প্রযুক্তি সংযোগে বর্তমানে মিলটি চালু রয়েছে। এই মিলকে কেন্দ্র করে অনেক খামারিরা পশু পালনের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

বাঘাবাড়ি সেতুর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বড়াল নদীর তীরে ১১ একর জমির উপর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তিনটি কোম্পানির ডিপো স্থাপিত হয়েছে। যমুনা, মেঘনা ও বার্মা ইস্টার্ন তিনটি তেল কোম্পানি সারা উত্তরবঙ্গের তেল ও পেট্রোলিয়াম পদার্থের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। বাঘাবাড়িতে তেলের ডিপোর পাশে রয়েছে একটি সরকারি খাদ্য গুদাম। এতে ৫০০০০ হাজার টন খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বাঘাবাড়ি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি নদী বন্দর ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপত্য ও শৈল্পকর্মের নিদর্শন এ জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

উল্লাপাড়া উপজেলা

উল্লাপাড়া উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। এটি করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত। এককালের প্রসিদ্ধ পাট বন্দর। একসময় পাট রপ্তানীর ব্যাপারে কলকাতা বন্দরের সাথে এর ব্যাপক যোগাযোগ ছিল। আজও এটি উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট পাট ক্রয়-বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। জানা যায় তদানন্তীন পাকিস্তান সরকার এটিকে একটি নৌবন্দর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। উল্লাপাড়ায় একটি প্রসিদ্ধ রেল স্টেশন, একটি হিমাগার ও খাদ্য গুদাম রয়েছে। পূর্ণিমাগাতিতে থানা হেল্‌থ কমপ্লেক্স রয়েছে। উল্লাপাড়া উত্তরবঙ্গের যাতায়াতের প্রধান কেন্দ্রস্থল। শিক্ষা-দীক্ষায় থানাটি বেশ উন্নত।

উল্লাপাড়া থানাধীন সলঙ্গা হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ শাসকদের একটি চরম বর্বরতার নজির। এই হত্যাকাণ্ড 'বাংলার জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে খ্যাত। উল্লাপাড়া থানার উত্তর-পশ্চিমে রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের আনু খাঁর দীঘি। এই দীঘিটা নির্মিত হয়েছিল দিল্লির সম্রাট শেরশাহের আমলে। এই দীঘির পশ্চিম পাড়ে পীর শাহ জামাল (রহ.) এর মাজার এবং পূর্ব পাড়ে শায়িত আছেন আর এক 'ওলিয়ে দ্বীন' কামাল দরবেশ সাধক পীর হজরত মাওলানা ওয়াহেদ আলী (রহ.) এর মাজার। যিনি 'পাগলা পীর' নাম খ্যাত ছিলেন।

এই উপজেলার আয়তন ৪১৪.৪৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে রায়গঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে শাহজাদপুর উপজেলা, পূর্বে কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলা, পশ্চিমে তাড়াশ উপজেলা। এই উপজেলায় ৪টি নদী যথা: করোতোয়া, ইছামতি, বিলসূর্যিয়া রয়েছে। এখানে ৪৬৫টি মসজিদ, ৪টি মাজার, ১৭টি মন্দির, ও ২টি তীর্থস্থান রয়েছে। শিক্ষার হার পুরুষ ৪৭.২%, মহিলা ৪০.১%, কলেজ ১৩টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৪৭টি, নিম্ন

www.pathagar.com

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৩টি, মাদ্রাসা ১১৬টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৪৬টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৫টি, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩টি, সংগীত বিদ্যালয় ১টি ও স্যাটেলাইট স্কুল রয়েছে ১০টি।

এ উপজেলায় কৃষি ৪৭.৭৫%, কৃষি শ্রমিক ২৬.১৪%, অকৃষি শ্রমিক ২.৪৫%, ব্যবসা ১০.৮৫%, চাকুরি ৪.১০%, পরিবহণ ২%, তাঁত ৩.৯৪% ও অন্যান্য পেশার লোক রয়েছে ৮.৭৭%। এখানে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৩৪৯১২.১৮ হেক্টর, অনাবাদি জমির পরিমাণ ৬৫২৫.৭০ হেক্টর। এক-ফসলি জমি ২৫%, দো-ফসলি ৪৮%, তিন ফসলি জমি ২৭%। এছাড়া সেচের আওতায় আবাদী জমির পরিমাণ ৮১%। এ উপজেলায় কৃষি ফসল হিসেবে ধান, পাট, জব. গম, তিল, সরিষা, আলু, পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

এছাড়া যোগাযোগের জন্য পাকা রাস্তা ৭৮ কি. মি., আধা পাকা রাস্তা ৩৭ কি. মি., কাঁচা রাস্তা ৫৯১ কি.মি., রেলপথ ২১ কি. মি., নৌ-পথ ৬৭ নটিক্যাল মাইল ও তিনটি রেলস্টেশন রয়েছে। এ উপজেলার উল্লেখযোগ্য হাটবাজারগুলো হল উল্লাপাড়া, সলঙ্গা, গয়হাট্টা, প্রতাপ, বিনায়েকপুর, সলপ, বড়হর, হাটিকুমরুল, মোহনপুর ও ধরইল হাট ইত্যাদি। স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসেবে হাসপাতাল রয়েছে ২টি, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৫টি, মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র ১টি ও পরবিার পরিকল্পনা কেন্দ্র রয়েছে ১১টি।

রায়গঞ্জ উপজেলা

সিরাজগঞ্জের অন্যতম থানা রায়গঞ্জ। ব্রিটিশ শাসনামলে তৎকালীন প্রভাবশালী জমিদার রায় পরিবারের পুরোধা শ্রীমান হরিদাশ রায় ঠাকুরের নাম থেকে রায়গঞ্জ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে কথিত আছে। সে সময় এ অঞ্চলে হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি। ফলে অত্র এলাকার বেশিরভাগ গ্রাম ও মহল্লার নাম হিন্দু ও তাদের দেব-দেবির নামানুসারে হয়েছে। রায়গঞ্জ উপজেলার আয়তন ২৬৭.৮৩ বর্গ কি. মি.। উত্তরে বগুড়া জেলার শেরপুর ও ধুনট উপজেলা, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া এবং কামারখন্দ উপজেলা, পূর্বে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, পশ্চিমে তাড়াশ উপজেলা। মোট থানার সংখ্যা ২টি (রায়গঞ্জ ও সলঙ্গা)। জনসংখ্যা ৩,১৭,৬৬৬ জন। পুরুষ ১,৫৮,৬০৪ জন এবং মহিলা ১,৫৯,০৬২ জন।

এ উপজেলা ৯টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা ১টি, মৌজা ১৯৩টি ও ৩০৪টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। শিক্ষার হার ৩৮.১%। পুরুষ ৪১.১%এবং মহিলা ৩৫.২%। আবাদি জমির পরিমাণ ২২০৬৪ হেক্টর। প্রধান নদী ফুলজোড়, বাঙালি, করতোয়া এবং ইছামতি। উপজেলার সলঙ্গা থানায় ১৯২২ সালের ২৭শে জানুয়ারি স্বদেশি আন্দোলনের অংশ হিসেবে তৎকালীন কংগ্রেস নেতা মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ এর নেতৃত্ব অনুষ্ঠিত সমাবেশে ব্রিটিশ বাহিনী নির্বিচারে গুলি চালালে শত শত মানুষ নিহত হয়। এই উপজেলার সোনাখাড়া ইউনিয়নের নিমগাছি হাটের পশ্চিমে রাজা জয়পালের আমলে নির্মিত দীঘি 'জয়সাগর'। নিমগাছি বাজার থেকে পশ্চিম দিকে দিঘির দূরত্ব ১ কিলোমিটার। আয়তন প্রায় ৫৮ একর। জনশ্রুতি আছে বিরাট রাজার আমলে

www.pathagar.com

প্রজাদের জনকষ্ট নিবারণের নিমিত্তে এবং রাজার কয়েক লক্ষ গরুর পানীয় জলের জন্য এই দিঘি খনন করা হয়।

নিমগাছি সভ্যতা হয়ত পুণ্ড্রবর্ধনের প্রাচীন সভ্যতা। নিমগাছি বিরাট রাজার বাড়ি, বরুজ ও সেখানে অসংখ্য মাটির টিবি তারই সাক্ষ্য বহন করে। জয়সাগর উদায়দীঘি, শৈরদীঘি একসময় বিশাল জলাশয় ছিল। হাটিকুমরুলে রামনাথ ভাদুড়ীর নবরত্ন মন্দির রয়েছে। তাছাড়া উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দূরে ধুবিল ইউনিয়ন পষিদের দক্ষিণে ধুবিল জমিদার বাড়ি অবস্থিত। কাটার মহল পরগোনার প্রতিষ্ঠিতা জমিদার মুন্সি মরহুম আব্দুর রহমান তালুকদার এর আমলে এই জমিদার বাড়িটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়।

তাড়াশ উপজেলা

তাড়াশ উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। ১৯১৩ সালে তাড়াশকে থানায় উন্নীত করা হয়। তাড়াশ চলনবিলের এক বিরাট অংশ। গ্রামের সংখ্যা ও লোকবসতি কম। বিস্তৃর্ণ মাঠ। এর আয়তন ২৯৭.২০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে শেরপুর উপজেলা, দক্ষিণে ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর উপজেলা, পূর্বে রায়গঞ্জ ও উল্লাপাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে গুরুদাসপুর ও সিংড়া উপজেলা। মোট জন সংখ্যা প্রায় ১,৯৭,২১৪ জন, এর মধ্যে পুরুষ ৪৮%, মহিলা ৫২%। মুসলমান ৮৯.০৩%, হিন্দু ১০.৮৮% এবং অন্যান্য ০.০৯%। শিক্ষার গড় হার ২২.৬%। এর মধ্যে পুরুষ ৩০.২৫%, মহিলা ১৪.৯%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলেজ ৫টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৫টি, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪৯টি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭৫টি ও মাদ্রাসা রয়েছে ১৬টি। এ উপজেলার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশা কৃষি। এখানে কৃষি ৫৫.৫%, কৃষি শ্রমিক ৩১.৮৬%, অকৃষি শ্রমিক ১.৩৩%, চাকরি ১.৭৭%, ব্যবসা ৩.৩২% ও অন্যান্য ৬.২২% জনগোষ্ঠী রয়েছে। এ উপজেলায় ভূমিহীন রয়েছে ২৪%, মাঝারি চাষি ২৫%, ক্ষুদ্র চাষি ৪২% ও বড় চাষি রয়েছে ৯%। প্রধান প্রধান কৃষি ফসল হলো ধান, গম, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, কলাই ইত্যাদি। পাকা রাস্তা রয়েছে ১৬ কি. মি., আধাপাকা রাস্তা ৪০কি. মি. ও কাচা রাস্ত ৩৫০ কি. মি.। উল্লেযোগ্য হাট বাজারগুলো হলো বারুহাস, বিনশরা, গুল্টা বাজার ইত্যাদি। এই উপজেলায় রয়েছে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ৭টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র। চলন বিলের উত্তরাংশে বর্ষাকালে সমুদ্রের আকার ধারণ করে।

তাড়াশের অবস্থা বহুদিন থেকেই উন্নত। বেহুলা-লক্ষীন্দারের লোককাহিনির কথা কে-না জানে? কিংবদন্তি সেই সতীসাধ্বী বেহুলা সুন্দরীর পৈত্রিক ভূমিও এই তাড়াশে। তাড়াশ থানার বিনসারা গ্রামে বেহুলার পিতা সাঁই সওদাগার ওরফে বাছো বানিয়ার বাসস্থান ছিল। আজ কালের সাক্ষী হয়ে দাড়িঁয়ে আছে সেই ভিটা। বাছো বানিয়ার ভিটা, ৩৬০টি পুকুর, চুনসুড়কি ছাড়া বড় ইটের সাজানো গাঁথুনি দ্বারা চার অন্তঃমুখ বিশিষ্ট অদ্ভুত কূপ (যা জীয়ন কূপ নামে লোকমুখে প্রচলিত)। তাড়াশের নবগ্রাম বা

www.pathagar.com

নওগায় মামা ভাগ্নের মসজিদ এবং সুফিসাধক হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ.)-এর মাজার শরিফ পঞ্চদশ শতকে নির্মিত। সে সময় বাংলা শাসক ছিল নাসিরুদ্দিন নুসরত শাহ।

চৌহালী উপজেলা

চৌহালী সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত অন্যতম একটি উপজেলা। থানাটি যমুনা নদীর দুই তীরে অবস্থিত। এর আয়তন ২৪৩.৫৭ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে বেলকুচি উপজেলা, দক্ষিণে দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) উপজেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল সদর ও নাগরপুর উপজেলা, পশ্চিমে শাহজাদপুর ও বেড়া উপজেলা। উপজেলার প্রধান নদীর নাম যমুনা। চৌহালী থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮৪ সালে। উপজেলায় ইউনিয়ন রয়েছে ৫টি, মৌজা ১৫২টি ও গ্রাম ১০১টি। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদ ২০০টি, মাজার ১টি, মন্দির ২টি। উল্লেখযোগ্য খাজা ইউনুস শাহ এনায়েতপুরী মাজার। জনসংখ্যা ১,৬০,০৬৩ জন, পুরুষ ৫১%, মহিলা ৪৯%। মুসলমান ৯৯.৫% হিন্দু ০.০৫%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ উপজেলায় কলেজ ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১২টি মাদ্রাসা, ১৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬৫টি কিন্ডার গার্টেন স্কুল রয়েছে। এখানকার জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৩৪.৩৮% ব্যবসা ৮.৮৪%, অকৃষি শ্রমিক ৫.০১%, কৃষি শ্রমিক ২৩.৩৯%, চাকুরি ৪.৯৩%, তাঁত ৬.২৬% অন্যান্য ১৭.১৯%। এ উপজেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৭২৫০.৭৬ হেক্টর অনাবাদি জমি ৭৩৮৯.৬৪ হেক্টর। এক ফসলি ৬০% দো-ফসলি ৩০% এবং তি ফসলি ১০%। সেচের আওতাধীন আবাদি জমির পরিমাণ ৪০%। এছাড়া ভূমিহীন ১০%, ক্ষুদ্র চাষী ৩২%, মধ্যম চাষি ২৮% ও বড় চাষি ১৪%। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.৪৯ হেক্টর। কৃষি ফসলাদি হিসেবে এখানে ধান, গম, পেঁয়াজ, রসুন, মিষ্টি আলু, চিনাবাদাম প্রভৃতি প্রধান। বিলুপ্ত প্রায় ফসলাদির মধ্যে পাট, তিসি, তিল, চিনা ও অড়হর উল্লেখযোগ্য।

যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে এ উপজেলায় পাকা রাস্তার পরিমাণ ৬ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ৭৫ কিলোমিটার। কুটির শিল্প হিসেবে তাঁত ২০০০০টি, বাঁশের কাজ ৮৭ জন, স্বর্ণকার ২০ জন, কামার ৫০ জন, কাঠের কাজ ৩০ জন, সেলাই কাজ ১৮৮ জন রয়েছে। হাট-বাজার রয়েছে ১৩টি। উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের মধ্যে এনায়েতপুর, জোতপাড়া হাট। এ উপজেলায় রয়েছে ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৬টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র। উপজেলাটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থানের কারণে নৌযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল। ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি আমলেও এ থানা যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে গণ্য হওয়ায় এ এলাকায় ইংরেজরা নীলের চাষ করত। তাঁত শিল্প ও চুড়ির ব্যবসার জন্য এলাকাটি প্রসিদ্ধ ছিল। বাংলার মুসলিম ধর্মাকাশের উজ্জ্বল তারকা ওলিয়ে কামেল, নকশা বন্দি মোজদ্দদিয়া তরিকার অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত সাধক পীর হজরত খাজা শাহ সুফি ইউনুস আলী (রহঃ) চৌহালী থানার এনায়েতপুরে সমাধিস্থ।

www.pathagar.com

কাজীপুর উপজেলা

কাজীপুর উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। এ উপজেলার আয়তন ৩৬৮.৬৩ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে বগুড়া জেলার ধনুট ও সারিয়াকন্দি উপজেলা এবং যমুনা নদী, দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা, পূর্বে সারিয়াকান্দি উপজেলা ও যমুনা নদী পশ্চিমে ধুনট উপজেলা। প্রধান নদী ইছামতি ও যমুনা। কাজীপুর থানা সৃষ্টি ১৯২০ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা। এ উপজেলায় ১টি পৌরসভা, ১১টি ইউনিয়ন, মৌজা ১১৪টি, ও ১৮২টি গ্রাম রয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে মসজিদ ২৩১টি,মাজার ৩টি ও মন্দির রয়েছে ৪৫টি। উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ২,৭৪,৬৭৯ জন। পুরুষ ৪৭% নারী ৫৩%। মুসলমান ৯৬.৯৪%, হিন্দু ৩.০৩% এবং অন্যান্য ০.০৩%।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলেজ ১৬টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩২টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৫টি, মাদ্রাসা ৭টি। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ৫৪.২২% কৃষি শ্রমিক ২০% অকৃষি প্রমিক ২.১১% ব্যবসা ৯.৩৮%, চাকুরি ৪.২৪% এবং অন্যান্য ১০.০৫%। অত্র উপজেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ২৩৩৮৪.০৬ হেক্টর। অনাবাদি বা পতিত জমি ২০৭.২০ হেক্টর। এক ফসলী ১৩.৪৩%, দোফসলি ৫৪.৫৬% এবং তিনফসলি ৩২.০১%। সেচের আওতায় আবাদী জমির পরিমাণ ১২৭৪.৭৯ হেক্টর। ভূমিহীন ৬.৬৩%, প্রান্তিক চাষী ১৭.৬০%, ক্ষুদ্র চাষী ২০.৫০%, মধ্যম চাষি ৩৫.২৭% ও বড় চাষি ২০%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, মরিচ, সরিষা, গম প্রভৃতি। বিলুপ্ত প্রায় ফসলাদি হলো : খেসাড়ি, আউশ ধান। প্রধান ফল-ফলাদি হলো আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, লিচু, কলা প্রভৃতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে পাঁকা রাস্তা রয়েছে ১৯ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ২০২ কিলোমিটার। এখানে কুটির শিল্প হিসেবে তাঁত রয়েছে ৫৮৭০টি, হাট-বাজার রয়েছে ১৩টি বাটোয়ার পাড়া, সোনামুখী, পানাগাড়ী হাট উল্লেখযোগ্য। অত্র উপজেলায় বাৎসরিক মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে, তার মধ্যে সোনামুখী উল্লেখযোগ্য। এ উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এই থানায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম স্থপতি ক্যাপ্টেন এম. এনসুর আলী সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর পাকা রাস্তা নির্মাণ ও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে জনপ্রিয় হয়ে রয়েছেন।

বেলকুচি উপজেলা

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে সিরাজগঞ্জ, চৌহালী ও বেলকুচি প্রভৃতি এলাকা সমন্বয়ে বেলকুচি থানা নামে ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার অংশ ছিল। আনুমানিক ১৭৭৫ সালে জমিদার সিরাজ আলী চৌধুরী বেলকুচি বন্দর প্রতিষ্ঠা করেন। বেলকুচি উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। এ উপজেলার আয়তন ১৬৪.৩১ বর্গকিলোমিটার। এর উত্তরে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা দক্ষিণে শাহজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল সদর ও কালিহাতি উপজেলা পশ্চিমে কামারখন্দ ও উল্লাপাড়া উপজেলা। প্রধান নদী যমুনা ও হুরাসাগর। বেলকুচি থানা সৃষ্টি ১৯২১ সালে। বর্তমানে এটি উপজেলা। এ উপজেলা ৬টি ইউনিয়ন, মৌজা ১০৮টি, ও ১৩২টি গ্রাম নিয়ে

www.pathagar.com

গঠিত। উপজেলায় মোট জনসংখ্যা ৩,৫২,৮৩৫ জন। পুরুষ ৫০.৯৪% নারী ৪৯.০৬%। মুসলমান ৯১.৭৯%, হিন্দু ৭.৮৪% এবং অন্যান্য ০.৩৭%। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কলেজ ৬টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৫টি, নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৮টি, মাদ্রাসা ২২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২৯টি।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ক্লাব রয়েছে ৪২টি পাবলিক লাইব্রেরি, ২টি সিনেমা হল ৬টি মহিলা সমবায় সমিতি ১৪৫টি ও খেলার মাঠ ১৩টি। জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ১৮.৬% কৃষি শ্রমিক ৯.৬৭% অকৃষি শ্রমিক ২৪.৮৪% ব্যবসা ১৪.৮৪%, চাকুরি ৩.৬৯%, তাঁতী ১৩.২৭%, শিল্প শ্রমিক ৪.২৯% এবং অন্যান্য ১০.৮০%। অত্র উপজেলার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৭৩১.১১ হেক্টর। অনাবাদি বা পতিত জমি ২৫০৩.৩২ হেক্টর। এক ফসলি ৫২.২৪%, দো-ফসলি ১৪.৬৭% এবং তিন-ফসলি ৪৩.০৯%। সেচের আওতায় আবাদী জমির পরিমাণ ৪৯৩৭.২৭ হেক্টর। ভূমিহীন ২৮%, প্রান্তিক চাষী ২১%, ক্ষুদ্র চাষি ৩১%, মধ্যম চাষি ১৬% ও বড় চাষী ৪%। মাথাপিছু আবাদি জমির পরিমাণ ০.০৬ হেক্টর। প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, আলু, চিনা বাদাম, সরিষা, গম ও আউস ধান প্রভৃতি। বিলুপ্ত প্রায় ফসলাদি হলো : তিল ও তিসি।

প্রধান ফল-ফলাদি হলো আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, লিচু, কলা প্রভৃতি। যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে পাঁকা রাস্তা রয়েছে ২৩.৫০ কিলোমিটার, কাঁচা রাস্তা ২১০ কিলোমিটার, নৌপথ ১৯ নটিক্যাল মাইল। বিলুপ্ত প্রায় সনাতন বাহন হলো পাল্কি, গরু মহিষ ও ঘোড়ার গাড়ি। তাঁতের জন্য এ এলাকা বিখ্যাত। এখানে কুটির শিল্প হিসেবে তাঁত রয়েছে ৫০৩২টি, হাট-বাজার রয়েছে ২৮টি, এর মধ্যে সোহাগপুর হাট উল্লেখযোগ্য। প্রধান প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তাঁত বস্ত্র, ধান ও পাট। এ উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। বেলকুচি একটি প্রসিদ্ধ নৌবন্দর ও ব্যবসা কেন্দ্র। বেলকুচি তাঁত শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

কামারখন্দ উপজেলা

সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত জেলার সবচেয়ে ছোট্ট উপজেলা। আয়তন ৯১.৬১ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে সিরাজগঞ্জ ও রায়গঞ্জ উপজেলা, দক্ষিণে উল্লাপাড়া ও বেলকুচি উপজেলা, পূর্বে বেলকুচি ও সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা এবং পশ্চিমে উল্লাপাড়া উপজেলা অবস্থিত। জনসংখ্যা ১,৩৮,৬৪৫ জন। পুরুষ ৬৮,৪১১ জন এবং মহিলা ৭০,২৩৪ জন। এ উপজেলা ৪টি ইউনিয়ন, মৌজা ৫৫টি, ও ১১৬টি গ্রাম নিয়ে গঠিত। শিক্ষার হার ৪৬.২%। পুরুষ ৪৮.৯%এবং মহিলা ৪৩.৭%।

কামারখন্দের শিক্ষার হার জেলার অন্যান্য উপজেলার তুলনায় কখনোই পিছিয়ে ছিল না। কারণ এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন গণিত সম্রাট যাদব চক্রবর্তী। যার পরিচিতি বিশ্বব্যাপী। উপজেলায় ১টি সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ১৪টি পোস্ট অফিস, ১৫টি হাট বাজার ও ৫টি ব্যাংক রয়েছে। নদনদীর মধ্যে হুড়াসাগর ও ফুলজোড় অন্যতম। এ অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। বড় ধরনের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। এ উপজেলার ঝাউল ইউনিয়নের চাঁদপুর গ্রাম বেত শিল্পের জন্য বিখ্যাত। প্রায়

www.pathagar.com

৪০টি পরিবার এ পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানকার শীতলপাটি, বেতের আসবাবপত্র ও তৈজষপত্রের সুনাম রয়েছে। তাছাড়া উপজেলার রায়দৌলতপুর ইউনিয়নের ধলেশ্বর নামক গ্রামে টুপি বয়ন করা হয়। এ গ্রামের প্রায় ৭০/৮০টি পরিবারের মহিলারা দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি টুপি সেলাই করে থাকে।

এ উপজেলায় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে কয়েক দশক পূবেই যুগান্তর শিল্পীগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত এবং সুনামের সাথে এখানো কাজ করছে। এ উপজেলার নান্দিনা কামালিয়া গ্রামে সাধক পীর আওলিয়া হজরত শাহ কামাল চিরনিদ্রায় শায়িত। তিনি সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দির প্রথম দিকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এখানে আস্তানা গাড়েন। তাঁর মাজারে প্রতি পৌষ-মাঘ মাসে ওরশ হয়ে থাকে এবং হাজার হাজার ভক্ত অনুরাগীরা জমায়েত হয়ে থাকে।

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলা

আয়তন ৩২৫.৭৭ বর্গ কিমি। উত্তরে কাজীপুর উপজেলা, দক্ষিণে কামারখন্দ ও বেলকুচি উপজেলা, পূর্বে ভূয়াপুর ও কালিহাতি (টাঙ্গাইল) উপজেলা, পশ্চিমে কামারখন্দ, রায়গঞ্জ ও ধুনট উপজেলা। প্রধান নদী: যমুনা, ইছামতি, হুরাসাগর।

উপজেলা শহর ১৫টি ওয়ার্ড ও ৫২টি মহল্লা নিয়ে গঠিত। আয়তন ৩২৬ বর্গ কি: মি: । জনসংখ্যা ৫৫৫১৫৫ জন; পুরুষ ৫০.২৭%, মহিলা ৪৯.৭৩%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ৬৫০০ জন। শিক্ষার হার ৪৮%। ডাকবাংলো ২। এক সময় পাট ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কলকাতা ও নারায়ণগঞ্জের পরেই ছিল সিরাজগঞ্জ বন্দরের স্থান।

প্রশাসন মোমেনশাহী জেলার অধীনে ১৭৭২ সালে সিরাজগঞ্জ সদর থানা গঠিত হয়। বর্তমানে এটি উপজেলা। পৌরসভা ১, ওয়ার্ড ১৫, ইউনিয়ন ১০, মৌজা ২৬১, গ্রাম ২৮২।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ কাটাখালী নদীর ওপর নির্মিত ইলিয়ট ব্রিজ বা লোহার পুল (১৮৯৩)।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নিখিল ভারত মুসলিমলীগের কনফারেন্সে যোগ দিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রাহ্মসমাজের মহাসম্মেলনে মহাত্মা গান্ধী ও সুভাস চন্দ্র বসু সিরাজগঞ্জে আসেন। ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস পরিচালিত স্বরাজ পার্টির বিখ্যাত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট অনুমোদিত হয়। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ১৯৩২ সালে সিরাজগঞ্জ শহরে 'তরুণ মুসলিম' সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক সিরাজগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন চন্ডিদাসগাঁতী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'দূর্জয়' নামে ১টি ভাস্কর্য রয়েছে।

www.pathagar.com

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ৬৫৩, মাজার ৪, মন্দির ২০। সুপরিচিত: সিরাজগঞ্জ জামে মসজিদ, হোসেনপুর লাল মসজিদ, যুগল কিশোর মন্দির, কালীবাড়ি মন্দির।

জনসংখ্যা ৫৫৫১৫৫; পুরুষ ৫০.২৭%, মহিলা ৪৯.৭৩%। মুসলমান ৯৫.১৬%, হিন্দু ৪.৮%, অন্যান্য ০.০৪%।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ৪৮%; পুরুষ ৪৫.৮%, মহিলা ৪৮%। সরকারি কলেজ ৪, বেসরকারি কলেজ ৮, আইন কলেজ ১, হোমিওপ্যাথ কলেজ ১, মেডিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল ১, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, ভকেশনাল ইনস্টিটিউট ১, নার্সিং ইনস্টিটিউট ১, প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, বি এড প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১, সরকারি হাইস্কুল ২, বেসরকারি হাইস্কুল ৩৬, নিম্নমাধ্যমিক স্কুল ৬, মাদ্রাসা ১৯, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫৩, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮৫। সুখ্যাত প্রতিষ্ঠান: ইসলামিয়া কলেজ (১৮৮৭), জ্ঞানদায়িনী হাই স্কুল (১৮৮৪), বি.এল উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৯), সিরাজগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ (১৯৪০)।

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী দৈনিক: কলম সৈনিক, যমুনা প্রবাহ, যমুনা সেতু। সাপ্তাহিক: যমুনা বার্তা, সাহসী জনতা, যাহা বলিব সত্য বলিব, সুন্দর বার্তা, আনন্দভোর। অবলুপ্ত: মাসিক যমুনা, সাপ্তাহিক সময়ুগ, সাপ্তাহিক সিরাজগঞ্জ সমাচার।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পাবলিক লাইব্রেরি ২, পাঠাগার ৬৫, গ্রামীণ ক্লাব ১২৩, সিনেমা হল ৬, নাট্যদল ১০, মহিলা সংগঠন ৩৩।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমূহ কৃষি ২৫.১৭%, কৃষি শ্রমিক ১৫.৭৬%, অকৃষি শ্রমিক ৪.৩৭%, ব্যবসা ১৬.০৯%, চাকরি ১২.৫৫%, তাঁত ৪.১০%, পরিবহণ ৩.৫৩%, শিল্প শ্রমিক ৪.১২%, অন্যান্য ১৪.৩১%। ভূমি ব্যবহার চাষযোগ্য জমি ২৩৮৭২.৯৩ হেক্টর, পতিত জমি ৭৭২.১৬ হেক্টর। এক ফসলি ২১.৪৪%, দো ফসলি ৪৭.৫৪%, তিন ফসলি ৩১.০২%। সেচের আওতায় আবাদি জমি ৪২.৩৮%। ভূমি নিয়ন্ত্রণ ভূমিহীন ৭.৫৩%, ক্ষুদ্র চাষি ৬১.৯৯%, মধ্যম চাষি ১৭.৮১%, বড় চাষি ২.৫৫%, প্রান্তিক চাষি ১০.১২%। প্রথম শ্রেণির আবাদি জমির মূল্য ০.০১ হেক্টর প্রতি ৭৫০০ টাকা।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, ইক্ষু, পেঁয়াজ, রসুন, আলু, মিষ্টি আলু, সরিষা, মরিচ, চীনাবাদাম। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি নীল, তামাক, চিনা, ছোলা, মুগ, আউশ ধান, অড়হর, কলাই। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, জাম, পিঁয়াজ, নারিকেল, তাল, খেজুর, পেঁপে, জলপাই, বরই, বেল, তেঁতুল।

মৎস্য, গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার মৎস্য ২, গবাদি পশু ৪০০, হাঁস-মুরগি ৬৫, হ্যাচারি ২। যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকা রাস্তা ৯০ কিমি, কাঁচা রাস্তা ২৮০, রেলপথ ২৩ কিমি; নৌপথ ১৫ নটিক্যাল মাইল। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় সনাতন বাহন পালকি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।

শিল্প ও কলকারখানা জুট মিল ১, স্পিনিং এন্ড কটন মিল্‌স ১, গণস্বাস্থ্য টেক্সটাইল মিলস্‌ ১, সিমেন্ট কারখানা ১, ফ্লাওয়ার মিল ১। কুটিরশিল্প খাদ্য ও খাদ্যজাত ১,০৬৮,

www.pathagar.com

তাঁত ১৭,৩৬০, বাঁশ ও বেত ৩৫, পাট ও পাটজাত ৮০, স্বর্ণকার ৯০, কারুপণ্য ৩৩, পাটি ও মাদুর তৈরি ২২, কামার ১২৭, কুমার ৪০, কাঠের কাজ ৬০০।

হাটবাজার, মেলা হাটবাজার ২১; উল্লেখযোগ্য হাটবাজার: কালিয়াকান্দাপাড়া, রতনকান্দি ও বাগবাটি বাজার। প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পাট, গুড়, ময়দা, তাঁত শাড়ি, লুঙ্গি, গ্রামীণ চেক। এনজিও কার্যক্রম রোটারি ক্লাব, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, কেয়ার, গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা, গণকল্যাণ সংস্থা, এনডিপি, গ্রামীণ উদ্যোগ, এসডিএস, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিরাজগঞ্জ উত্তরণ মহিলা সংস্থা, দ্বীপসেতু, অনন্য সমাজকল্যাণ সংস্থা, সুন্দর, সার্প (সোসিও হেলথ্ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশান প্রোগ্রাম), সোসাল ওয়ার্ক সেন্টার। স্বাস্থ্যকেন্দ্র জেলা সদর হাসপাতাল ১, বেসরকারি হাসপাতাল ৩, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক ১, পল্লী চিকিৎসা কেন্দ্র ১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৯, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ১, শিশু হাসপাতাল ১, চক্ষু হাসপাতাল ১, ডায়াবেটিক ক্লাব ১, ক্লিনিক ৬, সন্ধানী ডোনার ক্লাব ১।[১]

চ. বিভিন্ন উপজেলার আয়তন ও জনসংখ্যা

ক্রমিক	উপজেলার নাম	আয়তন	জনসংখ্যা	পুরুষ	নারী
১.	শাহজাদপুর	৩২৪ বর্গ কিলোমিটার	৫,৬১,০৭৬ জন	২৮৩৩৩০ জন	২৭৭৭৪৬ জন
২.	উল্লাপাড়া	৪১৪ বর্গ কিলোমিটার	৫৪০১৫৬ জন	২৬৯৪৮১ জন	২৭০৬৭৫ জন
৩.	রায়গঞ্জ	২৬৮ বর্গ কিলোমিটার	৩১৭৬৬৬ জন	১৫৮৬০৪ জন	১৫৯০৬২ জন
৪.	তাড়াশ	২৯৭ বর্গ কিলোমিটার	১৯৭২১৪ জন	৯৭৪৪৭ জন	৯৯৭৬৭ জন
৫.	বেলকুচি	১৬৪ বর্গ কিলোমিটার	৩৫২৮৩৫জন	১৭৯৭৩৮ জন	১৭৩০৯৭ জন
৬.	চৌহালী	২৪৪ বর্গ কিলোমিটার	১৬০০৬৩ জন	৮০২৫২ জন	৭৯৮১১ জন
৭.	কামারখন্দ	৯২ বর্গ কিলোমিটার	১৩৮৬৪৫ জন	৬৮৪১১ জন	৭০২৩৪ জন
৮.	সিরাজগঞ্জ সদর	৩২৬ বর্গ কিলোমিটার	৫৫৫১৫৫ জন	২৭৯১১৩ জন	২৭৬০৪২ জন
৯.	কাজিপুর	৩৬৯ বর্গ কিলোমিটার	২৭৪৬৭৯ জন	১৩৪৯৯২ জন	১৩৯৬৮৭ জন

www.pathagar.com

ছ. বিভিন্ন উপজেলার শিক্ষার হার

ক্রমিক	উপজেলার নাম	পুরুষ	নারী	গড়হার
১.	শাহজাদপুর	৪১.৬%	৩৫.১%	৩৮.৪%
২.	উল্লাপাড়া	৪৭.২%	৪০.১%	৪৩.৬%
৩.	রায়গঞ্জ	৪১.১%	৩৫.২%	৩৮.১%
৪.	তাড়াশ	৪৩%	৩৫.১%	৩৯%
৫.	বেলকুচি	৪৮.২%	৪৩.১%	৪৫.৭%
৬.	চৌহালী	৪০.৬%	৩২.৫%	৩৬.৫%
৭.	কামারখন্দ	৪৮.৯%	৪৩.৭%	৪৬.২%
৮.	সিরাজগঞ্জ সদর	৫০.১%	৪৫.৮%	৪৮%
৯.	কাজিপুর	৪০.৭%	৩৪.৪%	৩৭.৫%

জ. ব্যবসা বাণিজ্য

বিট্রিশ আমলে সিরাজগঞ্জ গড়ে ওঠে একটি ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে। কালক্রমে বাণিজ্যিক কেন্দ্রটি গোটা উত্তরবঙ্গের তথা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বন্দর হিসেবেও খ্যাতি লাভ করে। পলিমাটি বিধৌত সিরাজগঞ্জের পাট সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদা পাওয়ায় এখানে গড়ে ওঠে ইংরেজ-মাড়োয়ারি বেনিয়াদের পাট ক্রয়কেন্দ্র। নৌ ও রেলপথে তৎকালীন রাজধানী কলকাতার সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সিরাজগঞ্জকে বলা হতো 'দ্বিতীয় কলকাতা'। নৌপথ উন্মুক্ত ও স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যমুনার শাখা নদীগুলি খনন ও বিস্তৃত করা হয়। খনন করা হয় শহরের মাঝ দিয়ে কাটাখালী। এই কাটাখালীর পূর্বপাশ দিয়ে গড়ে ওঠে পাট বেচাকেনার কেন্দ্র পাটের কুঠি। যার মালিক ছিল ইংরেজ ও মাড়োয়ারি কোম্পানি। বাংলাদেশে প্রথম একমাত্র বেলিং মেশিন (কাঁচা বেল) স্থাপিত হওয়ায় পাট ব্যবসায়ের প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়। পাটের বেল চলে যেত কলকাতা বন্দর নগরীর উদ্দেশ্যে সেখানকার জুট মিলের জন্য এবং সাত সমুদ্র পাড় ইংল্যান্ডের ডান্ডিতে।

১৮৮৩ সালে এই কাটাখালীর উপরে ৪৫০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় ১২৯ ফুট লম্বা এক স্প্যানবিশিষ্ট একটি ব্রিজ। শহরের দু'পাশের জনগণের সুবিধার্থে শহরকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য এ ব্রিজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার আলফ্রেড ইলিয়ট। তাঁর নামানুসারেই এই ব্রিজটি নামকরণ করা হয় ইলিয়ট ব্রিজ। আজও কালের নিরব সাক্ষী হিসেবে সৌন্দর্যের প্রতীক রূপে দাঁড়িয়ে আছে এ ব্রিজটি।

সিরাজগঞ্জ পাটের জন্য বিখ্যাত হওয়ায় একটি ইংরেজ কোম্পানি ১৮৭৫ সালে এখানে গড়ে তোলেন একটি মিনি জুট মিল। সেখানে ৩৫৮ জন মহিলা শ্রমিক ও ৩৩৩ জন শিশু শ্রমিক কাজ করতো। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে সেই জুট মিলটি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত

www.pathagar.com

হয়। পাট শিল্পের ঐতিহ্যগত কারণেই ১৯৬৪ সালে সিরাজগঞ্জ রায়পুর স্টেশনের পাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে তোলা হয় উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম পাট কল 'কওমী জুট মিল্‌স'। এছাড়া তাঁত ও সুতা শিল্পে সিরাজগঞ্জ বরাবরই সমৃদ্ধশালী।

শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, বেলকুচি, চৌহালী থানা তাঁত শিল্প সমৃদ্ধ এলাকা হিসেবে খ্যাত। এ জেলার অন্যান্য শিল্প কারখানার মধ্যে সিরাজগঞ্জ স্পিনিং ও কটন মিল্‌স, মিল্কভিটা, ৫টি বস্ত্রকল, সিমেন্ট কারখানা, উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম ময়দা কল নর্দান ফ্লাওয়ার মিল্‌সসহ অর্ধ-শতাধিক ময়দা কল, সরিষা তেলকল, ওপেল বিস্কুট ফ্যাক্টরিসহ অনেক ছোট বড় মিল কারখানা গড়ে উঠেছে। পাট ছাড়াও রপ্তানি হতো সরিষা, আলু, কাঁচা তরকারি, হাঁস-মুরগি, ডিম, মাছ প্রভৃতি। আমদানির বিষয় ছিল ঔষধ, কেরোসিন, লৌহজাত দ্রব্যাদি, ঢেউটিন, লবণ, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ইত্যাদি।[২]

ঝ. সিরাজগঞ্জ জেলার শিল্প

মিল্কভিটা

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি ইউনিয়ন লিমিটেড নামক সংস্থার তৈরি সামগ্রীর ট্রেড-মার্কের নাম মিল্কভিটা। এটি সমবায়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত সাধারণত মিল্কভিটা নামে পরিচিত। এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দুধ সংগ্রহ করে শহরবাসীর দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর চাহিদা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটার সবচেয়ে বড় কারখানাটি শাহজাদপুর উপজেলা সদর থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার অদূরে বাঘাবাড়ি নামক স্থানে অবস্থিত। উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুরে ১৯৪২ সালে প্রথম এ কারখানাটি স্থাপিত হয়েছিল।

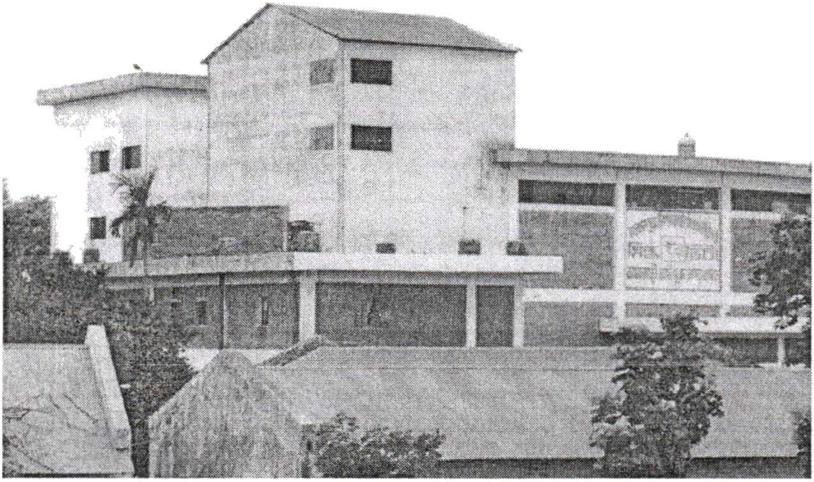

www.pathagar.com

১৯৭৬ সালে ডেনিশ ক্রেডিট কোং-এর সহযোগিতায় আধুনিক প্রযুক্তি সংযোগে বর্তমানে কারখানাটি চালু রয়েছে। এই কারখানায় দুধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াও দুগ্ধজাত ঘি, মাখন, দই, গুড়াদুধ, তরল দুধ ও আইসক্রিমসহ নানা ধরণের পণ্য উৎপাদিত হচ্ছে। মিল্কভিটার প্রধান উপকরণ দুধের প্রায় ৮০% শাহজাদপুরের বিভিন্ন গ্রামের খামার থেকে সংগ্রহ করা হয়। বর্তমানে এই খামারের সংখ্যা প্রায় ৮৪৬৮টি। এসকল খামারের বেশিরভাগ ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। এসব খামারে উন্নতজাতের গাভী পালন করা হয় এবং কোনো কোনো গাভী থেকে দিনে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লিটার পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়।

বাঘাবাড়ি মিল্কভিটা এ অঞ্চলের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি সৃষ্টির মাধ্যমে দুধ ক্রয় করে থাকে। প্রতিটি সমিতিতে সভাপতি, সহ-সভাপতি ও ডাইরেক্টরসহ ছয় সদস্যের একটি কমিটি থাকে। এই কমিটি সদস্যরা প্রতিদিন সকাল ও বিকেল দুধ সংগ্রহ করে মিল্কভিটায় পোঁছে দেয়। মিল্কভিটা দুধ থেকে আহরিত ফ্যাট বা চর্বির ভিত্তিতে দর নির্ধারণপূর্বক সপ্তাহে একবার সরবরাহকারীদের দুধের বিল পরিশোধ করে থাকে। তাছাড়া দুধ যোগানদারদের প্রণোদনা হিসেবে বার্ষিক দুইবার বোনাস প্রদান করা হয়। এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে দুধ উৎপাদন হয় বলে দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য তৈরি কারখানা গড়ে উঠেছে ব্যাপক হারে এবং অত্যন্ত সুলভ মূল্যে মিষ্টি ও মিষ্টিজাত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয় করে থাকে। এ সংস্থার দুগ্ধজাত সামগ্রী 'মিল্কভিটা' ট্রেডমার্ক নামে বাজারজাত হয়।[৩]

তাঁত শিল্প

সিরাজগঞ্জ দেশের অন্যতম তাঁত অধ্যুষিত এলাকা। তাঁত শিল্প সিরাজগঞ্জ জেলাকে বিশ্ব দরবারে যেমনটি পরিচিত করেছে তেমনি করেছে সমৃদ্ধ। এ জেলা তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। সিরাজগঞ্জ জেলার সাথে তাঁতের নাম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। এ জেলায় হস্তচালিত তাঁতে বছরে প্রায় ৭১০ কোটি মিটার বস্ত্র উৎপাদিত হয় যা অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৪০ ভাগ মিটিয়ে থাকে। এ শিল্প থেকে মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প এদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। সরকার কর্তৃক সম্পাদিত তাঁত শুমারি ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বর্তমান ৫ লক্ষাধিক হস্তচালিত তাঁত রয়েছে তম্মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলাতে রয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজারের অধিক। তাঁতী পরিবারের সংখ্যা ১৪,৮৭০। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণসহ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে দ্বিতীয় অবস্থানে। দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ লোক পেশার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জ জেলার উপজেলাওয়ারি তাঁত ও তাঁতী সংখ্যা নিম্নরূপ

ক্রমিক	উপজেলার নাম	তাঁতী পরিবার	চালু তাতের সংখ্যাঙ	বন্ধ তাঁতের সংখ্যা	মোট তাঁত সংখ্যা
১	শাহজাদপুর	৪৯৬১	৩৪৬৪৪	১৩১৯৫	৪৭৮৩৯
২	উল্লাপাড়া	১৮৮৬	১১০৫৭	৩৭৮৮	১৪৮৪৫
৩	রায়গঞ্জ	৮৫৫	৩৯৮৮	১৫৯৩	৫৫৮১
৪	তাড়াশ	০৩	০৮	০১	০৯
৫	বেলকুচি	৩৫১২	২৫১৯৫	১৪৪১৯	৩৯৬১৪
৬	চৌহালী	৬২৯	৩৯৯১	২৪৯১	৬৪৮২
৭	কামারখন্দ	৫৫৭	৩১৯২	২৩৮	৩৪৩০
৮	সিরাজগঞ্জ সদর	১৯৯৭	১১৫৩৮	৪৩৭৮	১৫৯১৬
৯	কাজিপুর	২২৫	১৩৪৪	৩৩৫	১৬৭৯
	সর্বমোট	১৪৬২৫	৯৪৯৫৭	৪০৪৩৮	১৩৫৩৯৫

দেশের অন্যান্য জেলার মতো সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত শিল্পে নিয়োজিত বেশিরভাগ লোক প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে। তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বাজারজাতকরণের প্রচলিত ব্যবস্থা এখানো অত্যন্ত অসংগঠিত। জেলার কয়েকটি হাটে

www.pathagar.com

তাঁতীদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় হতে দেখা যায়, যার মধ্যে শাহজাদপুর হাট, সোহাগপুর হাট, শাহাপুর হাট, এনায়েতপুর হাট ও সিরাজগঞ্জ নিউমার্কেট হাট অন্যতম। বিদ্যমান বিপণন ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এখনো বিদ্যমান। মহাজন, পাইকারি, খুচরা ব্যবসায়ীরা তাঁতীদের নিকট থেকে বস্ত্র ক্রয় করে থাকে। এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে এসব বস্ত্র ক্রয় করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অতি মুনাফাতে বিক্রয় করে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁত বস্ত্র বিপণনের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে তোলা হলে তাঁতীরা তাদের উৎপাদিত বস্ত্রের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হবে না। তাঁতীরাও প্রত্যাশা করে তাদের উৎপাদিত বস্ত্র বিক্রয় ও রপ্তানির মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের উন্নয়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হবে। কিন্তু অবহেলিত তাঁতীদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ থেকে যায়। ক্রমাগত সুতার মূল্য, রং ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির দাম বৃদ্ধি এবং তাদের উৎপাদিত বস্ত্র সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে তাঁতীরা ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা ক্রমান্বয়ে হয়ে পড়ছে বিপর্যস্ত। এভাবে আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার কারণে এ জেলার অনেক তাঁতী পেশা বদল করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ বিপুল সম্ভাবনার এই খাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করলে সহজেই অনেক সুফল পাওয়া যাবে বলে অনেকের ধারণা।

এ অঞ্চলের তাঁত শিল্পের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে সুষ্ঠু সংগঠনের অভাব, মূলধনের অভাব, ন্যায্য মূল্যে মানসম্মত উৎপাদন উপকরণ সহজলভ্য না হওয়া, প্রযুক্তিগত অনগ্রসরতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার অভাব, উৎপাদিত বস্ত্রের বিপণনের অভাব অন্যতম। সিরাজগঞ্জ জেলার তাঁত শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও তাঁতীদের কল্যাণার্থে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের তিনটি বিসিক (বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন) সেন্টার রয়েছে। এগুলো হলো সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচি, কামারখন্দ, কাজিপুর ও তাড়াশ উপজেলা নিয়ে বিসিক সেন্টার সিরাজগঞ্জ, শাহজাদপুর ও চৌহালী উপজেলা নিয়ে বিসিক সেন্টার শাহজাদপুর এবং উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ উপজেলা নিয়ে বিসিক সেন্টার উল্লাপাড়া কাজ করে যাচ্ছে। উল্লিখিত বিসিক সেন্টারগুলো থেকে এ জেলার তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কর্মসূচির মাধ্যমে ঋণ দিয়ে থাকে। এবং বিভিন্ন কাস্টম হাউসে রক্ষিত সুতা স্বল্পমূল্যে বিভিন্ন তাঁতীদের সমিতিতে বরাদ্দ দিয়ে থাকে। এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে জড়িত লোকদের কল্যাণার্থে সরকারসহ সকলের এগিয়ে আসা উচিৎ। দেশীয় এ শিল্প রক্ষার মাধ্যমে যেমন বস্ত্রের চাহিদা মিটিয়ে আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যাবে, তেমনি অন্যদিকে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। তাই যেকোনো মূল্যে এই সম্ভাবনাময় শিল্পকে রক্ষা করে একে আরো আধুনিক ও সময়োপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।[৪]

ঞ. বাঘাবড়ি নদীবন্দর

সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় আভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন খাতের উন্নয়ন তত্ত্বাবধানের ধারায় বিআইডাব্লিউটিএ অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল এবং খুলনায় পাঁচটি প্রধান অভ্যন্তরীণ

www.pathagar.com

বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার ১৯৬০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখের তারিখের ৪৬২-এইচটিডি নং গেজেট নোটিফিকেশন দ্বারা ১৯০৮ সালের বন্দর আইনের প্রবিধিসমূহ এই পাঁচটি অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তী সময়ে আইডাব্লিউটি খাতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের ছয়টি নতুন অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর প্রতিষ্ঠা করা হয়। পটুয়াখালী (১৯৭৫), নগরবাড়ি (১৯৮৩), আরিচা (১৯৮৩), দৌলতদিয়া (১৯৮৩), বাঘাবাড়ি (১৯৮৩) এবং নরসিংদীতে (১৯৮৩)। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার বড়াল নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছে বাঘাবাড়ি নদীবন্দর। বাঘাবাড়ি নদী বন্দরের পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্য এবং সার সরবরাহের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়। এই বন্দরটি সিরাজগঞ্জের অর্থনীতিতে বিরাট ভূমিকা রাখছে।[৫]

ট. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সিরাজগঞ্জ ছিল অগ্রগামী। এক্ষেত্রে অতীত গৌরব বহন করে সিরাজগঞ্জ ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ব্রিটিশ আমলের নাট্যভবনে (বর্তমানে ভাসানী মিলনায়তন) প্রতিনিয়ত চর্চা হত নাটক নৃত্যকলার। এখানকার নাট্যশিল্পীরা আজ জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত। প্রথিতযশা চলচ্চিত্রকার মরহুম ফতেহ লোহানী, ফজলে লোহানী, ফররুখ শিয়রসহ বহু কীর্তিমান শিল্পী এ সিরাজগঞ্জেরই সন্তান। উপমহাদেশের চলচ্চিত্র জগতের কিংবদন্তির নায়িকা সুচিত্রা সেন, কাননবালা ও বলিষ্ঠ চিত্র অভিনেতা পাহাড়ী সান্যালের পৈত্রিক বাসভূমি এ সিরাজগঞ্জেই। সাংস্কৃতিক চর্চায় সিরাজগঞ্জ শিল্পকলা একাডেমিসহ বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং জাতীয় পরিসরেও রয়েছে অনন্য ভূমিকা।

নদীমার্তৃক সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলিময় সিরাজগঞ্জ জেলার এই অপরূপ প্রকৃতিতে রয়েছে শিল্প-সাহিত্যেরও অঢেল উপকরণ। তাই এই জেলার রূপময় প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুকাল থেকেছেন শাহজাদপুরে। এখানে তাঁর কাছারিবাড়িতে বসে শুধু জমিদারি কাজের তদারকিই করেননি, রচনা করেছেন বহু কাব্য, নাটক, গল্প যা তাঁকে করেছে বিশ্বনন্দিত। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও এসেছিলেন ১৯৩২ সালে 'তরুণ মুসলিম' সম্মেলনের সভায় সভাপতিত্ব করতে। সাথে ছিলেন সুকণ্ঠী গায়ক আব্বাস উদ্দিনসহ বহিরাগত বহু গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ এবং কবির বন্ধুবর্গ। সময় ছিল বর্ষাবিগম মৌসুম। শহর, শহরতলীসহ মহকুমার বিভিন্ন স্থান ঘুরে ফিরে দেখেন-'বাংলার বুলবুল বিদ্রোহী নজরুল'। সিরাজগঞ্জের প্রাকৃতিক রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি স্মৃতি বিজড়িত ইরানের সিরাজ নগরীর সাথে সিরাজগঞ্জকে তুলনা করেন। ১৯৬৮ সালে সিরাজগঞ্জে একটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে দেশের খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকরা এসেছিলেন। এ জেলায় জন্ম নিয়েছে অনেক কৃতি শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, বিজ্ঞানী, লোকবিজ্ঞানী, চিকিৎসক, রাজনীতিক। বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'অনল প্রবাহের' কবি ও বাগ্মী বাংলার অবহেলিত মুসলিম সমাজ জাগরণের অগ্রদূত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কবি রজনীকান্ত সেন, উপমহাদেশের খ্যাত

www.pathagar.com

গণিতবিদ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, ঔপন্যাসিক নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, বিজ্ঞান সাহিত্যিক ডক্টর আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকবিজ্ঞানী কবি, গবেষক ডক্টর মযহারুল ইসলাম, চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এম. এ. মতিন, রাজনীতিবিদ মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী প্রমুখ। এছাড়াও বর্তমানে জাতীয় অঙ্গণে রয়েছে অনেক সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব।[৬]

ঠ. মুক্তিযুদ্ধ ও সিরাজগঞ্জ মহকুমা

মুক্তি সংগ্রাম আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। সিরাজগঞ্জের আপামর জনসাধারণ স্বাধীনভাবে শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে এই সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের প্রথম ভাগেই স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, যানবাহন, রেল, স্টিমার, মিল, কারখানা সব বন্ধ রাখতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন ও আওয়ামীলীগ কর্মীবৃন্দ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন মরহুম মোতহার হোসেন তালুকদার এমএলএ এবং সদস্য সচিব ছিলেন জনাব আনোয়ার হোসেন রতু। একই সাথে জেলা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়, যার আহ্বায়ক ছিলেন আলমগীর।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ৩রা মার্চ ১৯৭১ সালে জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তৎকালীন ছাত্রনেতা জনাব এম. এ রউফ প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ৮ই মার্চ ১৯৭১ তারিখ হতে আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদ এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কলেজ মাঠ ও স্টেডিয়াম মাঠে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ শুরু হয়। কলেজ মাঠে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আনসার কমান্ডার আবদুর রহমান, ল্যান্স নায়েক লুৎফর রহমান অরুণ এবং রবিউল ইসলাম (গেরিলা)। স্টেডিয়াম মাঠে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহকারী আনসার কমান্ডার বাহাজ আলী, সেনা সদস্য আমজাদ হোসেন ও রাইফেল ক্লাবের সদস্য জহুরুল ইসলাম মিন্টু।

পাক বাহিনী যাতে সিরাজগঞ্জে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য শাহজাদপুর উপজেলাধীন বাঘাবাড়ি ফেরিঘাটে স্থানীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক শহীদ শামসুদ্দিন উক্ত প্রতিরোধ যুদ্ধে সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করেন। এমনকি তিনি অস্ত্রাগার হতে সকল অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে তুলে দেন। প্রবল প্রতিরোধের কারণে একমাস পর ২৬ এপ্রিল সিরাজগঞ্জ শহরে পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে। পাক হানাদার বাহিনী প্রবেশ করে নির্বিচারে শহরের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়, লুটতরাজ করে, নিরীহ জনগণকে হত্যা, ধর্ষণ এবং নির্যাতন করতে থাকে। পাক সেনারা সিরাজগঞ্জ দখল করার পর মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও মুক্তিযোদ্ধারা উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং আধুনিক অস্ত্রের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে ভারতে গমন করেন। ভারতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষ করে মুক্তিযোদ্ধাগণ সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েন এবং পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন। উল্লেখযোগ্য যুদ্ধের মধ্যে রয়েছে যুব শিবিরের নেতৃত্বে ভদ্রঘাট, ব্রহ্মগাছা ও

www.pathagar.com

নওগার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম যুদ্ধ ছিল। ৭ নং সেক্টরের এফ উইং এর নেতৃত্বে কাজিপুর থানা দখলের জন্য মুক্তিযোদ্ধারা দু'বার থানা আক্রমণ করেন এবং বড়ইতলীতে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এসকল যুদ্ধে বেশ কিছু পাকসেনা হতাহত হয় এবং সাতজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন।

৭ নং সেক্টরের এফ উইং এর নেতৃত্বে বেলকুচি থানা দখলের জন্য আরও একটি ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা থানার দখল গ্রহণ করে থানার সকল অস্ত্র হেফাজতে নেন এবং ১২জন রাজাকারকে গ্রেফতার করেন। এতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা আহত হন। বেলকুচির রাজাপুর, সমেশপুর ও কালিয়াহরিপুর ব্রিজে এফএফদের নেতৃত্বে পাকসেনাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ সংগঠিত হয়। পলাশডাঙ্গা যুবশিবির, এফএফ ও বিএলএফ এর মুক্তিযোদ্ধাগণ একে একে তাড়াশ, রায়গঞ্জ, উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুরসহ জেলার বিভিন্ন স্থানে পাকহানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে ঐ সকল এলাকা দখল করে নেয়। সবশেষে ১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সিরাজগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাগণের অধিকাংশ দল একত্রে সিরাজগঞ্জ শহরের উত্তরে শৈলাবাড়ি পাক হানাদার ক্যাম্প আক্রমণ করেন। এখানে সিরাজগঞ্জ এর সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধ সংগঠিত হয়। এ যুদ্ধে পাক বাহিনী পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করে এবং তারা ব্যাপকভাবে হতাহত হয়। তাছাড়া ইঞ্জিনিয়ার আহসানুল হাবিব ও সোহরাব আলীসহ ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অবশেষে মিত্র বাহিনীর কোনরূপ সহায়তা ছাড়াই ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সিরাজগঞ্জ এর বীর মুক্তিযোদ্ধগণ সিরাজগঞ্জ শহরকে এবং ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলা শত্রুমুক্ত করেন।[৭]

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বজন গৃহীত 'শত্রুমুক্ত অঞ্চল' ঘোষণার তারিখসমূহ :

ক্রমিক	উপজেলার নাম	'শত্রুমুক্ত অঞ্চল' ঘোষণার তারিখ
১	শাহজাদপুর	১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১
২	উল্লাপাড়া	১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৩	রায়গঞ্জ	১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৪	তাড়াশ	১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৫	বেলকুচি	১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৬	চৌহালী	২৫শে নভেম্বর ১৯৭১
৭	কামারখন্দ	১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৮	সিরাজগঞ্জ সদর	১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১
৯	কাজিপুর	৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১

ড. রাজনৈতিক পরিমণ্ডল

রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সিরাজগঞ্জ বহু পূর্ব থেকেই ছিল অগ্রগামী। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ বেনিয়া শাসক ও তাদের সেবাদাস জমিদার জোতদার মহাজনদের অত্যাচারের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে নীল বিদ্রোহ, পলো বিদ্রোহ, 'বাংলার জালিয়ানওয়ালাবাগ' রক্তাক্ত সলঙ্গা বিদ্রোহের ন্যায় ঐতিহাসিক কৃষক সংগ্রামও সংগঠিত হয়েছে এ সিরাজগঞ্জেই। রাজনৈতিক দিক থেকে সিরাজগঞ্জ বিশেষ গুরুত্ব বহন করায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দিন, আবুল হাশিম, মাওলানা আকরাম খাঁ, আব্দুল গাফফার খান, আব্দুল কাইয়ূম খান, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় বরেণ্য প্রখ্যাত চারণ কবি মুকুন্দ দাস, পল্লী কবি জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ এই পুণ্য ভূমিতে অনুষ্ঠিত বহু রাজনৈতিক সম্মেলন, সভা সমাবেশে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মহাকালের পরিক্রমায় জন্ম নিয়েছে ঐতিহাসিক নেতৃত্ব। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, মহান ভাষা আন্দোলনে, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলনে, অসহযোগ-আন্দোলনে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে সিরাজগঞ্জের ভূমিকা অনন্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্নে পাকহানাদার বিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রাম সংগঠিত করতে এ সময়ে বেশ কিছু যুব নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়। জনাব আব্দুল লতিফ মির্জার নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে গড়ে ওঠে পলাশডাঙ্গা যুব শিবির। বীর মুক্তিযোদ্ধারা সরাসরি যুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর সুদৃঢ় অবস্থান ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। নয় মাসের যুদ্ধে পাকবাহিনী পরাজিত হলে যুব নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে মুক্ত স্বাধীন পতাকা উড্ডীয় হয়। উল্লেখ্য, ভারতীয় 'মিত্র বাহিনীর' সাহায্য ছাড়াই সিরাজগঞ্জ পাকহানাদার বাহিনী মুক্ত হয়।[৮]

ঢ. ঐতিহ্য/বিশেষত্ব

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে সিরাজগঞ্জ পাবনা জেলার মহকুমা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপন বৈশিষ্ট্যে সুপরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ছিল। সিরাজগঞ্জ জেলা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও লোকাসংস্কৃতিতে গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী।[৯]

ণ. সিরাজগঞ্জ কৃষকবিদ্রোহ

বৃহত্তর পাবনা জেলার বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলা একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এলাকা। এই এলাকায় ১৮৭৩ সালে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়। এই কৃষকবিদ্রোহ ইতিহাসে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ বা পলোবিদ্রোহ নামে পরিচিত। কারণ কৃষকরা সংঘর্ষের সময় মাছ ধরার পলোকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতো। শাহজাদপুর থানা এলাকা ইউসুফশাহী পরগনার অন্তর্গত। এই ইউসুফশাহী পরগনা বা শাহজাদপুরে যে কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তা ছিল অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম সফল কৃষক বা প্রজাআন্দোলন। এই বিদ্রোহ বা আন্দোলনের ফলে জমির উপর কৃষকের অধিকার অনেকাংশে স্বীকৃত হয়েছিল। সিরাজগঞ্জ তথা পাবনা কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহ ইতিহাসে একটি বিস্মৃতিপ্রায় ঘটনা। সমগ্র উপমহাদেশ, অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান

www.pathagar.com

বাংলাদেশেও বাঙালি কৃষকদের আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের সমাজ জীবনে একটি গৌরবজনক অধ্যায় হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। আবহমানকাল থেকে বাঙালি কৃষক নিপীড়িত ও নির্যাতিত। তাই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের শত শত ঘটনার জন্ম দিয়েছে বাঙালি কৃষকগণ। ১৮৭৩ সালে তৎকালীন পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষকগণ আন্দোলন ও সংগ্রামের একটি মাইলফলক স্থাপন করেছিল। এই সময় উপমহাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম জমিদারি প্রথাম উচ্ছেদের দাবি উঠেছিল। ভূমির অধিকার নিয়ে এটাই ছিল প্রথম গণতান্ত্রিক সংগ্রাম। উপমহাদেশের প্রথম ভূমিসংস্কার আন্দোলন। এমনকি সমগ্র উপমহাদেশের মধ্যে এটাই প্রথম গ্রামাঞ্চলের মধ্যে ধর্মঘট ও হরতালের সূচনা করেছিল। ধর্মঘটী কৃষকগণ জমিদারের খাজনা বন্ধ করে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে এই এলাকায় তিন বছর জমির খাজনা বন্ধ ছিল। সিরাজগঞ্জ তথা পাবনার কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তেত্রিশ বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়ে প্রজাবিদ্রোহের তথ্যসমূহ আজ বিলুপ্তপ্রায়। বাংলাদেশে এই প্রজাবিদ্রোহ নিয়ে তেমন কোনো কাজ হয়নি। তবে শাহজাদপুরের জনাব আকতার উদ্দিন মানিক পাবনা প্রজাবিদ্রোহের উপর একটি মূল্যবান কাজ করেছেন। তাঁর প্রদত্ত বেশ কিছু তথ্যে এ লেখাটি সমৃদ্ধ।

কৃষকবিদ্রোহের পটভূমি

১৯৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাঙালির স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। উদিত হয় মহাপরক্রমশালী ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম সূর্য। বাংলা শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের সাথে সাথে দ্রুত যবনিকাপাত ঘটতে থাকে মধ্যযুগের মুসলিম সামন্ত শক্তির। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল প্রবাঞ্চনা, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ ও দমননীতির। ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এই একশ বছরের ইতিহাস ছিল সংগ্রামের ইতিহাস। এ সুদীর্ঘ সময়ে বাংলার সর্বত্র বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে জনগণ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে, আবার কখনো সংগঠিতভাবে লড়াই করেছে, বিদ্রোহ করেছে। কখনো তারা ব্যর্থ হয়েছে, আবার কখনো পেয়েছে সাময়িক সাফল্য। ফকির বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম সংঘটিত সংঘবদ্ধ অন্দোলন। সংগ্রামী শহীদ তিতুমীরের আন্দোলন ছিল স্বাধিকার আন্দোলন। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশে যেসব ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছিল, ফরায়েজী আন্দোলন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি এটি ছিল কৃষক আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম উপমহাদেশের ইতিহাসে এক অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এট প্রথম সংগ্রাম। উনবিংশ শতাব্দির মধ্যভাগের গণআন্দোলনের মধ্যে বাংলার নীলবিদ্রোহ ও প্রজাবিদ্রোহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিদ্রোহ বাংলার কৃষক সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিল।

ইংরেজ শাসকগণ তার শক্তি ও লোকবলের স্বল্পতার কারণে দেশ শাসন আর শোষণের জন্য তৈরি করে এক পরজীবী শ্রেণির। এই ভয়ংকার পরজীবীকুলই হলো জমিদার শ্রেণি। এই শ্রেণি কৃষক ও জনসাধারণের উপর অর্থনৈতিক নিপীড়ন চালাতো,

www.pathagar.com

খাজনা আদায়ের নামে শারীরিক পীড়ন এবং সম্পদ লুণ্ঠন করতো। অত্যাচার আর নিপীড়নজনিত কারণে উনিশ শতকে বার বার গণঅসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। কখনো কখনো তা গণবিদ্রোহের রূপান্তরিত হয়েছিল। এই গণবিদ্রোসমূহের কতকগুলো ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যাপকতার জন্য তা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নেবর্ণিত এই সাতটি কৃষক তথা গণবিদ্রোহ বাঙালির ইতিহাসের গৌরবজনক অধ্যায় এবং এই কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহসমূহ উনিশ শতকের বাঙালির ইতিহাসকে করেছে মহিমামণ্ডিত।

১. ফকির বিদ্রোহ : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা লাভের পর সর্বপ্রথম যে বিদ্রোহ সংঘবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা ইতিহাসে ফকির বিদ্রোহ নামে পরিচিত। ফকিররা ১৭৬০ সাল থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করেছিলেন। ফকিরদের সাথে সন্ন্যাসীরাও সংঘবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহ করেছিলেন। এ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে মজনু শাহ ও ভবানী পাঠক। ১৭৬৭ ও ১৭৬৯ সালে ফকিরদের সঙ্গে কোম্পানির কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে ইংরেজ সেনাপতিসহ অনেকে নিহত হয়। ১৭৭৬ সালে ফকিররা মহাস্থানে একটি দূর্গ নির্মাণ করেন। ১৭৮২ সালে চরকায়থ নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদের সাথে ফকিরদের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ফকিরগণ পরাজিত হন। ১৭৮৮ সালে ফকির মজনু শাহের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফকির অন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

২. তিতুমীরের বারাসত বিদ্রোহ : বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে শহীদ তিতুমীরের নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিতুমীরের নেতৃত্বে চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে ১৮৩১ সালে সংঘটিত হয়েছিল কৃষকবিদ্রোহ। যা ছিল বিশেষভাবে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাংলার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। তিতুমীর অসম্প্রদায়িক ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান কৃষক ঐক্যবদ্ধ করে জমিদারদের অতিরিক্ত করারোপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলে ছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিতুমীরের এ আন্দোলন গণআন্দোলনে রূপ নেয়। তিতুমীরের জনপ্রিয়তা দেখে পূর্ণিয়ার জমিদার কষ্ণদেব মুসলমান কৃষকদের দাড়ির ওপর জনপ্রতি আড়াই টাকা হারে কর আরোপ করেন। ১৮২৫ সালে তিতুমীর বারাসতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি চব্বিশ পরগনার কিছু অংশ নদীয়া ও ফরিদপুরের একাংশ নিয়ে এক স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করেন। তাঁকে দমন করার জন্য বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে প্রেরিত সশস্ত্রবাহিনী তিতুমীরের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এ বিদ্রোহ বারাসত বিদ্রোহ নামে পরিচিত। উইলিয়াম হান্টারের মতে, এ বিদ্রোহে ৮৩ হাজার কৃষকসেনা তিতুমীরের পক্ষে যোগদান করে। জমিদার, মহাজন ও ইংরেজ নীলকরদের তিতুমীর আক্রমণ করে তাদের যথাবিহিত শাস্তি বিধান করেছিলেন। তিনি ইংরেজ রাজত্বের অবসান দাবি করেছিলেন। বারাসতের বিদ্রোহের পর তিতুমীর ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ অনিবার্য বুঝতে পেরে ১৮৩১ সালে চব্বিশ পরগনার বারাসতের নারিকেল বাড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা নির্মাণ এবং সেখানে যুদ্ধাস্ত্র জমা

www.pathagar.com

করেন। ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর উপরিউক্ত স্থানে তিতুমীরের ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। তিতুমীর নির্ভীক বীরের মতো যুদ্ধ করে শহীদ হন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট মি. আলেকজান্ডরের নির্দেশে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি ভবিষ্যৎ স্বাধীনতাকামী সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবেন চিরদিন। ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে একজন কৃষক নেতা হিসেবে তিতুমীরের অবদান অমর হয়ে থাকবে।

৩. ফরায়েজী আন্দোলন : হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তাঁর পুত্র দুদু মিয়ার নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছিল ফরায়েজী আন্দোলন। হাজী শরীয়তুল্লাহ মক্কা থেকে বিদ্যা অর্জন শেষে ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্বদান করেন। তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো তিনি বাংলার কৃষকদের মধ্যে জাগরণে সঞ্চার করেন। হাজী শরীয়তুল্লাহ ১৮৪০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র দুদু মিয়া এই আন্দোলন অব্যাহত রাখেন। ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়েছিল ফরিদপুর জেলায়। পরে এই আন্দোলন অন্যান্য স্থানেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল জমি সৃষ্টিকর্তার দান, তিনি মানুষকে তার ভোগ করতে দিয়েছেন। সুতরাং যারা চাষ করবে তারাই জমির মালিক। কোনো জমিদারেরই অধিকার নাই কৃষকদের উপর অত্যাচার করার। ফরায়েজী আন্দোলনে জমিদার কর্তৃক কর আরোপ এবং সেস আদায়কে চ্যালেন্স প্রদান করা হয়েছিল। ফরিদপুরের সিকদার ও ঘোষ জমিদার পরিবার দুটি নানাভাবে প্রজাদের নির্যাতন করতো। দুদু মিয়ার নেতৃত্বে কৃষকরা জমিদারদের উপর হামলা করে সিকদার ও ঘোষ-জমিদারদের শাস্তি বিধান করেছিল। ফরায়েজী আন্দোলন প্রথমেসামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার হিসেবে শুরু মুসলমান জনগণকে সংঘবদ্ধ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেনি, আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি স্থানীয় হিন্দু কৃষকদের এক বিরাট অংশকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং সরকারের বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে এ আন্দোলন অসম্প্রদায়িক আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে।

৪. সাঁওতাল বিদ্রোহ : ১৮৫৫ সালে সংঘটিত হয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সিধু ও কানু নামে দুই ভাই এ বিদ্রোহ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ বাংলা-ভারতের কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহের ইতিহাসে এক গৌরবজনক স্থান অধিকার করে আছে। সাঁওতাল জাতি ছিল পশ্চাতপদ এবং অনগ্রসর আদিবাসী গোষ্ঠী। তারা গভীর জঙ্গল পরিস্কার করে চাষাবাদে উপযোগী করেছিল। কিন্তু মহাজনরা তা কেড়ে নিত। সরকার পক্ষ থেকে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যদি জঙ্গল কেটে জমি উদ্ধার করতে পারে তবে সাঁওতালদের নামমাত্র কর ধার্য করে সেই জমি তাদের চাষাবাদ করতে দেওয়া হবে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। জমিদার ও তাদের নায়েবগণ নানাভাবে সাঁওতালদের উপর জুলুম ও নিপীড়ন চালাতো। জাল দলিল তৈরি করে সাঁওতালদের জমিজমা কেড়ে নেওয়া হতো। সাঁওতালরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ করেছিল তা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল নির্মমভাবে। কিন্তু তার ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তী সময়ে ইংরেজ সরকার বেশ কিছু দাবি মেনে নিয়ে আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল।

www.pathagar.com

৫. ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম : সমগ্র উপমহাদেশের ইতিহাসে ১৮৫৭ সালের সংগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার জন্য এটা প্রথম সংগ্রাম। ভারতীয়দের এ স্বাধীনতা সংগ্রামকে কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিক 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক জে.বি. নটন ড. মজুমদার প্রমুখ এ আন্দোলন সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে এটা বিদ্রোহ আকারে শুরু হলেও পরে জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। সভাকর বলেন, '১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় সংগ্রাম। সুরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেছেন '১৮৫৭ সালের আন্দোলন প্রথমে সিপাহীদের বিদ্রোহরূপে শুরু হয়েছিল, কিন্তু সর্বত্র এ বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে ছিল না। ঐতিহাসিক কাই এবং মালিজন বলেন, 'এ বিদ্রোহ ছিল গণবিদ্রোহের প্রতীক'। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এক বছরের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে এ ছিল এক মহাবিদ্রোহ। জনগণের সমর্থনে সিপাহীদের এ মহাবিদ্রোহ ছিল দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম। কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো ছিল এ মহাবিদ্রোহের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সামরিক কারণে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে স্বাধীনতা অর্জন হয়নি সত্য, তবে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বসাধারণের একসাথে জ্বলে উঠার এ ছিল প্রথম এবং একমাত্র ঘটনা। ইংরেজ সেনাবাহিনীর দেশিয় সিপাহীগণ এক প্রবল স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। গোটা ভারতে এই বিদ্রোহ তীব্র হয়েছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলা থেকেই। ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ ব্যারাকপুরে সংগ্রাম শুরু হয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম, বহরামপুরসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সিপাহীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাংলা এই সিপাহী বিদ্রোহ সুপরিকল্পিতভাবে সযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সফল হতে পারেনি। এ সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও পরবর্তীকালের জন্য সকল সংগ্রামের সূচনা হিসেবে এটা কাজ করেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের এ ব্যাপক সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। পরবর্তী সময়ে সারা ভারতে এই বিদ্রোহ স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এ বিদ্রোহের সবচেয়ে বড় সাফল্য এই যে, এ সংগ্রাম ছিল দেশপ্রেম ও প্রগতিশীলতার পরিচায়ক।

৬. নীলবিদ্রোহ : উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের গণআন্দোলনের মধ্যে বাংলার নীলবিদ্রোহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিদ্রোহ বাংলার কৃষককুল সংঘবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। নীলকরদের অকথ্য নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, অত্যাচার ও অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকেরা নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এক পর্যায়ে নীলচাষীরা সংঘবদ্ধভাবে নীলচাষ করতে অসম্মতি জানায়। এ আন্দোলন ছিল অহিংস 'সত্যাগ্রহ'। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের ভিত্তিতে সংগ্রাম করাকে 'সত্যাগ্রহ' বলা হয়। নীল চাষ না করার জন্য চাষীদের ওপর ভায়ানক নির্যাতন, গ্রেপ্তার ইত্যাদি শুরু হলে এ আন্দোলন সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয়। নীলবিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার 'নীল কমিশন' গঠন করেন। কমিশন সরেজমিনে নীলচাষীদের অভিযোগের সত্যতা পরীক্ষা করেন এবং অভিযোগ যথার্থ বলে অভিমত দেন। ফলে সরকার একটি আইন দ্বারা ঘোষণা করেন যে, নীলকররা বলপূর্বক চাষীকে নীলচাষে

www.pathagar.com

বাধ্য করতে পারবে না এবং তা করলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় হবে। এ আইন পাসের ফলে ১৮৬০ সালে নীলবিদ্রোহের অবসান ঘটে। হিন্দু, মুসলমান জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল নীলচাষীরা পারস্পারিক সহযোগিতা, শৃঙ্খলা এবং দৃঢ় সংকল্পের ফলে নীলবিদ্রোহ সাফল্যমণ্ডিত হয়।

নীলবিদ্রোহের শিক্ষণীয় বিষয়ে এই যে, প্রয়োজনে অশিক্ষিত, দুর্বল কৃষকেরাও সংঘবদ্ধ হয়ে অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে। যা হোক, নীলকর বিরোধী আন্দোলন বাংলার কৃষককুলের এক গৌরবের বিষয়। কৃষকদের প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত বাংলার নীলচাষ বন্ধ করতে হয়েছিল।

৭. পাবনা প্রজাবিদ্রোহ : ১৮৭৩ সালে তৎকালীন পাবনা জেলার বর্তমানে সিরাজগঞ্জ-এ সংঘটিত হয় কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহ। সিরাজগঞ্জে সংঘটিত প্রজাবিদ্রোহে সরাসরি জমিদার শ্রেণির বিলোপ বা জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের দাবি ঘোষিত হয়েছিল। তাই এই বিদ্রোহ অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিদ্রোহের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যে, সরাসরি ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না হয়ে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে হয়েছিল। ফলে ইংরেজ রাজশক্তি এই বিদ্রোহ দমনে সমরশক্তি ব্যবহার না করে বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের ক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জে সংঘটিত প্রজাবিদ্রোহ ছিল প্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। শুধু এই বাংলায় নয়, গোটা উপমহাদেশে এটাই ছিল সব প্রথম জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের জন্য এক সর্বাত্মক প্রতিবাদ। এই বিদ্রোহের ফলে ইংরেজ সরকার প্রজাদের স্বার্থে কিছুটা হলেও ছাড় দিয়েছিল । ১৮৮৫ সালে ব্রিটিশ সরকার 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' প্রণয়ন করে। এই আইনে প্রজাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। সিরাজগঞ্জের এই প্রজাবিদ্রোহের এটা একটা গৌরবজনক বিজয়।

কৃষক বিদ্রোহের সূত্রপাত

বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর একটি উপজেলা। ইয়েমেনের শাহজাদা হজরত মুখদম শাহদৌলা (রহ:) শহীদের নাম অনুসারে এই স্থানের নামকরণ হয়েছে 'শাহজাদপুর'। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হজরত মুখদম শাহদৌলা (রহ:) শাহজাদপুর আগমন করেন। ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করে শাহজাদপুরের প্রতিষ্ঠাতা বিখ্যাত সাধক হজরত মুখদম শাহদৌলা (রহ:) একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য কলার ইতিহাসে শাহজাদপুর মসজিদ এক অনন্য সাধারণ ঐতিহ্যের নিদর্শন। কথিত আছে সাধক মুখদম শাহদৌলা (রহ:) দীর্ঘকায় মানুষ ছিলেন। শাহজাদপুরের জমিজমার মাপের প্রচলন ছিল সাড়ে তেইশ ইঞ্চি এক হাত হিসেবে। জমি মাপার উক্ত পদ্ধতিকে বলা হত 'মুখদম সাহেবের হাত' হিসেবে। শাহজাদপুরের জনসাধারণ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল (বর্তমানেও মুখদম সাহেবের ভক্ত।

শাহজাদপুর থানা এলাকা ছিল ইউসুফশাহী পরগনার অন্তর্গত। এই ইউসুফশাহী পরগনার অধীনস্থ গ্রাম সংখ্যা ছিল মোট ৬৯৫টি। সম্ভবত বাংলার স্বাধীন সুলতান

www.pathagar.com

সামসুদ্দীন ইউসুফশাহের নামানুসারে উপরোক্ত রূপে ইউসুফশাহীর পরগনার নামকরণ করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকদেরও ধারণা। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের এক বৃহৎ অঞ্চল তার রাজ্যেও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি অনেকগুলো মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার স্বাধীন সুলতান রুকুনুদ্দীন বারবকশাহের পুত্র। সামসুদ্দীন ইউসুফশাহ ১৪৮০ খ্রি. (হিজরি ৮৮৫) পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তার পূর্বে তিনি পিতার অধীন যুবরাজ হিসেবে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৬০ সাল থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত বাংলার জমিদারগণ জমির খাজনা বৃদ্ধির জন্য নতুন মাত্রার জুলুম করেছিল। ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ইংরেজ সরকার ভূমি জরিপ ও কর নির্ধারণ করে রায়তদের ব্যক্তিগতভাবে ভূমির মালিকানার অধিকার প্রদান করেছিল। উৎপাদিত পণ্য লাভজনক হওয়ায় জমির দাম দ্রুতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দেশিয় মহাজনরা তাদের সঞ্চিত মূলধন জমি ক্রয় ও কৃষি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়েছিল। এই সময়ে বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক প্রজাদের অসন্তোষ ক্রমাগতভাবে বেড়ে গিয়েছিল। এই অসন্তোষের ফলে ইংরেজ সরকার জামিদার ও রায়ত বা প্রজাদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল। এই আইনের কারণে রায়ত চাষীদের মধ্য থেকে কায়েমি রায়ত বা স্বত্ববান রায়ত শ্রেণি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। জমিদার এই সময় জমির উপর খাজনা ও করের পরিমাণ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি করে চলছিল। বেড়ে চলছিল কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা। কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার পঞ্চম ও সপ্তম আইন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। কৃষক বা রায়তদের রক্ষাকল্পে প্রবর্তন করেছিল 'দশম' আইন। এই আইন প্রবর্তন করেও কোনো লাভ হয়নি। ব্রিটিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণিকে অক্ষুণ্ন রেখে কোনো আইনই কৃষক বা রায়তদের স্বার্থের পক্ষে অনুকূল ছিল না। শাহজাদপুরের কৃষকরা জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। জমিদারগণ যে কত শত প্রকারে কৃষকদের সর্বনাশ করতো তা এই স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। এই কৃষকবিদ্রোহের মূলে ছিল জমিদার কর্তৃক প্রজা নিপীড়ন এবং মাত্রাতিরিক্ত লোভ-লালসার বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধ।

শাহজাদপুর তথা ইউসুফশাহী পরগনা এক সময় নাটোরের রানী ভবানীর অধীনস্থ ছিল। পরবর্তীকালে নাটোরের রাজপরিবার অর্থকষ্টে পতিত হয়। ফলে ইউসুফশাহী পরগনা নিলামে ওঠে। পাঁচ জমিদার মিলে এই ইউসুফশাহী পরগনা বা শাহজাদপুর এলাকা নিলাম ধরে ভাগাভাগি করে নেয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তের টাকা দশ আনা দিয়ে ডিহি শাহজাদপুর ক্রয় করেন।

ইউসুফশাহী পরগনা যে পাঁচ জমিদার হস্তগত করেন তারা হচ্ছেন-- কোলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর জমিদার, ঢাকার মুরাপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যানার্জী জমিদার, সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া থানার সলপের সান্যাল জমিদার, সিরাজগঞ্জের চৌহালী থানার অন্তর্গত স্থলের পাকড়াশি জমিদার এবং শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত পরোজনার ভাদুড়ি জমিদার। এই পাঁচ জমিদার হয়ে ওঠেন শাহজাদপুরের কৃষক প্রজাকূলের দণ্ডমুণ্ডের

www.pathagar.com

অধিকর্তা এবং ভাগ্যবিধাতা। এই নতুন জমিদারগণের সঙ্গে প্রজাসাধারণের সম্পর্ক শুরুতে মোটেই ভালো ছিল না। তাঁরা কখনো বা প্রজাসাধারণের উন্নতি মঙ্গল কামনা করতো না। তাঁরা শুধু প্রজাদের দোহন করে সব রস নিংড়ে নিতো। তাঁদের জমিদারি নিলামে ক্রয় করার উদ্দেশ্য ছিল খাজনা বৃদ্ধি করে প্রজাদের নির্মমভাবে শোষণ করে নিজেদের অর্থসম্পদ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা। নাটোরের রাজপরিবার যখন জমিদারের মালিক ছিলেন তখন বিঘা প্রতি খাজনার পরিমাণ ছিল ছয় আনা থেকে দশ আনা মাত্র। নব্য জমিদারগণ ইচ্ছামতো জমির খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকেন। তাঁরা আইনের কোনো ধার ধারতেন না। ইউসুফশাহী পরগনার সবচেয়ে বড় অংশের মালিক সান্যাল জমিদারের অত্যাচার আর কুশাসন এলাকায় কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। মাঝে মাঝে জমিদারে জমিদারে সংঘর্ষ হতো। স্যানাল জমিদারের সাথে ১৮৭৩ সালে জমিদারের এক জমির দখল নিয়ে সংঘর্ষে ঠাকুর পরিবারের একজন বরকন্দাজ সড়কির আঘাতে নিহত হয়। ১৮৭০ সালে ভাদুড়ি জমিদারের প্রেরিত বরকন্দাজ বাহিনী শাহজাদপুর থানার টিয়ারবন্দ গ্রামের মানুষের বিষয়সম্পত্তি লুটতরাজ করে। গ্রামবাসীরা বাঁধা দিতে এগিয়ে আসলে একজন গ্রামবাসীকে সড়কির আঘাতে হত্যা করা হয়। এই সব জমিদারদের অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছিল আর তা থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদ অনুভব করছিল কৃষকগণ। এই অনুভব থেকেই কৃষকরা ঐক্যবদ্ধ হবার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

জমিদারদের বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং প্রজানিপীড়নের বিভিন্ন কৌশলসমূহ সামাজিক আবহাওয়াকে ক্রমশ উত্তপ্ত করে তুলতো। জমিদারগণ অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের জন্য নানারকম অভিনব পন্থা প্রয়োগ করত। শাহজাদপুরের জমিজমার মাপের প্রচলন ছিল সাড়ে তেইশ ইঞ্চি এক হাত হিসেবে। জমি মাপার উক্ত পদ্ধতিকে বলা হত 'মুখদম সাহেবের হাত' হিসেবে। কিন্তু নব্য জমিদারগণ উক্ত মাপ পরিবর্তন করে আঠারো ইঞ্চিকে এক হাত ধার্য করলেন। ফলে বিঘা হিসেবে জমির পরিমাণ বেড়ে গেল এবং খাজনার পরিমাণও বেড়ে গেল। সিরাজগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা প্রশাসক মি. পিটার নোলন জমি মাপের উক্ত 'সাড়ে তেইশ ইঞ্চি' পদ্ধতিকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ জমিজমা মাপের প্রচলিত ও অঞ্চল বিশেষের নিয়ম কানুনকে সমর্থন করা ব্রিটিশ নীতিমালার মধ্যেই ছিল। 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি পত্রে জানা যায়, শাহজাদপুর থানার দৌলতপুরসহ বিভিন্ন গ্রামে জরিপের দায়িত্ব কালেক্টরের উপর ন্যস্ত হয়। উক্ত পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় : 'সিরাজগঞ্জের প্রশংসিত নোলেন সাহেব সাড়ে তেইশ ইঞ্চি হাতে জমি জরিপের আদেশ করেন। নোলেন সাহেবের এই কার্যকে নিতান্ত অসঙ্গত এ-মত বলা যায় না, কেননা ১৮৬৯ ইংরেজির ৮ আইনে যে স্থানের যে মাপদণ্ড প্রচলিত আছে সে স্থানে তদ্দারা মাপ হইবার বিধান থাকায় এবং ইউসুফশাহী পরগনায় 'মোকদম সাহেব' অর্থাৎ ২৩॥. (২৩.৫০) ইঞ্চি হাত থাকার দলিল ও প্রমাণ পাইয়া নোলেন সাহেব এরূপ মিমাংসা করেন।

কিন্তু জমিদারেরা অসন্তুষ্ট হন। শুধু খাজনা বৃদ্ধি করার জন্যই জমিদারগণ নতুন মাপের জমি জরিপ পদ্ধতি চালু করলেন। এই নতুন মাপের কবলে পড়ে কৃষকের জমির খাজনা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ফলে দরিদ্র কৃষকেরা ধনসম্পদ হারিয়ে পথে বসার

www.pathagar.com

উপক্রম হলো। এতে করে প্রজাঅসন্তোষ আরো ঘনীভূত হয়ে উঠলো। ১৮৭২ সালে ঠাকুর জমিদার জমির খাজনার পরিমাণে টাকা প্রতি আট আনা বৃদ্ধি করলেন এবং অল্প পরে টাকা প্রতি আরো চার আনা খাজনা বৃদ্ধি করলেন। ঠাকুর জমিদারের খাজনা এমনিতেই বেশি ছিল। পার্শ্ববর্তী সান্যাল জমিদারদের এলাকা গদিবাড়িতে খাজনা ছিল বিঘাপ্রতি এক টাকা দু'আনা আর পাশের গ্রাম জমিরতাতে ঠাকুর জমিদারের জমির খাজনা এক টাকা দশ আনা। অথচ জমির উর্বরতা ছিল একই রকম।

ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় বা ব্যানার্জী জমিদাররা বেআইনিভাবে কয়েকশত কৃষকের নিকট থেকে জোরপূর্বক কবুলিয়াৎ রেজিস্ট্রি করার পর একটি গ্রামের কৃষকরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই কবুলিয়াৎ রেজিস্ট্রি করে দিতে অস্বীকার করে তখন বিষয়টি মুন্সেফ কোর্টে যায়। জমিদার মুন্সেফ কোর্ট থেকে সুকৌশলে রায় নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে। প্রজারাও ঐক্যবদ্ধভাবে আপিল করে এবং আপিলে জজ সাহেব জমিদারের দাবি নাকচ করে প্রজার পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। প্রজাদের পক্ষে এই রায় ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করল। তাদের উৎসাহ দশগুণ বেড়ে গেল। জমিদার মামলায় হেরে গিয়ে কোর্ট থেকে ফেরার পথে একজন প্রজাকে অপহরণ করেন। ম্যাজিস্ট্রেট পিটার ও নোলেন উদ্যোগী হয়ে উক্ত অপহরণ ব্যক্তিকে দশদিন পর উদ্ধার করেন এবং জমিদার প্রতিনিধিদের নিকট থেকে ঐ ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটানোর জন্য মুচলিকা আদায় করেন। জমিদারের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা পাওয়া ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কৃষকেরা দলবদ্ধ হতে থাকে। এই অবস্থায় যখন আন্দোলন ক্রমান্বয়ে দানা বাঁধতে শুরু করেছে, তখন কৃষকেরা অনুভব করল তাদের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করা দরকার। এ সময় এগিয়ে এসে কৃষকদের নেতৃত্বকে গতিশীল করে তুললেন—ঈশান চন্দ্র রায়। তিনি পাবনা প্রজাবিদ্রোহের নেতৃত্বের আসনে আসীন হলেন।

১৮৭৩ সালের মে মাসে শাহজাদপুরে এই কৃষকবিদ্রোহের সূত্রপাত হয় এবং জুন মাসের মধ্যে তা ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করে। যদিও বিদ্রোহের সূচনা বন্দোপ্যাধ্যায়ের বা ব্যানার্জী জমিদারদের এলাকা থেকে, কিন্তু অতি দ্রুত ঠাকুর জমিদারদের প্রজারাও বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গ্রামে গ্রামে এই কৃষকবিদ্রোহ শাহজাদপুর থানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। সিরাজগঞ্জের অন্যান্য থানাতেও তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এরপর এই প্রজাবিদ্রোহ সিরাজগঞ্জ অতিক্রম করে সমগ্র পাবনা জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্রোহী কৃষক গোপনে গোপনে সভা করতে থাকলেন। এইসব গোপন সভায় প্রজাসাধারণকে বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হতো। বলা হতো এই বিদ্রোহে বা প্রতিবাদে সমবেত না হলে কৃষককুল ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং বাঁচার তাগিদেই সকল প্রজাসাধারণকে দুর্বার ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। বিদ্রোহ সংঘটিত করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রচারকগণ জোর তৎপরতা শুরু করল। প্রজাবিদ্রোহের নেতাদের নির্দেশ মতো প্রজারা জমিদারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। প্রজাবিদ্রোহের শ্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠল সমগ্র ইউসুফশাহী পরগনা এবং শাহজাদপুরসহ সমগ্র পাবনা জেলা। সমবেত কণ্ঠে কৃষকরা দাবি তুলল জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই। তৎকালীন সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে এই প্রথম সরাসরি জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি উঠল। এ ক্ষেত্রে এই প্রজা আন্দোলন ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলনের মাইলফলক

www.pathagar.com

হিসেবে স্থান করে নিল। বিদ্রোহী কৃষকদের এবং সংগঠিত কৃষকরা দলবদ্ধ হয়ে তৎকালীন সিরাজগঞ্জ মহকমা প্রশাসকের নিকট জমিদারদের অত্যাচার-অবিচারের চিত্র তুলে ধরল। ১৮৭৩ সালে ১ জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ২৬৯টি গ্রাম এই কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করে। তারপরও ১০/১২টি করে গ্রাম নতুন করে এই বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। সে সময় ইউসুফশাহী পরগনার মোট গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৯৫টি।

কৃষকবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যসমূহ

তৎকালীন পাবনা জেলার ইউসুফশাহী পরগনা বা শাহজাদপুর কৃষকবিদ্রোহ সশস্ত্র গণপ্রতিরোধের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহের উদ্ভব ও বিকাশ একদিনে হয়নি। ১৮৭৩ সালে কৃষকবিদ্রোহ মূলত চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করেছিল। এই কৃষকবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে অনেক প্রশ্নের সমাধান হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত মুক্তির সংগ্রামে ভারত গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

"বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও পূর্ব বাংলাতে কৃষক বিক্ষোভের আগুন আবার জ্বলে ওঠে ১৮৭০ এর দশকে। এই অঞ্চলে বড় বড় জমিদারেরা ছিলেন ভয়ানক অত্যাচারী। তাঁরা যখন তখন, যেভাবে খুশি গায়ের জোরে দখল করতেন ফসল ও জমিজমা। বাড়িয়ে দিতেন খাজনার অঙ্ক। এর বিরুদ্ধে ১৮৭৩-এ পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার চাষীরা প্রথম জোটবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলল খাজনা বিরোধী সমিতি। দেখতে দেখতে সেই সংঘ ছড়িয়ে পড়ল পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লাতে। গরীব হিন্দু ও মুসলান চাষী ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামল সেই লড়াইতে। তাদের দাবি ছিল বাড়তি খাজনা তারা কেউ দেবে না। ইংরেজ সরকার এসে দাঁড়াল জমিদারের পাশে। শিক্ষিত সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে গেল, তবে তাদের প্রগতিশীল অংশটি সমর্থন করল বিদ্রোহী কৃষকদেরই। এই সংগ্রামেই সমিতি গড়া ও ধর্মঘট করার চেতনা, বলা যেতে পারে প্রথম গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়"।

সে সময় কৃষকবিদ্রোহের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিম্নে আলোকপাত করা হলো। পাবনা প্রজাবিদ্রোহ ব্রিটিশ সরকারকে তার ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ সালে দ্বিতীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধিত আকারে পাস করেন। প্রথম প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৫৯ সালে পাস হলেও বারবার তা পরিবর্তন হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন বাংলার প্রজাকুলকে রক্ষার জন্য ছিল একটা বিরাট পদক্ষেপ। রায়ত বা প্রজাগণের জমির উপর আধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ছিল একটা যুগান্তকারী রক্ষাকবচ। কিন্তু এ অধিকারকে অর্জন করতে যথেষ্ট পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সংগ্রাম করতে হয়েছে জীবন বাজি রেখে। খালি হাতে জমিদার শ্রেণির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছে। জমিারদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে হয়েছে। বছরের পর বছর সংগ্রামেরই এই ছিল পরিণতি। শাহজাদপুর থানার কৃষকগণ অপরিসীম ত্যাগ আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ইউসুফশাহী পরগনা শুধু নয় পাবনা সিরাজগঞ্জের প্রায় সব থানা শত শত গ্রামের রায়তগণ এই প্রজাবিদ্রোহী হিসেবে নাম লিখিয়েছিলেন। আর সংগ্রামের ফলে সফল এই কৃষক বিপ্লবে লাভবান হলো বাংলার কৃষকগণ। এই

www.pathagar.com

কৃষক বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল শাহজাদপুর থেকে। শাহজাদপুরের কৃষকগণই এই কৃষকবিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এক দল লোভী ও নির্মম শাসকরূপে জমিদার শ্রেণির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁরা কারণে অকারণে বছর বছর জমির খাজনা বাড়িয়ে চলেছিলেন। এই খাজনা বৃদ্ধি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের প্রবর্তিত আইনসিদ্ধ ছিল না। এই খাজনা বৃদ্ধি ও সেস্ বা আবওয়ার আদায়কে কেন্দ্র করে নিরীহ প্রজাগণ ক্রমান্বয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। শাহজাদপুর তথা ইউসুফশাহী পরগণার কৃষকবিদ্রোহ আবার বাংলাদেশের অন্যান্য জেলাতেও কৃষকবিদ্রোহ গঠনে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। তাই শাহজাদপুর সূচিত এবং কথিত পাবনা প্রজাবিদ্রোহের গুরুত্ব বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও অপরিসীম তাৎপর্য বহন করে।

কৃষকবিদ্রোহে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

১৮৭৩ সালে জমিদারদের অত্যাচারকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শাহজাদপুর তথা ইউসুফশাহী পরগনায় কৃষকবিদ্রোহ সূচিত হয়। এই বিদ্রোহ পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই কৃষকবিদ্রোহে শুধু এই অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তৎকালীন কলিকাতাকেন্দ্রিক বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। কৃষকবিদ্রোহ বিষয়ে কলকাতার বুদ্ধিজীবীগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। একটি ধারা কৃষক প্রজাবিদ্রোহের বিরোধিতা এবং জমিদারদের সমর্থন করেছিলেন অপরটি জমিদারদের বিরোধিতা এবং কৃষকবিদ্রোহীকে সমর্থন করেছিলেন। দেশবরেণ্য যে সকল বুদ্ধিজীবী কৃষক আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন– বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত শিশির কুমার ঘোষ যিনি "অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, 'গীত কৌমুদী' গ্রন্থের রচয়িতা উমাচরণ চৌধুরী, 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'সাপ্তাহিক মধ্যস্থ' পত্রিকার সম্পাদক নাট্যকার মানোমোহন বসু প্রমুখ। এছাড়াও আরো অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবী এই কৃষক আন্দোলনে বিরোধিতা করেছিলেন।

যে সকল বুদ্ধিজীবী সেই সময়ে প্রজা বা কৃষকবিদ্রোহকে সমর্থন এবং প্রজাদের সপক্ষে লেখনি ধারণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমে যার নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার। তিনি ছিলেন 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক, যা কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে প্রকাশিত হতো। প্রজাস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই পল্লী-গাঁয়ের পত্রিকাটি। আরো যাদের নাম করতে হয় তাঁরা হলেন, সুলভ সমাচার' পত্রিকার সম্পাদক কেশবচন্দ্র সেন, 'ভারত সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক উমেশচন্দ্র দত্ত, 'সাধারণী' পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও অভয়চরণ দাস ও রামেশচন্দ্র দত্ত। পিপলস ফ্রেন্ড, ইন্ডিয়ান মিরর প্রভৃতি

www.pathagar.com

পত্রিকা প্রজাবিদ্রোহকে সমর্থন করেছিল। পাবনা কৃষকবিদ্রোহের কালজয়ী নাটক 'জমিদার দর্পণ' রচনা করে মীর মশাররফ হোসেন প্রজাবিদ্রোহের তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। 'জমিদার দর্পণ' নাটকটি সে যুগে প্রতিক্রিয়ার দূর্গে সরাসরি আঘাত হেনেছিল। তাই কৃষকবিদ্রোহের ভয়ে ভীত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উক্ত নাটকটি নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করেছিলেন।

কৃষকবিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ

কৃষক বা প্রজাবিদ্রোহ পরিচালনার জন্য যে বিদ্রোহী পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' মে/১৮৭৩ সালে উক্ত বিদ্রোহী পরিষদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল যা নিম্নরূপ :

ক্রমিক	নাম	পদবি
১.	ঈশানচন্দ্র রায়	বিদ্রোহীদের রাজা
২.	ক্ষুদি মোল্লা	রাজমন্ত্রী
৩.	রমজান সরকার	নাএব (নায়েব)
৪.	জাকের জোয়ার্দ্দার	গোমস্তা
৫.	শম্ভুনাথ পাল	সুপারিনটেনডেন্ট
৬.	রহিম প্রামাণিক	সর্দার
৭.	হাজারি প্রামাণিক	পাইক
৮.	আরবিন মৃধা	মৃধা
৯.	মন্দীর সরকার	জরিপ আমিন
১০.	জগৎ ভৌমিক	জজ আমিন
১১.	গঙ্গাচরণ পাল	হুড়া সাগরের পশ্চিম পাড়ের শাসনকর্তা

এই ১১ (এগার) সদস্যবিশিষ্ট বিদ্রোহী নেতারা অত্যন্ত সংগঠিতভাবে তাঁদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তাঁদের কর্মকৌশলও ছিল অভিনব। তাঁরা তাঁদের কর্মকৌশলের গুণে প্রজাসাধারণের হৃদয়ের মাঝে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিদ্রোহী কৃষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডেমরা গ্রামের রাজু সরকার, যার নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষকগণ গোপালপুরের জমিদারদের বসতবাড়ি ও সম্পদাদি ধ্বংস সাধন করে। প্রচলিত ছড়া ও লোকসংগীত থেকে এ তথ্য জানা যায়। তাছাড়া অন্য একজন কৃষক নেতা বিদ্রুপ সম্পর্কেও কিছু তথ্য জানা যায়।

শাহজাদপুর তথা ইউসুফশাহী পরগনায় ১৮৭৩ সালে যে কৃষকবিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল সেই বিদ্রোহে যে সকল বিশিষ্ট কৃষকনেতা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ে সন্নিবেশ করা হলো।

১. ঈশানচন্দ্র রায় : বাংলা-ভারতের আন্দোলন-বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ঈশানচন্দ্র রায় ইতিহাসে তেমন প্রসিদ্ধ লাভ করতে পারেননি। কারণ এই কৃষক আন্দোলনে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির ভূমিকাই ছিল সমধিক। ঈশানচন্দ্র রায় ছিলেন

www.pathagar.com

কৃষকবিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। ঈশানচন্দ্র রায়ের বাসস্থান ছিল শাহজাদপুর থানার দৌলতপুর গ্রামে। পিতার নাম কালীচন্দ্র রায়। ঈশানচন্দ্র রায় ছিলেন শিক্ষিত এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী। শাহজাদপুরের এক জমিদার ঢাকার ব্যানার্জী বাবুদের সাথে তাঁর বিরোধ ছিল। তাঁর তালুকের একটি অংশনিয়ে বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা হয়েছিল। একবার ব্যানার্জী বাবুদের সাথে জমিদাররা তাঁকে কাচারিতে ডেকে এনি অপমান-অপদস্ত করে এবং তাঁর নিকট থেকে অনেক টাকা জোরপূর্বক আদায় করে। এই কারণেই ঈশানচন্দ্র রায় প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে বিদ্রোহী কৃষকদলে যোগদান করেন। তাঁর মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষা-দীক্ষার গুনে তিনি বিদ্রোহী দলের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি বিদ্রোহীদের পরিচালকস্বরূপ ছিলেন। প্রজাবিদ্রোহের সময় তিনি অনেক বিচার-আচার নিষ্পত্তি করেছেন। বিদ্রোহে অংশগ্রহণের জন্য প্রজাগণ তার নিকট এসে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে দলে দলে যোগদান করতেন। কৃষকবিদ্রোহের সময়ে ঈশানচন্দ্র রায় প্রজাদের অর্থ ও আইনগত পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতেন। তিনি ক্ষুদি মোল্লা ও গঙ্গাচরণ পালের সহযোগিতা নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করতেন। এ কাজের জন্য ১১ (এগার) সদস্য বিশিষ্ট একটি বিদ্রোহী পরিষদ ছিল। তিনি ছিলেন জমিদারদের প্রধান শত্রু। অসামান্য ব্যক্তিত্বের কারণে প্রায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার কৃষককে নিজের শাসনাধীন আনতে পেরেছিলেন। জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি তাঁর আন্দোলন থেকেই সোচ্চার হয়েছিল। ঈশানচন্দ্র রায় গ্রেফতার হয়ে পাবনা জেলে স্থানান্তরিত হয়। ঈশানচন্দ্র রায় বিচার শেষে মুক্তিলাভ করেন। ঈশানচন্দ্র রায় ছিলেন বিদ্রোহীগণের নেতা, তাঁকে বলা হতো প্রজাবিদ্রোহীদের রাজা।

২. ক্ষুদি মোল্লা : শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত জগতলা গ্রামে ক্ষুদি মোল্লা বসবাস করতেন। এই অঞ্চলটি ছিল সলপের সান্যাল জামিদারের এলাকাধীন। ক্ষুদি মোল্লা একজন গ্রামীণ সমাজপতি ও ক্ষুদ্র জোতদার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বেশি কিছু তথ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে যতদূর জানা যায় ক্ষুদি মোল্লা এই কৃষকবিদ্রোহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। প্রজাবিদ্রোহী পরিষদে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি। তাঁর মেধা বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার জন্য তিনি প্রজাবিদ্রোহের প্রাণপ্রিয় নেতা হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন। তিনি বিদ্রোহের মূল নেতা ঈশানচন্দ্র রায়ের দক্ষিণহস্ত ছিলেন। সান্যাল জমিদারদের সাথে তাঁর জমি সংক্রান্ত বিরোধ ছিল। সান্যাল জমিদারদের লাঠিয়ালগণ অন্যায়ভাবে তাঁর বিষয় সম্পত্তি লুটতরাজ করে। ফলে ক্ষুদি মোল্লার অনুসারিগণের সঙ্গে জমিদার পক্ষের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে জমিদার পর্যুদস্ত হয়। শেষ পর্যন্ত জমিদার পক্ষ নতিস্বীকার করে এবং লুণ্ঠিত মালামাল ফেরত দিতে বাধ্য হয়। ক্ষুদি মোল্লা ছিলেন একজন প্রতিবাদী কৃষক নেতা। তিনি কৃষকবিদ্রোহের সময় রাজমন্ত্রী হিসেবে আভহিত হয়েছিলেন।

৩. রমজান সরকার : রমজান সরকার ছিলেন প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের সদস্য এবং একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা। বিদ্রোহী পরিষদে তাঁর পদবি ছিল নায়েব। তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঢুলিয়াবাড়ী গ্রামে।

www.pathagar.com

৪. জাকের জোয়ার্দ্দার : জাকের জোয়ার্দ্দার ছিলেন প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের সদস্য। তাঁর পদবি ছিল গোমস্তা। জাকের জোয়ার্দ্দার-এর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত আড়কান্দি গ্রামে।

৫. শম্ভুনাথ পাল : শম্ভুনাথ পাল ছিলেন বিদ্রোহের একজন বিশিষ্ট নেতা। তিনি ছিলেন প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের সুপারিনটেনডেন্ট। শম্ভুনাথ পাল ছিলেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মেঘুল্লা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ছিলেন ব্যানার্জী জমিদারদের একজন কর্মচারী। জমিদারদের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও জমিদার বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। শম্ভুনাথ পাল ছিলেন একজন ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং গ্রাম্য প্রধান। তিনি গ্রামে গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রজাবিদ্রোহে ভূমিকার কারণে শম্ভুনাথ পাল পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হন। পরবর্তী সময়ে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

৬. রহিম প্রামাণিক : রহিম প্রামাণিক প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। প্রজা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান বা সর্দার হিসেবে তিনি গুরুত্ব ও সাহসী ভূমিকা পালন করেন। রহিম প্রামাণিক ছিলেন একজন অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ও সুদক্ষ লাঠিয়াল। তিনি তাঁর দলবল নিয়ে জমিদারের লোকজনের সনে ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। রহিম প্রামাণিকের বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত হোড়দীঘলিয়া গ্রামে।

৭. হাজারি প্রামাণিক : হাজারি প্রামাণিক শাহজাদপুর থানার জালালপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত রূপসী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের একজন সদস্য। তাঁর পদবি ছিল পাইক। বিদ্রোহী কৃষকদের সংগ্রামে তিনিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

৮. আরবিন মৃধা : আরবিন মৃধা ছিলেন প্রজাবিদ্রোহী পরিষদের সদস্য এবং নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তি। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত মহারাজপুর গ্রামে। আরবিন মৃধার পদবিও ছিল মৃধা।

৯. মন্দীর সরকার : মন্দীর সরকার ছিলেন পেশাগতভাবে আমিন। তাঁর বাড়ি ছিল শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত হাতকোড়া গ্রামে। মন্দীর সরকার ছিলেন জরিপ আমিন। তিনি এগার সদস্য বিশিষ্ট বিদ্রোহী পরিষদের অন্যতম সদস্য।

১০. ভৌমিক : পেশাগতভাবে আমিন ছিলেন জগৎ ভৌমিক। তাঁর বাড়ি শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত হাতকোড়া গ্রামে। জগৎ ভৌমিক ছিলেন জজ জগৎ আমিন। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী পরিষদের অন্যতম সদস্য।

১১. গঙ্গাচরণ পাল : বিদ্রোহীদের অন্যতম নেতা ছিলেন গঙ্গাচরণ পাল। তিনি ছিলেন উল্লাপাড়া থানাধীন রুদ্রগাঁতী গ্রামের বাসিন্দা। গঙ্গাচরণ পাল ছিলেন শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত হুরাসাগর নদীর পশ্চিম তীরের শাসনকর্তা। তাঁর পিতার নাম ছিল কালীচরণ পাল। বিদ্রোহী কৃষকের রাজা ঈশানচন্দ্র রায়ের সহকারী ছিলেন। গঙ্গাচরণ পাল প্রজাবিদ্রোহে সংশ্লিষ্টতার দায়ে গ্রেফতার হন। বিচারে তার ছয় মাস জেল এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়।

www.pathagar.com

মর্মকথা

সিরাজগঞ্জের কৃষকবিদ্রোহ ছিল অনেকটা সুসংঘটিত এবং তা পরিচালিত হতো পরিকল্পনা মাফিক। শাহজাদপুর ও পার্শ্ববর্তী থানাসমূহে এই বিদ্রোহ ব্যাপকতা লাভ করেছিল। সলপ গ্রামে বিদ্রোহী কৃষক নেতৃবৃন্দের এক বিরাট সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রজাসাধারণ অংশগ্রহণ করেছিল। বিদ্রোহী স্বেচ্ছাসেবীগণ বিভিন্ন গ্রামের প্রজাসাধারণকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে বলেও হুমকি প্রদান করা হয়। সলপের সান্যাল জমিদারদের আবাসস্থলের নিকটবর্তী স্থানে এই কৃষক মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কৃষক সমাবেশের স্মৃতি এবং নানা উপকথা আজও ছড়িয়ে আছে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে। এই সমাবেশ স্থানে প্রজাবিদ্রোহীদের দ্বারা একটি হাট বসানো হয়েছিল। যা আজও 'কৃষকগঞ্জ হাট' নামে প্রজাবিদ্রোহের স্মৃতি বহন করছে।

সিরাজগঞ্জ কৃষকবিদ্রোহের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর এটাকে তুলনা করা চলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মহান ভাষা আন্দোলনের সাথে। ভাষা আন্দোলনের সময় এর ব্যাপ্তি ছিল সীমিত, রক্তপাত ও জীবনহানির পরিমাণ খুব বেশি ছিল না। কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনই অবশেষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল এবং বাংলা ভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মর্যাদায় উন্নীত করেছে। তেমনি ১৮৭৩ সালে সিরাজগঞ্জ তথা পাবনা কৃষকবিদ্রোহ জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবি তুলেছিল। সীমিত রক্তপাত ও প্রাণহানির এই আন্দোলন জমির উপর কৃষকের অধিকার এবং জমিদারি প্রথার উচ্ছেদের ক্ষেত্রে পাবনা প্রজাবিদ্রোহ ছিল গুরুত্বপূর্ণ প্রথার পদক্ষেপ।[১০]

ত. সিরাজগঞ্জ জেলার প্রধান প্রধান স্থাপত্য ঐতিহ্য

সিরাজগঞ্জ জেলা বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজশাহী বিভাগের একটি প্রশাসনিক অঞ্চল। তাঁতশিল্প এ জেলাকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করেছে। বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা সেতু) এবং সিরাজগঞ্জ শহররক্ষা বাঁধের অপূর্ব সৌন্দর্য এ জেলাকে পর্যটনসমৃদ্ধ জেলার খ্যাতি এনে দিয়েছে। তাছাড়া শাহজাদপুর উপজেলার রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি, এনায়েতপুর খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মিল্কভিটা, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম প্রান্তের ইকোপার্ক, বাঘাবাড়ি বার্জ মাউন্টেড বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি নদী বন্দর ইত্যাদি বিখ্যাত স্থাপত্য ও শৈল্পকর্মের নিদর্শন এ জেলাকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে মুসলিম শিল্প ঐতিহ্যের কেন্দ্রবিন্দু স্থাপত্য। নিঃসন্দেহে স্থাপত্য নিদর্শন অতীতকে তুলে ধরার জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করে। উপস্থাপন করে প্রমাণ্য দলিল। মুসলিম স্থাপত্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে মসজিদ; এছাড়া রয়েছে মাজার, দরগা ও অন্যান্য নিদর্শন। বাংলাদেশের মধ্যযুগের ইতিহাসের আকর উৎস এসব স্থাপত্য নিদর্শন সংরক্ষণের অভাবে অবহেলিত হয়ে বিলপ্তির পথে এগিয়ে চলছে। প্রায় সাত'শ বছর ধরে মুসলমানেরা এ দেশে মসজিদ,

www.pathagar.com

মাজার, দরগা ইত্যাদি নির্মাণ করে স্থাপত্যকৃর্তির এক অনুপম ঐতিহ্য গড়ে তোলে। সিরাজগঞ্জ জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পূর্বে ও পরে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এখানে যে সব উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন-মসজিদ, মাজার, দরগা ও অন্যান্য স্থাপনা গড়ে ওঠে এ নিবন্ধ তার একটি সামগ্রিক আলেখ্য তুলে ধরার প্রয়াস মাত্র।

১৯৮৪ সালে নবগঠিত সিরাজগঞ্জ জেলার সৃষ্টি হয়। নবগঠিত জেলা বৃহত্তর পাবনা জেলার সাবেক মহকুমা এবং এ জেলা ২৪° ২২ ও ২৪° ৩৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯° ৩৬ ও ৮৯° ৪৭ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে মধ্যে অবস্থিত। বেলকুচি, চৌহালী, কামারখন্দ, কাজপুির, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, তাড়াশ ও সিরাজগঞ্জ সদর এ নয়টি উপজেলা। ৭৯টি ইউনিয়ন, ১৪৫০টি মৌজা নিয়ে সিরাজগঞ্জ জেলা গঠিত। বর্তমান আয়তন প্রায় ৩৬৬ বর্গমাইল। এর উত্তরে বগুড়া জেলা দক্ষিণে পাবনা জেলা, পূর্বে টাঙ্গাইল ও জামালপুর জেলা ও প্রমত্তা যমুনা নদী এবং পশ্চিমে পাবনা ও নাটোর জেলা অবস্থিত।

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলাটি আংশিকভাবে চলন বিল এলাকাধীন। সিরাজগঞ্জ শহরটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। সিরাজগঞ্জ জেলাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৭৫ কিলোমিটার, পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার বিস্তৃত। ভূ-প্রাকৃতিক দিক দিয়ে জেলাটি যমুনা, বড়াল, ইছামতি, করোতোয়া ও তাদের অসংখ্য উপনদী ও শাখা নদী দ্বারা বিধৌত। এদেশের প্রধান নদী যমুনার নৈকট্যের কারণে প্রায় প্রতিবছরই এ জেলায় বন্যা হয়ে থাকে পূর্বে সিরাজগঞ্জ ছিল ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি থানা। ১৮৮৪ সালে যমুনা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে ১৮৫৫ সালে সিরাজগঞ্জ থানাকে জেলার সাথে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এ সময়েই বগুড়া জেলাধীন রায়গঞ্জকে সংযুক্ত করে সিরাজগঞ্জকে পাবনার একটি মহকুমায় রূপান্তরিত করা হয়। সিরাজগঞ্জ জেলার মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শনসমূহের ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:[১১]

শাহজাদপুর জামে মসজিদ

শাহজাদপুর মসজিদটি সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার দরগা পাড়ায় অবস্থিত। শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ৪১ কিলোমিটার দূরে ২৪° ০৪ ও ২৪° ২৫ উত্তর অক্ষরেখায় এবং ৮৯° ৩১ ও ৮৯° ৪৫ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। শাহজাদপুর করতোয়া নদীতীরে একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। মসজিদটি শাহজাদপুর শহরের একবারে পূর্ব প্রান্তে (যমুনা নদীর শাখা নদী) হুরাসাগরের পাড়ে দণ্ডায়মান। শাহজাদপুর মসজিদটি বৃহত্তর পাবনা (পাবনা ও সিরাজগঞ্জ) জেলায় নির্মিত সর্বপ্রাচীন মসজিদ বলে ধারণা করা হয়। এ মসজিদে কোনো শিলালিপি না থাকায় এর নির্দিষ্ট কোনো নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। তবে এর প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ পদ্ধতি, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, অলঙ্করণ শৈলীর ভিত্তিতে এক বাংলাদেশের মুসলিম শাসনের প্রথমভাগে তৈরি একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ নিদর্শন বলে অভিহিত করা যায়। অধিকন্তু এ মসজিদটি মখদুম শাহ দৌলা শহীদ কর্তৃক নির্মাণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। স্থাপত্য রীতি, বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন সূত্রে যেসব তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তার

www.pathagar.com

উপরে ভিত্তি করে ইমারতটি পঞ্চদশ শতাব্দির প্রথমভাগে নির্মিত মসজিদ বলে প্রতীয়মান হয়ে থাকে।

শাহজাদপুর মসজিদ মখদুম শাহ দৌলা কর্তৃক নির্মিত- জনমনে এ সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ নেই। বাংলায় মুসলিম আগমনের আরম্ভ থেকে শাহজাদপুরের নাম ইতিহাসে সুবিদিত। শাহজাদপুরে অবস্থিত শাহজাদপুর মসজিদ, মখদুম শাহ দৌলার সমাধি, গঞ্জে শহিদান, লাং শাহ পীরের মাজার, আজমত শাহ ইয়ামেনির মাজার, শামসুদ্দীন তাব্রেজির প্রতীক সমাধি, বদর উদ্দীন মসজিদ (ছয় আনি পাড়া মসজিদ), বাদল বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শন ও পবিত্র স্থাপনাসমূহ এ অঞ্চলের পূর্ব গৌরব দাবি করে।

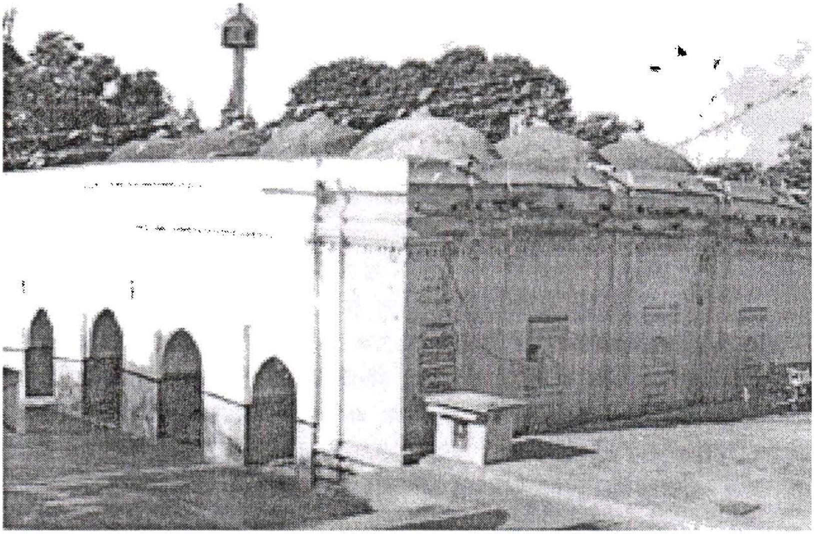

কুচবিহারের অমুসলিম অধিপতি মুখদুম শাহ দৌলার শাহজাদপুর আগমনে শঙ্কিত হয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। উক্ত সৈন্যবাহিনীর সাথে সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত মুখদুম শাহ দৌলা ও তার সঙ্গী সাথিগণসহ শহীদ হন। এই যুদ্ধে তার শহীদ হওয়ার কারণে তিনি শহীদ নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শাহজাদপুরে মুখদুম শাহ দৌলার প্রস্তর-কফিনে করে মসজিদের দশ 'রশি' পার্শ্বে পরবর্তীতে তাঁর ভাগিনা খাজানূর ও তাঁর একজন সঙ্গী ইউসুফ শাহকে কবরস্থ করা হয়। মসজিদের সামনের উত্তর-পূর্বকোণে অষ্টভুজাকৃতির আর একটি ক্ষুদ্র ইমারত অবস্থিত। কারুকাজমণ্ডিত বর্ণাঢ্য ক্ষুদ্র ইমারতটি এর আঙ্গিক সৌষ্ঠবের জন্য সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বে এই স্থানটি ১.৩৭ মিটার উঁচু দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত উন্মুক্ত স্থান ছিল। অষ্টভুজাকৃতির ইমারতটি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। এটি মুখদুম শাহ দৌলার ওস্তাদ বিখ্যাত সামসুদ্দীন তাব্রেজির কথিত সমাধি বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখদুম শাহ দৌলা এবং তাঁর ভাগিনার সমাধি ছাড়া আরো আঠারটি সমাধি সেখানে

www.pathagar.com

ছিল। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় ইয়েমেনের শাহজাদা মুখদুম শাহ দৌলা শহীদের নাম অনুসারে এই স্থানের নামকরণ করা হয়েছে শাহজাদপুর।

শাহজাদপুর জামে মসজিদটি বাংলার সুলতানী শাসনামলে স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিচয় দানকারী ধর্মীয় ইমারত বলে খ্যাত আয়তকার বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। শাহজাদপুর মসজিদ এই আয়তকার বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের গোত্রভুক্ত। এ মসজিদটি তিন আইলে পাঁচটি করে মোট পনেরটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৯.১৩ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থ ১২.৬০ মিটার। এ মসজিদে জুল্লা বিভক্ত। দুই সারিতে মোট আটটি স্তম্ভ থেকে উপরে রয়েছে কৌণিক খিলান। পশ্চিমদিকে দেয়ালে রয়েছে চারটি অন্তপ্রবিষ্ট মিহরাব।

মোট দুই সারিতে ব্যালাস্ট পাথরের স্তম্ভ রয়েছে; দণ্ডায়মান এই প্রস্তর স্তম্ভের সংখ্যা আটটি। এ মসজিদের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এর ছোট গুম্বুজবিশিষ্ট ধাপযুক্ত দ্বিতল মিম্বার। শাহজাদপুর মসজিদের ব্যতিক্রমধর্মী দ্বিতল মিম্বার, ছাদ ও কার্নিশের অতিস্বল্প বক্রতা, প্রাথমিক পর্যায়ের নির্মাণ পদ্ধতি, অলঙ্করণ শৈলী, পার্শ্ববুরুজের অনুপস্থিতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রস্তুতিলগ্নে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে এ মসজিদটি নির্মিত বলে প্রতীয়মান হয়। পরিণত মসজিদ স্থাপত্যের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এতে সমন্বিত হয়নি। কিন্তু বাংলার মুসলিম স্থাপত্য ঐতিহ্য সৃষ্টিতে শাহজাদপুর মসজিদ অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করে পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্যের রূপরেখার পথ নির্দেশ করছে।

নবগ্রাম ভাগনের (ভাঙা) মসজিদ, নবগ্রাম (নওগাঁ)

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার অন্তর্গত নওগাঁ বা নবগ্রাম ভাগনের (ভাঙা) মসজিদ ও নবগ্রাম শাহী মসজিদ- দু'টি মসজিদ অবস্থিত। নবগ্রাম শাহী মসজিদের প্রায় ১৮২.৮৮ মিটার (২০০ গজ) দক্ষিণ-পশ্চিম আর-একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ ধ্বংসপ্রায় মসজিদটিকে স্থানীয় জনসাধারণ ভাগনের (ভাঙা) মসজিদ এবং নিকটস্থ নবগ্রাম শাহী মসজিদকে মামার মসজিদ বলে অভিহিত করে থাকেন। দু'টি মসজিদের নির্মাতা দু'জনের মধ্যে মামা ভাগ্নের সম্পর্ক না থাকলেও অনুমতি হয় ভাগনের মসজিদের (১৪৫৪ খ্রিঃ) নির্মাতা উলুগ রহিম খানের সাথে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিঃ) কোনো আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত জরিপ প্রতিবেদনে ভাগনের মসজিদ ভূমি নকশাসহ বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে-পূর্ব পশ্চিমে বিভক্ত সাতটি ও উত্তর-দক্ষিণে তিনটি সারিতে এই আয়তাকার মসজিদটি মনে হয় মূলত একুশ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এটির অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ লম্বা ২৫.১০ মিটার এবং চওড়া ৯.৬০ মিটার (বহির্ভাগের পরিমাপ লম্বা ২৯.১০ মিটার এবং চওড়া ১৩.৬০ মিটার) এবং দেওয়াল চার মিটার প্রশস্ত। ১২টি স্তম্ভ, সাতটি মিহরাব উত্তর এবং দক্ষিণ দিকেও তিনটি করে প্রবেশ পথ ছিল। চারটি অষ্টকোণাকৃতি মিনার ছিল যার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান। আগাছা পরিপূর্ণ বিধ্বস্ত মসজিদটির আদিরূপ এখন আর অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ধ্বংসে নিপতিত মসজিদটির পার্শ্বে একটি ঢিবি আছে।

www.pathagar.com

সেখান থেকে একটি শিলালিপি নবগ্রাম শিলালিপি ৮৫৮ হিজরি (১৪৫৪ খ্রিঃ) পাওয়া গেছে। যদিও অতীতে ধ্বংসপ্রায় এ মসজিদের গাত্রে সংযুক্ত অবস্থায় শিলালিপিটি পাওয়া যায়নি কিন্তু শিলালিপিটি এ মসজিদের বলে প্রতীয়মান হয়। শিলালিপিটি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত আছে এবং এর জাদুঘর সংযোজন নম্বর ৩১৭১। শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি সুলতান নাসির উদ্দিন মাহমুদ শাহের সময়ে ৮৫৮ হিজরিতে (১৪৫৪ খ্রিঃ) খিত্তা সিমলাবাদের একজন সুদক্ষ শাসনকর্তা উলুগ রহিম খান কর্তৃক নির্মিত হয়।

নবগ্রাম শাহী মসজিদ

নবগ্রাম শাহী মসজিদটি সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ থানার অন্তর্গত নওগাঁ গ্রামে চামোহর রেল স্টেশন থেকে ২০.৯২ কি. মি. (১৩ মাইল) দূরে অবস্থিত। ইতিহাস-সূত্রে জানা যায় সুলতানি শাসন আমলে মুসলিমদের দ্বারা এ অঞ্চলে সতুন মুসলিম অধিবাস গড়ে ওঠায় এ স্থানের নামকরণ হয় নওগাঁ বা নবগ্রাম অর্থাৎ নতুন শহর।

নবগ্রাম অবস্থিত হোসেন শাহী আমলের অনিন্দ্যসুন্দর এ মসজিদ বহুদিন সংস্কারের অভাবে জঙ্গলাকীর্ণ ও ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। বহু ক্ষয়ক্ষতির পর সম্প্রতি স্থানীয় জনসাধারণ সংস্কার করে এক ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছে ; তবে এভাবে সংস্কার করার ফলে আদি ইমারতের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষণীয়। নবগ্রাম শাহী মসজিদের জুল্লা বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট এবং জুল্লার সম্মুখভাগ তিন গম্বুজবিশিষ্ট বারান্দাযুক্ত। এ মসজিদের অভ্যন্তর দিক থেকে একেক দিকের পরিমাপ ৭.৩২ মিটার পূর্বদিকে সম্মুখের অংশের পরিমাপ ৩.৩৫ মিটার এবং ৭.৩২ মিটার ২৪ ফুট। মসজিদের চার কোণে চারটি পার্শ্ববুরুজ ছাড়াও সম্মুখের বর্ধিত অংশের দুই পার্শ্বে দু'টি পার্শ্ববুরুজ আছে। গোলাকার এই বুরুজগুলোর উপরিভাগ ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। পূর্বের বরান্দার ছাদ দু'টি ব্যাসাল্টি পাথরের স্তম্ভের উপরে স্থাপিত। বরান্দায় যে দু'টি অনতিউচ্চ প্রস্তর স্তম্ভ আছে, তার পরিধি বাংলাদেশের সবচেয়ে স্ফীতবিশাল (ব্যাস ১.৮৩ মিটার প্রায় ৬ ফুট) আকৃতিবিশিষ্ট যা অবশ্যই এ মসজিদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে নবগ্রাম শাহী মসজিদের ভূমি-নক্শায় বৈচিত্র লক্ষণীয় এবং মসজিদে এধরনের বরান্দার ব্যবহার অভিনবত্বের দাবিদার।

নবগ্রাম শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে; জাদুঘর সংযোজন নং ১৫২৩। শিলালিপি পাঠে জানা যায় সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের শাসন আমলে আজিয়াল মিয়া জংদার ৯৩২ হিজরিতে (১৫২৬ খ্রিঃ) মসজিদটি নির্মাণ করেন।

নবরত্ন মন্দির

উল্লাপাড়া উপজেলাধীন হাটিকুমরুল ইউনিয়নের নবরত্নপাড়া গ্রামে নবরত্ন মন্দির নামে পুরাকীর্তি অবস্থিত। এর আশপাশে আরো কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। এ মন্দিরগুলো আনুমানিক ১৭০৪-১৭২৮ সালের মধ্যে মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনামলে তার জনৈক নায়েব দেওয়ান রামনাথ ভাদুরী নামক ব্যক্তি স্থাপন করেন। হিন্দু স্থাপত্যেও

www.pathagar.com

উজ্জ্বল নিদর্শন কারুকার্যমণ্ডিত নবরত্ন মন্দিরটি তিনতলাবিশিষ্ট। এ মন্দির ছিল পোড়ামাটির ফলক সমৃদ্ধ ৯টি চূড়া। এজন্য এটিকে নবরত্ন মন্দির বলা হতো। এবং অন্যান্য মন্দিরসমূহ দোচালা এবং মঠাকৃতি আটকোণাবিশিষ্ট। এ মন্দির নির্মাণকালে প্রতিটি ইট ঘিয়ে ভেজে তৈরি করা হয়েছিল মর্মে জনশ্রুতি রয়েছে। দিনাজপুর জেলার কান্তজীর মন্দিরের অনুকরণে গঠিত তিনতলা এই মন্দিরের আয়তন ৬৫.২৪ বর্গফুট। বর্গাকৃতির মন্দিরটি প্রায় ২ ফুট প্লাটফরমের উপর তৈরি। মন্দিরের মূল কক্ষটি বেশ বড়। চারদিকের দেয়ালের বাইরের চারপাশে পোড়ামাটির ফলক সাজানো ছিল। পরে

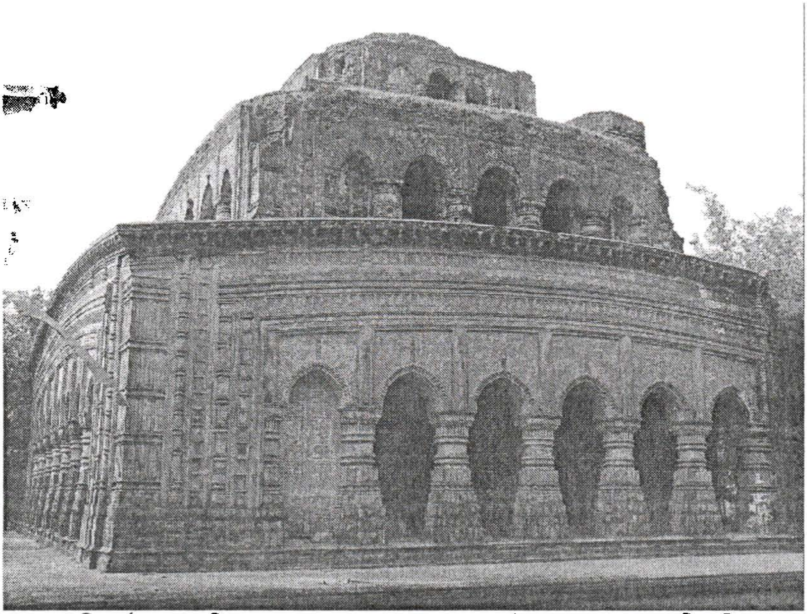

কালের বিবর্তনে প্রাকৃতিক আর মানুষের অবহেলায় নষ্ট হলে নবরত্ন মন্দিরটি ১৯৮৭ সালে সংরক্ষিত ইমারত হিসেবে সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করে সংস্কার কাজ সম্পন্ন করে। মন্দিরটি ক্রমহ্রাসমান তিনতলাবিশিষ্ট। এলাকার লোকজন এটাকে দোলমঞ্চ নামেও পরিচিত করে। মন্দিরের উপরের রত্ন বা চূড়াগুলো অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। নিচতলায় ২টি বারান্দা বেষ্টিত একটি গর্ভগৃহ। এর বারান্দার বাইরের দিকে ৭টি এবং ভিতরের দিকে ৫টি খিলান বা প্রবেশ পথ। গর্ভগৃহের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে ২টি প্রবেশ পথ আর মন্দিরের ২য় তলায় কোনো বারান্দা নেই।

হাটিকুমরুল নবরত্ন মন্দিও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নবরত্ন মন্দির। মূল অবস্থায় মন্দিরটি পোড়ামাটির চিত্রফলক দ্বারা সাজানো যে ছিল সেটা মন্দিরটি দেখেই বোঝা যায়। এখন মাটির হয়ে সামান্য কিছু চিত্রফলকের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। এই মন্দিরের কোনো শিলালিপি বা নির্ধারিত পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্থানীয়ভাবে এই মন্দির

www.pathagar.com

ভাদুরী জমিদারের বাড়ি আর সেই জমিদারির মন্দির নামেই পরিচিত। অনেকে মনে করেন এই মন্দির খাজনা আদায়ের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এখানকার স্থানীয় পূর্বপুরুষের স্মৃতি হাতড়ে কেউ কখনো পূজা অর্চনা হতে দেখেনি। নবরত্ন মন্দিরের বাইরে পূজার আয়োজন হলেও ভেতরে পূজা হতে দেখেনি কেউ। এমনিভাবেই নবরত্ন মন্দিরকে দেখে এসেছে এলাকার লোকজন।

প্রথমদিকে সরকারের পক্ষ থেকে নবরত্ন মন্দিরে পূজার জন্য আয়োজনের কথা বলা হলেও দুটো কারণে স্থানীয় হিন্দু পরিবাররা রাজি হয়নি। এক, এটি জমিদারি সম্পত্তি হওয়ায় প্রজা হিসেবে জমিদারি সম্পত্তি ব্যবহার যথাযোগ্য মনে করেনি তারা। দুই, এখানকার হিন্দু পরিবারদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। নবরত্ন মন্দিরে পূজা চালিয়ে যাওয়ার মতো সাধ্য এখানকার পরিবারগুলোর নেই। একারণে এ মন্দিরের ভেতরে পূজা না দিয়ে বাইরের পূজা করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে এলাকার লোকজন। এই এলাকায় এখনো দুই তিন মাইল জুড়ে স্থানীয় মাপে তিন চার পরুষ অর্থাৎ ২০/২৫ ফুট মাটি খুড়লে পুরনো লম্বা প্রাচীর এবং সারি সারি ইটের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ধারণা করা যায় জমিদারি আমলের এই জমিদার বাড়ি মাটির নিচে হারিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকজনও এটা বিশ্বাস করে। তাদের ধারণা মন্দিরগুলো জমিদার বাড়ির চেয়ে উঁচুতে ছিল অথবা দৈববলে মন্দিরগুলো মাটির নিচে হারিয়ে যায়নি। সম্প্রতি ঐ স্থানের মন্দিরসমূহের সংস্কার সাধন করা হয়েছে। নবরত্ন মন্দির ও আশপাশের অন্যান্য মন্দিরের প্রকৃত অবয়ব অনেকাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর গঠন আকৃতি ও নির্মাণশৈলী অভূতপূর্ব। খুব ছিমছাম আর পরিচ্ছন্নতার জন্য জায়গাটা পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

বদরউদ্দিনের মসজিদ

বদরউদ্দিনের মসজিদ শাহজাদপুরের আর-একটি উল্লেখ্যযোগ্য স্থাপত্য নিদের্শন। এ মসজিদটি শাহজাদপুরের থানার পার্শ্বে ছয়আনি পাড়ায় অবস্থিত। সমজিদটি বড় আকৃতির শাহজাদপুর জামে মসজিদের (দরগাপাড়া) সাথে তুলনা করে ছোট মসজিদ বলে অভিহিত করা হয়। ছয়আনি পাড়ায় অবস্থিত বলে ছয়আনি পাড়া মসজিদ নামেই বেশি পরিচিত। নির্মাতার নামানুসারে মসজিদটি স্থানীয়ভবে শাহ বদরউদ্দিনের মসজিদ নামেও খ্যাত। বদরউদ্দিনের মসজিদটি প্রধান দু'টি কারণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত : ১. এর বিরল ধরনের দুই গম্বুজবিশিষ্ট আচ্ছাদন ও ২. ব্যাতিক্রমধর্মী টেরাকোটর শিলালিপি। বদরউদ্দিনের মসজিদটি আয়তনকৃতি। বাইরের দিক থেকে এর দৈর্ঘ্য ৯.৩৯ মিটার এবং প্রস্থ ৬.০৭ মিটার এবং মসজিদের অভ্যন্তর থেকে এর দৈর্ঘ্য ৭.৩১ মিটার এবং প্রস্থ ৩.৫৫ মিটার। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত এ মসজিদের উচ্চতা ৫.৮৯ মিটার। ভূমি নক্শা থেকে পরিলক্ষিত হয় যে, মসজিদের জুল্লা মাত্র এক 'আইল' ও দুই 'বে'-এর সমন্বয়ে গঠিত যার উপর দুইটি সমাকৃতির গম্বুজ স্থাপিত হয়েছে।

বদরউদ্দিনের মসজিদে সমানের ফাসাদের তিনটি দরজার সোজাসুজি বিকলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবের পেছনে কিবলা দেয়ালে বাইরের দিকে সম্প্রসারিত করা আছে। মসজিদের অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান কোনো স্তম্ভ নেই। মসজিদরে পূর্ব ফাসাদে মোট তিনটি খিলানবিশিষ্ট প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম

www.pathagar.com

দেয়ালে মোট তিনটি মিহরাব। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়লে একটি করে জালি নক্‌শা সংবলিত গবাক্ষ আছে। অন্যান্য সকল মসজিদ থেকে ভিন্নভাবে এ মসজিদের জুল্লা সমান দুই ভাগে বিভক্ত; কিন্তু মিহরাব এখানে তিনটি। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডানপাশে একটি তিনধাপবিশিষ্ট মিম্বার আছে। মসজিদের চার কোণে চারটি পার্শ্বসংলগ্ন বুরুজ আছে। কলস ভিতের উপরে স্থাপতি এসব পার্শ্ব বুরুজ প্যারাপেটের উপর পর্যন্ত উঠে গেছে এবং বুরুজের শীর্ষ ছোট কিউপোলা যুক্ত। শেষ পর্যন্ত কিউপোলাগুলি পদ্মকলি মোতিফের ফিনিয়ালে শেষ হয়েছে। এ মসজিদের শিলালিপিটি সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী বিসমিল্লাহ দিয়ে হয়নি। এখনে কালেমা তৈয়্যবা দিয়ে ব্যতিক্রমীভাবে শুরু হয়েছে লেখা। এ শিলালিপির ভাষা ফারসি এবং এর লিখনরীতি পরিশীলিত নাস্তালিক। শিলালিপির শেষাংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে মুঘল সম্রাট মোহাম্মদ শাহের সময়ে জনৈক বদরউদ্দিন কর্তৃক ১১৫১ হিজরিতে মসজিদটি নির্মিত হয়েছে (১৭৩৮-১৭৩৯)।

মসজিদের শিলালিপিটি; একটি কারণে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য; আর তা হলো এ লিপিটি সাধারণ কোনো শিলাখণ্ড লিখিত নয় এটা একটা টেরাকোট ফলকলিপি। এখানে বাংলার আদি অকৃত্রিম টেরাকোট ফলকে সার্থকভাবে উৎকীর্ণ লিপি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফারসি ভাষায় নাস্তালিক রীতিতে উৎকীর্ণ।

গদাই সরকার মসজিদ

তাড়াশের বারুহাস ইউনিয়ন থেকে পাঁচ মাইল পূর্বে কোহিত তেতুলিয়া গ্রামে একটি মাঠের মধ্যেই গদাই সরকারের মসজিদটি অবস্থিত। এ মসজিদ এক গম্বুজবিশিষ্ট বর্গাকৃতির। ক্ষুদ্র মসজিদটির পরিমাপ ৩.৫০ মিটার ও ৩.৫০ মিটার এবং উচ্চতা ৬ মিটার।

এ মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশ পথ এবং অভন্তরে পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। গম্বুজটি অষ্টাভুজাকৃতির ড্রামের উপরে স্থাপিত। গম্বুজটি ঘিরে নিচে চার দিকে পদ্মপাপড়ির ন্যায় মারলেন নক্‌শা রয়েছে। মসজিদের ছাদের কার্নিশ সমান্তরাল এবং মসজিদের চার কোণে চারটি গোলায়িত পার্শ্ব বুরুজ আছে। মসজিদটি সপ্তদশ শতকের শেষ দিকে তৈরি।

ধানগড়া মসজিদ

রায়গঞ্জ থানা সদর থেকে প্রায় ৫০০ গজ পশ্চিমে এবং ধানগড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল অফিস থেকে দেড় মাইল উত্তরে ধানগড়া গ্রামে ধানগড়া মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট। এ মসজিদের পূর্ব ফাসাদে তিনটি প্রবেশ পথ এবং পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ আছে। তিনটি গম্বুজ সমান এবং গম্বুজের নিচের গাত্রে মারলন নক্‌শাযুক্ত মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৮.৮০ মিটার প্রস্থ ২.১৩ মিটার। এ মসজিদটি এতই ভগ্নদশায় উপনীত হয়েছে যে. এর সংস্কার করার আর উপায় নেই।

www.pathagar.com

খারিজা ঘুঘাট মসজিদ

রায়গঞ্জ থানা সদর অফিস থেকে প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে ডুবিল ইউনিয়ন অফিস। এ অফিস থেকে দক্ষিণ পূর্বদিকে খারিজা ঘুঘাট গ্রামে জেলা বোর্ড রাস্তার কাছে ফাঁকা স্থানে খারিজা ঘুঘাট মসজিদটি অবস্থিত। মসজিদটি বর্গাকৃতির এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট। পূর্ব ফাসাদে মাত্র একটি প্রবেশ পথ। মসজিদটির অন্য তিন দিকে কোনো দরজা বা জানালা নেই। এক গম্বুজবিশিষ্ট অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব আছে। এ মসজিদের ছাদের উপরে অষ্টাকোণাকৃতির ড্রামের উপরে গম্বুজটি স্থাপিত। গম্বুজের চার দিকে ঘিরে রয়েছে পদ্মপাপড়ির ন্যায় 'মারলন' নক্শা। মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি পার্শ্বগম্বুজ এবং বুরুজের শীর্ষ ছোট গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত।

মক্কা আউলিয়া মসজিদ

উল্লাপাড়া বাজার থেকে আনুমানিক ৩০০ গজ পশ্চিমে জেলা পরিষদ সড়কের উত্তর পার্শ্বে মক্কা আউলিয়ার মসজিদ ছিল বলে স্থানীয় লোকেরা বলে থাকেন। সে মসজিদ ইমারতটির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই এবং জানা যায় এ ইমারতটি ছিল দৈর্ঘ্যে ৯.১৪ মিটার। অনুমিত হয়, ইমারতটি মুঘল আমলের শেষপাদে সপ্তদশ শতকের শেষে তৈরি হয়েছিল।

মক্কা আউলিয়ার মসজিদের স্থলে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। বর্তমানে দক্ষিণ দিক মক্কা আউলিয়ার দোচালাকৃতির আচ্ছাদনযুক্ত কক্ষটির অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান। পরিত্যক্ত এই কক্ষটি আয়তকার; এর দৈর্ঘ্য ২.৭৪ মিটার ও প্রস্ত ০.৯১ মিটার। জনশ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, শেখ বুলাক নামে একজন মক্কাবাসী ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলে আগমন করেছিলেন। মতান্তরে ধর্ম প্রচারকের নাম আরমান উল্লাহ (আরজান উল্লাহ) বলেও কথিত আছে। তিনি এখানে একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আউলিয়া মক্কা থেকে আসেন বলে স্থানীয়ভাবে তিনি মক্কা আউলিয় বলে পরিচিত।

বেড়িপোটল মসজিদ

সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার বেড়িপোটল গ্রামে এ মসজিদ অবস্থিত। উপজেলা সদর অফিস থেকে মাইলখানেক ঠিক দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর প্রধান সড়কের পূর্বদিকে বেড়িপোটল মসজিদটি দণ্ডায়মান আছে। বেড়িপোটল মসজিদটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট। এই ক্ষুদ্র বর্গাকার মসজিদের অভ্যন্তরভাগে থেকে এককে দিকের দৈর্ঘ্য ২.৩৯ মিটার। দেয়াল ০.৫৬ মিটার প্রশস্ত। এ মসজিদে মাত্র একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশপথটি পূর্বদিকে অবস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জানালা নেই। অভ্যন্তরে পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব আছে এবং এ মিহরাবের উচ্চতা এত কম যে, তা এক ফুটের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি হবে। একমাত্র গম্বুজের উপরে কলস ফিনিয়াল রয়েছে। গম্বুজের নিচে চারদিক ঘিরে রয়েছে পদ্মপাপড়ির ন্যায় মারলন-নক্শা। মসজিদের চারকোণে রয়েছে চারটি পার্শ্ব বুরুজ। বেড়িপোলে অবস্থিত এ ক্ষুদ্র মসজিদটিকে সম্প্রতি চারগুণ প্রশস্ত করে এর পরিসর বৃদ্ধি করা হয়েছে।

www.pathagar.com

সান্দুরিয়া জামে মসজিদ

সান্দুরিয়া জামে মসজিদটি সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ (মৌজা : জে এল নং ৭২) থানা সগুনা ইউনিয়নের অন্তর্গত সান্দুরিয়া গ্রামে অবস্থিত। তাড়াশ থানা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার পশ্চিমে তাড়াশ থেকে বারুহাস যাওয়ার সড়কের পার্শ্বে এবং বারুহাস থেকে ১.৫ কিলোমিটার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূমিসমন্বয়ে গঠিত এ সান্দুরিয়া গ্রামটি গুমানী নদীর তীরে অবস্থিত। সান্দুরিয়া জামে মসজিদটি ভূমি থেকে প্রায় ১.০৭ মিটার উঁচু ঢিবির উপরে নির্মিত। এ মসজিদের অধীনে পুকুরসহ প্রায় পাঁচ একর জমি রয়েছে এবং মূল মসজিদের ইমারতটির দৈর্ঘ্য ১১.১৮ মিটার ও প্রস্থ ৪.৫৭ মিটার বিশিষ্ট। অভ্যন্তরভাগে মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৮ মিটার ও প্রস্থে ২.২৯ মিটার। আয়তাকৃতির এই ক্ষুদ্র মসজিদটি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের পূর্ব ফাসাদে তিনটি খিলানের মাধ্যমে নির্মিত প্রবেশদ্বার। এ মসজিদের পশ্চিমের দেয়ালে মিহরাব আছে।

এ মসজিদে কোনো শিলালিপি নেই। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণ কৌশল ও স্বল্প নক্‌শা লক্ষ্য করে মসজিদটি আঠারো শতকের শেষপাদে তৈরি বলে প্রতীয়মান হয়। সান্দুরিয়া জামে মসজিদের উত্তরে ৪.৫৭ মিটার থেকে ৬.৮৬ মিটার। দূরে দু'টি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখন কেবল ভাঙ্গা ইট ও সুরকির স্তুপ ও উঁচু ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়।

বারুহাস মসজিদ

তাড়াশ উপজেলা সিরাজগঞ্জ জেলার বিখ্যাত চলনবিলের এক প্রাচীন জনপদ। বারুহাস মসজিদটি তাড়াশ থানা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এবং বারুহাস বাজার থেকে প্রায় ১৮৩ মিটার পশ্চিমে বারুহাস গ্রামে অবস্থিত। মসজিদটি আয়তকার তিন গম্বুজবিশিষ্ট। মসজিদের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১১.৬০ মিটার এবং প্রস্থে ৩.৬০ মিটার। মসজিদের চারটি বর্হিকোণে চারটি পার্শ্বগম্বুজ আছে। এর সমানে ফাসাদে তিনটি প্রবেশপথ ও পশ্চিম দেয়ালে অভ্যন্তর ভাগে তিনটি অলংকৃত মিহরাব আছে। এ মসজিদের তিনটি গম্বুজের কেন্দ্রীয় গম্বুজটি সামান্য বড়। মসজিদের পূর্বফাসাদ একেবারে অলঙ্করণবিহীন নয়; এখানে খোপ নক্‌শা ও ফুলেল অলঙ্করণ রয়েছে। বন্ধ খিলান নক্‌শাও এখানে দেখা যায়। বারুহাস মসজিদটি ঔপনিবেশিক আমলে মুঘল স্থাপত্যরীতির অনুকরণে জনৈক স্থানীয় ব্যক্তি দেলওয়ার হোসেন খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। মসজিদ-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে যে বারুহাস মসজিদটি নির্মাণকাল ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি

বাংলা সাহিত্যের সবচাইতে প্রতিভাবান ও মহৎ কবি নিঃসন্দেহে কোনো অঞ্চল বিশেষের ফসল নন। তাঁর সাহিত্যের বিশ্বমানবতাবোধ ও বিশ্বজনীনতা তাঁকে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে স্থাপন করেছে। তবু একথাও স্বীকার করতে হয় যে, বৃক্ষ যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানকার মাটির রস শোষণ করেই পত্র পুষ্পে সুশোভিত হয়ে মানুষের

www.pathagar.com

মনোরঞ্জন করে। একজন কবিও ঠিক স্থানিক বেষ্টনীর মঞ্চ থেকেই চিন্তা ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটান। প্রতিভা এমন এক বিস্ময়কর কিছু যার জাদুস্পর্শে সাধারণ হয়ে উঠে অসাধারণ, সমান্যও হয়ে উঠে অসামান্য। স্থানিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্য ব্যক্তির অমলিন প্রতিভার স্পর্শে বিশ্বমানবিক বিশ্বজনীনতার গুণ অর্জন করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এমনটি হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও রসোজ্জ্বল করেছে শাহজাদপুর কাচারি বাড়ির স্থানিক বৈশিষ্ট্য।

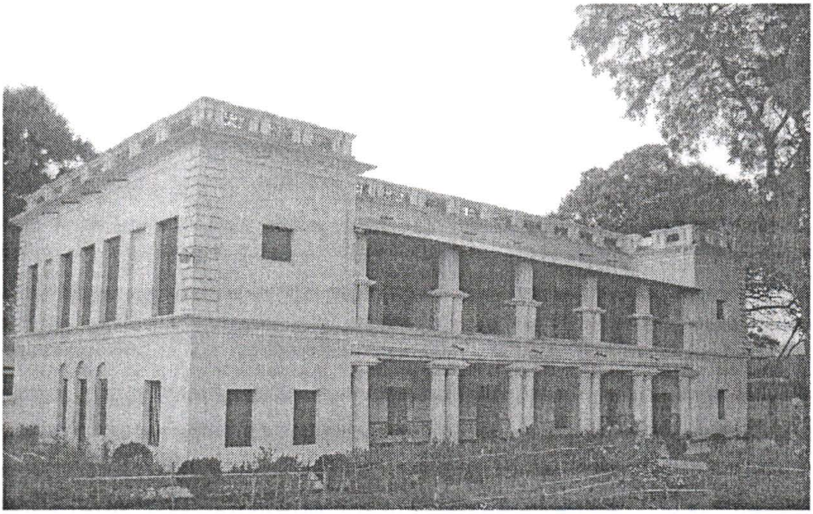

কবিগুরুর স্মৃতি বিজড়িত সিরাজগঞ্জ জেলার প্রাচীন ঐতিহ্য শাহজাদপুর থানায় অবস্থিত এ বাড়িটি। বগুড়া-নগরবাড়ি মহাসড়ক শাহজাদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিট কয়েকের পথ। পথের ধারে নদী ঠিক নয়, করতোয় নদীর একটি নালা। বয়ে গেছে শাহজাদপুরের বুক চিরে। অন্য সময় পানি থাকে না কিন্তু বর্ষার সময় পানিতে থাকে টইটুম্বর। এক পাড়ে শাহজাদপুর দ্বারিয়াপুর বাজার (তাঁতপণ্যের হাট; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম অনুসারেই নাকি নাম হয়েছে দ্বারিয়াপুর)। বাজারের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি। রবীন্দ্র কাছারি বাড়ির প্রাঙ্গণের সে নালটির কিছু অংশ ভরাট করে উপজেলা ভবন সংলগ্ন নতুন প্রবেশদ্বার করা হয়েছে। সেই নালাটির ধারে দাঁড়ালেই কবির বিখ্যাত কবিতাটি মনে পড়ে–

“আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাটুজল থাকে।”

ইন্দো-ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীতে নির্মিত রবীন্দ্র কাছারি বাড়ির দ্বিতল ভবন। আজ থেকে প্রায় পৌনে তিনশ বছর পূর্বে প্রায় ৩৫ শতাংশ জায়গার উপর নির্মিত হয়েছিল এই ভবনটি। সেদিন নীলকর সাহেবদের এই ‘কুঠিবাড়ি’। কুঠিবাড়ি এই ভবনটি ছিল

www.pathagar.com

নীলকুঠিয়ালদের রংমহল। নীলকুঠির শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা এই ভবনে রাজার হালে নানাবিধ আনন্দফূর্তির মধ্যে দিন কাটাতো। প্রজাদের দিয়ে জোর করে নীল চাষ করাতো আর নীল চাষে অবাধ্য চাষীদের উপর নেমে আসতো জুলুম, অত্যাচার ও অমানবিক নির্যাতন। যে ভবনে একদিন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের করুণ গাঁথা সৃষ্টি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে কবিগুরুর পদস্পর্শে সে ইতিহাস ধুয়ে মুছে যায়। সৃষ্টি হয় আর এক ইতিহাস।

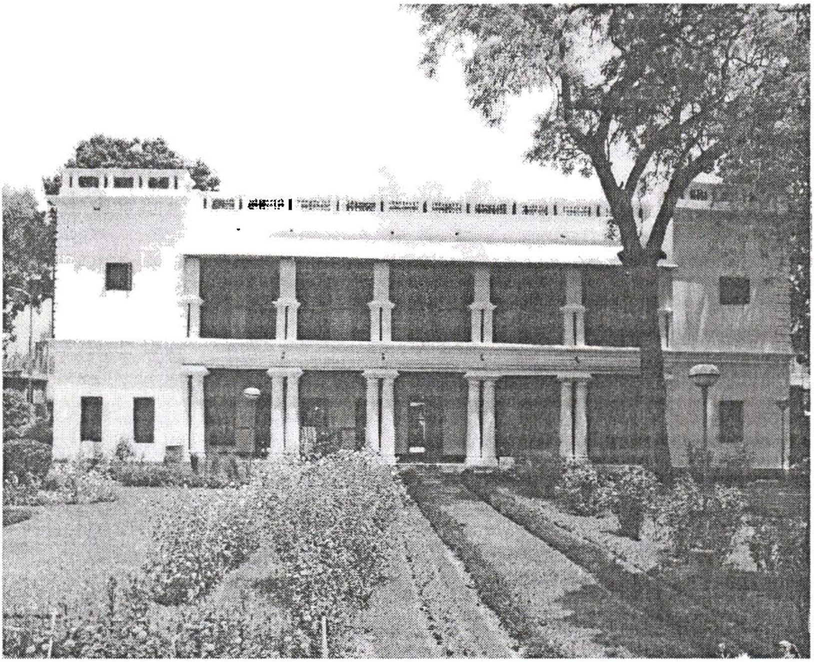

কালচক্রে একদিন নীলকর পতন ঘটে এবং এ দেশ থেকে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়। তিন তৌজি অন্তর্গত ডিহি শাহজাদপুর জমিদারি একসময় নাটোরের রাণী ভবানীর জমিদারির একটি অংশ ছিল। ১৮৪০ সালে শাহজাদপুরের জমিদারি নিলামে উঠল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তের টাকা দশ আনায় এ জমিদারি কিনে নেন। জমিদারির সাথে সাথে শাহজাদপুরের কাছারি বাড়িটিও ঠাকুর পরিবারের হস্তগত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এর আগে এ বাড়ির মালিক ছিল নীলকর সাহেবরা। 'নীলকুঠি' থেকে রাণী ভবানীর 'কাচারি বাড়ি' এরপর ঠাকুর কাছারি বাড়ি' বা 'কুঠিবাড়ি' তারপর 'রবীন্দ্র কাছারি বাড়ি'-তে 'রবীন্দ্র স্মৃতি জাদুঘর' এ পরিণত হয়েছে।

১৮৯০ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ছয় বছর কবি রবীন্দ্রনাধ ঠাকুর শাহজাদপুরে জমিদারি দেখা শোনার কাজে মাঝে মাঝে আসতেন এবং সাময়িকভাবে বসবাস

www.pathagar.com

করতেন। তিনি স্থায়ীভাবে থাকতেন কুষ্টিয়ার শিলাইদহে। সম্ভবত এ কারণেই শিলাইদহে তাঁর বাসগৃহ কুঠিবাড়ি নামে এবং শাহজাদপুরের বাড়িটি কাছারি বাড়ি নামেই পরিচিত। শাহজাদপুর কাছারি বাড়ি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের একটি দশক (১৮৯১-১৯০১) কেটেছিল উত্তর বাংলার পল্লীর প্রান্তরে আর উন্মুক্ত নদী বুকে। সেটি ছিল কবি জীবনের চতুর্থ দশক। এ দশকেই প্রথম অর্ধাংশে কবির ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল শাহজাদপুরের সঙ্গে। শাহজাদপুর কাচারি বাড়ি এই সময়টা (১৮৯০-১৮৯৬) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির স্বর্ণময় যুগ বলা হয়।

'বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ'-এ শিরোনামে একটি দশক নয় যথার্থভাবে একটি অর্ধদশকই চিহ্নিত হতে পারে। আর এ অর্ধদশকের সংযোগ থাকলেও তাঁর জীবনের একটি মূলবান অধ্যায় কাচারি বাড়িতে কেটেছে। দেখেছেন এখানকার মানুষকে, উপভোগ করেছেন নিসর্গের বিচিত্র রূপকে, আবিষ্কার করেছেন স্বদেশের আত্মাকে। শাহজাদপুর কাছারি বাড়ি এসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাস্তব জীবনের সম্মুখীন হলেন। পল্লী বাংলার একদিকে প্রকৃতির অবারিত আমন্ত্রণ, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি। এ দুইয়ের মাঝখানে কবি বৃহত্তর জীবনের ইঙ্গিত পেয়েছেন। শাহজাদপুরের পল্লী প্রকৃতি কবিকে বিমোহিত করে। সে কারণে কবি নিজেই এ বাড়ির সংস্কারের কাজে হাত দেন। বাড়ির আঙ্গিনায় কবি নিজ হস্তে তমাল, অর্জুন, পঞ্চবট, মহুয়া ও বকুল বৃক্ষ রোপণ করেন। কালের চক্রে সেসব গাছ নিঃশেষ হয়ে গেছে। তবে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও (প্রায় মৃত) দাঁড়িয়ে আছে কবিগুরুর সেই প্রিয় বকুল গাছ বা বকুল তলা। সেই বকুল তলায় এখন প্রায় মৃত গাছটির স্থলে আর একটি বকুল গাছ রোপণ করা হয়েছে। তমাল, অর্জুন পঞ্চবট, মহুয়া, বকুল গাছের মর্মর ধ্বনি, পাখির কলকাকলি কবিকে করেছিল ব্যাকুল। তাই এই কাছারি বাড়িটিকে কবি নামকরণ করেছিলেন 'আনন্দ ভবন'।

কবিগুরু এই কাছারি বাড়িতে অবস্থানকালীন অসাধারণ কালজয়ী সাহিত্য রচনা করেছেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সোনার তরী' কাব্যের 'ভরা ভদরে', 'দুইপাখি', 'আকাশের চাঁদ', 'হৃদয় যমুনা', 'প্রত্যাখ্যান', 'বৈষ্ণব কবিতা', 'পুরস্কার' ইত্যাদি কবিতা এবং 'কল্পনা' কাব্যের 'যাচনা' 'বিদায়', 'নববিবাহ' মানস-প্রতিমা', 'লজ্জিতা', 'সংকোচ' ইত্যাদি বিখ্যাত গান রচনা করেছেন। তাঁর এখানে বসে রচিত ছোটগল্পের মধ্যে 'পোস্টমাস্টার', 'ছুটি', 'সমাপ্তি' এবং 'অতিথি' ইত্যাদি বিখ্যাত। আর প্রবন্ধের মধ্যে 'ছেলে ভুলনো ছড়া', 'পঞ্চভূত' এর অংশবিশেষ এবং 'ছিন্নপত্র' ও ছিন্নপত্রাবলীর আটত্রিশটি পত্র রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁর বিখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকও এখানে রচিত। সবচেয়ে বড় কথা হলো তাঁর পরবর্তী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাহজাদপুরের প্রভাব বিশেষভাবে বিদ্যমান। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ভাগাভাগির ফলে শাহজাদপুর জমিদারি চলে যায় রবীন্দ্রনাথের অন্য শরিকদের হাতে। তাই ১৮৯৬ সালে তিনি শেষ বারের মতো শাহজাদপুর থেকে চলে যান। প্রতিদিন দেশ-বিদেশ থেকে বহু দর্শনার্থী কবির স্মৃতিধন্য এই স্থানটি দেখতে আসেন।[১২]

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদীর উপর নির্মিত স্বপ্নসৌধ 'বঙ্গবন্ধু সেতু' নদীমাতৃক বাংলাদেশের জাতীয় গর্ব অগ্রগতির মাইল ফলক হিসেবে কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বিকাশের পথ উন্মোচন করছে। মাননীয় সংসদ বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আবদুল লতিফ মির্জা জাতীয় সংসদে বঙ্গবন্ধু

সেতু নামকরণের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু সেতুর দৈর্ঘ্য ৪.৮ কিলোমিটার। সেতু সড়কের প্রস্থ ১৮.৫০ মিটার। ৪টি লেনের মধ্য সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল করে। সেতুর উপর স্থান পেয়েছে ব্রডগেজ রেলপথ। টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ সংযোগও স্থাপন করা হয়েছে। গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। ১২১টি পাইল এর উপর নির্মিত হয়েছে এই সেতু। পাইল এর গড় উচ্চতা ৮৩ মিটার। বঙ্গবন্ধু সেতুতে স্প্যানের সংখ্যা রয়েছে ৪৯টি। মোট সেগমেন্ট রয়েছে ১২৬৩টি। নদী শাসন প্রক্রিয়ায় সেতুর পূর্বদিকে ২.০৮ কিলোমিটার এবং পশ্চিমদিকে ২.০২ কিলোমিটার গাইড লাইন বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুর পূর্বদিকে ১৫.৩০ কিলোমিটার এবং পশ্চিমদিকে ১৪.৪০ কিলোমিটার অ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ করা হয়েছে। সেতুটির নির্মাণ কাজে ৪ লক্ষ সিএফটি পাথর ৮৬ লক্ষ ঘনমিটার বালি, ১১.৫০ কোটি ব্যাগ সিমেন্ট, ৩৬ হাজার টন স্টিল প্লেট ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৪.৫ হাজার একর।

এই সেতু প্রকল্পে সর্বমোট ব্যয় প্রায় ৩৮৫০ কোটি টাকা। বাংলাদেশ সরকারের ব্যয় প্রায় ১৪৫০.০০ কোটি টাকা অবশিষ্ট প্রায় ২৪০০ কোটি বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও জাপান ওভারসিজ ইকোনমিক কো-অপারেশন ফান্ড থেকে পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের মূল দায়িত্ব পালন করেছে সাউথ কোরিয়ার হুদাই ফান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং অব কোম্পানি। নদীশাসন ও ভূমি-উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব পালন করেছে নেদারল্যান্ডের

www.pathagar.com

হ্যাম বান অর্ড জেডি। পূর্ব ও পশ্চিম সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেছে সাউথ কোরিয়ার স্যামওয়ান কর্পোরেশন।

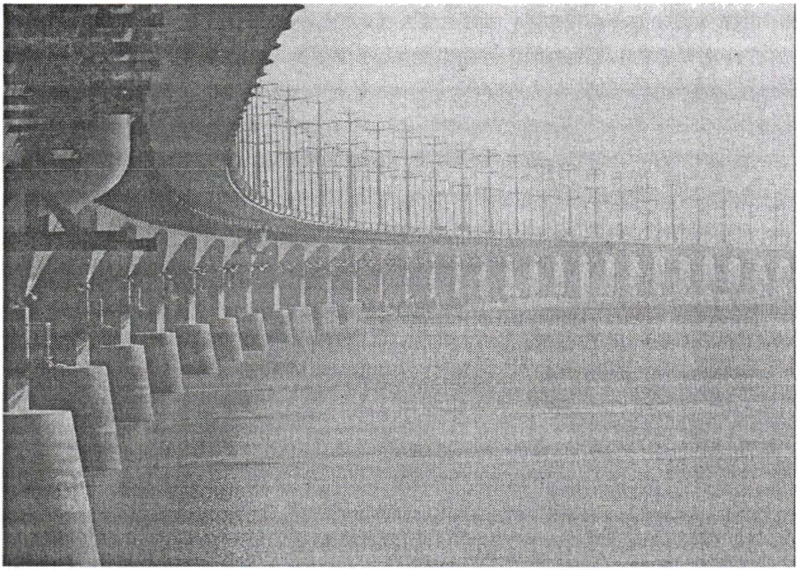

অত্যন্ত আধুনিক ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু সেতুর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। উভয় পার্শ্বে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূর হতে প্যাপরোচ সড়ক অতিক্রম করে সেতুর যানবাহন পারাপারের পূর্বে টোল প্লাজার স্বংয়ক্রিয় মেশিন হতে ভাড়ার রশিদ সংগ্রহ করা হয়। সেতুর উভয় পার্শ্বে রয়েছে দু'টো পৃথক থানা ফায়ার স্টেশন। সেতুর উভয় পার্শ্বে রয়েছে পৃথক দুইটি রেলস্টেশন। প্রতিদিন কমপক্ষে দুইবার সেতুর উপর দিয়ে রেল চলাচল করে। বঙ্গবন্ধু সেতুর দুই পার্শ্বের এলাকায় উপশহর এবং পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উপশহরে চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাইকেলে এবং পায়ে হেঁটে সেতু পারাপার হওয়া যায় না। সেতুর উভয় প্রান্তে টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেতুর মধ্যবর্তী ৪টি স্থানে টহল প্লাজায়ও টেলিফোন ব্যবস্থা আছে। সেতুর উপর দৈবাৎ কোনো কোনো দুর্ঘটনা দক্ষিণ এশিয়ায় এই ধরনের সেতু নেই। মূলত দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সেতুটিকে কিছুটা বাঁকা করা হয়েছে। সেতুটি যদি সোজা হতো তা হলে সূর্যকিরণ এবং বিপরীতমুখী গাড়ির হেডলাইট চালকের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করতো। এ ছাড়াও সেতুর বাঁকা চেহারা চালককে সতর্ক রাখবে। চালক সতর্কতার সাথে গাড়ি চালাতে বাধ্য হবেন।

বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজে দেশি-বিদেশি প্রায় ১৮ লক্ষ মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল। একদিনের কর্মরতদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ২৮৫৬ জন। ঈদের ছুটি ছাড়া এই সেতু নির্মাণ কাজে কেউ ছুটি ভোগ করেননি। হরতাল অবরোধ কর্মসূচি চলাকালেও সেতু নির্মাণের কাজ অব্যাহত ছিল। বঙ্গবন্ধু সেতু উদ্বোধনের সাথে সাথেই দেশে যোগাযোগ

www.pathagar.com

ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু একাধারে সড়ক সেতু, পাশাপাশি রেল, এই সেতুর মধ্য দিয়ে সংযোগ পেয়েছে টেলিফোন, বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবস্থা। বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেল লাইন সংযোগের ফলে রেল ব্যবস্থায় একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুর উপর রেলপথ উদ্বোধনের সাথে সাথেই শুরু হয়েছে রেলের ক্ষেত্রে অহংকারের যুগ। বঙ্গবন্ধু সেতু এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যে রিকটার স্কেলে ৭ মাত্রার ভূমিকম্পে এটির কোনো ক্ষতি হবে না। তাছাড়া সেতুটির আয়ুষ্কাল ধরা হয়েছে ১২০ বছর। বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর রাখা হয়েছে কঠোর নজরদারি। এলক্ষ্যে দুই পাশে এবং সেতুর উপর বসানো হয়েছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। তাছাড়া আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কঠোর নজরদারি ও টহল রয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর জন্য দুই পাশে অধিগ্রহণ করা হয়েছে ৫৬৮০ একর জমি। এই সেতু ভয়াল যমুনার গতি প্রকৃতি বদলে দিয়েছে। নদী শাসন প্রক্রিয়ার গাইড বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সেতুর নির্মাণ কাজ শুর হয়। ইতোপূর্বে নদীবক্ষে একাধিক নৌচ্যানেল ছিল। এখন একটি সেতুর নিচ দিয়ে একটি চ্যানেলে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু সেতু বিশ্বের ১১তম দীর্ঘ সেতু হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের ষোল কোটি মানুষের স্বপ্নের সেতু ১৯৯৮ সালের ২৩শে জুন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। এই সেতু উত্তরাঞ্চলের সাথে দেশের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তরায় দূর করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া সেতুর উপর দিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ফলে সিরাজগঞ্জসহ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে জ্বালানি সমস্যা সমাধান এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চল গঠন ও পর্যটন শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প কারখানা স্থাপনে নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। শিল্প সমৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা সমাধানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথও প্রশস্ত হয়েছে। তাই একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে বঙ্গবন্ধু সেতু আমাদের অহংকার।[১৩]

ত. সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত মাজার ও দরগাহ

মুখদম শাহ দৌলা (রহ:) শহীদের মাজার ও শামস উদ্দিন তাব্রেজির প্রতীক সমাধি

মুখদুম শাহ দৌলা শহীদের মাজারটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানায় দরগাপাড়ায় শাহজাদপুর জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত। মুখদম শাহ দৌলা বাংলায় প্রবেশ করে প্রথমে সিরাজগঞ্জের পোতাজিয়া এবং পরে শাহজাদপুরে পৌঁছেন। এখানে অমুসলিম অধিপতি প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে মুখদম শাহ দৌলা তাঁর সঙ্গী সাথীসহ শহিদ হলে একজন শত্রুসেনা তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং বিহারের রাজার কাছে মস্তক নিয়ে উপস্থিত হয়; আর মুখদম শাহ দৌলার মস্তক বিহীন দেহ খাজা নূর তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে প্রস্তর কফিনে করে শাহজাদপুর জামে মসজিদের দশ রশি দক্ষিণে সমাহিত করেন। পরে কফিনটি সরিয়ে বর্তমান স্থানে মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে কবরস্থ করা হয়। একই স্থানে তার (মুখদম শাহ

www.pathagar.com

দৌলার) কবরের পার্শ্বে পরবর্তীতে মুখদম শাহের ভাগনে খাজা নূর ও তাঁর একজন অন্যতম ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ইউসুফ শাহকে সমাহিত করা হয়। নির্মাণকালে আদিতে এখানে কোনো আচ্ছাদন এবং কবরে কোনো শিলালিপিও ছিল না। পঁচিশ বছর পূর্বেও এখানে একটি অতি সাধারণ পাকা কক্ষ পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯০ সালে তিনটি কবর ঘিরে এক গম্বুজবিশিষ্ট বিরাট আকৃতির ষোলকোণাকার মাজার সৌধ নির্মাণ করা হয়েছে। সুডৌল গম্বুজটির উপরিভাগ প্রস্ফুটিত পদ্মের নক্‌শায় আচ্ছাদিত ও গম্বুজ শীর্ষ পদ্মকলির ফিনিয়ালে শোভিত। গম্বুজটি বেষ্টন করে রয়েছে আকর্ষণীয় স্ট্যাকো নক্‌শা। নবনির্মিত সুরম্য বিশাল এ সমাধি-সৌধটি শাহজাদপুর জামে মসজিদ কমপ্লেক্সে প্রতিনিধিত্বকারী ইমারতের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আপাতদৃষ্টিতে মনোরম এ অতিউচ্চ সঙ্গতিহীন ইমারত সাধারণ জনগণের সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সম্প্রতি মাজারভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান জমজমাট হয়ে উঠেছে যা এ ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনটির মর্যাদার পরিপন্থি।

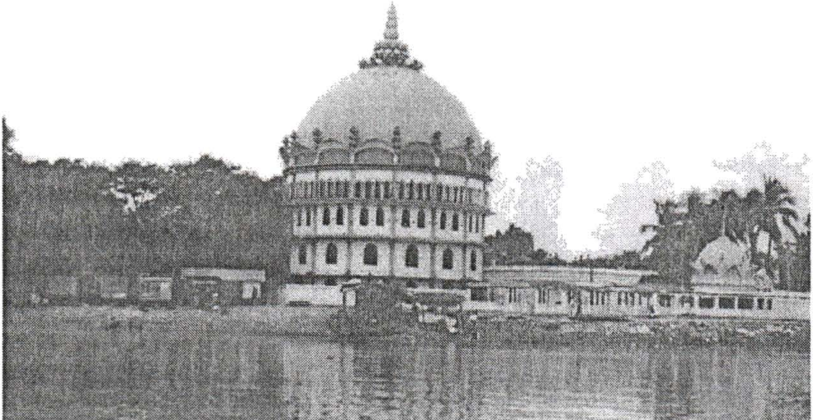

শাহজাদপুর জামে মসজিদের সামনের উত্তর-পূর্ব হুরাসাগর নদীর পাড়ে অষ্টাভুজাকৃতির আর একটি ক্ষুদ্র ইমারত সম্প্রতি নির্মাণ করা হয়েছে। এর অভ্যন্তরে একটি কষ্টি পাথরের স্তম্ভ লম্বভাবে প্রোথিত আছে যা মুখদম শাহ দৌলা শহীদের আগমনসূচক প্রথম স্থাপিত বিজয়স্তম্ভ বলে অভিহিত হয়। আদিতে কেবল এ স্তম্ভটি ঘিরে ১.৩৭ মিটার উঁচু বেষ্টনী দেয়াল ছিল। কালক্রমে এখানে অষ্টভুজাকৃতির একটি দৃষ্টিনন্দন ক্ষুদ্র ইমারত নির্মিত হয়। অষ্টভুজাকৃতির ইমারতের এককে দিকের পরিমাপ ২.১৩ মিটার। এটি মুখদম শাহ দৌলা শহীদের ওস্তাত বিখ্যাত ধর্মীয় সাধক শামস উদ্দিন তাব্রেজির প্রতীক সমাধি। এ সাধকের মৃত্যু সময়কাল ১২৪৭ খ্রিস্টাব্দ। শামস

www.pathagar.com

উদ্দিন তাব্রেজির সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে আগমন করার পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই; অতএব স্বাভাবিকভাবে এ সমাধিতে যে তিনি সমাহিত নন তা বুঝতে পারা যায়। এজন্য কথিত সমাধিটিকে শামস উদ্দিন তাব্রেজির প্রতীক সমাধি বলে অভিহিত করা যায়। উল্লিখিত কষ্টি পাথরের স্তম্ভটি বর্তমানে কক্ষটি নির্মাণের সময় প্রায় মেঝের সমান্তরাল অবস্থান স্থান করে নিয়েছে; মেঝের উপরে দণ্ডায়মান অবস্থায় নেই। কারুকার্য মণ্ডিত বর্ণাঢ্য ক্ষুদ্র ইমারতটি এর আঙ্গিক সৌষ্ঠবের জন্য আকর্ষণীয় রূপ লাভ করেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে সমাধি স্থাপত্য বিকাশে অষ্টাভুজাকৃতি ভূমি-নক্শা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আছে। বাংলাদেশে এ ধরনের আর একটি মাত্র অষ্টাভুজাকৃতির সমাধি রয়েছে রোহনপুর (নওয়াবগঞ্জ)-এ। এ দিক থেকে লক্ষ্য করে শামস উদ্দিন তাব্রেজির অষ্টাভুজাকৃতির সমাধিতে একটি বিরল রীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়।

মুখদম শাহ দৌলা শহীদের মাজারে কিংবা শামস উদ্দিন তাব্রেজির প্রতীক সমাধিতে কোনোটির গাত্রে কোনো শিলালিপি উৎকীর্ণ করা নেই। এজন্য এগুলো তারিখবিহীন। এ নিদর্শনগুলো আদিতে শাহজাদপুর জামে মসজিদের সমসাময়িক-কালের যা পরবর্তী সময়ে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। উল্লেখ্য, দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সম্প্রতি মুখদম শাহ দৌলা শহীদের মাজার, শামস উদ্দিন তাব্রেজির প্রতীক সমাধি ও শাহজাদপুরে জামে মসজিদে তিনটি নিদর্শন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করেছে।[১৪] মাজারে অসংখ্য ভক্ত ধর্মনুরাগী মানুষ নানান সমস্যা ও রোগবালাই থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় মানত প্রদান করে। মানত প্রদানকারী একজানের সাথে আলাপকালে জানা যায়, যে কারণে মানত প্রদান করা হয় তার শতভাগ সফল হয়েছে। ফল লাভের পরিতৃপ্তির আসায় মাজারে মানত দিতে এসেছি। অনেকে গোরু, ছাগল, মোরগ, আগরবাতি, মোমবাতি, মাংস খিচুড়ি ও পোলাও প্রভৃতিসহ নগদ টাকা পয়সা ও গায়ের গহনা মানত করে থাকেন। মানতকারীরা অনেকেই মাজারে এসে দোয়া দরুদ, নামাজ কালাম আদায় করে পায়েস, খিচুড়ি ও মাংস রান্না করে নিজেরা খায় এবং মাজারের রক্ষক, খাদেম ও আশপাশের দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে। ফলশ্রুতিতে বছরের সারা সময়ই মাজারকে ঘিরে এক উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) এর মাজার শরিফ :

নওগাঁ বা নবগ্রাম তাড়াশ থানার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ১৯১৩ সালে রায়গঞ্জ থানার দক্ষিণাংশ নিয়ে পৃথক তাড়াশ থানা গঠিত। নবগঠিত থানার আয়তন ১১৬ বর্গমাইল। এতে ইউনিয়নের সংখ্যা আটটি এবং গ্রামের সংখ্যা ২২১টি। এ থানার গুড পিপুল নামে একটি ইউনিয়ন সঠিকভাবে পরিচালিত না হওয়ায় ১৯৫৮ সালে এ ইউনিয়ন রহিত করে বারুহাস, মাধাইনগর ও দেশীগ্রাম ইউনিয়নের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাড়াশে অনেক উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন ও পুরাতন দিঘি ও পুকুর রয়েছে। নবগ্রামে সুলতান নাসির উদ্দিন নুসরাত শাহের আমলে নির্মিত শাহী

www.pathagar.com

মসজিদ (৯৩২ হিজরি : ১৫২৬ খ্রি:) এর সামনে আবৃত বারান্দাসংলগ্ন স্থানে শাহ শরিফ জিন্দানির মাজার অবস্থিত।

এ মাজারের দৈর্ঘ্য ২.৮২ মিটার প্রস্থ ১.৮৩ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ২ মিটার বা (৬ ফুট ৩ ইঞ্চি)। এখানে সমাহিত সিদ্ধপুরুষের সম্পূর্ণ নাম আব্দুল বাকী জিন্দানী। ভারতীয় উপমহাদেশে যেসব সুফি সাধক ইসলাম প্রচারে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন তাদের মধ্যে হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) অন্যতম। তিনি ইরাকের জিন্দান শহরে জন্ম গ্রহণ করেন বলে তার উপাধি হয় জিন্দানী। এর মাজার শরিফটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামে অবস্থিত। হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান বীরপুরুষ ছিলেন। তথ্য দাতা রহিম

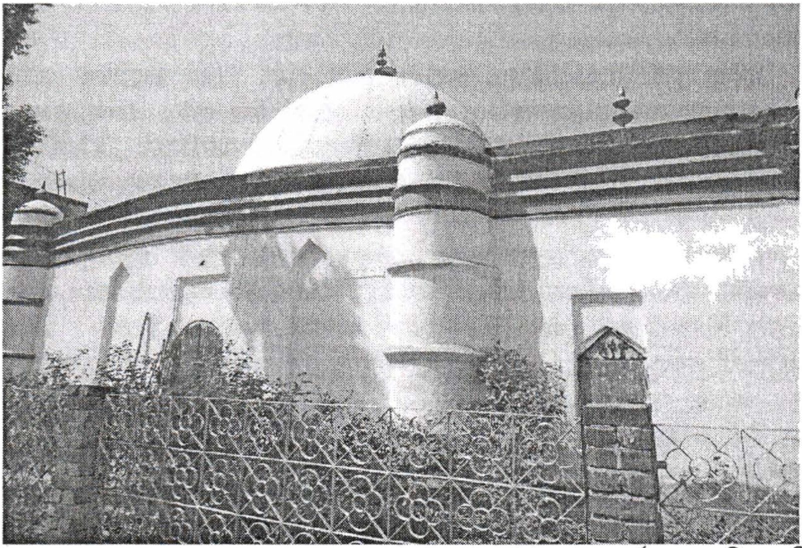

পাগলা প্রায় সতেরো বছর ধরে এ মাজারে অবস্থান করছে। তার বর্ণনা এবং কিংবদন্তী অনুসারে হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) এর নওগাঁ আগমন উপলক্ষ্যে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়।

তৎকালীন সময়ে ভানু সিংহ নামক একজন প্রভাবশালী রাজা নওগাঁ শাসন ও বসবাস করতেন। তিনি ছিলেন মুসলমান বিদ্বেষী ও দেব দেবী ভক্ত গোড়া হিন্দু রাজা। তার কালী মন্দিরে অনেক মূর্তি ছিলো এবং বেশ কয়েকজন পুরোহিত ও দাস দাসী তাদের সেবা করতো। ভানু সিংহ রাজার অন্যায় অত্যাচারে নওগাঁর জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তার নির্মমতার করুন কাহিনী সম্পর্কে হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) অবগত হন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) যখন নওগাঁয় তার দলবল নিয়ে উপস্থিত হন তখন রাজা ভানু সিংহ মন্দিরেই অবস্থান করছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি সাপুড়ে চাবুক হাতে নিয়ে এবং বাঘের পিঠে সওয়ার হয়ে কালী মন্দিরে উপস্থিত হন। এ সময়

www.pathagar.com

মন্দিরে পুরোহিতরা মূর্তি ও দেবতার সামনে ভোগ সামগ্রী উপহার দিচ্ছিল। পুরোহিত মন্দিরের সামনে হঠাৎ একদল মুসলমান দেখে চমকে গেলেন। পুরোহিত প্রধান রাগে লাল হয়ে সামনে এসে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই মুসলমান? তোমাদের সাহসতো কম নয়। যদি বাঁচতে চাও তাহলে এখান থেকে বের হয়ে যাও। পীর সাহেব মৃদু হেসে বললেন নিশ্চয়ই যাবো তবে জবাব দাও মূর্তি দেবতা কেনো তোমাদের দেওয়া ভোগ সামগ্রী ভক্ষণ করছে না। পুরোহিত প্রধান বললেন, মূর্তি দেবতা কোনো কিছু ভক্ষণ করে না, শুধু তারা দৃষ্টি করে। পীর সাহেব তখন বললেন, মূর্তি দেবতার মুখ আছে খায় না, চোখ আছে দেখে না, কান আছে শোনে না, অথচ তাকেই তোমরা সেবা করো। মানুষ এসব রূপ সজ্জা দিয়েছে কিন্তু চেতনা দিতে পারে নাই। তাই যিনি চেতনা দিতে

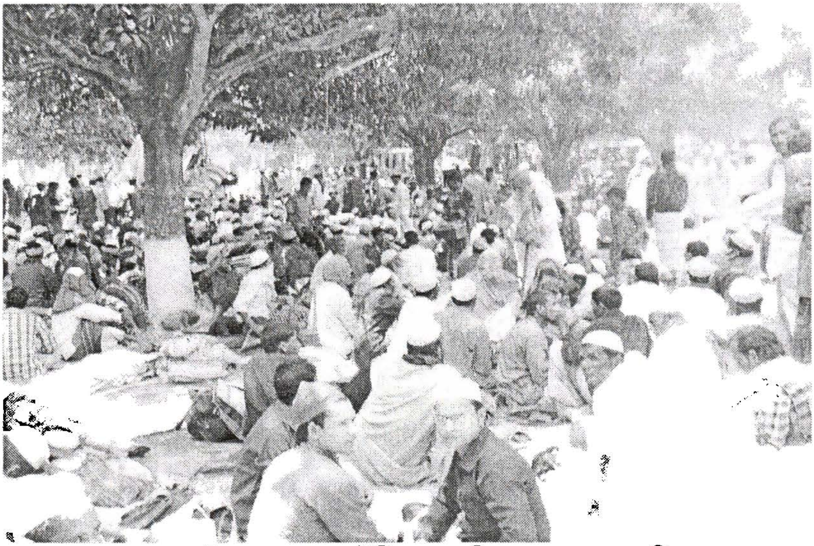

পারেন তোমরা তাকেই সেবা করো। ইতিমধ্যে মন্দিরের সকল পুরোহিতরা ভোগ দান বন্ধ করে একে একে দরবেশ বাহিনীর সামনে হাজির হলো। পীর সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মের কিছু মহৎ বাণী উদার কণ্ঠে বলতে লাগলেন। এদিকে কিছু সংখ্যক পুরোহিত দেরি না করে ছুটে গেলো রাজা ভানু সিংহের কাছে। তারা রাজাকে বিস্তারিত সব জানালো। রাজা দরবেশ বাহিনীর আগমন বার্তায় ভীত সন্ত্রস্ত হলেন। কেন না তিনি মুসলমান আতঙ্কে ভুগছিলেন। কারণ সে সময় যে সকল মুসলিম বিজেতা অথবা সুফি দরবেশ যেখানে আগমন করেছে সেখানেই তারা জয়লাভ করেছে। রাজার এমন আতঙ্কের সময় একজন পুরোহিত সাহস দিয়ে বললেন যে, মহারাজ দরবেশ বাহিনী নিরস্ত্র অপরদিকে আমাদের কাছে তীর ধনুক সজ্জিত সেনাবাহিনী। তাই ভয়ের কোনো কারণ নেই। রাজা পুরোহিতের কথা শুনে কিছু সাহস সঞ্চয় করে দরবেশ বাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। তখন ছিলো আসর নামাজের সময়। পীর সাহেব

www.pathagar.com

নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে জিকিরে মশগুল ছিলেন। এমন সময় রাজা ভানু সিংহ তার সৈন্য বাহিনী নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়ায় এবং বজ্র কণ্ঠে বলেন, পীর সাহেব আমার রাজ্যে আপনি যে অপরাধ করেছেন তার প্রায়শ্চিত্ত অগ্নিদহ অথবা নরবলী, তবুও আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। এক্ষণি আমার রাজ্য থেকে বেরিয়ে যাও নইলে আমার বিশাল সৈন্য বাহিনী তোমাকে হত্যা করবে। পীর সাহেব তখন বললেন, শক্তির দম্ভ করো না রাজা। আর একবার যদি কুটবাক্য উচ্চারণ করো অপমানজনক আচরণ করো তাহলে আমারও বিশাল সৈন্য বাহিনী তোমাকে হত্যা করবে। রাজা দেখলেন হঠাৎ দরবেশ বাহিনীর পাশে বিরাট এক দেহধারী বাঘ ভয়ংকার চেহারা আর আক্রমণের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। তারই পাশে বিরাট এক বিষধর সাপ হেলে দুলে বার বার লিকলিকে জিহ্বা প্রদর্শন করছে। এ দৃশ্য অবলোকন করে রাজার মনোবল ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে রাজ জ্যোতিষী রাজাকে বলেন যে, আপনি কিছুতেই আপনার রাজ্য আর রক্ষা করতে পারবেন না। এতে রাজার মনোবল আরও ভেঙে যায়।

এমতাবস্থায় রাজা ভানু সিংহ স্বপরিবারে নৌকা বোঝায় ধন দৌলতসহ গভীর নদীতে ডুবে মারা যায়। এভাবে সহজেই হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) নওগাঁয় তার আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হন। বর্তমানে এখানে প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম শুক্রবারে ওরস শরিফ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রচুর মুসল্লিরা জামায়েত হয় এবং জিকির আজগার সাহায্যে তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা আল্লাহর নিকট পেশ করে এবং মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। তাছাড়া এ স্থানটিতে প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের অংশগ্রহণের জন্য প্রচুর মুসলমানদের সমাবেশ ঘটে। সেই সঙ্গে অনেক পুরুষ এবং মহিলারা মাজারে মানত করার জন্য কোরআন শরিফ, আগরবাতি, জায়নামাজ ইত্যাদি দান করে থাকেন। তাছাড়া এ দিন বিভিন্ন জেলা হতে বহু পুরুষ ও মহিলা যাদের প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় তাদের মুখে ভাত খাওয়ানের জন্য মাজারে আসে। এসময় তারা সবাই একত্রিত হয়ে খিচুড়ি ও পায়েস রান্না করে খেয়ে থাকে এবং আশে পাশের সেসব গরিব লোকজন থাকে তারা এসে জামায়েত হলে তাদেরও খাবার দেয়া হয়। এতে সব শ্রেণির লোকের মধ্যে একটি মেলবন্ধন সৃষ্টি হয়।[১৫]

ভাঙ্গা মসজিদ সংলগ্ন মাজার

এ মাজারটি হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ:) এর মাজারের প্রায় আধা কি:মি: পশ্চিমে অবস্থিত। বিশ্বনাথ পাগলা নামক এক ব্যাক্তি এ মাজারে প্রায় ২২ বছর হলো অবস্থান করছে। এখানে প্রচুর কালো পাথরের অনেক মূর্তি রয়েছে এবং মূর্তিতে বিভিন্ন প্রকার নকশা খোদাই করা আছে। তার বর্ণনা মতে প্রতি শুক্রবারে এ মাজারে বহু পুরুষ ও মহিলারা এসে ভিড় জমায় এবং তারা বিভিন্ন প্রকার মানত দেয়। সেই সঙ্গে যেসব মহিলাদের সন্তান হয় না এবং সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরেও মারা যায় তাদেরকে দলে দলে এসে ভিড় করতে দেখা যায়। তারা এখানে অবস্থিত পাথরের মূর্তিতে তেল, দুধ, কলা ও চিনিসহ আরো বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র মানত করে থাকে। তাছাড়া

www.pathagar.com

মাজারে অবস্থানকারী পাগলা পীরদের তারা অর্থদান করে থাকে। আবার অনেক ছেলে-মেয়েদের দেখা যায়, তারা পাথরের মূর্তিগুলো ধরে কান্নাকাটি করছে এবং এক পর্যায়ে চুম্বন দিচ্ছে ও তাদের দাবি-দাওয়াগুলো পাথরের নিকট থেকে এক অন্ধবিশ্বাসের মাধ্যমে আদায় করতে চাচ্ছে। এ স্থানটিতে ঘরের মতো কোনো ব্যবস্থা নেই। এটি একেবারে খোলা আকাশের নিচে অবস্থিত। অবশ্য এখানে একটি বিশাল বটগাছ রয়েছে। গাছের নিচেই একটি নির্দিষ্ট স্থানে মেয়েরা দল বেধে নফল নামাজ পড়ে এবং জিকির আজগার করে ও দু'হাত তুলে তারা আল্লাহর কাছে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মাজারের অনেক পাগলা পীর বলে যে, এ মাজারের একটুকরো পাথরও কেউ যথাস্থান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। তারা বলে যে একবার কোনো এক ছাত্র বয়সি ছেলে একটুকরো পাথর মাজার থেকে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে রেখেছিল। ঠিক ঐ দিন রাত থেকেই সেই ছেলের নাকি স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে এবং রাতে তাকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, সে যদি আগামীকাল যে স্থান থেকে পাথরটি নিয়ে এসেছে সে স্থানে না রেখে আসে তাহলে তার জীবন অবসান ঘটবে। তাই পরের দিন ছেলেটি আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে যে স্থান থেকে পাথরটি নিয়ে গিয়েছিল সে স্থানে রেখে এসো এবং পরবর্তীতে সে আগের মতোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।[১৬]

বাণীকুঞ্জ

সিরাজগঞ্জ সদরে রহমতগঞ্জে বাণীকুঞ্জ নামে ইসমাইল হোসেন সিরাজির স্মৃতি বিজড়িত নিদর্শনটি অবস্থিত। এখানে সিরাজগঞ্জের কৃতী সন্তান ইসমাইল হোসেন সিরাজির বাড়ি এবং পরবর্তীতে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে এখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহেরু, চিত্তরঞ্জন দাস, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখসহ ভারতবর্ষের অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। সিরাজির সমাধিপার্শ্বে একটি জাদুঘর ও গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আগত দর্শনার্থীদের অবস্থানের প্রয়োজনে আবাস স্থল নির্মাণের উদ্দেশ্যে আঠারো শতাংশ জমি ওয়াকফ করা হয়। জমিটি এখনও খালি পড়ে আছে। পরিকল্পনা এবং তা বাস্তাবয়নের কোনো উদ্যোগ নেই। ১৮৭৯ সালের ৫ জুলাই ইসমাইল হোসেন সিরাজি বাণীকুঞ্জে জন্মগ্রহণ এবং ১৯৩২ সালের ১৭ই জুলাই তিনি এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বাণীকুঞ্জ সিরাজির সমাধি একটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট সৌধ।[১৭]

হজরত খাজা ইউনুস আলীর মাজার

সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শহর থেকে ১৭ মাইল দক্ষিণে, চৌহালী থানায় যমুনা নদীর তীরে এনায়েতপুরে (সৌদিয়া চাঁদপুর ইউনিয়ন) নামক স্থানে প্রখ্যাত ধর্মীয় সাধক হজরত খাজা মোহাম্মদ ইউনুস আলীর মাজার অবস্থিত। এনায়েতপুর গ্রামে এ সিদ্ধপুরুষ ইসলাম ধর্মসাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন; এজন্য তার নামের সাথে এনায়েতপুরী পদবি যুক্ত হয়েছে। এনায়েতপুর পবিত্র দরবার শরিফ, জামে মসজিদ ও

www.pathagar.com

এ সাধকপীরের কবর একই কমপ্লেক্সে অবস্থিত। সামগ্রিকভাবে এ মাজার কমপ্লেক্সের পরিমাণ ১৬০০০ বর্গফুট। মসজিদটি আয়তাকৃতির; এর দৈর্ঘ্য ১৩৭, মিটার প্রস্থ ৯১.৪৪ মিটার এবং উচ্চতা ১৫.২৪ মিটার। মাজার ভবনের দৈর্ঘ্য ২৬.২১ মিটার, প্রস্থ ১৫.৫৪ মিটার ও উচ্চতা ৯.১৪ মিটার। এ মসজিদটি ১৯৫৬ সালে নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়। কমপ্লেক্সের অধীনে মোট ৩ বিঘা জমি আছে। এনায়েতপুর গ্রামে অবস্থিত এনায়েতপুর পবিত্র দরবার শরিফ, জামে মসজিদ ও মাাজার সংবলিত কমপ্লেক্সটি সমগ্র বাংলাদেশে অতি উল্লেখযোগ্য একটি ধর্মীয় স্থানরূপে পরিচিত। স্থানীয় বসবাসকারী জনসাধারণের কাছ থেকে জানা যায় প্রথমে যখন হজরত খাজা শাহ মোহাম্মদ ইউনুস আলী এখানে আস্তানা স্থাপন করেন তখন এ স্থান ছিল নিরিবিলি জঙ্গলাকীর্ণ। সংস্কারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করায় এ ধর্মীয় ভবনগুলো কোনোরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি। ১৯৮৭ সালে মসজিদের সাথে পূর্বদিকে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে। মসজিদটি চার গম্বুজবিশিষ্ট, চারটি উঁচু পার্শ্ব বুরুজ সংবলিত এবং মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে পদ্মপাপড়ির মারলন নক্‌শায় অলংকৃত। মাজারটি মসজিদের অনেক পরে নির্মিত এবং এতে রয়েছে একটি গম্বুজ চারটি পার্শ্ববুরুজ ও মাজারের গম্বুজ শীর্ষ কলস ফিনিয়ালে শোভিত। সামগ্রিকভাবে এ কমপ্লেক্সের প্রত্যেকটি ভবনই সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৮]

বাদলবাড়ি

মুখদাম শাহ দৌলা শহীদ ও তার ভাগনে শাহ নূরের সমাধি ছাড়াও নদীর (হুরা সাগর) পূর্ব পাড়ে রতনকান্দি গ্রামে শাহ হাবিবুল্লাহ নামে মুখদম শাহ দৌলা শহীদের একজন সঙ্গীর স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থান রয়েছে। মুখদম শাহ দৌলার সাথে আগত তাঁর ঘনিষ্ঠ ছয়জন আউলিয়ার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য শাহ হাবিবুল্লার নাম কথিত আছে, শাহ হাবিুল্লাহর কড়া মেজাজের জন্য মুখদম শাহ দৌলা তাঁকে মসজিদের সামনে প্রবাহিত নদী হুরা সাগরের অপর পাড়ে বসবাস করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন থেকে ঐ আউলিয়া রতনকান্দিতে একটি নির্জন স্থানে জীবন অতিবাহিত করেন এবং পরবর্তী সময়ে সেখানেই পরলোকগমন করেন। রতনকান্দিতে অবস্থিত তার স্মৃতিবিজড়িত স্থানটি বাদল বাড়ি নামে পরিচিত। এখানে বিস্তৃত স্থান জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অতি পুরাতন বটবৃক্ষের ন্যায় বিশাল আকৃতির পুরাতন গাছ। অধিকন্তু এখানে একাধিক পুরাতন বৃক্ষ মাটিতে পতিত অবস্থায়ও জীবন্ত রয়েছে যা বাস্তবে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। সম্প্রতি এ পবিত্র অঙ্গনটি বেষ্টনী দ্বারা ঘিরে সামনে একটি সাধারণ প্রবেশ পথ নির্মাণ করা হয়েছে। বিশ্বাস করা হয়, এখানে এ বিখ্যাত সাধকপুরুষের কবর আছে। কিন্তু তাঁর কবরের কোনো চিহ্ন নেই অথবা রাখা হয়নি। এমনকি অন্য কোনো ইমারতেরও ধ্বংসাবশেষ নেই। বাদাল বাড়ির বিস্তৃত গাছপালা পরিবেষ্টিত স্থানটি অতি ঝকঝকে পরিষ্কার সেখানে সব সময়ই আঁচল বিছিয়ে প্রার্থনারত অবস্থায় ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে অনেককে দেখা যায়। কথিত আছে, এখানে 'মানত' করে অসাধ্য সাধন করা সম্ভব। বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে, বাদলবাড়ি ছায়া সুনিবিড় শান্তিময় বৃক্ষরাজি পরিবৃত শাহ হাবিবুল্লাহর স্মৃতিধন্য পবিত্র স্থান।[১৯]

www.pathagar.com

জেলার প্রধান প্রধান নদনদী ও খাল বিল

বিস্তীর্ণ হাওড়, বিলের সবুজের হাতছানি, শস্যে ভরা শ্যামল মাঠ, বুকের ওপর দিয়ে ছলছল শব্দ করে এগিয়ে চলা পালতোলা নৌকা সমেত বিশাল বিস্তারী নদী, টুপটাপ করে জাল আর বড়শি দিয়ে মাছ টেনে তোলার অসংখ্য নদী, খাল, বিল, জলাশয় সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জ জেলা। জেলার প্রধান প্রধান নদনদীর মধ্যে অন্যতম যমুনা, বড়াল, ইছামতি, করতোয়া, হুরাসাগর, গোহালা, বাঙ্গালী, গুমনী এবং ফুলঝুড়ি।

যমুনা নদী

প্রায় দু'শ বছর আগের কথা। সিরাজগঞ্জেরে অদূরে প্রবাহিত গত শীর্ণকার নদী। যার নাম ছিল দাকোপা। এই দাকোপা নদীই আজকের প্রমত্তা যমুনা নদী। ১৭৭৮ সালে মেজর জেমস রেনেলের আঁকা বাংলাদেশের প্রথম মানচিত্রে যমুনাকে ছোট খাল হিসেবে দেখানো হয়েছে। ১৭৬২ সালের প্রবল এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে এই দাকোপা নদীটিই উত্তাল, অশান্ত, বিশাল আর বিস্তৃত হয়ে মিশে যায় ব্রক্ষপুত্রের সাথে। ব্রক্ষপুত্র তার গতিপথ পরিবর্তন করে যমুনা খাল দিয়ে নতুন স্রোতধরায় প্রবাহিত হয়। ১৭৮৭ সালে তিস্তা নদীর বন্যায় প্রবাহিত বিপুল পরিমাণ জলরাশি ব্রক্ষপুত্র নদের জলরাশির সাথে মিশে যমুনা খালে পতিত হলে সৃষ্টি হয় বিশাল যমুনা নদীর। ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত বুকানন হ্যামিল্টনের ম্যাপে যমুনা নদীটিকে বিশাল নদী হিসেবেই চিত্রিত করা হয়েছে।

থ. সিরাজগঞ্জ জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

জন্ম সিরাজগঞ্জ পৌরসভা সয়াধানগড়া গ্রাম ১২ ডিসেম্বর ১৮৮০ সাল। মক্তবে শিক্ষা গ্রহণ এবং মক্তবেই কিছুকাল শিক্ষকতা। ১৮৯৭ তে পীর সৈয়দ নাসিরুদ্দিদের সঙ্গে

আসাম গমন। ১৯১৯ এ কংগ্রেসে যোগদানের মধ্যদিয়ে খেলাফত ও অসহযোগ আনন্দোলনে অংশ গ্রহণ এবং দশ মাস কারাদণ্ড ভোগ। ১৯২৬ এ আসামে প্রথম কৃষক-প্রজা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। ১৯২৯ এ আসামের ধুবড়ী জেলার ব্রক্ষপুত্র নদের ভাসানচরে প্রথম কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখান থেকে নামের শেষে ভাসানী শব্দ যুক্ত। ১৯৩১ সন্তোষের কাগমারীতে, ১৯৩২ এ সিরাজগঞ্জের কাওয়াকোলায় ও ১৯৩৩ এ গাইবান্ধায় বিশাল কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান। ১৯৩৭ এ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগদান। ১৯৪৪ এ আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত। পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ। ১৯৪৮ এ পূর্ব বাংলায় আগমন। ১৯৪৯ এ ২৩ জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ এর প্রতিষ্ঠাতা

www.pathagar.com

সভাপতি (১৯৪৯-১৯৫৭) হন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৫২-র ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরি হলে তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয় এবং এর অন্যতম প্রধান সদস্য নিযুক্ত হন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (ফেব্রুয়ারি-১৯৫২) এ সহযোগিতার জন্য গ্রেফতার। ১৬ মাস কারা নির্যাতন ভোগ করেন।

১৯৫৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে যুক্তফ্রন্ট গঠন। ১৯৫৭ সালের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনে ভাসানী পাক মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিলের দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী সেই দাবি প্রত্যাখান করলে ১৮ই মার্চ (১৯৫৭) আওয়ামী লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। একই বছর ২৫ জুলাই (১৯৫৭) তার নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত ও এর সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৪৬ সালের ২১শে জুলাই সম্মিলিত বিরোধী দল (কপ) গঠনে ভূমিকা পালন। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি-মার্চের আইয়ুব বিরোধী গণআন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন। ছাত্র সংগ্রম ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি দৃঢ় সমর্থন প্রদান। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ এ মামলার সকল আসামির নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করেন। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় সভাপতি ভাষণ দানকালে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবি উত্থাপন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন (৩-২৫ মার্চ ১৯৭১) এর প্রতি সমর্থন প্রদান করেন। ১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে ভারত গমন। মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি হন। ১৯৭২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক হক কথা প্রকাশ করেন। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির (১৯৭২) তীব্র বিরোধীতা করেন। ১৯৭৬ এর ১৫ মে ফারাক্কা মিছিলের নেতৃত্বে দেন। সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলনের আপোষহীন সংগ্রামী। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রসংশনীয় ভূমিকা পালন। দেশের মানুষের কাছে তিনি মজলুম জননেতা হিসেবে পরিচিত। কাগমারীতে আফ্রিকা-এশিয়া সাংস্কৃতিক সম্মেলন (৯-১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) অনুষ্ঠান তাঁর জীবনের এক অমর কীর্তি। প্রকাশিত গ্রন্থ : দেশের সমস্যা ও সমাধান (১৯৬২), মাও সে তুং-এর দেশে (১৯৬৩)। মৃত্যু : ঢাকা ১৭.১১.১৯৭৬।

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ১৬ই জানুয়ারি ১৯১৯ সালে বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর থানার রতনকান্দি ইউনিয়নের কুড়িপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম হরফ আলী সরকার। পড়ালেখা শুরু করেন কাজীপুর গান্ধাইল হাইস্কুলে। এরপর চলে আসেন সিরাজগঞ্জ বি. এল. হাইস্কুলে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এখান থেকেই। পরবর্তীতে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ১৯৪১ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি.এ পাস করেন। এরপর ভর্তি হন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো-নাম করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। ১৯৪৫ সালে এখান থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন। তাছাড়া

www.pathagar.com

এল.এল.বি-তে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। ১৯৫১ সালে পাবনা জেলা আদালতে আইন ব্যবসা শুরু করেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তি। পাবনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন তিনি।

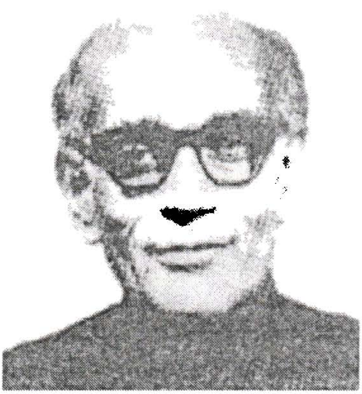

আলীগড় থেকে দেশে ফেরার পর তিনি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সাথে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ছিলেন পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৪৮ সালে যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং পিএলজি-এর ক্যাপ্টেন পদে অধিষ্ঠিত হন। এসময় থেকেই তিনি ক্যাপ্টেন মনসুর নামে পরিচিত হতে থাকেন। ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পরিচিত হন। কলকাতা থেকে দেশে ফেরার পর স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আমজাদ হোসেন, আব্দুর রব রগা মিঞা, জনাব আমিন উদ্দিন অ্যাডভোকেট প্রমুখের সাথে তাঁর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে।

১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী-মুসলিম লীগে যোগ দেন। এবং জড়িয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে। আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন এবং দলের পাবনা জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। পাবনা শহরে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এম. মনসুর আলী। ফলে গ্রেফতার হতে হয় তাকে। পরবর্তীতে মুক্ত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এ নির্বাচনে পাবনা-১ আসনের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ আল মাহমুদের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তিনি। এবং সবাইতে অবাক করে দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন।

১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক, খাদ্য ও কৃষি এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দয়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে দেশে জারি হয় সামরিক শাসন। তিনি নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন। কারা নির্যাতন ভোগের পর মুক্ত হন ১৯৫৯ সালের শেষের দিকে। বাঙালির মুক্তির সনদ ১৯৬৬ সালের ৬ দফ আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে তিনি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন করেন। পাবনা-১ আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

২৫শে মার্চ বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হলে এম. মনসুর আলী গ্রেফতার এড়াতে চলে যান সোবহানবাগ কলোনীতে। এখান থেকে তিনি কেরানীগঞ্জ হয়ে কুড়িপাড়া যান তাঁর

www.pathagar.com

পরিবারের সাথে দেখা করতে। এরপর চলে যান ভারতে। আসামের মাইনকার চর হয়ে তিনি কলকাতা গমন করেন। ভারতে আশ্রয় নেয়া অন্য নেতাদের সাথে দেখা ও যোগাযোগ হয় তাঁর। এরপর দলীয় হাই কমান্ডের অন্য নেতারা মিলে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে গঠন করেন মুজিব সরকার। নতুন গঠিত সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে মন্ত্রী পরিষদ পুনর্গঠন করলে তিনি দায়িত্ব পান প্রথমে যোগাযোগ ও পরে স্বরাষ্ট্র এবং যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ এম মনসুর আলী পুনরায় পাবনা-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এবছর তিনি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের সদস্য নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল দলকে একত্রিত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি চালু করেন। এ সময় ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব নেন। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) সাধারণ সম্পাদক হন তিনি। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মধ্যরাত্রিতে অন্য চার জাতীয় নেতার সাথে তাঁকে হত্যা করা হয়।

ড. আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন

দেশের বিজ্ঞান-সাহিত্য অঙ্গনে আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন অতি পরিচিত জনপ্রিয় নাম। বিজ্ঞান এক রহস্যাচ্ছন্ন নীরস জগৎ। এ জগতে বিচরণ করে জননন্দিত হয়ে মানুষের মনের মণিকোঠায় স্থান পাওয়া সহজসাধ্য নয়। তাঁর এরই জনপ্রিয়তার পশ্চাতে রয়েছে একান্ত আন্তরিকতা। প্রাণের ছোঁয়া। আর নিরলস দীর্ঘ সাধনা। এ সাধনা এবং একাগ্রতা তাঁর জীবনের সাফল্য রয়ে এনেছে। গলায় পরিয়েছে কৃতিত্বের বিজয় মাল্য।

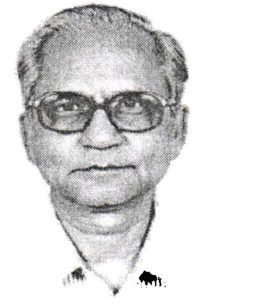

আমরা ফুটন্ত কাননে এবং সাদরে লালিত সবুজ কোমল দূর্বাঘাসের উপর দিয়ে চলি স্বাচ্ছন্দে মনানন্দে গুণ-গুণিয়ে। সাধারণত কণ্টাকাকীর্ণ পথে হাঁটতে চায় না কেউ। আল-মুতীর যাত্রা সেই কণ্টাকাকীর্ণ দুর্গম পথে। এ দুর্গম পথে পা বাড়িয়ে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য দুঃসাহস প্রয়োজন। তিনি সাহসে ভর করে এ রহস্যাচ্ছন্ন দুর্গম পথকে আমাদের নিকট সুগম করে দিয়েছেন। উৎসারিত, উদ্বুদ্ধ এবং আকর্ষণ করেছেন বিজ্ঞানের মায়াপুরীতে প্রবেশ করতে। ফলে তাঁর প্রতি উৎসাহিত হয়েছে সকলের হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধার ধারা। তাই আমরা আল-মুতীকে বলব বিজ্ঞান-সাহিত্যের কথাশিল্পী।

www.pathagar.com

আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিনের জন্ম ১লা জানুয়ারি ১৯২৮, ফুলবাড়ী, সিরাজগঞ্জ। তিনি সরকারি মুসলীম হাই স্কুল থেকে ১৯৪৫ সালে এম.এস.সি ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক (সম্মান), ১৯৫৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৬২ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। পেশায় একজন সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলা একাডেমি ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশের সভাপতি ছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ : এসো বিজ্ঞানের রাজ্যে, অবাক পৃথিবী, আবিষ্কারের নেশায়, রহস্যের শেষ নেই, বিজ্ঞান ও মানুষ, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, জানা-অজানার দেশে, সাগরের সহস্যপুরী, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, এ যুগের বিজ্ঞান, মেঘ-বৃষ্টি-রোদ, ফুলের জন্য ভালোবাসা, সোনার এই দেশ, তারার দেশের হাতছানি, বিচিত্র বিজ্ঞান, বিপন্ন পরিবেশ, প্রাণলোক : নতুন দিগন্ত, বিজ্ঞানের বিস্ময়, ছবিতে আমাদের পরিবেশ, টেলিভিশনের কথা, বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা, কীটপঙ্গের বিচিত্র জগৎ, কাজী মোতাহার হোসেন, বিজ্ঞান এগিয়ে চলে, চোখ মেলে দেখ, শিক্ষা ও বিজ্ঞান : নতুন দিগন্ত, ফারিয়া নাদিয়ার মজার সফর, পরিবেশের সংকট ঘনিয়ে আসছে, আমাদের শিক্ষা কোন পথে, আজকের বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ, মহাকাশে কী ঘটছে। অনুবাদ : আকাশের সাথে মিতালী, মহাবীর পরমাণু, রহস্যটা জানতে হবে, বিজলীর খেলা, সেকালে জীবজন্তু, তাপ, আলো, শিক্ষা ও জাতীয় উন্নয়ন বিশ্বসৃষ্টির মালমশলা, পরমাণু রাজ্যে। সম্পাদনা : আধুনিক বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, বাংলাদেশে বিজ্ঞানচিন্তা, বিজ্ঞান-দর্শন-সংস্কৃতি, সংবাদপত্রে বাংলাভাষা। পুরস্কার : শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য টি.কিউ.এ (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার), সাহিত্যের জন্য ইউ.বি.এল, পুরস্কার (১৯৬৯), লোকশিক্ষামূলক সাহিত্যে ইউনেস্কো পুরস্কার (১৯৬৯), সাহিত্য পুরস্কার, বাংলা একাডেমি (১৯৭৫), বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার জন্য ড. কুদরত-এ খুদা স্বর্ণপদক (১৯৭৯), শিক্ষার জন্য জিয়াউর রহমান জাতীয় পুরস্কার (১৯৮১), শিশুসাহিত্য (বিজ্ঞান)-এর জন্য অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার (১৯৮৯), শিশুসাহিত্যের জন্য শহীদুল্লাহ কায়সার স্মৃতি পুরস্কার (১৯৮২), শিশুসাহিত্যের জন্য সাবিক্ষর ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৩), বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ বিষয়ে ইউনেস্কোর আন্ত র্জাতিক কলিঙ্গ পুরস্কার (১৯৮৩), শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান রাখায় বাংলাদেশ সরকারের 'একুশে পদক' (১৯৮৫), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, কাজী মহবুবউল্লাহ পুরস্কার, শিশুসাহিত্য (বিজ্ঞান) এর জন্য অগ্রণী ব্যাংক পুরস্কার, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য ঋষিজ শিল্পী গোষ্ঠী পুরস্কার, প্রযুক্তি জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আই.ডি.ই, পদক : বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেন। গুণী এই বিজ্ঞানী ১৯৯৮ সালে ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

জন্ম : সিরাজগঞ্জ ১৩.০৭.১৮৮০। কবি ঔপন্যাসিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। দারিদ্রের কারণে উচ্চ শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হলেও নিজের চেষ্টায় সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্মনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। বিশ শতকের প্রারম্ভে কংগ্রেসে যোগদান এবং

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন শীর্ষ স্থানীয় নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন্ বঙ্গ-ভঙ্গ প্রাদেশিক আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) এ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এ বিতর্কে বাংলাভাষার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। বলকান যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য ভারতবর্ষ থেকে ১৯১২-তে যে মেডিক্যাল মিশন পাঠানো হয়, সিরাজী ছিলেন তার সদস্য। তুরস্কের সুলতান তাঁকে গাজী উপাধি প্রদান করেন। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২৩) এ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ এ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ দল গঠিত হলে তাতে যোগদান করেন। ইংরেজ সরকারের আমলে বাংলা সাহিত্যে রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হয় তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' এবং কবিদের মধ্যে রাজদ্রোহের অপরাধে সর্বপ্রথম কারাবরণের 'সৌভাগ্য' ও অর্জন করেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। তিনি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। জ্বালাময়ী বক্তৃতার কারণে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বিশেষ কৃতিত্ব সাহিত্যচর্চা ও পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা। 'মাসিক নূর' ছোলতান, সাপ্তাহিক 'হাবলুল মতীন' প্রভৃতি সাময়িকী তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত। তিনি কবিতা, গান, গজল, উপন্যাস, ইতিহাস প্রভৃতি লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী : ১. অলন প্রবাহ (১৯০৪), ২. উচ্ছ্বাস (১৯০৭), ৩. উদ্বোধন (১৯০৭), ৪. নব উদ্দীপনা (১৯০৭), ৫. স্পেন বিজয় কাব্য (১৯১৪), ৬. সংগীত সঞ্জীবনী (১৯১৬), ৭. প্রেমাঞ্জলী (১৯১৬)। উপন্যাস : ১. তারাবাঈ (১৯০৮), ২. রায়নন্দিনী (১৯১৮), ৩. নূরউদ্দীন (১৯২৩), ৪. ফিরোজা বেগম (১৯২৩)। প্রবন্ধ : ১. স্বজাতির প্রেম (১৯০৯), ২. আদব কায়দা শিক্ষা (১৯১৪), ৩. স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬), ৪. সুচিন্তা (১৯১৬), স্ত্রী শিক্ষা, তুর্কি নারী জীবন। ভ্রমণ কাহিনী : তরস্ক ভ্রমণ (১৯১০)। তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'মহাশিক্ষা কাব্য'। তাঁর বক্তব্য ও মূল কথা ছিল মুসলমানদের সভ্যতা, সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণ। তাঁর রচনাবলী এবং অনলবর্ষী বক্তৃতা মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেছে। ১৯৩১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.pathagar.com

গণিত সম্রাট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ থানার ঝাঐল ইউনিয়নে ১৮৫৫ সালে এক শুভক্ষণে সবুজেঘেরা সুন্দর তেতুলিয়া গ্রামে যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। মাতা দুর্গা সুন্দরী দেবী। তিনভাই এবং তিনবোনের মধ্যে যাদবই ছিলেন বয়ঃজ্যেষ্ঠ। পরিবারের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তেতুলিয়া গ্রামে কালিয়া বাবুদের পাঠশালায়। তিনি গৃহশিক্ষকতা করে পড়ালেখার খরচ যোগাড় করেন। যাদব মধ্যবৃত্তি পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ফলে চার বছরের জন্য মাসিক চার টাকা হারে বৃত্তি লাভ করেন। মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ঐ বছরেই কাওয়া-খোলার রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের কন্যা গিরিজা সুন্দরী বেদীকে স্ত্রী রূপে ঘরে তুলে নেন। তিনি ১৮৭৬ সালে ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এফ.এ. এবং ১৮৮০ সালে বি.এ. পাস করেন। তিনি ১৮৮২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিতশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮২ সালে কলকাতা সিটি কলেজ এবং স্যার সৈয়দ আহমদের আমন্ত্রণে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। এ সময় সাধনা ও অধ্যবসয়ের মাধ্যমে গণিতশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ও রচিত পাটিগণিত গ্রন্থটি সারা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। পাটিগণিত গ্রন্থটি ১৮৯০ সালে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে এ গ্রন্থটি বাংলা, উর্দু, হিন্দী, অহমিয়া, মালয়ী ও নেপালী ভাষায় অনূদিত হয়। ১৯১২ সালে যাদব চক্রবর্তীর বীজগণিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি কুলশাস্ত্র দীপিকা নামে আরেকটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা একটি জ্যামিতি বইও ছিল। ১৯১৬ সালে মার্চ মাসে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

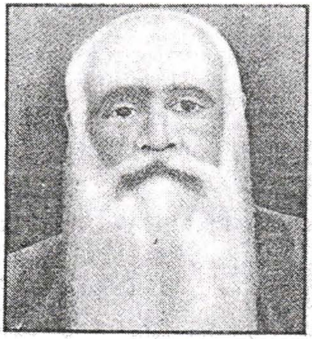

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যাদবচন্দ্র যে কত লোকপ্রিয় ছিলেন, প্রীতির বন্ধন কত গভীরে প্রবেশ করেছিল, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে চাকরি জীবনের শেষে বিদায় বেলায়। যাদবের বিদায় দৃশ্য বড়ই হৃদয়স্পর্শী। কে কিভাবে স্থান দিয়ে লোকটিকে বিদায় দিবে এ নিয়েও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। বিরাট এবং বিপুল গণসংবর্ধনার মাধ্যমে যাদবকে সকলে বিদায় অভিনন্দন জানান। সিরাজগঞ্জ শহরের ধানবান্দিতে সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর বাড়ির নাম 'যাদব নিবাস'। এখানে অবস্থানকালে তিনি মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। বর্তমানে তাঁর বাড়িটিতে প্রসূতি সদন শিশু হাসপাতাল এবং একটি অত্যাধুনিক চক্ষু হাসপাতাল চালু রয়েছে। দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি কলকাতা চলে যান। গণিত

www.pathagar.com

জগতের কিংবদন্তি গণিত সম্রাট যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ১৯২৩ সালে ২৬শে নভেম্বর কলকাতায় নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৯৬৫-১৯১০)

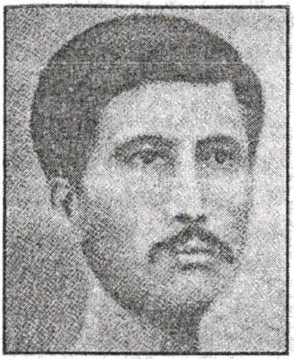

নদীমাতৃক ও চিরহরিৎ পূর্ববাংলা বেশ কিছু খ্যাতিমান কবি, সাহিত্যিক বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদের জন্মভূমিরূপে সেই ব্রিটিশ আমলেই উপমহাদেশে গৌরবদীপ্ত আসন লাভ করেছিল। এ পূর্ববাংলারই এক কৃতি সন্তান ছিলেন রজনীকান্ত সেন। সেই সময় একজন বিখ্যাত কবি ও সংগীত রচয়িতা হিসেবে তিনি সমগ্র বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। স্বাধীন স্বদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে রজনীকান্ত সেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেননি। ব্রিটিশ আমলে কবি রজনীকান্ত ঘুম ভাঙানিয়া গানের মাধ্যমে জনগণের তন্দ্রাচ্ছন্ন চেতনাকে উদ্দীপ্ত করেছিলেন। জন্ম ভাঙ্গাবাড়ি গ্রাম, বেলকুচি থানা, সিরাজগঞ্জ, ২৬ জুলাই, ১৮৬৫। গীতিকার, কবি ও সংগীতশিল্পী। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ, 'পদচিন্তামণি' নামক কীর্তন গ্রন্থ ও 'অভয়াবিহার' নামক গীতিকাব্যের রচয়িতা। পিতার কাছে শৈশবকালে সংগীত অনুশীলন। রাজশাহীতে প্রাথমিক শিক্ষাগ্রহণ। কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮৩), রাজশাহী কলেজ থেকে এফ.এ. ও কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি. এ. ডিগ্রি লাভ। ১৯৮১-তে বি.এল. পাস করে রাজশাহী আদালতে আইন ব্যবসায় যোগদান। কিছুদিন নাটোর ও নওগাঁয় অস্থায়ী মুন্সেফ হিসেবে দায়িত্ব পালন। সংগীত রচনায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান। স্বরচিত গানের সুকণ্ঠ গায়ক। তাঁর গান বিষয়বস্তু অনুযায়ী চার ভাগে বিভক্ত : ১. দেশাত্মবোধক গান, ২. ভক্তিমূলক গান, ৩. প্রীতিমূলক গান ও ৪. হাস্যরসের গান। রজনীকান্তের দেশাত্মবোধক গানের আবেদন ব্যাপক। স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) চলাকালে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে রে ভাই' গানটি রচনা করে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি। কবি হিসেবেও খ্যাত। নির্মল আবেগ ও কোমল সুরের ব্যঞ্জনায় তাঁর গান ও কবিতা সমৃদ্ধ। তাঁর রচিত 'বাণী' (১৯০২), 'কল্যাণী' (১৯০৫), 'অমৃত' (১৯১০) 'আনন্দময়ী' (১৯১০), 'অভয়া' (১৯১০), 'বিশ্রাম' (১৯১০), 'সদ্ভাবকুসুম' (১৯১৩) ও 'শেদান' (১৯২৭) এই আটটি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই গীত। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' রজনীকান্তের বিশিষ্ট গানের সঞ্চয়ন। তিনি কান্ত কবি নামেও পরিচিত। মৃত্যু : ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১০।

www.pathagar.com

ফতেহ লোহানী (১৯২০-১৯৭৫)

পূর্ণ নাম আবু নজীর মোহাম্মদ ফতেহ আলী খান লোহানী। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অগ্রণী অভিনেতা, চিত্র পরিচালক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, বেতারের অনুষ্ঠান প্রযোজক, সংবাদ পাঠক, আবৃত্তিকার ও অনুবাদক। তাঁর জন্ম সিরাজগঞ্জে। পিতা সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবু সাঈদ মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন খাঁ (আবু লোহানী), মাতা স্কুল শিক্ষিকা ও লেখিকা ফাতেমা লোহানী। মায়ের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় তাঁর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত ঘটে। সেন্ট মেরিজ ক্যাথেড্রাল মিশন হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, রিপন কলেজ থেকে আই.এ এবং বি.এ পাস করার পর ১৯৫০-এ তিনি লন্ডন গমন করেন এবং ওল্ডভিক থিয়েটার স্কুলে নাট্য প্রযোজনা বিষয়ে দুবছরের কোর্স সমাপ্ত করেন। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটের সদস্য হিসেবে তিনি চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। কলকাতার স্কুলে পড়ার সময় তিনি অভিনয়, কৌতুকাভিনয় ও আবৃত্তি করতেন। রিপন কলেজে পড়ার সময় তিনি বহু বাংলা ও ইংরেজি নাটকে অভিনয় করেন। কলেজে অভিনীত তাঁর প্রথম নাটক বনফুল রচিত *শ্রী মধুসূদন*-এ তিনি কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয়। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক উৎপল দত্ত পরিচালিত *হ্যামলেট*। পরে তিনি শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে জড়িত হন। তিনি *সিরাজউদ্দৌলা* নাটকটি পরিচালনা ও অভিনয় করেন। বাণী থিয়েটার-এর মঞ্চে তিনি *রামের সুমতি* নাটকে অভিনয় করেন। পেশাদার নাট্যগোষ্ঠী 'আলোক তীর্থ'-এর উদ্যোগে রঙমহল-এ মঞ্চস্থ হেমেন রায়ের *নর-নারী* নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান চলচ্চিত্রকার বিমল রায় তাঁকে হিন্দি চিত্র *হামরাহী* (১৯৪৫)-র একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন, সেই সঙ্গে তাঁর নতুন নাম হয় কিরণ কুমার।

এর পাশাপাশি তিনি অভিনয় করেন রঙিলা আর্ট করপোরেশন প্রযোজিত উদয়ন চৌধুরী (ইসমাইল মোহাম্মদ) রচিত ও পরিচালিত জোয়ার নাটকে এবং হিমাদ্রি চৌধুরী (ওবায়েদ-উল হক) রচিত, প্রযোজিত ও পরিচালিত দুঃখে যাদের জীবন গড়া (১৯৪৬) চলচ্চিত্রে। এছাড়াও কলকাতায় বিভাগ-পূর্বকালে তিনি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায় জড়িত হন। তখন তিনি কাজ করতেন দৈনিক আজাদ ও সাপ্তাহিক ইত্তেহাদ-এ। বেতারের অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের পর ফতেহ লোহানী ঢাকা বেতার কেন্দ্রে যোগ দেন সংবাদ পাঠক হিসেবে, সেইসঙ্গে নাটক ও আবৃত্তিতেও অংশ নিতেন।

www.pathagar.com

ফতেহ লোহানী কিছু গানও রচনা করেন। ঢাকা থেকে ১৯৪৯-এ মাসিক সাহিত্য পত্রিকা *অগত্যা* প্রকাশে তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ঐ বছরই তিনি যোগ দেন করাচি বেতারে, পরে বিবিসি-তে। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় ফিরে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত হন, পাশাপাশি বেতার অনুষ্ঠান, অভিনয় এবং লেখালেখিতেও অংশ নেন। ১৯৫৭ সালে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (এফডিসি) প্রতিষ্ঠার পর তাঁর পরিচালিত প্রথম দুটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ছিল আকাশ আর মাটি (১৯৫৯) ও আসিয়া (১৯৬০)। ১৯৬৫ সালে মুক্তি পায় তাঁর পরিচালিত উর্দু ছবি সাত রং। ১৯৬৭ সালে তিনি প্রথম অভিনয় করেন টেলিভিশন নাটক নির্ভীক-এ। ঢাকায় তাঁর অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্র রাজা এলো শহরে (১৯৬৪)। ফতেহ লোহানী অভিনীত অন্যান্য চলচ্চিত্রের মধ্যে মুক্তির বন্ধন (১৯৪৭), তানহা (১৯৬৪) বেহুলা (১৯৬৬), ফির মিলেঙ্গে হাম দোনো (১৯৬৬), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৭), দরশন (১৯৬৭), জুলেখা (১৯৬৭), এতটুকু আশা (১৯৬৮) বাল্যবন্ধু (১৯৬৮), মোমের আলো (১৯৬৮), মায়ার সংসার (১৯৬৯), মিশর কুমারী (১৯৭০), তানসেন (১৯৭০), আঁকাবাঁকা (১৯৭০), অন্তরঙ্গ (১৯৭০), ঘূর্ণিঝড়, (১৯৭০), স্বরলিপি (১৯৭০), দর্পচূর্ণ (১৯৭০), দীপ নেভে নাই (১৯৭০), অপবাদ (১৯৭০), ডাকু মনসুর (১৯৭৪), দুই রাজকুমার (১৯৭৫), এক মুঠো ভাত (১৯৭৫), কুয়াশা (১৯৭৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফতেহ লোহানী রচিত কয়েকটি নাটক হচ্ছে নিভৃত সংলাপ, দূর থেকে কাছে ও সাগরদোলা। তাঁর অনূদিত নাটকসমূহ হচ্ছে, একটি সামান্য মৃত্যু (আর্থার মিলারের ডেথ অব এ সেলসম্যান), চিরন্তন হাসি (ইউজিন ও নীলের ল্যাজারাস লাফড), বিলাপে বিলীন (ইউজিন ও নীলের মর্নিং বিকামস ইলেক্ট্রা) এবং উপন্যাস সমুদ্রসম্ভোগ (আর্নেস্ট হেমিংওয়ের দি ওল্ডম্যান অ্যান্ড দ্য সি)।

পুরস্কার ও সম্মাননা : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পুরস্কার (১৯৬১-তে শ্রেষ্ঠ বাংলা চলচ্চিত্র আসিয়া-র জন্য), পাকিস্তানের নিগার পুরস্কার (১৯৬-তে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা আসিয়া), পাকিস্তানের মজিদ আলমাক্কী পুরস্কার (১৯৬৮-তে শ্রেষ্ঠ বেতার নাট্য-অভিনেতা), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস) পুরস্কার ১৯৭৫ (অভিনয়-চলচ্চিত্র), এফডিসি-র রজত জয়ন্তী ট্রফি (১৯৮৩)। চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ কুয়াশা ছবির শুটিংয়ে নিয়োজিত থাকাকালে ১৯৭৫ সালের ১২ এপ্রিল ফতেহ লোহানীর মৃত্যু হয়।[২০]

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৮৯৮ সালের ২রা মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত ঘোড়াশাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আজম আলী এবং মাতার নাম মোসাম্মাৎ তসিরন বিবি। বরকতুল্লাহ আশৈশব খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৪ সালে শাহজাদপুর হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ সালে প্রথম বিভাগ আইএ এবং ১৯১৮ সালে দর্শনে বিএ অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। ১৯২০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এমএ পাস করেন। তিনি ১৯২২ সালে এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ওকালতিকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। তিনি

www.pathagar.com

বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আয়কর অফিসার হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন এবং পরে সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেড ও ম্যাজিস্ট্রেড পদের দায়িত্ব পালন করেন। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি একাডেমির স্পেশাল অফিসার (নির্বাহী প্রধান)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি বাংলা একাডেমির দায়িত্ব পালন করেন।

বিংশ শতাব্দির প্রথমভাগে যে সকল মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে দার্শনিক ভাবগর্ব বিষয়বস্তুকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। অপূর্ব ধ্বনি ব্যঞ্জনাময় সাবলীল ভাষার জন্যে বাংলা গদ্য রচনার ইতিহাসে তিনি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সুললিত গদ্যভঙ্গি পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় এবং তাঁর জোরালো ও পরিশীলিত ভাষা ব্যবহার তাঁকে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য লেখকরূপে চিহ্নিত করেছে। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর অসামান্য গ্রন্থ 'পারস্য প্রতিভা' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সালে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত, মানুষের ধর্ম, নবী গৃহ ও নয়াজাতির স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ।

আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অধ্যুষিত ভারতে মুসলিম স্বার্থরক্ষার আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ ছিলেন অন্যতম। ১৯০০ সালে শিয়ালকোল ইউনিয়নের কয়ালগাঁতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দেরাজউদ্দীন তালুকদার। তিনি ১৯১৫ সালে এন্ট্রান্স, ১৯১৮ সালে আই এ, ১৯২০ সালে বিএ, ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবরিতে এমএ এবং আইন বিষয়ে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে আইন ব্যবস্থা শুরু করেন। তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান, অবিভক্ত বাংলার বিধানসভার সদস্য, পাকিস্তান আইন ও জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৩ সালে আব্দুল্লাহ-আল-মাহমুদ পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ

www.pathagar.com

মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে নিরহংকারী, পরমসহিষ্ণু ও অসাম্প্রদায়িক এই ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৩ই জুন।

মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ

মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯০০ সালে ২৭ নভেম্বর (বাংলা ১৩০৭ সালের ১১ অগ্রহায়ণ) উল্লাপাড়া থানার তারুটিয়া (রশীদবাদ) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম আবু ইসহাক এবং মাতার নাম আজিজুননেছা। ১৯14 সালে শেরপুর ডায়মন্ড জুবিলী ইংরেজি হাই স্কুলে অধ্যয়নকালে কিশোর আব্দুর রশীদ প্রথম মানবতার পক্ষে অন্যায় ও অনাচারের প্রতিবাদ করেন। কৈশোর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে এদেশের মাটি কাদামাখা মানুষের রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের আপোষহীন যোদ্ধার ভূমিকা পালন করে গেছেন। মানবিক লোভ লালসা তাঁকে তাড়িত করতে পারেনি, দলমত তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি, শাসকের মুক্তির দাপট তাঁর মাথা নত করতে পারেনি, ক্ষমতার প্রলোভন তাঁকে দুর্বল করতে পারেনি। অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬ দফা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭১-এর অসহযোগ ও মুক্তি সংগ্রাম- প্রতিটি আন্দোলনে জাতির বিবেক প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠে, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার নিখাদ রূপায়ণ ঘটেছে তার তৎপরতায়। এ কারণেই মওলানা তর্কবাগীশ এ জাতির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব।

স্কুলে অধ্যয়নকালেই সিরাজীর 'খাদিমুল ইসলাম'-এর সক্রিয় সদস্য এবং স্কুল ত্যাগ করে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোললে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন এবং স্থানীয় সলঙ্গা হাটে কংগ্রেসের অফিস স্থাপন করে বিদেশি পণ্য বর্জন অভিযান জোরদার করেন। ১৯২২ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের মতো ইংরেজ শাসক আরো একটি হত্যাযজ্ঞ সংগঠিত করে সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায়। এই পাশবিক হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ২৮শে জানুয়ারি জনগণ বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে এটি সংলঙ্গা বিদ্রোহ হিসেবে খ্যাত। মওলানা তর্কবাগীশ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন এবং ব্রিটিশ সশস্ত্র বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। পরে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯২৩ সালে কারামুক্তির পর বেলী এসাতুল উলুম মাদ্রাসায় আবার শিক্ষাজীবন শুরু করেন। পরে তিনি দেওববন্দ মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপ্ত করে পায়ে হেঁটে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। ১৯২৫ সালে তিনি লাহোর এশায়েতে ইসলামী কলেজে অধ্যয়ন শুরু করন। এখানে অধ্যয়নকালে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং তর্কবাগীশ উপাধিতে ভূষিত হন। কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে মওলানা তর্কবাগীশ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারে মনোবিবেশ করেন। এরপর পরই তিনি 'নিখিল বঙ্গ রায়ত ঘাতক সমিতি' গঠন করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। ১৯৩৩ সালে সমিতির চাচকৈর (রাজশাহী) সম্মেলনে তিনি 'ঋণ শালিসী' আইন প্রণয়নের দাবি উত্থাপন করেন। এই আইন যাতে সত্বর পাশ হয় সে জন্য তিনি ১৯৩৪ সালে সিরাজগঞ্জের জামতৈল (ধোপাকান্দি) শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সভাপতিত্বে আর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এ বিষয়ে দেশব্যাপী দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর প্রস্তাবের আলোকেই বঙ্গীয় বিধান সভায় ঋণ শালিসী বোর্ড আইন পাশ করা হয়। তর্কবাগীশ ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং মুসলিম লীগের অনুমোদনে ১৯৪৬ সালে বিপুল ভোটে বঙ্গীয় আইন পরিষদে সিরাজগঞ্জের একটি আসন থেকে জয়লাভ করেন। মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনে মহান ও সাহসী যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেন। ৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি অ্যাসেম্বলি বসেছে। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য মিছিল বের করে। মিছিলে গুলির খবর পেয়ে তর্কবাগীশ অ্যাসেম্বলি থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন এবং জানলেন শহীদ হয়েছে অনেক ছাত্র। ফিরে গেলেন অ্যাসেম্বলি হাউসে। স্পিকার মির্জা আব্দুল করিম সভায় আসন গ্রহণ করার সাথে সাথে ছাত্রদের উপর গুলি বর্ষণের তদন্তের দাবিতে ভাষণ দেন। সকল সদস্যকে পরিষদ ভবন ত্যাগ করার আবেদন জানান। এ নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। এক পর্যায়ে স্পিকার অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করতে বাধ্য হন। মওলানা তর্কবাগীশ এরপর ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে এব বিবৃতি দিয়ে চিরতরে মুসলিম লীগ ছেড়ে দেয়ার ঘোষণা করেন এবং অ্যাসেম্বলি ভবন ত্যাগ করেন। এজন্য তাঁকে পাকিস্তান সরকার ২৩ শে ফেব্রুয়ারি বন্দী করেন এবং ১লা জুন আন্দোলনের চাপের মুখে মুক্তি লাভ করেন। মওলানা তর্কবাগীশের সেদিনের অনমনীয় সেই দৃঢ়তা মুক্তিকামী বাঙালির ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি আওয়ামী মুসলীম লীগে যোগদান করেন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হন। ১২ই আগস্ট, ১৯৫৫ সাল। মওলানা তর্কবাগীশ সর্বপ্রথম ঐ তারিখে কোটি কোটি বাঙালির প্রতিনিধি হিসেবে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে এক মহান ইতিহাস রচনা করেন। ১৯৫৭ সালে মওলানা তর্কবাগীশ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালে তিনি উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ ও তাড়াশের পৃথক দুটি আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে মওলানা তর্কবাগীশের বলিষ্ঠ ভূমিকা এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর তাঁর সভাপতিত্বেই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে। তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে একাধিক বার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলি সফর করেন এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষে মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি আদায়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ সময়ে তাসখন্দে বিশ্ব সম্মেলনে যোগ দিয়ে 'মহাতারেমা নুর (সম্মেলনের আলো)' উপাধিতে ভূষিত হন। সুদীর্ঘ সংগ্রামী ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক পথ পরিক্রম করে বর্ষীয়ান এই জাতীয়নেতা ২০শে আগস্ট ১৯৮৬ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

www.pathagar.com

ড. মযহারুল ইসলাম (১৯২৮-২০০৩)

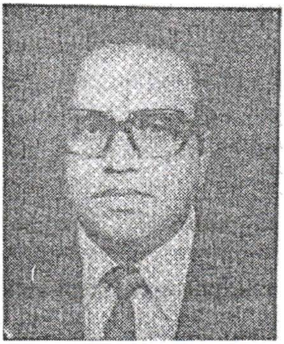

মানুষ তাঁর চিন্তা, মননের বিকাশ ঘটিয়ে থাকে অনন্ত সময় ধরে। তেমনি একজন প্রবাদ পুরুষ হলেন প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রত্যেকটা অংশে তার সমান অংশগ্রহণ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে বিচিত্র অঙ্গনে সাধনা করলেও ফোকলোরের ক্ষেত্রে তিনি একক ও অদ্বিতীয়। ব্যক্তি জীবনে তিনি শিক্ষক, প্রশাসক, উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, সংগঠক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি সফলতার স্বর্ণচূড়া স্পর্শ করেছেন কিন্তু তাঁর অর্ধশতাধিক বছরের সাহিত্য সংস্কৃতির সাধনায় ফোকলোর চর্চাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফোকলোরের সঙ্গে তাঁর নাড়ির অবিচ্ছেদ্য টান। তিনি মর্মে উপলব্ধি করেন Folklore : the pulse of the people. প্রফেসর মযহারুল ইসলাম বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চায় বিশেষণাত্মক গবেষণা করার পথিকৃৎ।

প্রফেসর মযহারুল ইসলামের জন্ম বৃহত্তর পাবনা জেলার শাহজাদপুর থানাধীন চর নবীপুর গ্রামে ১৯২৮ সালের ১০ সেপ্টম্বর। বাংলা ২৪ ভাদ্র ১৩৩৫ সালে। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ আলী। মাতা সালেহা বেগম।

ছাত্রজীবন থেকেই তিনি তাঁর বিরল বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছিলেন পাবনা শাহজাদপুরের তালগাছি উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ কলেজ, রাজশাহী কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৫১) অধ্যয়নকালে (১৯৪৯)।

কর্মজীবনেও নানা বৈচিত্রময়তার মধ্যে তাকে যেতে হয়েছে। কর্মজীবন শুরু হয ১৯৫২ সালে ঢাকা কলেজে যোগদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে যোগদান করেন ১৯৫৩ সালে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৫৭ সালে। ১৯৫৮ সালে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর তত্ত্বাবধানে মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে হেয়াত মাহমুদ তুলনামূলক আলোচনা শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য তিনি পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণার প্রতি অদম্য আগ্রহ নিয়ে দ্বিতীয়বার পি.এইচ.ডি গবেষণার উদ্দেশ্য ১৯৬০ সালে ফুব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণা শুরু করে। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের Department of English folklore collections in India and Pakistan বিভাগের একজন সফল গবেষক হিসেবে ১৯৬৩ সালে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল A History of Folklore collection.

১৯৬৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে স্থায়ী প্রফেসর পদে যোগদান করেন। কর্মক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি গবেষণায় যেমন উজ্জ্বল, তেমনি সৃজনী সাহিত্য সৃষ্টিতেও তেমনি পারদর্শী। কথা সাহিত্যের উপন্যাস ধারায় তাঁর পদচারণা না থাকলেও ছোটগল্প, কাব্য ও কবিতার ক্ষেত্রে অতুলনীয়।

www.pathagar.com

১. মাটির ফসল, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫।
২. বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।
৩. আর্তনাদে বিবর্ণ (ছড়া), এপ্রিল, ১৯৭০।
৪. যেখানে বাঘের থাবা, জুন, ১৯৭৯।
৫. অপরাহ্নে বিবস্ত্র প্রাতরাশ, আগস্ট, ১৯৭৯।
৬. দুঃসময়ের ছড়া, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯।
৭. উজানে ফেরার প্রতিধ্বনি, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮।
৮. তালতমাল, ১৯৫৯।
৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ১৭ই মার্চ, ১৯৭৪।
১০. কিশোর-নবীনদের বঙ্গবন্ধু, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
১১. "কালস্রোতে বর্তমান বাংলাদেশ", মে, ১৯৯৫।
১২. "রবীন্দ্রনাথ : কবি, সাহিত্যশিল্পী এবং কর্মযোগী", জানুয়ারি, ১৯৯৬।
১৩. "কবিতা সংকলন : (১) কাব্য বিচিত্রা", এপ্রিল, ১৯৯৮।
১৪. "রাজবারান্দায় তুমি" ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে বিচিত্র অঙ্গনে সাধনা করলেও ফোকলোর চর্চায় তিনি একক ও অদ্বিতীয়। ফোকলোর চর্চা, অনুশীলন, গবেষণা, পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নে তাঁর নিরলস ক্লান্তিহীন পরিচর্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ফোকলোর গবেষণার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর রচিত ফোকলোর বিষয়ক গবেষণা পত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুটিত হয়।

ফোকলোর বিষয়ক তাঁর কতিপয় গ্রন্থাবলি

১. কবি পাগলা কানাই (১৯৫৯)।
২. কবি হেয়াত মাহমুদ (১৯৬১)।
৩. ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পাঠন (১৯৬৮)।
৪. A History of Folklore Collection in India And Pakistan (1963).
৫. লোর চর্চার রূপতাত্ত্বিক বিশেষণ পদ্ধতি (১৯৮২)।
৬. 'আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর' (১৯৯৯)।
৭. 'বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর' (১৯৯৭)।

১৯৮০ পরবর্তী সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন, কচি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভারতের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ফেলো হিসেবে বাংলার বাহিরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করেন। এ সময় তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই লেখেন।

১. Folklore : 'The Pulse of the people' (1985)
২. 'The theoretical study of Folklore' (1998)
৩. 'The Socio Cultural Study of Folklore' (2001)

www.pathagar.com

ফোকলোরের উপাদানগুলো পরিবর্তন পরিমার্জন যাই ঘটুক না কেন তাতে প্রতিবিম্বিত হয় সমসাময়িক সমাজ ও দেশের বার্ষিক পরিচয়। নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ফোকলোর পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে।

তিনি একজন সংগঠকও ছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশে ফোকলোর সোসাইটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অবয়ব (১৯৯০) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকে একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৯০ সালের জুন মাসে। এটি ষান্মাসিক গবেষণা পত্রিকা। তিনি ফোকলোর নামে ১১টি পত্রিকা বের করেন। এতে ফোকলোর বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, খ্যাত-অখ্যাত ফোকদের জীবন সাধনাসহ নানা বিষয় ছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি দুই ধরনের কাজ করেছে- (ক) পত্রিকা প্রকাশ এবং (খ) গ্রন্থ বিচিত্র দৃষ্টিতে ফোকলোর প্রকাশ।

বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটির উদ্যোগে ছয়টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার ঐকান্তিক পরিশ্রমে ফোকলোর বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত দুই বছর পর পর। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৯০ সালে, ১৯৯২, ১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০০, ২০০২ (মূল বিষয় ছিল the study of Folklore in Modern world) এ সকল সেমিনারে দেশিয় পণ্ডিতদের সাথে সাথে বিদেশি পণ্ডিতদেরও আগমন ঘটে। প্রত্যেকটা সেমিনারে বাংলাদেশে একটা স্বাতন্ত্র্য ফোকলোর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার জোরালো দাবি রাখে। এরই ফলশ্রুতি ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর বিভাগ।

তারই অক্লান্ত পরিশ্রম আর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ বাংলাদেশে ফোকলোর চর্চা সব ক্ষেত্রে প্রতীয়মান। এই স্বনামধন্য ফোকলোরবিদ ইহধ্যামের মায়া ত্যাগ করেন ২০০৩ সালের নভেম্বর মাসে।

এক নজরে সিরাজগঞ্জ জেলার সাধারণ তথ্য[২১]

প্রশাসনিক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	আয়তন	২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার
২	ভৌগলিক অবস্থান	অক্ষাংশ ২৪.০০´ - ২৪.৪´ দ্রাঘিমাংশ ৮৯.২০´ - ৮৯.৫০´
৩	জনসংখ্যা	পুরুষ : ১৪৯৫০০০ জন মহিলা : ১৪৪৯০৮০ জন মোট : ২৯৪৪০৮০ জন
৪	শিক্ষার হার	৬৮%
৫	উপজেলার সংখ্যা	৯টি
৬	থানার সংখ্যা	১২টি
৭	পৌরসভার সংখ্যা	০৬টি
৮	ইউনিয়নের সংখ্যা	৮৩টি

www.pathagar.com

৯	মৌজার সংখ্যা	১৪৭২টি
১০	গ্রামের সংখ্যা	২১৮০টি
১১	নদীর সংখ্যা	০৮টি
১২	নদী পথের দৈর্ঘ্য	৩৫০টি
১৩	বিলের সংখ্যা	৫২টি
১৪	মসজিদের সংখ্যা	৩৯১৬টি
১৫	এনজিও'র সংখ্যা	৬৫টি
১৬	খাদ্য গুদামের সংখ্যা	৪৩টি
১৭	খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা	২৭০০০ মে: টন
১৮	ব্যাংকের সংখ্যা	১২৬টি
১৯	টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০৯টি
২০	সিনেমা হল	২৯টি
২১	ডাকঘর	১৬৪টি

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	৭৭টি
২	উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩৭৪টি
৩	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৮৮০টি
৪	বেসরকারি রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬৮৩টি
৫	মাদ্রাসার সংখ্যা	২১১টি
৬	এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা	১৪৫টি
৭	পলিটেনিক ইনস্টিটিউট	০১টি
৮	মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল	০১টি
৯	বেসরকারি মেডিকেল কলেজ	০২টি

কৃষি বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	মোট জমির পরিমাণ	১,৯৫,৯৩৭ হেক্টর
২	আবাদী জমির পরিমাণ	১,৮৩,২২০ হেক্টর
৩	সেচযোগ্য জমির পরিমাণ	১,৩৫,২৫০ হেক্টর
৪	অনাবাদী জমির পরিমাণ	২১,৩৩৭ হেক্টর

www.pathagar.com

৫	গভীর নলকূপের সংখ্যা	৫৯৭টি
৬	অগভীর নলকূপের সংখ্যা	৩১৭৮টি
৭	শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা	১৩১৮টি

রাজস্ব বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	উপজেলা ভূমি অফিস	০৯টি
২	ইউনিয়ন ভূমি অফিস	৭২টি
৩	বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ (কৃষি)	৬৩৬.৬৮৪ একর
৪	বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমাণ (অকৃষি)	২১০.১৫০৩ একর
৫	আদর্শ গ্রামের সংখ্যা	৪০টি
৬	আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	১৭টি
৭	আবাসন প্রকল্প	২৬টি (বাস্তবায়নাধীন)
৮	দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প	০১টি
৯	সায়রাত মহালের সংখ্যা	১৯টি
১০	হাট-বাজারের সংখ্যা	১৬২টি
১১	খাস পুকুরের সংখ্যা	৭২৩টি
১২	পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ	১৩.৬৬৫৫ একর
১৩	অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	১১,২৩৩.৫৮ একর
১৪	ভূমি উন্নয়ন করের দাবি (সর্বমোট) (২০০৮-০৯)	৬,১৩,৬৮,৪৬৭.০০ টাকা
১৫	ভূমি উন্নয়ন করের আদায় ঐ	৫,৭০,৫৪,৮৩৫.০০ টাকা
১৬	ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার ঐ	৯২.৯৭%

শিল্প বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	স্পিনিং মিল	০১টি
২	জুট মিল (বর্তমানে বন্ধ)	০১টি
৩	দগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা	০১টি
৪	কুটির শিল্প	২৪,৩১৬ টি

www.pathagar.com

৫	ক্ষুদ্র শিল্প	১,০৪৬টি
৬	মাঝারি শিল্প	৬৮৮টি
৭	বৃহৎ শিল্প	০৩টি

প্রাণি সম্পদ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	পশু চিকিৎসালয়	০৯টি
২	কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০৯টি
৩	পশু কল্যাণ কেন্দ্র	০৪টি
৪	গবাদি পশু খামার	১২১৫টি
৫	মুরগীর খামার	২৯৬টি
৬	দুগ্ধ খামার	২৬৪৭টি

স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	জেনারেল হাসপতাল	০১টি
২	সরকারি হাসপাতাল	১৫টি
৩	বেসরকারি হাসপাতাল	০৯টি
৪	চক্ষু হাসপাতাল	০২টি
৫	এফ. ডব্লিউ.সি'র সংখ্যা	৭২টি
৬	এপিআই কভারেজ	৮৫%
৭	স্যানিটেশন কভারেজ	৮১%
৮	বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার	৯৬%
৯	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০৮টি
১০	পুলিশ হাসপাতাল	০১টি
১১	রেলওয়ে হাসাপাতাল	০১টি
১২	মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র	০১টি
১৩	টিবি ক্লিনিক	০১টি

যোগাযোগ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	পাকা রাস্তা	৬৩৭.৪২ কি: মি:
২	কাঁচা রাস্তা	৪৭৬.৭৩ কি: মি

www.pathagar.com

৩	এইচবিবি রাস্তা	৩৪.২৫ কি:মি:
৪	রেলপথ	৪৯ কি:মি:

মৎস্য বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	মৎস্য খামার	০৬টি
২	মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার	০২টি
৩	মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুরের সংখ্যা	৮২৩টি

বিদ্যুৎ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	০৩টি
২	গ্রিড সাব-স্টেশন	০২টি
৩	৩৩ কেভি লাইন (পিডিবি)	৫০কি: মি:
৪	১১ কেভি লাইন	৯৫ কি: মি:
০৪	৪ কেভি লাইন	১৫০ কি: মি:
০৫	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি	০১টি

অন্যান্য বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক	বিষয়	সংখ্যা
১	বাফার গুদাম	০১টি
২	ডাক বাংলো	১৩টি
৩	হেলি প্যাডের সংখ্যা	০৯টি
৪	মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন	০১টি
৫	রেল ষ্টেশন	০৯টি
৬	কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি	০৯টি
৭	কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক	০১টি
৮	দৈনিক পত্রিকা	০৮টি
৯	সাপ্তাহিক পত্রিকা	০১টি
১০	পাক্ষিক পত্রিকা	০১টি

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. বাংলা পিডিয়া. প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।

২. স্মরণিকা, সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, ঢাকা।

৩. জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সিরাজগঞ্জ জেলা।

৪. যমুনা, সিরাজগঞ্জ জেলা সমিতি, প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১৪০৫ / নভেম্বর ১৯৯৮, ঢাকা।

৫. পূর্বোক্ত ৩।

৬. পূর্বোক্ত ২।

৭. পূর্বোক্ত ৪।

৮. পূর্বোক্ত ২।

৯. পূর্বোক্ত ২।

১০. পূর্বোক্ত ২।।

১১. পূর্বোক্ত ২।

১২. মো. আলতাফ হোসেন লাভলু, গ্রাম : চিনাধুকুরিয়া, পোস্ট : চিনাধুকুরিয়া, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : চাকরি।

১৩. পূর্বোক্ত ১২।

১৪. পূর্বোক্ত ২।

১৫. রহিম পাগলা, পিতা মৃত : আষাণ মন্ডল, গ্রাম : খাদুলী, ডাকঘর : পাঙ্গাসী, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : জিন্দানী মাজার শরীফ, বয়স : ৬০ বছর সময় : দুপুর ১২ঘটিকা।

১৬. বিশ্বনাথ পাগলা, পিতা-মৃত : অভয়চরন দাস, গ্রাম : নওগাঁ, ডাকঘর : শরীফাবাদ, উপজেলা : তাড়াশ, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, স্থান : ভাঙ্গা মসজিদ মাজার সংলগ্ন, সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা, তারিখ : ১৮.১১.২০১১।

১৭. পূর্বোক্ত ৩।

১৮. পূর্বোক্ত ৩।

১৯. মো. খোকন মিয়া, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

২০. পূর্বোক্ত ১।

২১. পূর্বোক্ত ৩।

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা/রূপকথা/উপকথা

লোককাহিনী, লোককথা, কেচ্ছা কাহিনী যে নামেই আখ্যায়িত করা হোক না কেন এগুলো লোকসমাজের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি হিসেবে পরিগণিত। মানবিক ও মানসিক সেতুবন্ধনের এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে দীর্ঘকাল লোকমুখে প্রচলিত ও প্রসারিত হয়ে আসছে। কেউ জানে না, প্রকৃতপক্ষে লোককাহিনীগুলো কবে, কখন শুরু হয়েছে বা কে তার স্রষ্টা। কিন্তু এখন পর্যন্ত তা একদিকে অভিজ্ঞতার ফসল অন্যদিকে বিনোদনের ক্ষুদ্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। তেমনি সারা পৃথিবীর ন্যায় সিরাজগঞ্জের সকল উপজেলা লোককাহিনীর জন্য প্রসিদ্ধ। তেমন মানুষ পাওয়া বিরল যে ছোট বেলায় কাহিনী গপ্প বা হাস্তোর শোনে নাই। লোককাহিনীগুলো সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখা গেছে যে, ব্যাপক আগ্রহ সহকারে কথকের কাহিনীগুলো শুনছে এবং কাহিনীর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তাদের মধ্যে অবলোকন করা যাচ্ছিল। কেচ্ছা বা কাহিনীতে সাধারণত পশু-পাখি, জীব-জন্তুর কথাই বেশি প্রাধান্য পায়। এছাড়া আটকুড়ো রাজা, বোকা জামাই, বোকা জোলাদের নিয়েও অনেক কাহিনীর প্রচলন রয়েছে। এক সময় সান্ধ্যকালীন আসরের মূল বিষয়ই ছিলো হাস্তোর বলা; হাস্তোর শোনা। এ পর্যায়ে রূপকাহিনী, পশুকাহিনী, হাস্যরসাত্মক কাহিনীগুলো তুলে ধরা হলো যা আঞ্চলিক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এক সময় কেচ্ছা-কাহিনী শ্রবণ ছিলো ভীষণ জনপ্রিয়। উল্লেখ্য যে, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে গল্পকার গল্প শুরুর প্রাক্কালে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি বলে গল্প বা গপ্প শুরু করে থাকেন। 'যে কয় হাস্তোর তার গোয়াত থাকে না বস্তর। যে করে মানা তার গোয়াত থাকে না ত্যানা। হাস্তোর হইল ওর, ধানে দিলাম ধোর। যা হাস্তোর বনে যখন কই তখন আসিস মনে। এ অঞ্চলে প্রচলিত কয়েকটি হাস্তোর এরকমের।

১

শিয়াল ও পরামাণিকের হাস্তোর

বাইশ্যা মাইশা দিনে হারাডা জমিন ডুইবা গ্যাচে। হিয়ালরা কুনো জাগায় থাইকবার না পাইরা এ্যাডা বড় লোগের গোয়াইল ঘরের হোলার চাঙ্গের পার যায়া বইয়া আচিল। ম্যালা দিন যায়, হ্যারা দুইজন কিচুই খাইবার না পায়া এ্যাক্কেবারে কাবু অয়া গ্যাচিল। দিনে রাইতে হেই হোলার পার এ্যাট্টু আদটু লড়াচড়া করে, হ্যার জন্য হোলাগুনা কচর মচর করে। তাই হঠাৎ কইরা হেই বড় বাড়ীর এ্যাডা চাহর কচর মচর হুইনা ভয় পায়া লৌড়ায়া যায়া বাড়ীর পরামাণিকের লগে কয়া দিচিল। তহন পরামাণিক আস্তে আস্তে গোয়াইলে যায়া হোলার চাঙ্গের পার ফুচকী দিয়া দ্যাহা লইচিল। হেসম কাবু হিয়াল দুইডা কাঁদা কাঁদা চোখ দিয়া হ্যার তরে চায়া আচিল। কাবু হিয়ালগারে চোখ দ্যাইহা আর প্যাডর পালি চায়া পরামাণিকের মনে খুব দয়া অইলো। পরামাণিক হিগগীর যায়া

www.pathagar.com

বাড়ীর মিদ থাইহ্যা এ্যাক থাল বাত আইন্না হিয়ালগারে কাচে হন্নি কইরা দিল। তহন হিয়াল দুইডা খুশি হয়া হব বাত খায়া ফালাইল। তিন চাইর দিন বাত খাওনের বাদে পরামণিকের বউ আর হ্যার ছাওয়াল কইলো যে, হে জানি কাউরে বাত দ্যায় না। পরামণিক হেই দিন থ্যা বিপদে পইড়া গ্যালো।

তাই আটে যায়া চাইর পয়সার পচা ভুঁড়ি এ্যাক পাইল্লা কিনা আইনা হেই হিয়ালগারে খাওয়াইল। এমুনি কইরা আরও কয়দিন খাওয়ানের বাদে এ্যাকদিন পরামাণিক আটে গ্যাচে কিন্তুক পয়সা না পায়া আর মাচ কিনবার পারে না। বাড়িত থনে পয়সা ল্যাওয়ার কতা হ্যার মনে আচিল না। তহন বাড়ীর কাচের দুইডা মানুষের কাচে আওলাত চাইল, হ্যারাও দিল না। পরামাণিক বিপদে পইরা গ্যালো, উপায়ডা যে কি, হেতা হে আর খঁইজা পাইল না। তহন আরাক গাঁর এ্যাকটা বিরাট জমিদারের কাচে যায়া চিন্তা কইরা দ্যাকলো যে, এ্যাত বড় জমিদারের কাচে এ্যাত গুনা মানুষের হুমকে দুইডা পয়সা চাওয়ন কতবড় মুসকিলের কতা। হেই ল্যাইগা জমিদারের কাচে কইল যে, আমাগো দুইডা মানিক্কি আওলাত দ্যাওন লাইগবো। জমিদার চুমক্যা গ্যালো। তহন পরামাণিক হ্যারে আবার কয় আত দইরা ফাহে লিয়া আস্তে আস্তে কইল, দুইডা মানিক্কি লয়, দুইডা ট্যারা পয়সা অইলেই অইব। জমিদার চুপ কইরা ডাইনের থইলায় থ্যা দুইডা ট্যরা পয়সা বাইর কইরা হ্যার আতে দিয়া চইলা গ্যালো। পরামাণিক দুই পয়সার মাচ কিন্না বাড়ীত লিয়া চুপচাপ কইরা হিয়ালগারে খাওয়াইল। হ্যার দুদিন বাদে হিয়ালরা হুকনা পাইয়া চল্যা গ্যালো। কয়দিন পরে জমিদার চিন্তা করলো যে, মাইনসের মিদা হে মানিক্কি ল্যাওনের কতা কয়া মাত্র দুইডা ট্যারা পয়সা লিচে। আইচা এ্যাহন আমি হ্যার কাচ থনে দুইডা মানিক্কি চাইমু, হাক্কি হাবুদ তো নাই। যুদিল মানিক্কি না দেয়, তাইল হ্যার হব জমিনই মানিক্কির বদলায় নিজের নামে লেইহা লিবো। কতাগুণা চিন্তা কইরা হে আবার হেই আটে গ্যালো। তহন যে দোহানের বগলে মানিক্কি চাইছিল হেই ঘরের মিদা পরামাণিককে চায়া দেইহা আইগ্যা যায়া এ্যাড়া কাগজে লেইহা লিল যে, পরামাণিক হ্যার কাচ থনে দুইডা মানিক্কি লিছে। হুদু হেডাই লয়, পরামাণিকের কাচ থন নাম সইও লিল কাগজডার উপর। পরামাণিক কিন্তুক হোজা আলে নাম সই দেয় নাই। হ্যার কাছের মাইসেরা ম্যালাডা কয়া কয়া হিকার করাইচিল।

জমিদার তহন বাড়িত যায়া বিনদ্যাইশা, আবার নিজের গার পরামাণিক পেরদানের কাচে বিচার চাইলো। তহন পেরদানেরা হেই পরামাণিকরে ডাহাইয়া আইনলো। পরামাণিক হ্যার থনে পরায় দুই মাইল পত চইলা আইয়া দরবারের মিদা খাড়াইল। হববাই পরামাণিকের কাচে মানিক্কির লেইগ্যা হক্ত কইরা চাপ দিল। পরামাণিক তহন হিমিস্যায় পইড়া হাত দিনের হোময় লিল।

হ্যার বাদে নিজের বাড়ীত যায়া পরামাণিক বড় পোলারে, বউরে কইল। তহন হব্বাই দুখে পইড়া কাঁদা হুরু দিল। কোন থনে হ্যারা মানিক্কি দিবে আর ভাইবা পায় না। হ্যাষে বাচ করল কি, পাঁচদিন বাদে যায়া কইলো যে, আর দশ দিন হোমায় না দিলি হ্যার মানিক্কি ফেরৎ দ্যাওয়া হোজা কাম অইবে না।

জমিদারের বিচারকরা কতাডায় হায় দিয়া দিল। তহন পরামাণিক পত দিয়া বাইব্যা বাইব্যা বাড়ীত যাওন লইচিল। হেই হোমায় এ্যাডা হিয়াল হ্যার হুমকে আইয়া

www.pathagar.com

জিগায়, "ক্যা গো পরামাণিক, কাঁদ ক্যান? পরামাণিক জব কইল, তোমাগো জাতের দুই হিয়ালের বাঁচাইবার যায়া আমার এ্যাহন জান যায়। কও তো কি করমু? হিয়ালডা কইলো, তোমাগো অনেক দয়া, আমাগো দুই জনেরেই তুমি খিলাইয়া বাঁচাইছ। হে সম ব্যাবাক বিত্তান্ত হুইনবার চাইল হিয়ালডা। পরামাণিক এ্যাকে এ্যাকে হব ভাইঙ্গা চুইরা কইল। চালাক হিয়াল কইলো, বিচারের দিন কবে, হে দিন আমি যায়া ভালা কইরা দিমু। পরামাণিক বিচারের দিনডা কয়া বাড়ীত চইল্যা আইল। হ্যাষে বিচারের দিন আইয়্যা গ্যালো। তহন বিচারের জাগায় বিচারের মানুষরা বইয়া আচিল, পরামাণিক বাদে হেই হ্যার হিয়ালনীর হাতে কইরা দরবারে আজির অইল। দরবারের মাইনষেরা হিয়াল আর হিয়ালনীরে বইবার দিল। হিয়াল তহন চেয়ারে বইল কিন্তুক হিয়ালনী না বইয়া দরবারের মিদা আটে আর পাও হন্যি কইরা কইরা মোতে, আর মোত না বাড়ালি খালি কান্দে। খানিক বাদে বাদে জমিদারের হুমকে যায়া হিয়ালনী খাড়ায়। জমিদার হিয়ালরে জিগায় যে, কিহ্যামে হ্যাগারে আইতে দেরী অইলো? হিয়াল কয়, ম্যালা জাগায় বিচার কইরা আইতে আইতে এ্যাতো দেরী অইল। জমিদার হিয়ালনীর মোতার কতাডা জিগাইল। হিয়াল কইল, বিচারে যে ঠইগ্যা যায় হ্যার মূখ বইরা ও মুইতা দ্যায়। তাই এহানে আইয়া অর মুত ফুরায়া গ্যাচে নাহি, তাই পরোক করতাইচে। আইজ ম্যালা মাইনষের মুখ বইরা মুইতা থুইয়া আইছে। জমিদার কতাডা হুইনা মনে মনে কইল, বিচারে তো তার নিজের ঠগা অইবার পারে, হেই লাইগ্যা হে কইল যে, বিচার আর অওন লাইগব না, তোমাগো হিয়ালনীডাও কাউরে খাওন লাইগবো না, তোমরা এ্যাহন যাও। হিয়াল কইল যে, না ওডা অয়না, বিচার করমুই, যার ঠগা অইবে হ্যার মুক ভইরা আমার হিয়ালনী দিয়া মোতামু, এ্যাক্কাবারে খাডি বিচার করুম। জমিদার কইল, বিচারডা অয়া গ্যাচে, আমি আর মানিক্কি কতাডা মুহে আনমু না। হিয়াল তহন বিচার না কইরা পরামাণিকরে কইল, আপনি চইলা যান, বিচার আর কুনোদিন অইব না, এই জমিদার কুনো দিন আর মানিক্কিও চাইবে না। পরামাণিক খুশী অয়া বাড়ীর পতে ম্যালা দিল। হ্যারপর হ্যার বড় পোলারে আর বউরে হিয়ালের কতাডা আগাথ্যা-গোরা অস্তিক কয়া দিল। বাড়ীর হগ্গলি হুইনা আইসা কুটপাট অয়া গ্যালো।[১]

২

চড়ুই ও কাকের কেচ্ছা

এ্যাকদিন এ্যাক গিরস্তর বাড়ীতে মরিচ মেইল্যা দিয়া থুইচে রোইদে হুকাইবার লাইগা। একটো কাউয়া আইসা ঐ মরিচ খাইবার লইচে। এমন সময় একটো চড়ুই পাহী আইসা ঐ বাড়ীতে পইলো। হেকানে আবার ধানও হুকাইবার দিছিলো, চড়ুই আইসা কাউয়াকে কইলো, আচ্ছা কাউয়া ভাই, তোমার হাতে আমার পাল্লা। দেহি কেডো আগে মরিচ খায়া উইঠপার পারে। কাউয়া কলো, যদি আমার মরিচ আগে খাওয়া অয়, তাহলি তুমি আমাকে কি দিবা? চড়ুই কলো, যদি তুমি আগে খাইবার পারো, তা হলি তুমি আমার বোটের দুধ খাইবা। দুইজনের মধ্যে পাল্লা চইল্লো। কাউয়া চালাকি কইরা কিছু মরিচ ঠোঁটে কইরা লিয়া এমমুহে ওমমুহে হারাইয়া থুইয়া আইসে আর কিছু খায়। এমনি কইরা কাউয়ার মরিচ খাওয়া আগে অয়া গ্যালো। ওমমুরা চড়ুই তার ধান খায়া হাইরবার পাইরলো না। চড়ুই পাহী, তার আবার পেট ছোট। হে কি আর অত মরিচ

www.pathagar.com

একলা খায়া হাইরবার পারে? কাউয়া তার মরিচ শ্যাষ কইরা আইসা চড়ুইক কইলো, চড়ুই ভাই তুমি যে আমার হাতে ওয়াদা কইরছো, তাই এহন পালন কর। চড়াই কইলো, ওয়াদা যহন করচি তহন তাতো পালন করা লাইগবো। কাউয়া কইলো তা হলি এহন তোমার দুধের বোটা দাও, আমি যায়া খাই। চড়ুই কইলো, ভাই কাউয়া, তুমি তো গু খাও, তাই তোমার ঠোঁট নাপাক থাহে। তোমাকে দুধ নিওয় খাইবার দিবো কিন্তু তোমার ঠোঁটটা ঐ নদীতে থাইকা ধুইয়া আইসো। কাউয়া তার কথামত নদীত গ্যালো ঠোঁট ধুইবার লাইগা। নদীত যায়া কইলো :

নদী ভাই, নদী ভাই
দ্যাও পানি, ধোব ঠোঁট
তবে খামু চড়ুইর বোট।

নদী কইলো, ভাই কাউয়া, তুমি গু খাও, তোমার ঠোঁট নাপাক, ঐ ঠোঁট আমার পানির মোদে ডুবাইবার দিবো না। কারণ এ নদীর পানিতে মেলা মুছুলমান ওজু কইরা নামাজ পড়ে। তাই যদি তুমি ঠোঁট ধুইবার চাও তাহলি এ্যাকটো খুঁটি বানায়া আন, তাতে পানি তুইল্যা হেই পানি দিয়া ঠোঁট ধোও। এই কথা হুইনা কাউয়া গ্যালো কুমারবাড়ী। কুমার বাড়ী যায়া কুমারকে কইলো :

কুমার ভাই, কুমার ভাই
দাও খুঁটি, ভরবো জল
ধোব ঠোঁট তবে খাব
চড়ুইর বোট॥

কুমার কইলো, আমার কাছে তো মাটি নাই, তুমি মাটি লিয়া আস, আমি খুঁটি বানায়ে দেবনে। কাউয়া তহন মাটি আইনবার যায়া মাটিক কইলো :

মাটি ভাই, মাটি ভাই
দাও মাটি, গড়ব খুঁটি
ভরব জল, ধোব ঠোঁট
তবে খাব চড়ুইর বোট॥

মাটি কইলো, দ্যাহ, যদি তুমি আমাক তুইল্যা লিবার পার তবে লিয়া যাও, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কাউয়া নিজের ঠোঁট দিয়া খুব চেষ্টা কইরলো কিন্তু পাইরলো না। তহন মাটি কইলো, যদি আমাক লিবার চাও তা অলি ঐ যে গরু দ্যাহা যায় ওর শিংগা লিয়া আইসো, তাই দিয়া খুইড়া তুইল্যানে। কাউয়া তখন গরুর কাছে যায় কইলো :

গরু ভাই, গরু ভাই
দাও শিংগা, তোলবো মাটি
গড়ব খুঁটি, ভরব জল
ধোব ঠোঁট, তবে খাব
চড়ুইর বোট।

www.pathagar.com

গরু কইলো, ভাই আমি তা আর নিজের শিংগা নিজে ভাইংবার পাইরতাছিনা। তবে যদি শিংগা নিবার চাও তা হলি ঐ যে কুত্তা যাইতেছে ঐ কুত্তাকে কও, হে আইসা আমার শিংগা দিয়া যাইবোনে। কাউয়া তহন কুত্তাকে যায়া কইলো :

কুত্তা ভাই, কুত্তা ভাই
ভাইংগা দাও শিংগা
তোলবো মাটি, গড়ব খুঁটি
ভরব জল, ধোব ঠোঁট
তবে খামু চড়ুইর বোট।

কুত্তা কইলো, ভাই কাউয়া, তোমার কাম করার নাইগা আমি রাজি আছি, কারণ তুমি বিপদে পইড়াচো। কিন্তু কি কমু আজ তিন চারদিন অয় আমি কিছুই খাই নাই। খিদাত প্যাট চো চো কইরতাছে। যদি কোনো বাড়ী থাইক্যা চারডা ভাত আইনা আমাক দিবার পারো, তা হলি তাই খায়া জোর বানাইয়া গরুর হাত পাচড়া পাচড়ি করমু। কাউয়া হেই কথা হুনা গেল এক গিরস্তের বাড়ী। যায়া কইলো :

গিরস্ত ভাই, গিরস্ত ভাই
দাও ভাত, খাইব কুত্তায়
বানাইবো জোড়, নইরবো গরুর সাথে
ভাইংগবো শিংগা, তুলবো মাটি
গড়ব খুঁটি, ভরব জল,
ধোব ঠোঁট, তবে খামু
চড়ুইর বোট।

গিরস্ত কইলো, তুমি তো গু খাও, তোমার ঠোঁট নাপাক, যদি আমার বাসনে ভাত দেই, হেই বাসন নিয়া যাবি। তোর ঠোঁট দিয়ে ধুইয়া, তার বাদে লিয়া দিবি কুত্তাক, হে কুত্তাও তো গু খায়, তহন আমার বাসনটা বাইরকা অয়া যাইবনে। যদি পার তো এ কামার বাড়ী দ্যাহা যায়, ওহান থাইকা একটা বাসুন বানায়া আন, তাতে হইরা ভাত লিয়া যাইয়ানে। কাউয়া তহন হেই কামার বাড়ী গ্যালো ও কামারকে কইলো :

কামার ভাই, কামার ভাই
দাও বাসন, নেব ভাত
খাওয়ামু কুত্তাক, ভাইংবো শিংগা
তুলবো মাটি,গড়ব খুঁটি
ভরব জল, ধোব ঠোঁট
তবে খামু চড়ুইর বোট।

কামার কইলো, আমি লোয়ার অভাবে কাজ ছাইড়া দিয়া বইসা আছি। যদি এল্লা লোয়া দিবার পার তা হলি এল্লা কষ্ট কইরা না অয় তোমার বাসন বানায়া দিমানি। কাউয়া কোন থাইক্যা একটা লোয়া আইনা কামারকে দিল। কামার কইলো, আমার আপর

www.pathagar.com

জ্বালামু, তার লাইগা আগুনের দরকার। তুমি ওই বাড়ীত থাইকা আগুন লিয়া আইসো। কাউয়া তার পাহাত কইরা আগুন আইনবার যায়া পাহাত আগুন লাইগা মইরা গ্যালো। আমার কাহিনী হ্যাশ অয়া গ্যালো।[২]

৩

টুনী পাখির কেচ্ছা

এক আচিল রাজা। তার ম্যালা ট্যাহা পয়সা। অনেক দিন অইলো হে একঘরে ট্যাহা পয়সা রাহে। একদিন দ্যাহে যে তার ট্যাহাতে উই পোকা ধইরছে। হে তার লোকজনকে হুকুম দিলো যে, কাইল সব ট্যাহা ঘর থাইহা বাইর হইরা আইনা ওইদে দিয়া হুকাইবা। পরের দিন লোকজন সব ট্যাহা-পয়সা বাইরে হুকায়া ঘরে থুইলো। সব ট্যাহা তুইলছে কিন্তু একটো ট্যাহা তোলে নাই। টুনী হেই ট্যাহাডো লিয়া তার বাসাত লিয়া থুইছে। পরের দিন রাজা যহন কাচারিতে লোকজন লিয়া দরবার কইরছে, হেই সময় ঐ টুনী রাজার মাতার উপর দিয়া ওরে আর কয় :

রাজার ঘরে যে ধন আছে
আমার ঘরেও হেই ধন আছে।

রাজা তো এ কতা হুইনাই খুব রাগ। হে তার লোকজনক কইলো, ঐ টুনীর কাছ থাইহা যে ট্যাহা থাহে তাই কাইড়া লিয়া আইসো। রাজার কতামত কয়েকজন যায়া টুনীর বাসা থাইহা হেই ট্যাহাডা আইনা রাজার কাছে থুইবার দিলো। রাজা আরাকদিন রাজ দরবার বাইসা আইছে, সেই সময় টুনী যায়া কইতাছে :

হোন হোন ভাইগণ, রাজা বড় কেরপন
টুনীর ধনে বাড়ায় ধন।

রাজা দরবারের মইধ্যে খুব লজ্জা পাইলো। হে আবার তার সেনাপতিকে কইলো যে, টুনীর ট্যাহাডা তার বাসাত দিয়া আইসো। সেনাপতি তার কতা হুইনা হেই ট্যাহাডো লিয়া টুনীর বাসাত লিয়া দিয়া আইসলো। টুনী তার বাসাত যায়া দ্যাহে যে তার বাসার মোধ্যে ট্যাহা। হে আবার রাজার দরবারে যায়া কওয়া লইলো :

রাজা বড় ভয় পাইছে
আর টুনীর ট্যাহা ফিরা দিছে।

রাজা হুইনা তা হিকারীগারে ডাইহা লিয়া কইলো, ঐ টুনী পাহীডোক না মাইরা যেবা হইরা পার জ্যান্ত ধইরা আইনা আমাক দিবা। রাজা তার সাত রানীক কইলো টুনীক ধুইরা আইনা দিবানে। তোমরা টুনীকে ত্যালের মোদে বাইজা মচমচ কইরা আইনা আমাক দিবা। হিকারীরা টুনীক ধইরা আইনা বড় রানীর কাছে দিল। সাত রানী নাড়াছাড়া কইরা দ্যাহা নাইগলো। একজনের আত থাইহা আর একজনের আতে লিয়া দেহতি দেহতি চট কইরা টুনী উইড়া গ্যালো। রানীরা চিন্তা হরা লইলো। কারণ রাজা খাইবার চাইছে, কিন্তু হে টুনীতো আত থাইহা উইড়া গ্যালো। তহন তারা যুক্তি হইরা কইলো, আচ্ছা এক কাম করি, তালি রাজা দিশা পাইবানে না। বড় রানী কইলো কিকাম হরা যায়? তহন অন্যান্য রানীরা কইলো, ঐ ঘরের কোণেতে একটো খস-খইসা

ব্যাঙ আছে, তাই আইনা ভাইজা রাহি। রানীরা হেই খস-খইসা ব্যাঙডো খুব ভাল হইরা ময়-মসলা দিয়া ভাইজা রাজাক লিয়া ভাত খাইবার দিলো। রাজা খুবমজা হইরা হেই ব্যাঙ ভাজা দিয়া ভাত খাইলো। পরের দিন রাজা যায়া দরবারে বইছে, হেকানে লোকজন গিয়া পুরা অয়া গ্যাছে। এমন সময় টুনী যায়্যা রাজার মাতার উপর দিয়া ছো দ্যায় আর কয় :

রাজা রে রাজা কেমন রাজা
রাজা খায় ব্যাঙ ভাজা।

রাজা তো দেইহালো ক্যারে, এতো শালার টুনীক ভাইজা খাওয়া অয় নাই। সাত রানী তো আমাক ব্যাঙ ভাইজা খিলাইছে। তহন রাজা তাড়াতাড়ি হইরা রাজদরবার ভাইঙ্গা দিয়া বাড়ীত আইলো। বাড়ীর মোদে যায়া রাগের চোডে থরথর হইরা কাঁপে আর সাত রানীকে ডাইহা কাছে আইনা কইলো যে, কাইল টুনীক ছাইড়া দিয়া আমাক ব্যাঙ ভাজা খাওয়াইছে কেডা? তহন রানীরা সব একাকজন এহাক জনের দোষ দেওয়া নইলো। তহন রাজা রাগ হইরা সব রানীরই নাক কাইটা দিলো। পরের দিন রাজা দরবারে যহন বইছে আবার টুনী যায়া ফের কওয়া নইলো :

এক টুনী টুন টুনাইছে
আর সাত রানীর
নাক কাটা গ্যাছে।

রাজা আর কি হইরবো। হে ভাইবলো যে, ও শালার টুনীক যতই কিছু হরা যাইব ততই ও আমাক খ্যাপাইবো। রাজা হেদিন থাইকা টুনীক কিছুই কইলো না। হাস্তোর কওয়া এহনকার মত শ্যাষ অয়া গ্যালো। যা হাস্তোর বনে, যহন কই তহন আসিস মনে।

এসব কেচ্ছা থেকে বুদ্ধির চাতুর্য, পাপের প্রায়শ্চিত্য, সততার পুরস্কার ইত্যাদি বিষয়ক নৈতিক মূল্যবোধের দিকটাই বিশেষভাবে প্রাধান্য প্রেয়েছে।[৩]

৪

টিপটিপানির গপ্প

এক দেশে আছিলো এক লোক। তার আছিলো একটি ঘোড়া। লোকটা খুব গরিব ছিলো। ঘোড়াটাই তার সম্বল। একদিন সন্ধ্যা বেলায় টিপ টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিলো। লোকটা তার ঘোড়া খুঁজে পাইতেছিলোনা, এদিক ওদিক অনেক খুঁজলো কিন্তু কোনোহানেই তার ঘোড়াটাকে দেখতে পাইলো না। মন খারাপ কইরা তবুও খুঁজতে লাগলো। ঘোড়া ছাড়া যে না খায়া থাকতে অইবো। হঠাৎ এক বৃদ্ধার ঘরের পেছনে তার ঘোড়াডাকে শুয়া থাকতে দেইখা খুশিতে চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠলো। তখন প্রায় অন্ধকার হইয়া আইছে। কাছের জিনিসও স্পষ্ট করে দ্যাখা যায় না। লোকটা যেটিকে তার ঘোড়া মনে করেছিলো সেটি আছিলো আসলে একটি বাঘ। কিন্তু সে তা বুঝতে পারলো না। ঘোড়ার মত করেই বাঘের মুখে লাগাম টানিয়ে দিলো।

বাড়ির পথে রওনা দেবার পর বাঘ হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলো। বাঘ ভাবলো, আমি বনের রাজা। আর আমাকেই দড়ি দিয়ে এভাবে বেঁধে পিটিয়ে পিটিয়ে নিয়ে

www.pathagar.com

যাচ্ছে এ কোন প্রাণি। বাঘ আর পেছনে তাকানোর সাহস পায় না। বাঘ রাস্তা ছেড়ে বনের মধ্যে ঢুকে পরে, লোকটা চাবুক মারতে থাকে রাস্তার দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাঘ ঝাইরা পিট্টা বনের মইধ্যে দিয়া দৌড়াইতে থাকে। বনের ভিতর শুধু কাঁটা আর কাঁটা। লোকটির সারা শরীর কেঁটে কেঁটে অবস্থা খুব কাহিল। কিন্তু লোকটা বুঝতে পারছিলো না তার ঘোড়া এরকম করছে কেন? যতই লাগাম টাইনা ধরে ততই বাঘ জোরে দৌড়াইতে থাকে। বাঘ ভাবে, এ কার পালায় পরলাম, নিশ্চই এ টিপটিপানি। এই কথা ভেবেই ভয়ে আরো জোরে গভীর বনের মইধ্যে দিয়া দৌড়াইতে থাকে। এদিকে লোকটা তো ভয়ে অস্থির। তার ঘোড়ার কি হলো এই ভেবে কান্দা কান্দা ভাব হইয়া যায়। এরকম সারা রাত দৌড়াইতে দৌড়াইতে বাঘও ক্লান্ত হইয়া পরে। এদিকে সূর্যের আলো আস্তে আস্তে উঠতে থাকে। লোকটা তখন খেয়াল করে যে এ তার ঘোড়া না, এ যে একটি বাঘ। লোকটা খুব ভয় পেয়ে যায়। লোকটা এবার পালাবার পথ খোঁজে। হঠাৎ একটা গাছের ডাল ধরে ঝল্যই দিয়া উঠে পরে, বাঘ তো আরো ভয় পাইয়া আরো জোরে দৌড়াইতে থাকে। এত ভয় জীবনে কোনোদিন পায় নাই বাঘ। বনের মইধ্যে এ কোথথেইকা আইলো। ওহ!

এদিকে লোকটিতো ভয়ে প্রায় আধ মরা, গাছের উপরে চুপচাপ বইসা বইসা হাঁপাচ্ছে আর কি করবে ভাবছে। আর ঐদিকে বাঘ আর থামে না, বনের মধ্যে একজায়গায় এক শেয়াল দাঁড়িয়ে আছিলো। সে দেখতে পাইলো বাঘ দৌড়াচ্ছে। শেয়াল ভাবলো, ঘটনা কি? বাঘ মামা এমন কইরা দৌঁড়াচ্ছে ক্যা। শেয়াল বাঘ মামা বাঘ মামা কইরা ডাকতে আরম্ভ করলো। সেই ডাক শুইনা বাঘ আরো জোরে দৌড়াইতে শুরু করলো। শেয়ালও পেছনে পেছনে দৌঁড়ায় বাঘও দৌঁড়ায়। শেয়াল পেছন থেইকা ডাইক্যা কয় বাঘ মামা একটু থামো, আমি তোমার ভাইগ্না, ভয় নাই, কি অইছে কও। বাঘ একটু খানি থামে, থাইমা কয়, বনে টিপটিপানি আইছে, দেখো আমার কি হাল কইরছে। শেয়াল কয়, মামা আমার সাথে চলতো দেইখা আসি কে এই টিপটিপানি? বাঘ কয় আমি আর যামুনা, গ্যালে তুমি যাও। শেয়াল কয়, তাইলে তুমি এহানে থাকো আমি দেইখা আসি। বাঘ একটু আশ্বস্থ হয়। কয়, ঠিক আছে যাও। শেয়াল টিপটিপানি দেখবার জন্য সামনে আগাইতে থাকে।

এদিকে গাছের উপর থেইকা শেয়ালকে আসতে দেইখা লোকটা গাছ থেকে নাইমা গাছের নিচে একটা গর্ত আছিলো সেইখানে লুকায়। শেয়াল দীরে দীরে (ধীরে ধীরে) গাছের কাছে আসে। অভ্যাস মতো গর্তের মইধ্যে লেইজ দিয়া উপরে তাকাইয়া টিপটিপানি খুঁইজতে থাকে। এদিকে লোকটা শিয়ালের লেইজ ধইরা এমন টান দেয় যে লেইজ ছিঁড়া রক্ত বাইর অইয়া যায়। মারে বাপরে কয়া দশাইলা চিৎকার দিয়া ওঠে শেয়াল। কোনোদিকে আর তাকায় না, ঝাইরা পিট্টা দৌঁড় লাগায়। দূর থেইকা শিয়ালের ওইরকম অবস্থা দেইখা বাঘ আরো জোরে দৌঁড় দেয়। শেয়াল দৌঁড়ায় বাঘও দৌঁড়ায়, শেয়াল মামা মামা কয়া যত জোরে ডাক দেয় বাঘ ততোই জোরে দৌঁড়ায়। ওই সময় ওই রাস্তা দিয়া এক ভালুক যাচ্ছিলো, দূর থেকে বাঘ আর শিয়ালের ওই ভাবে দৌড়ায়া আসতে দেইখা কিছু না বুইঝাই ভালুকও ঝাইরাপিট্টা দৌড় দিলো। বাঘ আর শেয়াল যত জোরে দৌঁড়ায় ভালুক আরো জোরে দৌড়ায়। এভাবে অনেক দূর

www.pathagar.com

যাওয়ার পর প্রথমে ভালুকের সাথে এক সিংহের দেখা। সিংহ ডাক দিয়া কয় এই থাম, কি অইছে কয়া যা, এমন কইরা দৌড়াইতোস ক্যা। ভালুক কয় জানি না কি অইছে তয় বাঘ আর শেয়াল এমন দৌড়ান দৌড়াইত্যাছে আমিও ভয়ে দিলাম এক দৌড়, আপনি যেহেতু আছেন আর কোন ভয় নাই। দেখি ওরা আসুক। কি অইছে শুনি।

সিংহ আর ভালুক রাস্তার মাঝ খানে দাঁড়াইয়া থাকে। এদিকে বাঘ আর শেয়াল দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাঁপাইয়া গেছে। সিংহ আর ভালুকের সামনে আসতেই ওরা ডাক দেয়। এই বাঘ, এই শেয়াল পণ্ডিত কি অইছে কয়া যাও। ভয়ে ভয়ে বাঘ আর শেয়াল থামে। বাঘ যদিও নিজে নিজে বনের রাজা মনে করে তবুও এই মুহূর্তে সিংহকে রাজা স্বীকার করে বলে, আপনি বনের রাজা, কিছু একটা করেন। বনে টিপটিপানি আইছে। আমার কি অবস্থা করছে দ্যাখেন। সিংহ দেখে বাঘের সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গ্যাছে। শেয়ালও দ্যাখায় তার লেজের কি হাল কইরছে ওই টিপটিপানি। সিংহ এসব দেখে নিজেও একটু ভয় পেয়ে যায়, কিন্তু বুঝতে দেয় না। বলে, ঠিক আছে, আমি যখন আছি তবে আর কোন ভয় নাই। চলতো দেখি কোথায় টিপটিপানি। বাঘ কয়, আপনি গেলে যান, আমি আর যামুনা। শেয়ালও যেতে রাজি অয়না। সিংহ অনেক বুঝানোর পরে রাজি হয়। চার জন এক সাথে টিপটিপানিকে দেখতে রওনা দেয়। এদিকে টিপটিপানি বুঝতে পারে যে সবাই মিলে ওকে ধরতে আসতেছে। ভাবে, আর বুঝি রক্ষা নাই। কিন্তু মাথা গরম না করে ঠান্ডা রাখে। এখন যা কিছু করতে হবে তা বুদ্ধি দিয়ে করতে হবে। লোকটা গর্ত থেকে উঠে আবার গাছের আগায় গিয়া বসে থাকে। সিংহ, বাঘ, শেয়াল আর ভালুক গাছের নিচে এসে খুঁজতে থাকে। বাঘ উপরে তাকিয়ে দ্যাখে টিপটিপানি গাছের মগডালে বসে আছে। টিপটিপানিকে দেখেই বাঘ আবার দৌড় দিতে নেয়, সিংহ বাঘকে আটকায়। বলে, ভয় পেলে চলবে না, ওকে ধরতে হবে। আমরা চারজন আছি। কিভাবে ধরবো সেই চিন্তা করে বের করতে হবে। হঠাৎ শেয়াল একটা বুদ্ধি দেয়। বলে, আমরা একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর উঠবো। তাইলে টিপটিপানিকে ধরা যাবে। সিংহ বলে ভাল বুদ্ধি। তাইলে কে কার উপরে উঠবে? বাঘ আগেই বলে বসে যে সে উপরে উঠতে পারবে না, সবার নিচে থাকবে। সিংহ বলে, ঠিক আছে। আমিই সবার উপরে উঠবো। সবার নিচে বাঘ, তার উপরে শেয়াল, তার উপরে ভালুক আর সবার উপরে সিংহ ওঠে। লোকটা খুব ভয় পেয়ে যায়, মনে মনে ভাবে, এবার আর রক্ষা নাই। এবার ধরা পরতেই হবে। মনে মনে বুদ্ধি খোঁজে। একটা বুদ্ধি পেয়ে যায়। ভাবে, এটাই কাজে লাগাতে হবে।

সিংহ, বাঘ, শেয়াল আর ভালুক যখন একজন আর একজনের ঘাড়ের উপর চড়ে বসে তখন লোকটা সিংহের হাতের নাগালের মধ্যে আইসা পরে। লোকটা তখন বুদ্ধি খাটিয়ে বলে, আমি উপরের টাও খামুনা, মধ্যেরটাও খামুনা, আমি খামু নিচেরটা। যেই এই কথা বলছে অমনি নিচ থেইকা বাঘ ঝাইরাপিট্টা দৌড় লাগায় আর উপর থেকে ডাবুস ডুবুস কইরা একটার উপর একটা পইরা হাত পা ভাইঙ্গা যে যার মত পারে এদিক ওদিক দেয় ছুট। লোকটা হাঁপ ছাঁইড়া বাঁইচা যায়। ধীরে ধীরে গাছ থেইকা নাইমা বাড়ির পথে রওনা দেয়। ঘোড়ার কথা আর মনে নাই লোকটির। জীবন নিয়া যে বাঁইচা আসতে পারছে এইটাই অনেক। বাড়িতে আইসা ঘরে ঢুকতে যাবে দ্যাখে যে

www.pathagar.com

তার ঘোড়া উঠানের এক কোনায় শুয়ে আছে। খুশিতে লোকটির চোখ চিক চিক কইরা ওঠে।

আর এদিকে সিংহ, বাঘ, শেয়াল আর ভালুক সেইযে দৌড়াইতে লাগলো আর থামলো না, এখনো তারা দৌড়াইতেই আছে, দৌড়াইতেই আছে।[৪]

৫
টু

আগে মানুষ সখ কইরা ছলপানেকে কোলে কোলে বিয়া করান। এরকম এক বিয়া করাইছে। বিয়া করাইলে বাপ মা দুই জনই মইরা গেছে। ছেলেডা দাদীর কাছে মানুষ। দাদীর কাছে মানুষ হইলেও হইছে বোকা সোকা। ধীরে ধীরে বড় হইছে। বড় হইলে ওয় বেহেই কয় ক্যারে হশুর বাড়ি যাবি না। তয় কয়, আমার আবার শশুর বাড়ি কিসের। তুই জানস না, তোর দাদীক যায়া কস। আইজ একজন কয়, কাল একজন কয়। এ একজন কয় ও একজন কয়। ও হুইনা দাদীক কয়, আমার বলে হশুর বাড়ি আছে। কয় আছে। তালি আমি এল্লা যামু। তহন দাদী কইছে যাবি যখন যা। একদিন দিনক্ষণ দেইখা দাদী পাঁচটো ট্যাহা দিয়া কইছে, হশুর বাড়ি যাওয়ার সময় কিছু, মিছু কিনা নিয়া যাস। তহন ও ভাবছে কিছু মিছু, এডো একটো কোন সদাইয়ের নাম। যেমন আম, কাঁঠাল, লিচু এবা। তো আটে যাইয়া হ্যারা কইছে, ভাই কিছু মিছু আছে। ওতো দোহানদার কয় কিছু মিছু কি? তা তো কননা। কয় না কিছু মিছু। কয় নাই। এই রকম কইরা হারা আট খুঁইজা কিছু মিছু পায় না। এর মধ্যে এক লোক আছিল চালাক, শিয়ান মানুষ। ও একটো 'ফ্যান' (মান কচু) নিছে আটে শ্যালা হেই ফ্যানের কেউ দাম কয় না। তহন ভাই কিছু মিছু আছে। ঐই ব্যাটা মনে মনে চিন্তা করছে এই শালা হইল ব্যাক্কেল ওর কাছেই তো ফ্যানডো বেঁচা না। তো কইছে আছে। দাম কত? পাঁচ টাকা। তখন চিন্তা করছে দাদী ট্যাহাও দিল পাঁচটো, কিনবার দিল কিছু মিছু। হারা আট ঘুরলাম কিছু মিছু নাই। তাইলি ঐ শালা কইল কিছু মিছু আছে, আবার ট্যাহাও কইল পাঁচটো। তাইলি দাদী আমাক এই জিনিসই কিনবার কইছে। ট্যাকা পাঁচটো দিয়া কিছু মিছু নিয়া রওনা হইছে। রাস্তার মধ্যে চিন্তা করতাছে হালা ও হুমন্দির নাইগা খাওয়া নিলাম কেবা জিনিস, স্বাদ বোঝা তা বুঝলাম না। না পাইড়া ফ্যানের মাথা থেইকা কয়েক কামড় খাইছে। যখন খাইছে তহন খাবলা ধরছে গলা, কাঁচা ফ্যান। ধরলি এ পরিমাণ খাবলাই ত্যাছে সোমানে গালে থাব রাইতাছে আর কইতাছে, এ গাল থেইকা ও গালে। এতো কতি কতি হোনা যায়তাছে এ ডাল থেইকা ও ডালে। এ ডাল থেইকা ও ডালে। একটো শিকারী রাস্তার ডালে ঘুঘু শিকার করার নেইগা মানে এইম কইরা নিয়া রইছে। শালা ঘুঘু টিকপো না শালা লাফ দিয়া এ ডালে যায়, আবার লাফ দিয়া এম্মরা যায়। শালা স্থির হইয়া বসতাছে না। একবার এই ডালে আবার ঐ ডালে। তহন ওহ্যান দিয়া যাইতাছে আর কয়তাছে এ গাল থেইকা ঐ ডালে, এই ডাল থেইকা ঐ ডালে। ওর হয়া গেছে মন খুব খারাপ। আমি ঘুঘু শিকার করবার পারতেছি না। হেই জন্য ইয়ার্কী মারতাছোস। না পাইরা বন্দুক দিয়া দুই বারি লাগাইছে। তহন কইছে ভাই তালি আমি কি কমু। বলে তুই এহন যাবি আর কবি, ঘুইরা আইসা ফান্দে পর, ঘুইরা আইসা ফান্দে পর। এ কথা কতি কতি চলল। তে এক লোক আবার যাবৎ জীবন জেল

www.pathagar.com

খাইটা কেবল বাড়ি ফিরতাছে। আইসা বাড়ির লোকজনের দেখা সাক্ষাত কইরা লুঙ্গি, গামছা, সাবান নিয়া বাড়াইছে নদীর ঘাটে গোসল কইরা বাড়িত যাইব। ও গোসল করবার বাড়াইছে এ শালাও নদীর ধারে যাইতাছে আর কইতাছে, ঘুইরা আইসা ফান্দে পর, ঘুইরা আইসা ফান্দে পর। এই কতা হুইনা ঐ লোকের মেজাজ হইয়া গেছে খারাপ। শালা মনে অয় আমাক জেল খানায় দেখছে হেই জন্য আমাক দিয়া ইয়ার্কী মারতাছে। ঘুইরা আইসা ফান্দে পর। তহন আমি কেবল বেড়াইছি আবার ফের ফান্দে আটকামু। না পাইরা ওদিল কয়েক থাপ্পর লাগাইয়া। তালি ভাই আমি কি কমু? এহন যাবি আর কবি, আইজ বড় শুবদিন, আইজ বড় শুবদিন। তে মনে কর যে এই কতা কতি কতি যাইতাছে। রাস্তার ধারে আবার এক বাড়িত ধরছে আগুন। ঐ আগুন দাউ দাউ কইরা জ্বলতাছে। ওহেন দিয়া যাইতাছে আর বাইতাছে, আইজ বড় শুবদিন, আইজ বড় শুবদিন। হেই পাবলিক ধইরা আচ্ছা মত ধলাই দিছে। তে ভাই কি কমু? যাবি আর কবি আর জানি ধরে না, আর জানি ধরে না। যাতি যাতি কইতাছে, আর জানি ধরে না আর জানি ধরে না। কতি কতি করে আর মনে নাই তাই কইতাছে আর জানি আয় না। একলোক আবার একশ একটো পাত্রী দেখছে, তো পছন্দ অয় না বিয়াও অয় না। হেই লোক একশ দুই নম্বর পাত্রী দেহার লাইগা রওনা দিছে। রাস্তায় তার সামনে পরছে, আর জানি অয়না, আর জানি অয় না। তহন এই লোক হুইনা আমারি দেইখা ইয়ার্কী মারস। না পাইরা ওক ধাইরা দুইটো থাপ্পর মারছে। থাপ্পর দুইডা খাইয়া হশুর বাড়ির কাছে আইসা উইঠা গেছে। গেলি তখন ব্যাক ইয়েরা কয় হালা হুমন্দিরা কয় দুলা ভাই কেবা আছেন। কয় "টু"। ঐ যে দাদী কইছে যে, কোকিলের সুরে কথা কইস। না পাইরা যেথাই কয় জামাই কেবা আছস কয় "টু"। যে যাই কয় ব্যাক্কের উত্তর দেয়, জামাই এবা ক্যা। তা বাদে কইছে হোন, উঁচা নিচা দেইহা বসিস। তে আগেকার মানুষ খাইবার দিছে সপে, সেখানে খাইবার দেয় হে কোনে কৈঠা থাকে না। ও মনে করছে উঁচা নিচা দেখা বসিস মানে নিচাত না বসে। ও সপ বাদে দিয়া ঠিলা যে থুইছে তা হরাইয়া কৈটার উপর যাবর দিয়া বইছে। ক্যারে বাপুরে, না আমি এহেনে বসমু। ওর দাদী কইছে হোন, তোর তো খাইবার নিতি হুশ থাকে না। যখন খাইবার দিব তহন আত উত দিয়া না করিস। যখনই থালির মধ্যে ভাত বারবার নয় কয় থাক থাক, নাড়াবো না হইছে। বুচ্ছস পরিবেশ বোঝে নাই। তহন দেখছে শালা একজন পাগল না পাইরা আচ্ছা মত বাইয়াছে।[৫]

৬

ঢুলি

এক ঢুলির বেটাক ল্যাহা পড়াইবার দিছে। এদিকে ব্যাবাক ছাত্র স্কুলে যাইয়া ল্যাহা পড়া করে। অর ঐ ঢুলির ব্যাটা স্কুলে তো যায়ই না পলা টইলা থাইকা বাড়িত আসে। সব পোলাপান পাশ করছে আর ঢুলির ব্যাটা ল্যাহা পড়াই করে নাই গোল্লা দিছে মানে ফেল। তহন ঐ ঢুলির, ঢুলির বউরে কইছে যে, শোন আজকা ছাওয়াল বাড়ি আসলি পারে, ভাত চাট্টো দিও কিন্তু তার পাতের কোণে দিও চারটো ছাঁই। তহন ভাতও দিছে আবার ছাঁইও দিছে, তহন ঢুলির ব্যাটা দ্যাহা হাইরা কইছে আসদিন (প্রতিদিন) মা আমাক যত্ন কইরা ভাত দেয়। আর আজকা দিছে ভাত আবার ভাতের কোনে ছাঁই। কি

www.pathagar.com

ব্যাপার? নারে ভাত টাত খাওয়া বাদ দিয়া থুইয়্যা ও বাড়িত থাইকা পরিত্যাগ করছে। এ দেশেই থাকমুনা। এ দেশেই থাকমুনা। যাইতে যাইতে যাইতে বহুত দূর চইলা গেছে। দূরে যাইয়া মানে রাইত হইয়া গেছে। এক বাড়িত যাইয়া কইছে, কারা বাপুড়ে আমি বিদেশি একজন পোলা মানুষ, রাস্তায় আইসা রাইত হয়া গেছে রাতখ্যান একটু পরবাস থাকবার জাগা দেয়া নাগব। তহন ঐ বাড়ীওয়ালা মাস্টার কইতাছে যে, চ্যাংড়া মানুষ রাইত হইয়া গেছে, আহুন রাইত কইরা কন যাইব। তহন ঐ মাস্টারের মাউ কইতাছেযে, হ্যাঁ তুমি তো জাগাদিবারই পার, জাগা দিলি আবার ভাত দেয়া লাগব। তহন মাস্টার কইতাছে যে, মা পোড়া চাষা ভাত-ভূত যা আছে তাই দেওগা। পথিক মানুষ ঐ খাইয়া থাকবনি। আংগোর মতন কি ডিস কি ডিস খাইব। তহন করছে কি পোড়া চাড়ডো ভাত ঢুলির ব্যাটাকে খাইবার নেইগা দিছে। তাই খাইয়া দিয়া রাইতে শুয়া হইছে। তহন কত রাইত বাদে ঐ যে দুইচার হরফ যে লেহাপড়া করছিল ঐ রাইতে গুনুর গুনুর কইরা পরতেছে। মাস্টারের মাউ কইতাছে এ গ্যাদা রাইতে যে পরবাস থাকল ছেলেডো, ছেলেডো নাহি লেহাপড়া আছে। কয় হ্যাঁ তাই মনে অয়। তালি এক কাম কর। তোমার ঐ মিয়াক ছেলের হাতে বিয়া দেও। ছেলের হাতে স্কুলে যাইব, পরে চাকরি নিয়া দিয়ে পারবা। তালি তোমার মিয়াক বিয়া দেওয়ার কোন চিন্তা ভাবনা করা লাগব না। তহন কয় যে, তাই। হেই ঢুলির ব্যাটার হাতে বিয়া দিছে। বিয়া দিয়া স্কুলে পাঠায়, টিফিন খরচ, যাতায়াত খরচ, ট্যাহা পয়সাও দিয়া দেয়। ঢুলি দেখছে যে, এত তো আমার বাপের বাড়িতে আজীবনও পাই নাই। যে রকম টাকা আর খাওয়া, যে রকম পোশাক আদি এ রকম আজীবনও পাই নাই। সুখের উপর সুখ হইয়া গেল। সুখে ঢুইলা ঢুইলা পরে। এদিকে ব্যাস করে কি জাইতে ঢুলি। প্রতিদিন ব্যাস ঘুমেতে থ্যাক উইঠা ওর বউয়ের গোয়াত চাবুকের মত একটা বাড়ি দেয়। বাড়ি দিয়া ঘরেত থ্যাক বাড়ায়। এ রকম বাইরাতি বাইরাতি, বউয়ের গোয়াত হয়া গেছে ঘাও। তহন মাস্টারের বিটি মাস্টারের মায়েক কইছে দাদী যে দিনতো ভর্তি সে তোমার নাতিন জামাই বারি না দিয়া ঘরেত থেইকা বাড়ায় না। এতদিন আমি কই নাই। আমি তো আর অসহ্য, আমি তো সয়া পারতাছি না, কুলায়া পারিনা। তে তহন ব্যাস করছি কি অরবাস কবরাজ খোঁজা শুরু করছে। ফকির নিয়া আইসা তাক বায় ফকির নিয়া আইসা যাক কয়। যে যাক কয় আমি এন্না ফাতা ফাতা খুব পারি। পাঁচ সের চাউল দেয়া নাগব। ধর পাঁচ সের চাউল তাউ আমার নাতনেক ফাতা নাতা কইরা দেয়া লাগব। এ দিকে ফলে তো আর কিছুই না। যা মনে নয় তাই হোক গা। এ রকম যেই আইসে তাক ট্যাহা পয়সা দেয়। খুবদেয়া দেয়া শুরু করছে। কিছুতেই হেই নাতিনের বাড়ি আর কমত্যাসে না ঘাউ আর কমতেছে না। তে নাতিন কইতাছে দাদী কি চিকিৎসাই কর এন্না করা নাগব আরও বেশি। আরো জোরে বারি দেয়। ঘাউ হইয়া গেছে আস্তে দিলে আরও জোরে লাগে। এবা করতি করতি ঢুলির দ্যাশে থেইকা এক ফকির গেছে। ফকির গেলি পারে এরে বাপুরে ফকিরের ব্যাটা তুমি কি কিছু ফাতা নাতা জান। বলে হ্যাঁ আমি তো কিছু জানি। বলে আমার এই নাতিনেক বিয়া দিছিলাম জামাই যে ঘরে থেইকা বারাতি গোয়ায় বাড়ি দিয়া দিয়া বারায়। তালি চিকিৎসা তো তুমি কইরা পার, তুমি যা চাও তাই দিমু। তহন ঐ ফকির কইতাছে হোন তোমার

নাতিনেক আমনে নিয়া আইস। আমার কিছু ফাতা নাতা আছে কিন্তু হলফ নামা আছে। তো সামনে খাড়া কর। জানে না কিছু সোমানে ডাইনে বায়ে ফু দিয়া হায়রে কয় হোন আমি যে, তোমাক হলফ নামা দিমু হেডো তোমাক মুখস্থ করা নাগব। পারবা? তহন ওর নাতি কয় হ্যাঁ পারমু। বলে "বাড়ি তোমার যাইতা ঢুলি, চ্যাংটা ঢুলি নাম, সুখে থাকতি ভূতে কিলায় কয়া গেছে শ্যাম"। এই রকম কয়া দিলো নাতিন তো মুখস্থ কইরা ফালাইছে। হেই ঢুলির ব্যাটা তো রাইতে বাড়িত আইছে। বাড়িত আসলি পারে মাস্টারের বিটি কইতাছে যে, "বাড়ি তোমার যাইতা ঢুলি, চ্যাংটা ঢুলি নাম, সুখে থাকতি ভূতে কিলায় কয়া গেছে শ্যাম"। সেই কইছে অবি জামাই তো পা পাইরা ধরছে। কইছে খবরদার যা কইলা এক বারই।[৬]

৭

রাজার বিটির নতুন কতার হাস্তর

এক রাজার মিয়া বলছে যে, নতুন কথা যে শুনাইব তার সাথে কাজ বসাইব। তখন এ রকম বহুত লোকজন যায়, সে কথাটাই বলে তহন কয় এ কথা পুরান। লোকজন যাতি যাতি রাজার সমস্ত কয়াতখানা ভর্তি হয়ে গেছে। এমন করতে করতে একজনের ছেলেকে বিয়া করাইছে। ঐ বউয়ের শাশুড়ী তার মিয়াক কইতাছে তোমার ভাই আইতে ঘুরো ঘুরো করে কি কয় এল্লা হুনছেন। তখন ননদ যাইয়া হাইরা মায়েক কইছে হোন কি কাম ভাবি যে ভাইয়ের গালের উপ গাল রাইখা সোমানে গ্যাংরায়ীয়া ঘুম পারতাছে। তখন ঐ শাশুড়ী দেখত্যাছে যে, এই তো ও গ্যাংরা ঘুম পারে এই কারণে আমার ছাওয়াল কাবু হইয়া যাইতাছে। এই বউ আর রাখা যাইব না। তাই আজকা কয় কি কথা কালকে কয় এক কতা এই কতি কতি, তুই এ বউ তাড়াই দে। তহন বউ তাড়াইড়া দিছে। তাড়াইড়া দিয়া ঐ রাজার মিয়াক ও কাজ করবার নিয়া গেছে। গেলি পারে নতুন কথা বলতেও পারে নাই ওক আটকা থুইছে। যে বউতো আছিল হে খালার বাড়ি যাক আর ফুপুর বাড়ি যাইতে ঐ জামাইয়ের বাড়ির বগল যাইতে দেহি কি শাশুড়ী আর শশুর ননদ, দেওর যা কিছু থাকে সব এহাবারে গোষ্ঠী ধইরা ক্যানতাছে। তহন ঐ বউডো দেখত্যাছে আমার তো এই বাড়িত কাজ হইছিল। দেহি কার না কি হইছে, এল্লা দ্যাহা যাই। বাড়ির উপর গেছি হশুড়ী আর হশুড় তার গাল ধইরা কান্দুন নই সে। কয় মা তোমাক দাবড়া দিয়ে আমার বেটা হেই যে, গেছে তাকে আর পাইতাছিনা। এরম কান্দন। কান্দা কাটি কইরা কয় দোআ কইরো, আমার বেটা যদি ফিরা আইসে তোমাক আবার আনমু। তহন ঐ যেয়াডো দেখছে, এ তো ঐ বাজার মিয়াক বিয়া করবার যাইয়া আটকা পইরা গেছে। তহন এ কথা শুইতা হে রাজ তা পোশাক বাইনা ও আবার ফের কাজ করবার যাইব। মিয়া মানুষ হইয়া মিয়া মানুষ কাজ (বিয়া) করবার যাইব। দিয়া রওনা দিছে। যাতি যাতি দ্যাহে যে বিরাট এক এন্দ্রা (কূয়া)। ঘোড়ার উপর থেইকাই এন্দ্রার মধ্যে ফুচকি দিছে, দ্যাহে যে লোক তিন ডো। ক্যারা বাপুরে তোমরা এহেনে। এন্দ্রার মধ্যে থেইকা তুলতে পারি আমি যা কই তা তোমরা শুনবানা। বলে হ্যাঁ একশবার শুনব। বলে হোন এই রাজার বিটিক আমি কাজ করবার যামু। একজনেক বানামু রাজার বিটির খাটের পালনী। আর এক জনেক বানামু রাজার মিয়ার পাশা। আর এক জনেক বানামু রাজার বিটির পায়া। তখন রাজকন্যার মিয়ার সাথে

www.pathagar.com

কাজ করবার আছি। তোমার ঘরে সে ঘাটের পায়া, পাশি আছে তারা কথা কয়বার পারে। আচ্ছা রাজার বিটি খাটের পায়া আমি যে রাজার মিয়াক কাজ করবার আছি। পেছনে সামার মত উত্তর দেয় আমি ১০০% গ্যারান্টি আমি রাজি আছি। ঐ রাজার বিটির পাশী আমি রাজাক বিটিক কাজ করবার আছি তাতে তুমি কি রাজি আছো। আমি ২০০% গ্যারান্টি রাজি আছি। আচ্ছা রাজকন্যাক আমি কাজ করবার আছি তালি ঘাটের পালনী তাতে তুমি কি রাজী আছো। আমি ৩০০% গ্যারান্টি, আমি রাজী আছি। তখন রাজার বিটি দেখত্যাছে এত লোক আমি কয়াত খানায় বন্দী করছি। আমার খাটের পায়া, পাশী তো কতা কয়নায়, আজ যখন পায়া পাশী কতা কয়তাছে। তাহলে এটাই তো নতুন কতা। তহন আর কয়া পারল না পুরান কতা। তহন দেশের মধ্যে ঢোল ডাক দিয়া মল্লা কাজি নিয়ে বিয়া-টিয়া পরায় জামাইয়ের সাথে নিয়া পাঠাইয়া দিল। খানটুক কইরা আসে কয় তোমার বাবার কয় খানা কয়াত খানা আছে। বলে এই রকম এগার ডো। প্রথম কয়াত খানা গেছে যাইয়া ছেঁড়ে দিছে। ওর জামাই নাই। তার পরের কয়াতখানায় গেছে ছেঁইড়া দিছে ওর জামাই নাই। তৃতীয় কয়াতখানায় গেছে দ্যাহে ওর জামাই। তহন ওর জামাইক টান দিয়া ঘোড়ার উপর রওনা হইয়া চলাইলা আসল বাড়িত। ওমকের বেটার বউ ওমকের রাজার বিটিক রাজ জামাতা সাজাইয়া নিয়া আসতাছে। এককারে আইলা আল ছাইড়া দিয়া পুরাতি ছাড়ছে ছল। দেখতি দেখতি সারারাত পোহায়া গেছে হে সুমকা রাজার বিটি কইতাছে নও যাই রাত পোহায় গেল শুইগা। তহন ঐ মহিলা কইতাছে। আমি যা তুমি ও তাই। অর্থাৎ বাতি নাগাও পান খাই।[৭]

৮

পিঁপড়া আর পিপড়ি

পিঁপড়া আর পিপড়ির বউ যাইতেছে। পিপড়ি কইছে যে, আমার যে এল্লা পানি পিপাসা নাগছে। তাইলে পিঁপড়া কইছে নদী যাইয়া পানি খাইয়া আইসেক গা। তে নদীত গেছে পানি খাইবার। দ্যাহে কি ওহেনে একটো হাতি। হাতি পারা দিছে আর পিপড়ি মারা গেছে। মইরা গেলি পরে পিপড়া যাইয়া কইতাছে, এই হাত্তি আমার পিপড়ি যে পানি খাইবার আছিল তুই পারা দিয়া মাইরা ফালাই দিসস। আমার হে পিপড়িকে। হাতির শুঁড়ে কামড় দিয়া দিসে এক ঝাড়ুদার বাড়িত ফালা দিছে। ঝাড়ুদারের বিটি বাইড় বাড়ি ঝাড় দিতাছে, হে দ্যাহে কি তার হ্যানে হাতি পরছে, হে ঝাড়ু দিয়া ঘোট্টা দিয়া এক মাইলানির বাড়ি দিছে। হে আবার মাটি দিয়া খোট্টা দিয়া ঝাড়ুদারের বাড়িত দিছে। একবার এ দেয় একবার ও দেয়। এই নিয়া দুইজন ঝগড়া বাঁধাইছে। দুইজন ঝগড়া করতাছে রাস্তার মধ্যে হোনে কেডো। দ্যাহে কি একলোক বারো বিলের মাছ তেরো ছপের ওরা তাই মাথাত কইরা নিয়া বাজারে বেঁচবার যাইতাছে। তহন ঝাড়ুদার বিটি আর মাইলানীর বিটি কইছে। তুমি এল্লা খাড়া থাইকা আমগোর ঝগড়া শোন তো । তহনকার আমি মাছ বেচবার যাইতাছি। বার বিলের মাছ তের বিলের ঝোপের মধ্যে ওরা। লোকটো কইছে তোমগোর তো ঝগড়া শুনমু আমি তালি না আমার মাছ পঁইচা যাইবনি। তালি এক কাম কর। তোমরা দুই কান্দে দুইজন বসো ঝগড়া কর আমি মাছ বেচমুনি। তে ওরা দুইজন দুই কান্দে উটছে। ঐ খ্যান দেইহা এক গাছে মেলা লাউ

www.pathagar.com

ধইরা আছে, ব্যাক লাউ দৌড়া দৌড়া কইরা ভয়ের ঠেলায় এক লাউ হইয়া গেল। ঐ দেইখা দুই হশুড়ি তাগোর একটো পুকুর আছিল তা ধরা ধরি কইরা ঘরে তুইলা থুইছে। তারপর এক রাজার বাড়ি এক রাখাল অনেক গরু নিয়া আইছে গরু চড়াইবার আইচে। ঐতা দেইখা ব্যাক গরু নেংটিং মধ্যে উঠছে। এক চিল আইসা মাছের ওরা ওয়ালাক ছো দিয়া নিয়া গেছে। রাজার বিটি ছাদে বইসা আছে। হে উপর মিলা চাইছে তার চোহের মধ্যে পরছে। পরলি পারে চোহের মধ্যে কি পরল? একজনেক দ্যাহাইছে একটো কুটা। হেই কুটাডো ফালাইদিছে। দিলি পারে রাজার বাড়ি রাখাল করছে কি ব্যাক গরু বাইর করছে নেংটিং মধ্যে থেইকা। একটো গরুর দ্যাহে কি চোখ কানা। তহন কইছে ক্যারে আমার গরুর চোখ কানা, রাজা না আমাক গাল পারবনি। হেসুমকা নেংটি ডো ঝাঁড়ছে। নেংটির মধ্যে দ্যাহে কি একটো চামুর (উকুন)। রাখাল ঘাউ দিছে চামুরের চোখ কানা কইরা দিছে। হেই চামুর কইতাছে আমার যে চোখ কানা কইরা দিলা, তা আমার চোখ ভালো কইরা দেও। আমি কেবা কইরা তোর চোখ ভালো করমু। কইছে ঐ পাড়ে যে আইড়া বলদ আছে, তারই দুধ আইনা আমাক খিলালি পারে আমার চোখ ভালো হইয়া যাইব। কয় আমি ঐ পারে যামু কেবা কইরা। তিলের ঢোঙ্গার নাউ আর ধানের হোঙ্গের বৈঠা দিয়া তিলের খোগলার নৌকা নিয়ে পার হইয়া যাইয়া। বাইরা বলদের দুধ আইনা চামুকেক খাওয়াইল। চামুক ভালো হইয়া গেল। ওর গরু বাহির কইরা দিল। রাজা বাড়িত গেছে ক্যারে দিনপত্তি সকালে অয় আজও দেরি হইল ক্যা। বলে রাজা মশাই আর কি কমু ব্যাক কাহিনি কইলো। তাই নাহি রে নু ছেন আমি এল্লা যামু। দেহি ছেন আইড়া বলদের দুধ খামু। গেছে রাজা রাজ প্রাসাদ হুদ্দা তিলের ডোঙ্গার নাও আর ধানের হোঙ্গের বৈঠা দিয়া ঐ পাড়ে গেছে। ঐ বলদের দুধ আইনা রাজা আর রাজ প্রাসাদের সবাই মিলে খাইল।[৮]

৯
রুচি নাই

এক লোক উর্ধ্ব নদীতে গোসল করবার গেছে তার মুখে রুচি নাই বলে। তে যাতি যাতি রাইত হয়া গেছে। তে একবার বাড়িত গেছে। কইছে ভাই আমাক এল্লা থাকপার দিবেন? বলে যে ক্যা। আমার তো মুখে রুচি নাই। আমি উর্ধ্ব নদীতে গোসল করবার যামু। গেলি গোসল করলি মুখের রুচি থাকে না। রাইতে খাইবার নেইগা দিছে। দিলে ঐ রুটি নিয়া আইসে নিয়া আসলি পারে পরে ভাজির নেইগা গেছে। আইসা দ্যাহে যে রুটি খাইয়া শেষ। ভাজি থুইয়া আবার রুটির নেইগা গেছে। ভাজি খাইয়া সাব। তে রুটি আর ভাজি একখানে কইরা পারে না। তে সকাল হইছে কইছে তাইলে থাকেন। তাইলে আসি। তহন ঐ লোক কইছে ভাই ফেরার সময় জানি এই রাস্তায় আইসেন না। বলে ক্যা? কয় যে রুচি নাই তাই উর্ধ্ব নদীতে ডুব দিবার চাইতাছেন। রুচি নাই তাই যে অবস্থা অতএব আসার সময় না জানি কেবা হইব। তাই ঐ মোড়া দিয়া ঘুইরা যাইয়েন।[৯]

১০
খুদু মণি রায়

জুরানগঞ্জ যায়।

www.pathagar.com

শাকের মামু তালুকদার
লবণ সরদার।

এক দেশে আছিল এক রাজা। হেই রাজাও গরিব। গরিবতো রাষ্ট্রর ভার নিছে। এক প্রজারও খাইবার নাই। তে তহন রাজার কাছে আইসা নালিশ করছে। তে রাজা মশাই আমার তো ঘরে খাইবার নাই। তে না রাজা উপদেশ দিতাছে খ্যাত খামারে কাম কইরা তুমি এহন এভাবে চল। এম্মরা রাজার বউ খুদ ভাজছে শাক ভাজছে। রাজা মশাই খায় নাই। তো এম্মরা জুইরা হেম মইরা দিয়া যায়। তালি এখন ওক (রাজাকে) ডাক দিব কেডো। পর্দার আড়াল থাইকা ডাকত্যাছে। খুদু মণি রায়, জুরানগঞ্জে যায়, শাকের মামু তালুকদার লবণ সরদার। প্রজারা বেহেই হুনছে। তে রাজার মশাই চইলা গেছে। আধা ঘণ্টা খানেক দেরি হইছে। এম্মরা প্রজারা আছেই। তে রাজা এখন খাইয়া দাইয়া রাজ দরবারে আইছে। রাজার আবার দাড়ি আছে। তো দাড়ির হাতে দুই তিনডো খুদ ভইরা আছে। তে প্রজারা যাইতাছে। আপনের বউ এই কইলো আর আপনি চইলা গেলেন কি করলেন। আমরা মানে তো কিছু দিশা পাইলাম না। তয় রাজা কইতাছে মানে দিশা পাও নাই। প্রজারা কয় না। তাহলে মানেতো আমি কই। আমার বউ আজকা শাক ভাজছে খুদ ও জুরাইত্যাছে শাক ও জুড়াইতাছে তালি কি ভালো লাগবানি। তাই আমার বউ আমাক ডাক দিব কেবা কইরা। তে কইতাছে খুদু মণি কয়, জুরানগঞ্জ যায়, শাকের মামু তালুকদার, লবণ সরদার। তাই রাজার কাছে আমরা কি চামু। রাজাই খাইয়া আসল শাক ভাজা আর খুদ ভাজা। তাইলে রাজা আমাগোর কি দিব। তাইলে এহন রাজ দরবার ভাঙ্গা গেল।[১০]

১১

বিল্লী ছে বিল্লী গায়া
কুইচকা যে মার গায়া।
আগামী পিছারী হে?
বলে হে
বাগন কাইটা থুইত।

রাজার খাইবার মনে নইছে হইল কুইচা মাছ। একটো কুইচা মাছ নিয়া আইসা কুইটা হায়রা ছিকার উপরে থুইছে। শালা বিলাই তো আইসা খায়া ফালাইছে। তে বিলাক দিছে দাবাড়। দ্যাহে দুই তিনডো মাছ আছে। তে রাজাক যাইয়া কইতাছে রাজা মশাই বিল্লী ছে বিল্লী গায়া, বিলাই আইসা কুইচা খায়া গেছে। রাজা প্রশ্ন করতাছে আগারী পিছারী হ্যাঁয়। বলে হ্যাঁ। বাগন কইটা থুইওগা মানে ঐ দিয়া বাগুন দিয়া ভাজগা।[১১]

১২

ফাটাফুটার গপ্প

একদেশে আছিল তিন কুমার। তারবাদে দুইডো হইল কামার আর একটো চোখে দেখে না। যে চোহে দ্যাহে না হে বানাইল তিনডো পাতিল। দুইডো পাতিল হইল ফাঁটাফুটা

আর একটোর তলি ফাঁটা। যে ডোর তলি নাই হেইডোত চড়াইল চারডো ভাত। দুইজন খাইলই না আর একজন পাইলই না। আর যে পাইল না হে বানাইল তোমার মাছ মারইনা তৈরা জাল। দুইডো জাল ফাঁটা ফুটা একটো জালের পাশ নাই। এই তিনডো জাল নিয়া রাজারবাড়ির সামনে আছিল তিনডো পুহুর। পুহুর হইলগা দুইডো তলীত পানি নাই আর একটোত ধুলাবালি। জাল তিনডো ফালাইলি পরে যেডোত পাশ নাই হেই ডোত উঠল বড় বড় তিনডো রুই মাছ। দুইডো লাফাতি লাফাতি গেল আর একটো ধরবারই পারল না। যেডো ধইরা হারল না হেইডো হাটে নিয়া বেঁচল তিন ট্যাহা। দুই ট্যাহা ফাটাফুটা আর এক ট্যাহা কাজই নাই।[১২]

১৩

রাজার হাস্তোর

এক রাজার এক ছেলে হইল। ছেলে হইলে পারে ছেলে দেইখা রাজা খুব খুশি। তারপরে আবার হইল কি, এক জোড়া কবিতর, কবিতর হইয়া উইড়্যা গেল। তারপরে হইল কি এক জোড়া ইন্দুর, ইন্দুর হয়া খামার মধ্যে গেল। আবার এক আইড়া গরু হইল। রাণী মইরা গেল। রাণী মইরা গেলি পারে রাজা আবার বিয়া করল। বিয়া করলি পারে সৎ মাও। সৎ মাও ঐ ছেলেকে দেখতে পারে না। সৎ মায়ের আর দুইডা ছেলে হইল। ঐ ছেলেগোরে ভালো ভালো জিনিস পাতি খাওয়ায়। আর ঐ ছেলেটাকে খাইবার কিছু দেয় না। ছেলেটা শুইখ্যা একাবারে ই হইয়া গেল। ঐ গরু রাখপার দেয়। গরু নিয়া চড়াইবার যায়। মায়ের পেটে যে গরু হইছে সেইটা নিয়াটিয়া খাওয়ায় আর পালে। একদিন ঐ ছেলেটা কানত্যাছে। তাই আইড়া হোস করছে, ভাই তুমি কান্দ ক্যা? ভাই কি হইছে। কয়, আর কি কমু, মাও মইরা গেছে আমাক কি ঠিক মত খাইবার দেয় না। ভালো ভালো জিনিস সব ঐ ভাইয়ে গোরে খাওয়ায়। আমাক পোড়া চাষা ইতু কইরা ভাত দেয়। ভাই তুমি কইন্দ না ঐ জঙ্গলের মধ্যে দ্যাহগা একটা গাছ আছে। হেই গাছে দ্যাহগা একটো ফল ধইরা আছে। লাল টুকটুকা ফল, ঐ ফল পাইরা তুমি খাওগা। খুব মিষ্টি, খুব স্বাদ। তো জায়া ফল পাইরা পাইরা খায়। ফল খাইয়া ওর পেঁট ভইরা যায়। আর ওর সৎ মা দ্যাহে যে পোড়া চাষা ভাত দেই তাও এত সুন্দর মোটা সোটাই হইয়া গেছে। তো কাজের বুয়াকে কইছে যে, দ্যাহা আয় ও কি খায়। কাজের বিটি দ্যাহে কি জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া ফল পাইরা ফল খাইতাছে। কামের বুয়া যাইয়্যা রাণীর কাছে কইয়া দিছে। রাণী কইছে যে, সকাল বেলা বাশি ছাই তুইলা নিয়া গাছের গোরে দিবি। যায়া কইবি ফল তুমি সত্যকার ফল হও, তোমার মধ্যে ছাই হইয়া যাও। পরের দিন খাইবার নিয়া দ্যাহে যে ফল ভাঙ্গে ওর মধ্যে দেখে যে ছাই। সেজন্য সকাল হইল হেই জন্য ফলের নাম হইছে মা ফল থেকে মাকাল ফল। আইসা আবার কানত্যাছে। আইরা কয় যে, কি ভাই কান্দস ক্যা, বলে আমি যে ফল পাইরা খাইলাম আজকা ফল পাইরা দেহি যে, ফলের মধ্যে ছাই। তুই কান্দিস না। তুই কিনা আমার এক শিঙ্গা ধইরা ঝাঁহি দিবি। এত বড় বড় ভোগ নাড়ু পারি ঐ তা খাবি। আর এক শিঙ্গা দিয়া ঝাঁহি দিবি একটো কইরা ফল বাড়াইব এইডো হইল টিয়াস নাড়ু খাবি তাই আর পানি পিপাসা নাগব না। তাই করছি কি। শিঙ্গা ধইরা ধইরা ঝাঁকায়। ঝাঁকালি

পারে এক শিঙ্গা দিয়া ফল পরে ভোগ নাড়ু, আর এক শিঙ্গা দিয়া ঝাঁহি দ্যায় ফল পরে টিয়াস নাড়ু। এক শিঙ্গার তা খালি পেট ভরে আর এক শিঙ্গা দিয়া পানি দিয়া প্যাট ভইরা যায়। রাণী ওকে দেখে বলে কাজের বুয়া দেহিস চ্যান কি সুন্দর ফলের মধ্যে ছাই আছে তারপর ওর না স্বাস্থ্য ফিকা উঠত্যাছে। ঐ কি খাইরে। কামের বুয়া আড়াল থাইকা দ্যাহে কি শিঙ্গা ধইরা ঝাঁকি দেয় আর ফল পরে ঐ তাই খায়। রাণীর তো প্যাটের মধ্যে গেল সাপ। ওক তো জবো করমু আইড়া গরু ডোক। রাণীর ব্যারাম হইল খাটের নিচে সোলা বিছাইয়া হাড় মুচমুচি ব্যারাম হইল। রাজা ডাক্তার, কবিরাজ কতকিছু দ্যাহাইতেছে মা হাড় মুচমুচি ব্যারাম। উ কইরা আর হাড় মুচমুচ করে। কি অসুখ হইছে কত ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য কত কিছু আনত্যাছে, রাণীর ব্যারাম হারে না। রাণীর ব্যারাম হারে না এক কবিরাজকে কইয়া দিছে যে, ঐ আইড়া গরু দিয়া মেজবানী দিলি পারে লোকজনকে খাওয়াইলে রাণীর অসুখ হারবো। তাই শুইনা রাজা কইছে তাই হোক। তাই আইড়া জবো করবো। সব লোকজন দাওয়াত দিছে, ও সব মসল্লাাতি, গুড়া ছাতু কইরা আইড়া জবো করবো। তাই ভাইতো শিঙ্গা ধইরা ক্যানতাছে। তুমি আমাক তো মা নাই, বাপ ও তো দেখবার পারে না। তুমি যে আমাক ভোগ নাড়ু দিছো তাই তোমাক জবো করত্যাছে। তুই কান্দিস না থাক আমি ব্যবস্থা করত্যাছি। সব লোকজন জিয়াফত দেয়া বাড়ি ভর্তি মানুষ অহন আইড়া জবো করব। আইড়াকে কিছু তেই পাইড়া পারে না। আইড়া লাফাইয়া উঠে। কত লোক ধরে আইড়া কিছুতেই পাইড়া পারে না। তো ভাইক কয়া দিল আমাক তো জোয়ান আইড়া হয়া গেছি কিন্তু কিছুতেই আমাক পাইড়া পারব না। তখন তুই কবি যে আচ্ছা আমি এল্লা দেহি ছেন। আইড়া পাড়বার পারি কিনা। তহন আস্তে ভাইডো আইড়ার শিংডো ধরছে। আইড়া ভরা মেজবানীর মধ্যে থেইক্যা উইড়া যাইতে যাইতে এ দ্যাশ থাইকা অন্য দ্যাশে চলে গেছে। গেলি পারে আর এক দ্যাশের রাজা বাড়ীত যাইয়া কইছে আমাদের একটু আশ্রয় দ্যান। ঐ রাজা আবার খুব নরম স্বভাবের ছিল। কিন্তু ঐ রাজার বাড়ীত থাকত এক নাপিত যে খুবই শয়তান ছিল। সে রাজার বাড়ীত ওরা থাকুক সেইটা পছন্দ করতাছিল না। তো রাজাক নাপিত তো বুদ্ধি দিল যে, ঐ ছেলেটাকে আপনি চাল, ডাল, সরিষা আর ধান একসাথে কইরা দ্যান যাতে ও দুপুরের মধ্যে যদি না বাছপার পারে তাইলে ওগোড় বাড়ি থেকে যাইবার কইবেন। রাজা তাই করে। এহন ভাইতো ক্যানতাছে। তহন আইড়াডো কয় ভাই তুই ক্যানতাছোস ক্যান। কয় যে, এই রকম ব্যাপার ঘটতে এত তাড়তাড়ি আমি কেবা কইরা এত কাজ করমু। আইড়াডো কয় ভাই তুই কান্দিস না। আমাগোর মায়ের প্যাটে থেইকা যে কবিতর হইছে হেই, তাগোর আবার মেলা বাচ্চা টাচ্চা হইছে হেরাই এসব কাম করমুনে। তুই চিন্তা করিস না। তার কাছে কবুতরের ঝাঁক আইসা চাল, ডাল, সরিষা আর ধান আলাদা আলাদা বাইছা তুইছে। তারপর রাজা আইসা দ্যাহা যে সব কাজ ঠিকমত করছে। আবার নাপিতের মাথায় একটো বুদ্ধি আইসল কেবা কইরা ওক হারান যায়। আবার কইলো কি অন্য দ্যাশের রাজার ষাঁড়ের সাথে আইড়াডোর লড়াইয়ের আয়োজন করল। ভাইডো আবার ক্যানত্যাছে। আবার যদি আইড়াডোর কিছু অয় তাইলি ও কি নিয়া থাকবো। আইড়াতো কইত্যাছে ভাই তুই চিন্তা করিস না আমাগোর যে ইন্দুর ভাইরা আছে তারাই

www.pathagar.com

সব ব্যবস্থা করব। প্রতিযোগিতার দিন অন্য রাজার ষাঁড়ের ওহেনে মাটি কাইটা ইন্দুর মাটি আগলা কইরা থুইছে। আর আইড়াডোর ওম্মরা মাটি শক্ত। যেই ষাঁড়ডো লড়াই করবার আইছে তহনি মাটি ঝপঝপ কইরা পইরা গর্তের মধ্যে পইরা গেছে। তাও কোন কাম হইল না। তাই নাপিতডো রাজাক কইছে আপনের বাপ মাও তো ঐ পুকুরের মধ্যে। তাইলে ঐ ছেলেডাকে কন যে, সে যেন আপনার বাপ মায়ের সাথে দেখা কইরা আসে। তখন ভাইডো শুইনা কইছে ভাই তুই কান্দস ক্যান। কিছুই হইব না। তারপর ছেলেডো পুকুরের মধ্যে ঝাপ দিছে। এদিকে আইড়া ডো তার যে ইন্দুর ভাইরা ছিল তাদের দিয়া একটো সুরঙ্গ তৈয়ার করছে ঐকেবারে ঘরের মধ্যে পর্যন্ত। তার পর ভাইডো পুকুরের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকে তিনদিন খিল আটকা আছিল। আর ভোগ নাড়ু আর টিয়াস নাড়ু খাইয়া তিনদিন পর বের হইছে। তারপর ভাইডো রাজা মশাইকে কইছে আপনার বাবা মা তো ভালো আছে কিন্তু আপনার বাপের দাড়ি মোছ মেলা হইয়া গেছে, তাই একজন নাপিতকে পাঠাইতে কইছে। তারপর রাজা মশাই তাদের বাড়িতে যে নাপিত ছিল তাকে পাঠাইয়া দিছে। নাপিত আসলে অন্যায় করছিল তাই তার শাস্তিও পাইছে। কারো খারাপ করলে তার নিজেরও খারাপ অয়। তারপর ভাই আর আইড়াডো সুখে শান্তিতে বাস করতে থাকল।[১৩]

১৪

লেখনের বন্ধু খইটা, সেখানে চন্দ্র বালি সেখানে কৈইটা

এক রাজার বাড়ি একটো চাকর থাকছে। চাকরের নাম ছিল কৈইটা। রাজার একটো বিটি আছে। চন্দ্রের বালির শিয়ানা বড় হয়ে গেছে। বিয়া টিয়া আসে না। রাজার বিটিকে কেডো বিয়া করবো। এবা সেবা বিয়া তো রাজার বিটির আসবো না। আর তাই রাজার বিটি ঘরে জুবক্ষা হইয়া থাকে। তে কটুয়া (কৈইটা) গোলান দিন পরতি গরু রাখবার যায়। চাকর মানুষ এখন গরু রাখে। রাজার কথাবার্তা কৈইটার সাথে। প্রত্যেকদিন গরু নিয়া সকালে যায় আবার সকালে ফিরা আসে। রাজার বিটি জিজ্ঞাস করে কটুয়া কোনে গেছিলি রে? গরু রাখবার গেছিলাম। প্রত্যেকদিন হোস করে এই কালকা এত দেরি কইরা আসলি ক্যা। এ কটুয়া ক্যালকা এত দেরি কইরা আসলি ক্যা। বলে দিদি মনি আর কয়েন না আমার গরু গুনান বাতান ধইরা, আমার গরু সব ছত্রভঙ্গ কইরা পাহাড়ের কাছে গেছিল। পাহাড়ের কাছে গরু আনবার গিয়া দেহি কি এক লোক সোমানে এ গাছের বাকল ও গাছের বাকল দিয়ে বিনি গ্যাতত্যাছে। আমি যে চাইয়া চাইয়া তা দেখলাম। দেইহা হাইরা আমার সখ হলো আমি জিজ্ঞাসা করলাম এন্না গাতেন ক্যা। তাই আমি জিজ্ঞাস করলাম আচ্ছা এক গাছের বাকল দিয়ে আর এক গাছের বাকলের সাথে বিনি গাথতাছেন এডোর কারণ কি করে সাথে কার বিয়া হইব তার জোড়া বাঁধতাছি। রাজার বিটি কইলি পারে, এই কৈটলা শোন, কালকা যাইয়া হোস করবি যে আমার কার সাথে জুড়ি আছে। ওই কইয়া দিচ্ছে দিলে পারে, হে পাহাড়ের কাছে যে গেলি পারে দ্যাহে যে জুড়ি বাঁধছে। হোস করছে যে আচ্ছা রাজার বিটি যে চন্দ্র বালি আছে তার সাথে কার বিয়া হইব। তো কইছে যে, দেখনের বন্ধু ঘইটা, সেখানে চন্দ্র বালি সেখানে কৈইটা। ওর নাম তো কইটা। ইয়া আল্লা চুমকা

www.pathagar.com

হইছে। আমি রাখাল গরু চড়াই আর আমার সাথে রাজার মিয়ার বিয়া হইব। ওই কইলি পারে ও আইসা রাজার বিটিক কয় নাই। পরের দিন রাজার মেয়ে জিজ্ঞাস করছে তুই কি গেছিলি। কৈইটা উত্তর দেয় না দিদি যাই নাই। কয়েক দিন গেছে আবার হোস করছে। তখন কৈইটা উত্তর দিছে হে মনেই নাই। কয়দিন ধরে কইতাছি কস না ক্যা। তো ঐ কেবা কইরা কইবো। তো একদিন রাজার বিটি পুকুর পাড়ে দাসীরা নিয়া ত্যাল মাখায় দিত্যাছে, কইটা যাইতে ছিল। তো রাজার মিয়া কইতাছে ঐ কৈইটা শোন শোন বলে কি আমার কথা হোস করস নাই। কয় যে করছিলাম। বলে কি কইছে। হে তখন মাথা নিচা কইরা কইছে যে, দেখনের বন্ধু খইটা, সেখানে চন্দ্র বালি সেখানে কৈইটা। হারামজাদা কি কইলি। ঐ কইছে তাই ত্যালের কইটা দিয়া ঢ্যাল দিছে। দিলি পারে ঔর (কৈইটার) কপালে কাইটা গেছে রক্ত বাড়াইত্যাছে। ভয়ের চোটে সোমানে দৌড় পারতে পারতে অন্য রাজ্যে চলে যায়। যাইতে যাইতে হয়রান হইয়া একটা গাছের নিচে বইছে। গাছের কাছে দেখে কি কত গুলা লোক ক্যানতাছে। হেই লোক গুলা জিজ্ঞাস করতাছে তোমার বাড়ি কোথায়, দ্যাশ কোথায়? কয় যে আমার বাড়ি ঘরও নাই, দ্যাশও নাই। আমার বাপ মাও কিচ্ছু নাই। আমি এক যাযাবর। হেইখ্যান থেইকা চইলা আসত্যাছি তখন ওকে ধরে নিয়া গেছে। ঐ দ্যাশের এক রাজা নিঃসন্তান, ছেলে পিলে নাই। সেই রাজা আবার অসুখে শয্যা কক্ষ। কিন্তু এত বড় রাজ্য কে চালাইবে। তো ঐ কৈইটা ছিল সুন্দর, মোটাকাটা আর নাদুস নুদুস হইছে। হেই লোকরা ওকে নিয়া গেছে রাজার কাছে। নিয়া গ্যালি রাজা ওকে পছন্দ হইছে। গোসল টোসল কইরা রাজার পোশাক পইরা দিছে। তখন রাজা দেইখা ওরে রাজা বানাইয়া দিছে। রাজা তহন তার প্রজাদেরকে বলল একি আমার রাজত্ব দিয়া দিলাম ওকেই রাজা বানাইলাম। রাজার রাজত্ব দিয়া দিছে, সে রাজা হইছে। তখন রাজা বিয়া করেন নাই। তখন কইছে বিয়া করেন। পাত্রী পাওয়া যায় কোথায় পায়। ঐ দেশের ঐ রাজার সাথে ঘটকালি করছে। এতদিন কোন খোঁজ খবর নাই। তাই রাজা কৈটলীর সাথে রাজার মেয়ের বিয়ে দিছে। রাজারও ঐ রাজার রাজত্ব দেইখা পছন্দ হইছে। বিরাট সম্পত্তির মালিক বিয়া দিছে। তারপর তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকল।[১৪]

১৫

মহাচুদুর কেচ্ছা-কাহিনি

রাজার পুত্র, উজিরের পুত্র, নাজিরের পুত্র এবং কোতোয়ালের পুত্র সবাই রাজার বাড়ির পুকুরের পারে বসে পাশা খেলছিল। ইতোমধ্যে একজন গোয়ালা দই নিয়ে তাদের নিকট দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। রাজার ছেলে তখন গোয়ালাকে বলছিল, আপনার ভাড়ে কি? গোয়ালা বলছিল ভাড়ে আমার দই। তখন উপস্থিত চারজনই গোয়ালাকে বলছিল আমাদের সবাইকে দই দিয়ে যান, আমরা দই খাবো। গোয়ালা তখন বলছিল এ দই দেয়া যাবে না, এ দই বায়নার দই। তারা চারজন গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলো দই কোথায় বায়না হয়েছে? গোয়ালা বললো এ দই মহাচুদুর বাড়িতে বায়না হয়েছে। তারা চারজন তখন বলছিল মহাচুদুর চেয়েও বড় চুদু আমরা তাই আমাদের দই দিয়ে যান। এমতাবস্থায় তারা চারজন দইয়ের ভাড় টেনে ধরলে গোয়ালের সাথে তাদের

www.pathagar.com

ভাড় টানাটানির এক পর্যায়ে তা ভেঙে যায়। গোয়ালা তখন রাজার বাড়িতে গিয়ে রাজার নিকট বিচার চাইলেন। রাজা তখন গোয়ালের নিকট বিস্তারিত সবকিছু শুনে ঐ চারজন গোয়ালাকে ধরে রাজ দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য আদেশ দেন।

প্রথমেই রাজপুত্রকে ডেকে পাঠালেন এবং রাজা জিজ্ঞাসা করলেন বাবা তুমি কেন গোয়ালের ভাড় ভেঙ্গেছো এবং নিজেকে মহাচুদুর চেয়ে বড় চুদু বলেছো? তা বুঝিয়ে বল। রাজপুত্র তখন বলল বাবা আপনি আমাকে বিয়ে করানোর পর এক জোসনা রাতে বউ আমাকে বলে, তুমি আমাকে ভালবাসে না, আমি বলি তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। তখন সে বলে তুমি যদি আমাকে অত্যন্ত ভালবেসেই থাকে তাহলে এখনি আমাকে আমার বাবার বাড়ি নিয়ে ঘুরিয়ে আনতে হবে। আমি তখন বউকে সাজতে বলি, সে তখন গায়ে আলতা মেখে সাজিয়ে গুছিয়ে নেয় এবং আমরা উভয়ই রওনা দেই। পথিমধ্যে পানি পার হতে হয়, পানি পার হতে গিয়ে আমি বউকে আমার কাধে উঠাই এবং এক পর্যায়ে পানি বেশি অনুভূত হওয়ার জন্য তাকে মাথা নিচের দিকে এবং পা দুটি উপর দিকে করে পার করতে থাকি, সে পারাপারের মাঝরাস্তায় গিয়ে নড়াচড়া করতে থাকে, আমি তখন বলি নড়াচাড়া করোনা সব ঠিক আছে, তোমার পায়ের আলতা ঠিক আছে। এক পর্যায়ে পানি পার হওয়ার পর অপর পারে গিয়ে দেখতে পাই সে মারা গিয়েছে। আমি যদি তাকে মাথা উপর দিকে এবং পা নিচের দিকে নিয়ে পারাপার করতাম তাহলে তো তার এ অবস্থা হতো না, তাই আমি নিজেকে মহাচুদুর চেয়ে বড় চুদু মনে করি।

অতঃপর ডাকা হলো উজিরের পুত্রকে। তাকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কেন নিজেকে মহাচুদুর চেয়ে বড় চুদু মনে করলে? উজিরের পুত্র তখন বললো, আমি প্রথম বিয়ে করি, বাবা আমাকে সখ করে আরেকটি বিয়ে করান। কিন্তু দুই বউ একদিন আমাকে বলে তুমি ছোট বউকে ভালবাসো, অপরদিকে ছোট বউ বলে আমি নাকি বড় বউকে ভালবাসি। কিন্তু আমি বলি না আমি তোমাদের দু'জনকেই সমান ভালবাসি। আমি একদিন দুজনকে দুই বগলতলা নিয়ে উপরের দিকে মুখ করে শুয়ে আছি, তখন উপরে বাঁধা ছিল মধুর বোতল, ওই বোতলে পিঁপড়া এবং ডাই ঢুকে এক পর্যায়ে বোতল ছিদ্র করে পিঁপড়া এবং ডাইসহ মধু এসে আমার ঠিক চোখের উপরে পড়ে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি আমার চোখের উপর থেকে তাদের সরিয়ে দিতে পারিনি। কারণ যদি ডান হাত দিয়ে পিঁপড়ে এবং ডাই সরিয়ে দিতাম তাহলে বাম হাতের বগলে যে বউ শুয়েছিলো সে মনে করতো তুমি আমাকে ভালবাসো না, অপরদিকে বাম হাত দিয়ে পিঁপড়া এবং ডাই যদি সরিয়ে দিতাম তাহলে ডান হাতের বগলে যে বউ শুয়ে ছিলো সে মনে করতো তুমি আমাকে ভালবাসো না। তাই উভয়ের ভালবাসাকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে গিয়ে আমার দুটি চোখই নষ্ট হয়ে গেল এবং আমি অবশেষে অন্ধ হয়ে গেলাম। আমি যদি একটা হাত দিয়ে পিঁপড়া এবং ডাই সরিয়ে দিতাম তাহলে আমি হয়তো অন্ধ হতাম না, তাহলে এখন বোঝেন আমার মতো মহাচুদু আর কে আছে? আমি তাই নিজেকে মহাচুদু মনে করি।

এরপর ডাকা হলো নাজিরের পুত্রকে এবং বলা হলো তুমি কেন নিজেকে মহাচুদুর চেয়ে বড় চুদু বলে মনে করো? সে তখন বললো আমি প্রতিদিনই অনেক রাত করে

www.pathagar.com

ঘরে ফিরে যাই। একদিন রাতে তাই আমার বউ খাবার খেয়ে আমার খাবার টেবিলের উপর রেখে শুয়ে পড়ে। আমি গিয়ে দেখি টেবিলের উপর খাবার, অতঃপর আমি খাবার খেয়ে বিছানায় ঘুমাতে যাই এবং বউকে দরজা দিতে বলি। বউ বলে আমি দরজা দিতে পারবো না, তুমি দরজা দিয়ে এসো। উভয়ের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে কেউ দরজা দিতে রাজি হয় না। পরে সিদ্ধান্ত হয় দুজনের মধ্যে যে আগে কথা বলবে সেই দরজা দিবে। তাই ঠিক হয় এবং ঐ রাতে চোর এসে ঘরের যাবতীয় কিছু চুরি করে নিয়ে যায় এবং এমনকি তাদের পরণের কাপড় পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়। অবশ্য তারা সবাই তা দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তারা কথা বলছে না। কারণ যে আগে কথা বলবে তাকেই দরজা দিতে হবে। পরদিন সকালে মা এসে তাদের দরজা খুলতে বললে তারা বলে আমরা দিগম্ভর অবস্থায় আছি, অতঃপর মা তাদের কাপড় চোপড় দিলে তারা ঘর থেকে বের হয়। যদি তাদের যে কেউ ঘরের দরজা দিতো তাহলে তাদের ঘরের মধ্যেকার জিনিস পত্র হারাতো না এবং তারা দিগম্ভর হতো না। তাই নাজিরের পুত্র উক্ত কাজের জন্য নিজেকে মহাচুদুর চেয়েও বড় চুদু মনে করেন।

এরপর ডাকা হলো কোতোয়ালের পুত্রকে এবং বলা হলো তুমি কি ভাবে নিজেকে মহাচুদুর চেয়ে বড় চুদু মনে করো? কোতোয়ালের পুত্র বললো, মা আমাকে দীর্ঘদিন হল বাণিজ্য করার কথা বলে। আমি অবশেষে রাজি হই এবং একদিন বাণিজ্যে যাই। বাণিজ্য করার তিন দিন পর যেসব লোকজন বাণিজ্যে গিয়েছিলো তারা অনেকেই বাড়ি ফিরে যায় এবং তাদের কেউ কেউ বলে তুমি নৌকায় থাকো আমি বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর তুমি বাড়ি যাবে। অতঃপর তারা ফিরে আসার পর কোতোয়ালের পুত্রকে বলে এবার তুমি বাড়ি যাও তোমার একটা সুখবর আছে। খবরটা হলো, তোমার বউয়ের পুত্র সন্তান হয়েছে। তখন কোতোয়ালের পুত্র খুশি মনে বাজার থেকে ২০ কেজি মিষ্টি এবং ছেলের জন্য কিছু কাপড় চোপড় কিনে বাড়ির উদ্দোশ্য রওনা হয়। অতঃপর বাড়িতে এসে দেখে মা উঠানে দাঁড়িয়ে আছে ছেলের অপেক্ষায়। উঠানে এসে মাকে দেখে ছেলে জিজ্ঞাসা করে মা কেমন আছে? মা বলে বাবা ভালো আছি, তোমার মাথায় কি বাবা? ছেলে বলে আমার মাথায় মিষ্টি, মা বলে এতো মিষ্টি কেন তুমি কিনেছো? ছেলে তখন বলে কেন মা আমার বউয়ের নাকি পুত্র সন্তান হয়েছে ? সে কথা বাণিজ্য করার জন্য যারা আমার সাথে গিয়েছিলো তারা বললো। মা বললো বাবা তুই কি বলিস, তুইতো বিয়েই করিশনি, তোর আবার পুত্র সন্তান হবে কি করে। ছেলে তখন তার মাথা থেকে মিষ্টির হাড়ি ফেলে দেয় এবং নিজেকে একজন মহাচুদুর চেয়েও বড় চুদু মনে করে। কারণ সেতো বিয়েই করেনি। তার পুত্র সন্তান হবে কি করে।[১৫]

১৬

পুরো পরিবার কানে না শোনার কাহিনি

এক পরিবার বাবা, মা, মেয়ে, ছেলে এবং ছেলের বউকে নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে ছেলে একদিন বাড়ি থেকে নিজের জমি চাষ করার জন্য মাঠে যায় এবং জমি চাষ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ঐ জমির পাশ দিয়ে এক পুলিশ হেটে যাচ্ছিল গ্রামে কোন এক মাতব্বরের বাড়ির উদ্দেশ্য। পুলিশ চাষরত ছেলেকে জিজ্ঞাসা করে এই ছেলে অমুক মাতব্বরের বাড়ি যাবে কোন রাস্তা দিয়ে ? তখন উত্তরে ছেলেটি বলে আমার এ দুটির

www.pathagar.com

গরুর একটি আমার বাড়ীর এবং অপরটি আমার শ্বশুর মশাই দিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ছেলেটি মাত্র কয়েকদিন আগে বিয়ে করেছে এবং সে উপহার হিসেবে শ্বশুর বাড়ি থেকে একটি গরু পেয়েছে। অতঃপর পুলিশ ছেলেটির নিকটে গিয়ে আবারও একই কথা জিজ্ঞাসা করলে ছেলেটিও একই উত্তর দেয়। তখন পুলিশ মনে করে যে ছেলেটি হয়তো তার সাথে তামাশা করছে তাই পুলিশ রাগ করে ছেলেটির নিতম্বে বা পাছায় একটি বেত্রাঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি জমিতেই হালচাষ রেখে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং বাড়িতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলে তোর বাবার দেওয়া গরুর জন্য আজ আমি পুলিশের হাতে মার খেলাম, তাই তোকে আমি এ বাড়িতে আর রাখবো না। ছেলে এবং তার বউয়ের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছেলের মা এসে হাজির হলে ছেলের বউ তার শাশুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলে দেখেতো মা সর্বনাশা বলে কি আমি নাকি যে জাউ রান্না করেছি তাতে নাকি লবণ দেই নাই। একথা শুনে kvïwo বলে আশুক সর্বনাশা স্বামী কাল করালো ছেলেকে বিয়ে আর আজকেই তার ছেলের বউ সুতা কাবাশের নিকাশ চায়। ইতোমধ্যে ছেলের বাবা বাড়ি ফিরলে স্বামীর কাছে স্ত্রী ছেলের বউয়ের অভিযোগ দেয় তখন ছেলের বাপ তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে হারামজাদি বলে কি আমি নাকি খিরার টালে থেকে বড় বড় খিরাগুলি একাই খাই, আসুক তোর মেয়ে তার কাছে অভিযোগ দিবো। এখানে উল্লেখ্য যে, খিরার টালে বাবা এবং মেয়ে এক সঙ্গে পাহারা দিতো। বাবা এবং মায়ের বির্তকের মধ্যেই মেয়ে এসে হাজির হয় এবং মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বাবা বলে আচ্ছা মা আমি নাকি খিরার টালে থেকে বড় বড় খিরাগুলো একাই খাই। তখন বাবার কথা শুনে মেয়ে বলে আচ্ছা বাবা নিকাহ দেন বা বিয়ে দেন তাতেই আমি রাজি আছি।[১৬]

১৭

এক জমিদার ও নাপিতের কল্প কাহিনি

এক জমিদার কোনো এক শহর পরিদর্শন শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একজন লোককে বসে থাকা দেখলো এবং লোকটি তাকে দেখে বলছে যে, আমাকে কেউ ১টি টাকা দিলে আমি তাকে শুধুমাত্র ১টি কথাই শিখিয়ে দিবো যা তার জীবনে অনেক উপকারে আসবে। লোকটির কথা শুনে জমিদার তার নিকটে যায় এবং পকেট থেকে ১টি টাকা লোকটিকে দিলে জমিদারকে লোকটি বলে তুমি যা করবা আমি তা জানি। জমিদার লোকটির কথার অর্থই বুঝতে পারলেন না এবং তিনি বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে এ বিষয়ে খুলে বললেন। জমিদার এক পর্যায়ে সবাইকে জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যদি কোনো ব্যক্তি এর সঠিক জবাব দিতে পারেন তাহলে তিনি ঐ ব্যক্তির সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দিবেন এবং তার অর্ধেক সম্পত্তি দান করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রশ্নের কেউ সঠিক জবাব দিতে পারলো না। তখন ঐ গ্রামের একজন গণক ঠাকুর ছিল। সে জমিদারের ঐ প্রশ্নে জবাব দেওয়ার জন্য রওনা হলো। কিন্তু পথিমধ্যে গণক ঠাকুর এক আইরা গরু দেখতে পেলো। গরুটি গণকঠাকুরকে দেখে দূর থেকে নাক সিটকাচ্ছে এবং ফোৎ ফোৎ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। সেইসঙ্গে গরুটি পা দিয়ে মাটি খামচাচ্ছে ও তার নাভি দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা চোনা বের হচ্ছে। তখন ঠাকুর দূর থেকে আইরা গরুকে উদ্দেশ্য করে বলছে–

www.pathagar.com

নাকের শনশনি খুড়ের ঘষাঘষি
আর নাভি দিয়ে চুরৎ চুরৎ পানি
আইরা তুমি যা করবা আমি তা জানি।

অর্থাৎ ঠাকুর আইরার কাছে গেলেই তাকে গুতো মারবে। তাই গণক ঠাকুর অন্য রাস্তা দিয়ে জমিদার বাড়িতে গেলো। গণকঠাকুর জমিদার বাড়িতে গিয়ে দেখলো জমিদার বাড়িতে নেই। গণক তাকে না পেয়ে জমিদার বাড়ির দেওয়ালের সাথে লিখে দিলো :

নাকের শনশনি খুড়ের ঘষাঘষি
আর নাভি দিয়ে চুরৎ চুরৎ পানি
আইরা তুমি যা করবা আমি তা জানি।

একথা লিখে গণক বাড়িতে চলে আসলো। জমিদারের বউয়ের সাথে নাপিতের ছিল সুসম্পর্ক। তাই জমিদারের বউ সিদ্ধান্ত নেয় যে, নাপিত তুমি জমিদারের চুল, দাঁড়ি কাটার সময় তার গলায় খুর লাগিয়ে মেরে ফেলবা। তাহলে আমি তোমার সাথে একেবারে চলে যেতে পারবো। নাপিত তাই জমিদারের বউয়ের কথামতো সিদ্ধান্ত নেয়। জমিদার বাইরে থেকে বাড়িতে আসলে সঙ্গে সঙ্গে নাপিত এসে হাজির হয় এবং চুল, দঁড়ি কাটার সিদ্ধান্ত নেয়। জমিদার তার চুল, দাঁড়ি কাটার সময় হঠাৎ দেওয়ালে চোখ পড়লে তা পড়তে থাকে উচ্চস্বরে। সঙ্গে সঙ্গে নাপিত জমিদারের হাত পা ধরে মাফ চায়। তখন নাপিত বলে হুজুর আমার কোনো দোষ নেই, সব দোষ আপনার স্ত্রীর। তিনিই আমাকে সব শিখিয়ে দিয়েছেন।

তখন জমিদার বলে ঠিক আছে তুমি আজ বাড়ি চলে যাও। আমি যখন তোমাকে ডাকি তখন এসো। পরবর্তীতে জমিদার নাপিতকে ডেকে পাঠান এবং বলেন, তার অর্থাৎ জমিদারের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। কিন্তু নাপিত এতে অস্বীকার করে এবং বলে হুজুর আমি সামান্য একজন নাপিত হয়ে জমিদারের স্ত্রীকে কিভাবে লালন-পালন করবো। তাই আমার পক্ষে তা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। জমিদার পরবর্তীতে নাপিতকে ক্ষমা করে দেন। সেই সঙ্গে জমিদার তার বাড়ির সামনে একটি কূপ খনন করেন এবং সেই কূপ থেকে পানি উঠাবার জন্য তার স্ত্রীকে পাঠান। যেইমাত্র তার স্ত্রী কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে জমিদারের কতিপয় লোক তার স্ত্রীকে কূপের মধ্যে ফেলে দেয় এবং তাদেরকে মাটি চাপা দেওয়ার কথা বলা হয়। এভাবে জমিদার তার দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর জীবনাবসান ঘটান।[১৭]

১৮

এক পরিবারের তিন ভাইয়ের কল্প কাহিনি

কোনো এক পরিবারে ৩ পুত্র সন্তান রেখে স্বামী এবং স্ত্রী মারা যায়। বড় এবং মেঝো ভাই একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা তাদের ছোট ভাইকে পড়ালেখা করাবে। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছোট ভাইকে পড়াশুনা ও দুই ভাই বাবার রেখে যাওয়া জমি চাষ করবে বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একদিন বড় এবং মেঝো ভাই জমি চাষ করতে যাবার সময় তাদের স্ত্রীদের বলে গেলো যে, আজ আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হবে। তাই ছোট ভাই স্কুল থেকে আসার পর যেন আমাদের খাবার নিয়ে জমিতে যায়।

www.pathagar.com

তাদের কথা অনুযায়ী ছোট ভাই খাবার নিয়ে জমিতে যায় এবং খাবার শেষে বড় ভাই মেঝো ভাইকে এক পর্যায়ে বলে তোকে যদি বলা হয় এখন তুই কি করলে শান্তি পাবি? তখন মেঝো ভাই বলে আমি বাড়ি যাবার পর মাথায় তেল মেখে গোসল করে একটি পান ও একটি সিগারেট খেয়ে বউয়ের কোলে ঘুমাতে পারলে শান্তি পেতাম। অপরদিকে মেঝো ভাই বড় ভাইকে বলে তুই কি করলে শান্তি পাবি? উত্তরে বড় ভাই বলে, বাড়ি ফেরার পর যদি আমি হুক্কা টেনে পরে ফুলের বিছানায় ঘুমাতে পারতাম তাহলে খুব শান্তি পেতাম। এবার তারা দুজনই ছোট ভাইকে জিজ্ঞাসা করে তুই কি করলে শান্তি পাবি? উত্তরে ছোট ভাই বলে আমি যদি সোনার খাটে মাথা রেখে এবং রূপোর খাটে পা দিয়ে ঘুমাতে পারতাম তাহলে খুবই শান্তি পেতাম। তাদের আলাপ শেষে ছোট ভাই বাড়ি চলে যায়।

এবার বড় এবং মেঝো ভাই ভাবতে শুরু করে যে, ছোট ভাই দক্ষিণের রাজকুমারী সোনাবতী এবং উত্তরের রাজকুমারী রূপাবতীকে বিয়ে করতে চায়। এতে দুই ভাইয়ের মধ্যে হিংসার উদ্রেক হয়। তারা ভাবতে থাকে যে, ছোট ভাই দুই রাজকুমারীকে বিয়ে করে জমিদার পরিবারের জামাই হয়ে যাবে, যা আমাদের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বাড়ি গিয়ে এক বিরাট তরবারি দিয়ে তাকে হত্যা করা হবে। তারা আরও সিদ্ধান্ত নেয় যে, একাজ করার জন্য তারা তাদের বাড়ির পাশে যে একটি ধানক্ষেত আছে তা পাহারা দেওয়ার জন্য ছোট ভাইকে পাঠানো হবে এবং রাতে একাজ সম্পন্ন হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত জমিতে প্রতিদিনই অনেক লোকজন এসে গরু এবং ছাগল দিয়ে ধান খাওয়াতো। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় ভাই তার স্ত্রীকে বলে আমাদের সেই তরবারিটি কই? নিয়ে এসো তা ধার দিবো। তখন স্ত্রী বলে ব্যাপারটা কি আমাকে না বুঝিয়ে বললে আমি তরবারি দেবো না। তখন বড় ভাই বলে আজ ছোট ভাই আমাদের সাথে যে বেয়াদবি করেছে তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি তরবারি ধার দেবো এবং উপরোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী তাকে মেরে ফেলা হবে বলে সে তার স্ত্রীকে অবহিত করে।

স্ত্রী একথা শোনার পর স্কুল থেকে লোক মারফত দেবরকে ডেকে আনে এবং সেই সঙ্গে দেবরকে বিস্তারিত সব বলে। অতঃপর সে তার দেবরকে বলে আজ রাতে তুমি তোমার সমান উচ্চতাসম্পন্ন একটি কলাগাছ কেটে বাড়ির পাশে জমি পাহারা দেওয়ার জন্য যে ঘর আছে ঐ ঘরে কাথা দিয়ে ঢেকে রেখে বাইরে বসে থেকে দেখবা দুই ভাই তোমাকে খুন করতে যাবে। বড় ভাবির কথা অনুযায়ী দেবর তাই করলো। সেই সঙ্গে দূর হতে রাতে দেখলো তারা দুই ভাই ঘরে ঢুকে ধারালো তরবারি দিয়ে এক কোপে কলাগাছটি কেটে আসলো। অবশ্য তারা মনে করলো যে, তাদের ছোট ভাই আর বেঁচে নেই। অতঃপর ছোট ভাই ঘরে ঢুকে দেখতে পেলো যে, তরবারিটি সেখানেই রয়েছে এবং সে কাঁথা দিয়ে তরবারিটি বেঁধে নিয়ে এক অজানা উদ্দেশ্যে রওনা হলো। যেতে যেতে সে দক্ষিণ দিকের কোনো এক জমিদার বাড়িতে উঠলো এবং জমিদার ছেলেটিকে দেখে খুব পছন্দ করলো সেই সঙ্গে তাকে তার বাড়িতেই থাকতে বললো। কিছুদিন অতিবাহিত হবার পর জমিদার তার মেয়েকে ঐ ছেলের সাথে বিয়ে দিলো। এখানে উল্লেখ্য যে, আগে দক্ষিণের যে সোনাবতী রাজকুমারীর সঙ্গে বিয়ের কথা ছিল

www.pathagar.com

সেই মেয়েই ছিল সোনাবতী। কিন্তু বিয়ে সম্পন্ন হবার পরেও ছেলেটি তার স্ত্রীর সঙ্গে তেমন সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি এবং মন খুলে কথা বলতে পারেনি। তাই তার স্ত্রী একসময় তাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কেন সবসময় মন খারাপ করে থাকো ? আমাকে বিস্তারিত বলো। তখন ছেলেটি তার স্ত্রীকে বলে আমি উত্তরের এক রূপবতী কন্যাকে বিয়ে করলেই খুশি হবো এবং তোমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবো। রাজকুমারী তার কথায় রাজী হলো এবং তার সঙ্গে রূপবতী কন্যার বিয়ে দিলো। কিন্তু এরপরও ছেলেটির মনে শান্তি নেই। তখন সে আগের রাজকুমারীর নিকট প্রস্তাব দেয় যে, যদি বাড়ির পাশে একটি বড় পুকুর খনন করা হয় তাহলে আমার মন ভালো হয়ে যাবে এবং আমি তোমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবো।

তখন তার স্ত্রী এ সিদ্ধান্তে রাজি হয় এবং পুকুর খনন করার জন্য প্রতি টুপরি মাটি ৫টাকা দরে যতো টাকা হয় তা দেওয়া হবে। আরও শর্ত থাকে যে, সে নিজে এ কাজে প্রত্যেক লোককে দেখে তারপর নিয়োগ দিবে। এ খবর পেয়ে যেসব লোক পুকুর খননের জন্য এসেছিল তার মধ্যে তার দুই ভাইও ছিল। মাটি কাটার জন্য দুই ভাই জমিদার বাড়িতে গেলো। তখন জমিদারের মেয়ের জামাই অর্থাৎ ছোট ভাই দুই ভাইকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তারা দুই ভাই নাকি? তারা উত্তরে হ্যাঁ বললো। এসময় ছোট ভাই দুই ভাইকে আলাদা করে আটক রেখে অন্যদের মাটি কাটার অনুমতি দেয়। সেই সঙ্গে প্রতিদিন মাটিকাটা বাবদ চুক্তি অনুযায়ী যে টাকা হয় তা হিসেব করে অন্য লোকের মাধ্যমে দুই ভাইয়ের পরিবারের নিকট পাঠানো হয়। এক পর্যায়ে জমিদারের মেয়ের জামাই আটককৃত দুই ভাইয়ের পরিবারের নিকট সংবাদ পাঠায় যে, তারা যদি জমিদার বাড়ি না যায় তাহলে তাদের স্বামীদের ছেড়ে দেওয়া হবে না।

সংবাদ পেয়ে দুই ভাইয়ের স্ত্রীরা জমিদার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। জমিদার বাড়িতে পৌঁছানোর পর জমিদার এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাদের অনেক আদর আপ্যায়ন করে। এরপর দুই ভাইকেসহ জমিদারের মেয়ে জামাই অর্থাৎ ছোট ভাই, তার দুই স্ত্রী এবং আটককৃত দুই ভাইয়ের স্ত্রীদের নিয়ে এক সঙ্গে বসলো। এক পর্যায়ে জমিদারের মেয়ে জামাই জিজ্ঞাসা করলো দুই ভাইকে যে,আপনারা মোট কয় ভাই? উত্তরে দুই ভাই বললো যে, আমরা মোট তিন ভাই ছিলাম, এক ভাই মারা গেছে এবং আমরা দুই ভাই এখনও জীবিত আছি। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের আরেক ভাই কিভাবে মারা গেছেন? তখন তারা আর কোনো কথা বলেনি। অতঃপর বড় ভাইয়ের স্ত্রী হুজুর আমি বিস্তারিত বলি তাদের আরেক ভাইয়ের কাহিনী। তখন সে পূর্ব উল্লিখিত কাহিনী বলতে শুরু করলো।

এক পর্যায়ে পূর্বে তিন ভাইয়ের মধ্যে ছোট ভাইকে হত্যা করার জন্য যে তরবারিটি এবং কাঁথা ব্যবহার করা হয়েছিল তা জমিদারের মেয়ে জামাই তাদের সামনে হাজির করলো। তখন তারা সবাই স্তব্ধ হয়ে যায় এবং তাদের আর বুঝতে বাকি থাকলো না যে জমিদারের মেয়ের জামাই হচ্ছে তাদের ছোট ভাই। অতঃপর তাদের ভুল স্বীকার করে তারা ছোট ভাইয়ের নিকট ক্ষমা চায়। এরপর ছোট ভাই তাদের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে তাদের পূর্বের বাড়ি থেকে যাবতীয় নিয়ে এসে রাজবাড়ির নিকটে ছোট ভাই অনেক টাকা খরচ করে তাদের বাড়িঘর করে দেয় এবং তারা সবাই

www.pathagar.com

সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এরপর ছোট ভাই তার দুই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলো এখন তোমরা বুঝতে পারলে তো কি জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে মনখুলে কথা বলতে পারিনি। আজ আমি মহাখুশি এবং তোমাদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলবো যার কোনো ইয়ত্তা থাকবে না।[১৮]

১৯

দুই ট্যাটনের কল্পকাহিনি

দক্ষিণ অঞ্চলে এক ট্যাটন ছিল। সেই ট্যাটনের এক পুত্র সন্তান ছিল। পুত্র বিয়ের উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ট্যাটন তার পুত্রকে বিয়ে না দেওয়ায় অনেক লোকজন ট্যাটনের পুত্রকে ধিক্কার দিয়ে অনেক কথাবার্তা বলতো। তাই ট্যাটনের পুত্র মনে কষ্ট নিয়ে ট্যাটনকে বলে বাবা- আমি আর মানুষের কথা সহ্য করতে পারছি না আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করো। বাবা তখন মনে মনে ভাবতে থাকে যে, আমার নাম ট্যাটন আর আমি ছেলের বিয়ে দিবো তা কি করে হয়। সে পারলে আমার মতো ট্যাটনামী করে বিয়ে করুক। তাই ট্যাটন একদিন তার ছেলেকে ৪০টি টাকা দিয়ে বললো বাবা তুমি যেভাবে পারো তোমার ইচ্ছে মতো বিয়ে করে নেও তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

ট্যাটনের কথা শুনে তার ছেলে ৪০টি টাকা নিয়ে উত্তর অঞ্চলে রওনা দিলো উত্তরা ট্যাটনের মেয়েকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে। ট্যাটনের ছেলে উত্তরদিকে রওনা দিয়ে বেশকিছু দূর যাবার পর দেখলো যে, একব্যক্তি জমিতে হালচাষ করছে। তখন তাকে দেখে ট্যাটনের ছেলে বললো বাবাজি, উত্তরা ট্যাটনের বাড়ি যাবো কোন রাস্তা দিয়ে ? তখন হালচাষরত ব্যক্তিটি বললো আমি নিজেই উত্তরা ট্যাটন। কি তোমার সমস্যা ? আমাকে বলো আমি সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো।

দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলে তখন উত্তরা ট্যাটনের কাছে বলে যে, আমি বিয়ে করার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার বাবা আমাকে বিয়ের ব্যবস্থা না করায় আমি বাড়ি থেকে রাগ করে বের হয়ে এসেছি। তখন উত্তরা ট্যাটন বললো, আচ্ছা আমার মেয়েকেই তোমার সঙ্গে বিয়ে দিবো, কিন্তু তুমি সঙ্গে কিছু নিয়ে এসেছো কিনা ? উত্তরে দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলে বললো, বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের হবার সময় ৪০টি টাকা দিয়েছে। তখন উত্তরা ট্যাটন বললো ঠিক আছে ঐ টাকা আমাকে দাও। অতঃপর উত্তরা ট্যাটন টাকা নিয়ে বাড়ি গেলো এবং গরু জমিতে রেখেই দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলেকে বললো ঐ যে দেখা যায় আমার বাড়ি তুমি একটু পরে আমার বাড়িতে এসো। ইতোমধ্যে উত্তরা ট্যাটন বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রীকে বিস্তারিত বললো। এখানে উল্লেখ্য যে, উত্তরা ট্যাটনের কোনো সন্তান-সন্ততি ছিল না। তাই সে বউয়ের অনুমতি নিয়ে আরেকটি বিয়ে করে নিয়ে আসে এবং দীর্ঘদিন দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলে উত্তরা ট্যাটনের বাড়িতে অবস্থান করে। অতঃপর উত্তরা ট্যাটনের একটি মেয়ে সন্তান হয় এবং সে বিয়ের বয়স হতে না হতেই ঐ অঞ্চলের এক মাতব্বর তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। কারণ সে ছিল অত্যন্ত সুদর্শনা। ফলে দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলে এবং উত্তর অঞ্চলের মাতব্বরের মধ্যে একপ্রকার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

এ সমস্যার সমাধানকল্পে দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলে উত্তরা ট্যাটনকে বলে যে, আমি আপনাকে কতিপয় প্রশ্ন করবো যদি আপনি এর সঠিক জবাব দিতে পারেন তাহলে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করবো না, আর যদি সঠিক জবাব দিতে না পারেন তাহলে আপনার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে হবে। উত্তরা ট্যাটন তার প্রস্তাবে রাজি হয়। ফলে কোনো একদিন অঞ্চলের সমস্ত লোকজন এবং মাতব্বর এসে দরবারে হাজির হয় এবং দক্ষিণের ট্যাটনের ছেলে নানা প্রকার প্রশ্ন করতে থাকে উত্তরা ট্যাটনকে। প্রথমেই সে উত্তরা ট্যাটনকে জিজ্ঞাসা করে আপনার এ অঞ্চলের এক বিরাট এলাকা জুড়ে বন জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। আমার দাদা তাই আপনার বাবার এ অঞ্চলের বিরাট বনজঙ্গল পরিস্কার করে সেখানে ফসল উৎপাদন করেছিল। আপনি কি তা জানেন ? উত্তরে ট্যাটন বলে হ্যাঁ আমি তা জানতাম। অতঃপর দক্ষিণের ট্যাটনের ছেলে বলে আমার দাদা মারা যাবার পর আমার বাবা আপনার বাবার ঐসব অঞ্চলের জমিতে প্রচুর শস্য উৎপাদন করে এবং তা বিক্রি করে প্রচুর অর্থ জোগাড় করেছিল আপনি কি তা জানেন ? উত্তরে সে বলে জানি।

এরপর সে ট্যাটনকে প্রশ্ন করে আমার বাবা ঐ উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে কয়েক লক্ষ টাকা জমা করেছিলেন। কয়েকদিন পর আপনার বাবা বিশেষ প্রয়োজনে আমার বাবার নিকট থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে প্রায় ২ লক্ষ টাকার মতো ধার নেয় আপনি কি তা জানেন ? উত্তরে ট্যাটন বলে হ্যাঁ আমি তা জানতাম। অতঃপর দক্ষিণের ট্যাটনের ছেলে বলে ঠিক আছে তাহলে আমার বাবার পাওনা টাকাগুলো আমাকে দিয়ে দিন। আমি আর আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই না। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ট্যাটন যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারতো তাহলে তার মেয়েকে দক্ষিণের ট্যাটনের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে হতো। তাই সে তার সব প্রশ্নের উত্তর হিসেবে হ্যাঁ বলেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরের ট্যাটন বিরাট এক সমস্যায় পরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত তার মেয়েকে দক্ষিণা ট্যাটনের ছেলের সাথে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। অপরদিকে দরবারে উপস্থিত মাতব্বর এবং অন্যান্য লোকজন তাদের স্ব-স্ব বাড়ি চলে যায়।[১৯]

২০
দুই সতীনের কাহিনি

কোনো এক গ্রামের এক ব্যক্তি প্রথম বিয়ে করে কিন্তু ঐ বউয়ের কোনো সন্তান না হওয়ায় সে আরও একটি বিয়ে করে, দুঃখের বিষয় অপর বউয়েরও কোনো সন্তান হয় না। কিছুদিন পর ঐ ব্যক্তি মারা যায়। মারা যাবার সময় সে একটি দুধ দেয়া গাভী রেখে যায়। সে মারা যাবার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, বড় বউ গাভীর সামনে এবং ছোট বউ গাভীর পেছন দিক নেবে। ছোট বউ ছিল অনেকটা চালাক পক্ষান্তরে বড় বউ ছিল বোকা পত্তনের। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় বউ সারাদিন কষ্ট করে গাভীটিকে পেটপুরে খাওয়ায় কিন্তু ছোট বউ গাভীর পেছন দিক নেওয়ায় দুধ দোহাই করে সম্পূর্ণ দুধ একাই ভক্ষণ করে। সে বড় বউকে কোনো প্রকার দুধ দেয়নি। তাছাড়া লোকটি মারা যাবার সময় একটি কাঁথা রেখে গিয়েছিল। এ কাঁথাটি নিয়ে দুই সতীনের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছোট বউ রাতে এবং বড় বউ দিনে কাঁথাটি ব্যবহার করবে। এখানেও

www.pathagar.com

ছোট বউ বড় বউয়ের চেয়ে নিজেকে বেশি চালাক বলে মনে করে। কারণ ঐ সময় ছিল শীতকাল। ফলে বড় বউ শীতে কষ্ট পেয়ে জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে একদিন এক মাতব্বরের বাড়ির পাশ দিয়ে হেটে যাচ্ছিল। তখন বড় বউকে দেখে মাতব্বর জিজ্ঞাসা করছিল এই তোমার কি সমস্যা হয়েছে? তুমি এরকম কাঁপছো কেন? উত্তরে তখন বড় বউ বললো মাতব্বর সাহেব আমার স্বামী মারা যাবার পর একটি দুধ দেয়া গাভী ও একটি কাঁথা রেখে যায়।

এক্ষেত্রে তার ছোট বউ নেয় গাভীর পেছন দিক এবং আমাকে দেয় সামনের দিক। আমি সারাদিন অনেক যত্ন করে গাভীটিকে খাওয়াই কিন্তু দুধ দোহাই করে ছোট বউ একাই সব দুধ ভক্ষণ করে। অপরদিকে রেখে যাওয়া কাঁথাটি সে রাতে ব্যবহার করে এবং আমাকে ব্যবহার করতে দেয় দিনে। শীতকালে আমি রাতে কাঁথাটি ব্যবহার না করায় প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে জ্বরে কাঁপছি। একথা শুনে মাতব্বর বলে ঠিক আছে এখন থেকে তুমি বাড়ি গিয়ে গরুটিকে একটি ফাঁকা মাঠের মধ্যে রেখে সামান্য কিছু খেতে দিবে। এসব পদক্ষেপ নেবার পর ছোট বউ যদি তোমাকে কিছু বলে তাহলে আমি সব সমস্যার সমাধান করে দেবো। বড় বউ মাতব্বরের কথামতো উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার পর দেখা গেলো গাভীটির আর আগের মতো দুধ হচ্ছে না এবং ছোট বউ রাতে কাঁথাটি ব্যবহার করতে গিয়ে দেখলো যে, সেটি ভেঁজা।

এসব বিষয় নিয়ে এক সময় উভয়ের মধ্যে সংঘাত শুরু হলে ঐ গ্রামের মাতব্বর গিয়ে হাজির হয় এবং উভয়ের নিকট থেকে ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারে। মাতব্বর তখন ছোট বউকে বলে তুমি কেন দুধগুলো একাই ভক্ষণ করো ? বড় বউ সারাদিন কষ্ট করে গরুটিকে খাওয়ায় অথচ তুমি তাকে কোনো প্রকার দুধ দেওনি। তাই এখন থেকে দুজন সমান ভাগ করে দুধ খাবে। মাতব্বর ছোট বউকে আরও বলে রেখে যাওয়া কাঁথাটি তুমি কেন একাই ব্যবহার করো ? শীতকালে তুমি একাই কাঁথাটি ব্যবহার করায় বড় বউ ঠান্ডা লেগে জ্বরে কাঁপছিল। তাই এখন থেকে কাঁথাটি রাতে দুজনই একসঙ্গে ব্যবহার করবা। এভাবে মাতব্বর উভয় সতীনকে সমবণ্টনের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করে দেন।[২০]

২১

এক রাজকন্যার বিয়ের কাহিনি

এক দেশে এক রাজা ছিল এবং তার এক সুদর্শনা কন্যা ছিল। রাজা তাকে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলে রাজকন্যা তাতে স্বীকৃতি না দিয়ে বাবাকে সে বলে যে, আমার সাথে কেউ যদি তর্ক করে আমাকে হারাতে পারে তাহলে আমি তাকে বিয়ে করবো, অন্যথায় নয়। রাজকন্যার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজা তার দরবারের সামনে বিরাট এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন। তিনি এতে বলেন যে, এ অঞ্চলের কোনো ব্যক্তি যদি তার কন্যার সাথে তর্ক-বিতর্কে জয়লাভ করে তাহলে তার কন্যা তাকে বিয়ে করবে। সেই সঙ্গে এ উপলক্ষ্যে একটি নির্দিষ্ট তারিখও ঘোষণা করা হয়।

উক্ত তারিখে রাজ দরবারে প্রচুর লোক জমায়েত হয়। সেই সঙ্গে রাজা, উজীর, পাইক পেয়াদা এবং রাজকন্যা দরবারে হাজির হয়। প্রথমেই রাজকন্যা একজনকে

www.pathagar.com

তলব করে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে ঐ ব্যক্তি উত্তর দেবার চেষ্টা করে। তখন রাজকন্যা আবার তাকে জিজ্ঞাসা করে তারপর কি হলো ? এভাবে উক্ত ব্যক্তি যে কথাই বলে রাজকন্যা তখন বলে এরপর কি হলো। এভাবে দরবারে উপস্থিত প্রচুর লোককে পর্যায়ক্রমে রাজকন্যা একই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তারা আর কোনো উত্তর দিতে পারেনি। ফলে রাজকন্যাকে বিয়ে করার আকাঙ্ক্ষাও তাদের পূর্ণ হয়নি।

এ পর্যায়ে হঠাৎ করে একজন লোক সাহস করে দাঁড়িয়ে বলে আমি রাজকন্যার সাথে বিতর্কে জড়াতে চাই। অতঃপর তাকে ডাকা হলো। এ সময় রাজকন্যা পূর্বের ন্যায় ঐ ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলে সে অবশ্য সঠিক জবাব দেয়, কিন্তু রাজকন্যা বলেন তারপর কি ? তখন ঐ ব্যক্তি বলে আমাদের বাড়ির পাশে একটি সরিষার জমি ছিল। ঐ জমিতে প্রচুর চড়ুই পাখি বসে সরিষার দানা খেতো। একদিন আমি বুদ্ধি করে বাড়ি থেকে একটি বিরাট জাল নিয়ে ঐ জমির পাশে অবস্থান করি। যেইমাত্র জমিতে চড়ুইগুলো পড়ে সরিষার দানা খাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ঐ বিশাল জাল দিয়ে সবগুলো চড়ই পাখিকে জালের মধ্যে আটকিয়ে ফেলি। কিন্তু দুঃখের বিষয় জালের এক পাশে ইদুর কেটে রেখেছিল, সেদিক দিয়ে চড়ুই পাখিগুলো ফুরৎ ফুরৎ করে উড়ে যাচ্ছিল। ঐ ব্যক্তি তখন রাজকন্যাকে বলেন, রাজকন্যা আপনি শুনতে পাচ্ছেনতো ? রাজকন্যা তখন বলেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। রাজকন্যা তখন ঐ ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তারপর কি। তখন উক্ত ব্যক্তি বলে ফুরৎ ফুরৎ। আবার রাজকন্যা বলেন, তারপর কি ? উত্তরে লোকটি বলে ফুরৎ ফুরৎ।

এভাবে রাজকন্যা যতবার ব্যক্তিটিকে বলেন তারপর, সে ততবারই বলতে থাকে ফুরৎ ফুরৎ। এক পর্যায়ে রাজকন্যা রেগে গিয়ে উক্ত ব্যক্তিটিকে বলে তোমার ফুরৎ ফুরৎ কি শেষ হবে না ? উত্তরে লোকটি বলে আপনার তারপর, তারপর শেষ হলেই আমার ফুরৎ ফুরৎ শেষ হবে। এভাবে শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা উক্ত ব্যক্তির সাথে বিতর্কে হেরে যায় এবং ঐ ব্যক্তির সাথেই রাজকন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়।[২১]

২২

এক শৃগাল ও কচ্ছপের কাহিনি

এক শৃগাল চৈত্র মাসের কোনো একদিন এক পুকুর পার দিয়ে হেটে যাচ্ছিল খাবারের সন্ধানে। যাবার সময় সে পুকুর পাড়ে একটি কচ্ছপকে দেখতে পেলো এবং তা ভক্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলো। যেইমাত্র শৃগালটি কচ্ছপকে ধরে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে কচ্ছপটি তার মুখমণ্ডল ভেতরে লুকিয়ে ফেললো। অতঃপর শৃগালটি কচ্ছপকে খাওয়ার চেষ্টা করেও পারলো না, কারণ কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশ ছিল অত্যন্ত শক্ত। তাই সে নিজেও শৃগালের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এক মতলব আটলো এবং সে শৃগালটিকে বললো :

জঙ্গলেতে থাকো তুমি বড় বড় হাও
পানির কিনারায় নিয়া ভিজায়া ভিজায়া খাও।

কচ্ছপের একথা শোনার সাথে সাথে শৃগালটি কচ্ছপটিকে নিয়ে পাশেই পুকুরের পাড়ে পানির নিকটে হাজির করলো। সেই সঙ্গে শৃগালটি দূর হতে তা লক্ষ্য করলো।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে কচ্ছপটি তার মুখমণ্ডল বের করে দেখতে পারলো যে, তার আশে পাশে শৃগালটি নেই। তাই সে সঙ্গে সঙ্গে পানির মধ্যে চলে গেলো এবং শৃগালটিকে উদ্দেশ্য করে কচ্ছপটি বলতে লাগলো

কাঠমে কুণ্ডরি বুদ্ধিরাখি ভারি
পানির কিনারায় নিয়া দেখালাম ধান্ধারি।

এভাবে কচ্ছপটি শৃগালের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে।[২২]

২৩

জীবনে উন্নতি লাভের কাহিনি

এক ব্যক্তির তিন পুত্র সন্তান ছিল। সে মারা যাবার পর বড় এবং মেঝো ছেলে তার রেখে যাওয়া কিছু জমি চাষাবাদ করতো এবং ছোট ছেলে পড়াশুনা করতো। একদিন বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে জমিতে সকালের খাবার নিয়ে যেতে বললো। ছোট ভাই তাই তাদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল। তখন প্রায় দুপুর বেলা। এসময় বড় দুই ভাই ছোট ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলে এতোদিন পড়াশুনা করে তুই কোনো বিদ্যাই অর্জন করতে পারিশ নি। এসময় কেউ সকালের খাবার নিয়ে আসে এখনতো প্রায় দুপুর হয়ে গেছে।

বড় দুই ভাইয়ের কথা শুনে ছোট ভাই মনে কষ্ট নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায় এবং সে বলে যতদিন বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে না পারবো ততদিন বাড়ি ফিরবো না। এভাবে সে বেশকিছুদূর যেতে যেতে একটি বিরাট বট গাছ দেখতে পেলো। উক্ত বট গাছের নিচে এক অতি বৃদ্ধলোক বসে আছে। এসময় লোকটি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করে, বাবা তুমি কোথায় যাচ্ছো ? সে তখন বলে আমার দুই ভাই আমাকে বলেছে যে, আমি নাকি বিদ্যা শিক্ষাই অর্জন করতে পারিনি। তাই আমি বিদ্যা শিক্ষা অর্জন করতে যাচ্ছি। তখন বৃদ্ধ লোকটি বলে ঠিক আছে আমি তোমাকে জীবনে ৩টি কথা শিখিয়ে দেবো, যা তোমার জীবনে অনেক উপকারে আসবে। তাই তুমি আজ থেকে আমার বাড়িতেই থাকবে।

বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে সে তার বাড়িতেই দীর্ঘদিন অবস্থান করতে থাকে। এসময় বৃদ্ধ লোকটি বলে আমি তোমাকে ৩ বছরে ৩টি কথা শিখিয়ে দেবো। এভাবে প্রথম বছর অতিবাহিত হলে ছেলেটি বৃদ্ধ লোকটিকে বলে প্রথম বছর অতিবাহিত হয়েছে। আমাকে কি কথা শিখাবেন ? তখন লোকটি ছেলেটিকে বলে, রাত জাগলে হায়াত বাড়ে, কথাটি মনে রেখো। অতঃপর দ্বিতীয় বছর অতিবাহিত হলে বৃদ্ধ লোকটি ছেলেটিকে বলে দ্বিতীয় কথাটি হলো, বেশি খেলে মানুষ মরে। অতঃপর তৃতীয় বছরে লোকটি ছেলেটিকে বলে যে, পরিশ্রম করলে দৌলত বাড়ে। এ তিনটি কথা তুমি মেনে চললে তোমার জীবনে উন্নতি ঘটবে।

বৃদ্ধ লোকটির কথা শুনে ছেলেটি তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে কোনো এক বাড়িতে দেখতে পেলো যে, বাড়ির সবারই ভীষণ মন খারাপ এবং তারা প্রতিনিয়ত কান্নাকাটি করে। ছেলেটি খোঁজ নিয়ে দেখলো যে, সে বাড়িটি এক রাজার বাড়ি। তখন সে রাজার নিকট গিয়ে বললো রাজামশাই আসলে সমস্যা কি ?

www.pathagar.com

রাজামশাই বলেন, আমার মেয়ের এক বিরাট সমস্যা আছে। যদি কেউ এর সঠিক সমাধান দিতে পারে তাহলে আমি তার সঙ্গে আমার মেয়েকে বিয়ে দিবো এবং আমার যাবতীয় সম্পত্তি তাকে দান করবো। তখন ছেলেটি রাজার নিকট থেকে জানতে পারে যে, তার মেয়ে প্রতি রাতেই প্রচণ্ড কান্নাকাটি করে, অবশ্য দিনে এ কান্নার মাত্রা অনেকটা কমে যায়।

একথা শুনে ছেলেটি রাজাকে বলে যে, আমাকে এতো তীক্ষ্ণ একটি ধারালো তরবারি দিবেন যেন তার ওপর একটি মাছি পড়লেও কেটে যায়। আমি দেখবো আপনার মেয়ের সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। ছেলেটির কথা অনুযায়ী একটি ঘরের মধ্যে রাতে ঐ রাজকন্যা ও ছেলেটিকে রাখা হলো এবং চাহিদা অনুযায়ী তাকে একটি ধারালো তরবারি দেওয়া হলো। গভীর রাতে ছেলেটি দেখতে পেলো যে, রাজকন্যার মুখ দিয়ে এক বিরাট অজগর সাপ বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তার ধারালো তরবারি দিয়ে সাপটি টুকরো টুকরো করে কেটে ফেললো এবং সমস্ত ঘর রক্তাক্ত হয়ে গেলো। এসময় ছেলেটি একটি ন্যাকরায় সাপের জিহ্বা ও লেজ বেধে রেখে ঘুমাতে লাগলো। সেই সঙ্গে রাজকন্যার আর কোনো কান্নাকাটিও ছিল না।

পরের দিন সকালে রাজার উজির এসে দেখতে পারলো যে, সমস্ত ঘরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং রাজকন্যা ও ছেলেটি ঘুমাচ্ছে। শর্ত ছিল, যে ব্যক্তি রাজকন্যার সমস্যার সমাধান দিতে পারবে তার সঙ্গেই রাজার মেয়ের বিয়ে হবে। তাই উজির বুদ্ধি করে তার গায়ে যে জামা পরিহিত ছিল তাতে রক্তমেখে রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে বললো হুজুর আমি এক বিরাট অজগর সাপ হত্যা করেছি এবং আপনার মেয়ের আর কোনো সমস্যা নেই। সে আরামে ঘুমাচ্ছে। তাই এখন আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। ওদিকে ছেলেটি সারারাত জেগে থেকে সাপ মারার পর ঘুমে কাতর হয়ে ঘুমাচ্ছিল। সে ঘুম থেকে জেগেই রাজদরবারে গেলো এবং উজিরের দাবির প্রেক্ষিতে রাজাকে বললো, রাজামশাই উজির যে সাপটিকে মেরেছে তার প্রমাণ কি? পরে রাজামশাই উজিরকে জিজ্ঞাসা করে তুমি যে সত্যি সত্যিই সাপটি মেরেছো তার প্রমাণ কি ? সে তখন কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। এসময় ছেলেটি সাপের জিহ্বা ও লেজ ন্যাকরা থেকে বের করে রাজামশাইসহ দরবারে উপস্থিত সবাইকে দেখায়। এতে সবাই ছেলেটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাজকন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেয়। এভাবে পূর্বের বৃদ্ধ লোকটি যে বলেছিল রাত জাগলে হায়াত বাড়ে তার প্রমাণ ছেলেটি পেলো।

এভাবে বিয়ে সম্পন্ন হবার পর রাজার মেয়ে বিভিন্ন প্রকার উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করে। এক সময় তার স্বামীকে অনেকটা জোরপূর্বক খাবার খাওয়ালে সে মরণাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়। পরবর্তীতে ডাক্তার এনে চিকিৎসা করে রোগ নিরাময় হয়। এভাবে বৃদ্ধ লোকটির শেখানো দ্বিতীয় কথাটি বেশি খেলে যে মানুষ মরে তা প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় কথাটি প্রমাণ করার জন্য সে তার স্ত্রীকে বলে আমি আগামীকাল কাজ করার উদ্দেশ্যে কোনো এক বাড়িতে যাবো, তুমি বাবাকে এসব কথা বলবা না।

www.pathagar.com

কথামতো সে কোনো এক বাড়িতে কাজ করার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। কাজ করে রাতে ঘুমাতে যাবার সময় অনেক শ্রমিকদের সঙ্গে ঘুমাতে গিয়ে সে এক শ্রমিককে বলে তুমি জানো আমি কিন্তু এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছি। তখন অন্যান্য শ্রমিকরা তা বিশ্বাস করে না। ঐ বাড়ির মালিক এসে ছেলেটিকে বলে তুমি যে রাজকন্যাকে বিয়ে করেছো তার প্রমাণ কি? তাই একথা প্রমাণ করার জন্য তুমি যদি ওই রাজবাড়ি থেকে হাতীতে করে রাজকন্যা এবং অনেক খাবার নিয়ে আসতে পারো তাহলে বুঝবো যে, তোমার কথাটি সত্য। মালিকের কথাশুনে ছেলেটি রাজবাড়ি আসে এবং রাজকন্যাকে বিস্তারিত সব বলে। তখন সে এবং রাজকন্যা হাতীর পিঠে ওঠে অনেক খাবার নিয়ে ঐ মালিকের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় এবং যথাসময়ে গিয়ে হাজির হয়। তখন উপস্থিত সবাই তাদের দেখে বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়। এভাবে বৃদ্ধের শেখানো তৃতীয় কথাটিও প্রমাণিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ছেলেটির জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি ফিরে আসে।[২৩]

আঞ্চলিক শব্দার্থ

হাস্তোর	:	কিসসা কাহিনি, গল্প
গোয়াত	:	পাছা
ত্যানা	:	পাতলা কাপড় বিশেষ
বন বাইড়া	:	বন বাড়িতে
দৌড় পাইড়া	:	দৌড় দিয়ে
গপ্প	:	গল্প
বিয়া	:	বিয়ে
অয়	:	হয়
বেহেই	:	সবাই
হশুর	:	শ্বশুর
হইনা	:	শুনে
এল্লা	:	একটু
ট্যাহা	:	টাকা
এতো	:	এটা
সদাই	:	জিনিসপত্র
দোহানদার	:	দোকানদার
হারা	:	সমস্ত
আট	:	হাট
শিয়ান	:	চালাক, চতুর লোক বিশেষ
ফ্যান	:	কচু জাতীয় গাছ যা সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়
শ্যালা	:	শালা গালি হিসেবে ব্যবহৃত
হালা	:	শালা, স্ত্রীর ছোট ভাই
হুমন্দি	:	শুমন্দি, স্ত্রীর বড় ভাই

www.pathagar.com

খাবলা ধরছে	:	প্রচণ্ড ধরা
সোমানো	:	অনবরত
থাব রাইতাছে	:	চর মারছে/থাপ্পর মারা
থেইকা	:	থেকে
কতিকতি	:	বলতে বলতে
হোনা	:	শোনা
নেইগা	:	জন্য
এম্মুরা	:	এদিকে
ওহ্যান দিয়া	:	ঐদিক দিয়ে
ইয়ার্কী	:	মজা করা
বারি	:	আঘাত করা
ফান্দে	:	ফাঁদে
ধোলাই	:	প্রহর করা
অয়না	:	হয় না
কেবা	:	কেমন
সপ	:	পাটি/মাদুর
থুইছে	:	রেখে
হরাইয়া	:	সরিয়ে
বাইরাছে	:	আঘাত করা
ল্যাহা	:	লেখাপড়া
ব্যাবাক	:	সবাই/সবটুকু
পলা টইলা	:	পালিয়ে
পোলাপান	:	শিশু/ছোট ছেলে-মেয়ে
রাইত	:	রাত
জাগা	:	জায়গা
নাগব	:	লাগবে
চ্যাংড়া	:	ছেলে
আংগোর	:	আমাদের
ঢুইলা ঢুইলা	:	ঢুলে ঢুলে
গোয়াত	:	পাছা/নিতম্ব
বাইরাতি	:	মারতে
কুলায় না	:	সহ্য করতে পারে না এমন
কবরাজ	:	কবিরাজ
এন্না	:	একটু
ঘাউ	:	ঘাঁ

www.pathagar.com

দ্যাশে	:	দেশে
ফাতানাতা	:	ঝাঁড় দেয়া
ডাইনে বায়ে	:	ডানে বামে
কইলা	:	বলা
কতা	:	কথা
তহন	:	তখন
যাতি যাতি	:	যেতে যেতে
হনুছেন	:	শোনা
কাবু	:	শুকিয়ে যাওয়া/স্বাস্থ্য কমে যাওয়া
বগল	:	নিকট/পাশে দিয়ে
দেহি	:	দেখে
এহাবারে	:	একেবারে
কাজ হইছিল	:	বিয়ে হয়ছিল
কান্দুন	:	কাঁদতে
দাবড়া	:	তাড়িয়ে দিয়ে
বেটা	:	ছেলে
এরম	:	এরকম
আনমু	:	আনবে
তহন •	:	তখন
এন্দ্রা	:	কূয়া
থেইকাই	:	থেকে
ফুচকি	:	উঁকি দেয়া
বিটিক	:	মেয়ে/কন্যাকে
ছেঁইড়া	:	ছেড়ে
আইলা	:	কৃষক/রাখাল
আল	:	হাল
পুয়াতি	:	প্রসূতি
হে সুমকা	:	তখন
নাগাও	:	লাগাও
ওহেনে	:	এখানে
বাইড় বুরি	:	বাহিরের আঙ্গিনা
খাড়া	:	দাঁড়িয়ে থাকা
পুঁইচা	:	পঁচে
যাইবনি	:	যাবে
বেচমুনি	:	বেচব
মেলা	:	অনেক

www.pathagar.com

ব্যাক	:	সব
তাগোর	:	তাদের
উপ্‌র মিলা	:	উপর দিকে
চোহের	:	চোখের
গাল পারবনি	:	বকা দেয়া
চামুর	:	উকুন
দিন পর্তি	:	প্রতিদিন
হুদ্দা	:	সহ
কেবা	:	কেমন
জুইরা	:	ঠাণ্ডা হওয়া
দিশা	:	বুঝতে
বিল্লী	:	বিড়াল
কুইচকা	:	কেঁচো
আগারী	:	আগের অংশ
পিহারী	:	পেছনের অংশ
বাগন	:	বেগুন
কাইটা থুইত	:	কেঁটে রেখ
দাবাড়	:	তাড়া
তারবাদে	:	তারপরে
মারইনা	:	ধরার
কবিতর	:	কবুতর
খামা	:	গর্তে
শুইখ্যা	:	শুকিয়ে
হোস	:	জিজ্ঞেস করছে
ক্যা	:	কেন
ইতু	:	একটু
ঝাঁহি	:	ঝাঁকি দেয়া
প্যাটে	:	পেট
ব্যারাম	:	অসুখ
শুইনা	:	শুনে
জবো	:	জবাই করা
কেবা	:	কেমন
আমাগোর	:	আমাদের
কেডো	:	কে
এবা সেবা	:	যেমন তেমন
জুড়ি বাঁধাত্যাছে	:	জুটি বাধা

www.pathagar.com

খ. লোকছড়া ও লোককবিতা

লোকছড়া

লোকজ সংস্কৃতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রপঞ্চ হলো মৌখিক সাহিত্য। মৌলিক সাহিত্য বা লোক সাহিত্যের আদিমতম নিদর্শন হলো ছড়া। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে সংস্কৃতি সমাজ জীবন ও মানব জীবনের নানা তত্ত্বমূলক কথা এবং ইতিহাস। তাই সমষ্টিগত লোকমনের সৃষ্টি, সমাজের সাধারণ মানুষের আবেগ কল্পনা, স্বপ্ন, স্মৃতি, অভিজ্ঞতার কথা, পদ্যের ভাষায় ছন্দের বন্ধনে ক্ষুদ্র অবয়বে যে ব্যঙ্গময় রূপ লাভ করে তাই ছড়া। অন্যভাবে বলা যায়, ছড়া লোকসাহিত্যের আরেকটি সমৃদ্ধতম ধারা। দেশের সব অঞ্চলের ন্যায় সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষও লোক চক্ষুর গোচরে অগোচরে লোকছড়া বলতে, শুনতে ভালোবাসে। ছড়া আসলে গ্রাম্য কবিদের মুখে মুখে সৃষ্ট ছোট ছোট পদ্য বিশেষ। অর্থ নয়-সুরের অনুকরণই ছড়ার মুখ্য বিষয়। সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের মুখেই বেশি ছড়া শুনতে পাওয়া যায়। বয়স্ক মানুষের মুখে ছড়া ততটা শোনা না যায় না। উল্লেখ্য যে, বাঙালি সমাজের নারীরা বিশেষ করে মায়েরাই ছড়া চর্চার ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। তারাই ছড়ার ধারক-বাহক, এমনকি রচয়িতাও। শিশুর ঘুম পাড়ানো থেকে শুরু করে, শিশুর কান্না থামাতে, শিশুকে হাঁটা শেখাতে মায়েরা ছড়ার যত্র-তত্র ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া গ্রাম্য খেলাধুলায় কিশোর-কিশোরীরা এমনকি যুবক-যুবতীরাও অনেক ক্ষেত্রে ছড়া কেটে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলায় সংগৃহীত ছড়াগুলোর মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য বিদ্যমান। যেহেতু একই উৎস জাত। এমন যৌক্তিক অবস্থান অনেক ক্ষেত্রে তার পরিবেশ প্রতিবেশের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়টিও লক্ষ্যণীয়। ব্যঙ্গ বিদ্রুপাত্মক ছড়াগুলো সংগ্রহ করার সময় দেখা গেছে শিশুরা অনেক সময় কান্না কাটির অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে। অনেক অভিভাবক এ বিষয়টি নিয়ে ঝগড়ারও পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যা মূলত পরবর্তীতে এক হাস্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। একজন ছড়া যখন বলছে, কার নাম দিবে এটি নিয়েও সামান্য মন মালিন্যর সৃষ্টি হয়েছে। সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এ শ্রেণির মানুষের মধ্যে ছড়ার ব্যবহার ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধারার কতিপয় ছড়ার উল্লেখ করা হচ্ছে। তবে প্রথমেই ঘুম পাড়ানী বা ছেলে ভুলানো ছড়া–

১

ঘুম যাবো রে মনের আশা
হায়রে কপাল পরের বাসা
পরের খোকার কপাল পোড়া
মনে মনে শঙ্কা ভরা।

২.

ঘুম পাড়ানি মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো

www.pathagar.com

বাটা ভরে পান দিবো
গাল ভরে খেও
খোকার চোখে ঘুম নেই
ঘুম দিয়ে যেও।

৩

চান্দের সুতা কুড়াইয়া
শাড়ি দ্যাওনা গড়াইয়া
চেকন শাড়ি বান্যায়া
শাড়ির আঁচল বান্দিয়া
মায়ের বাড়িত কান্দিয়া।

৪

তাই তাই তাই
মামা বাড়ি যাই,
মামা দিল দুধ ভাত
পেট পুরে খাই,
মামী এলো লাঠি নিয়ে পালাই পালাই।

৫

গ্যাদা ক্যারে কান্দে রে
শ্বশুরবাড়ি যাইতে,
সাত সমুদ্রর পাড়ি দেব নয়ার দেয় সাথে।
দুধের পুকুর দেব যাপুর খেলাইতে
আম কাঁঠালের বালিশ দেব শ্যামায় শ্যামায় যাইতে।

৬

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদম তলায় কে?
হাতি নাচছে ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বিয়ে।

৭

ঘুম পাড়ানী, মাসি পিসি
মোদের বাড়ি এসো।
খাট নাই, চৌকি নাই
টুলটা পেতে বসো।
বাটা ভরা দিলাম পান
গাল ভরে খাও।
যত ছেলের চোখের ঘুম
রিয়ালের চোখে ঘুম দিয়ে যা।

www.pathagar.com

৮

রিয়াল বাবু কমলা লেবু
একলা যাইও না।
জানলা দিয়া ফুচ্চি দিলে
দিশা পাইবা না।

৯

রিয়ালের হরির আন্ডা
গাড়ে তিন হাত গণ্ডা।
নয় ছয় করে না,
আলসি কইরা ফালাইনা।

নর-নারী বিষয়ক ছড়া

১

যেখানে দেখিব বিলডিং
সেখানে মারিবে ফিলডিং,
পাইলে পাইতে পার মনের মত ডালডিং।

২

সবাই খোঁজে মনি মুক্তা
যার আছে মূল্য,
আমি খুঁজি একটা মন
যার আছে স্বপ্ন।

৩

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে কেউ,
তোমায় আমি ভালো বাসি,
ও খড়াব You... ।

৪

টমেটো লাল,
কাঁচা মরিচ ঝাল
ছেলেদের ভালো লাগে
মেয়েদের গাল।

৫

বাড়ির গাছে ধান খেত
লম্বা লম্বা শিষ,
তুমি যদি বিয়ে না করো
আমি খাব বিষ।

www.pathagar.com

৬
হাফ প্যান্ট ডোরা ডোরা,
ফুল প্যান্ট টাইট।
তোমায় আমি ভালোবাসি
এই কথাটা রাইট।
আকাশে তারা
বাগানে ফুল
ছাত্রী জীবনে প্রেম করা ভুল।

৭
এক হাত কন্যা
বার হাত চুল,
ওঠে কন্যা
ফোটে ফুল।

৮
বাড়ির মধ্যে পেয়ারা গাছ
পেয়ারা ধরে না।
বন্ধুর কাছে শুইবার গেলে,
বালিশ লাগে না।

৯
ওরে বাবারে খালের পারে
চ্যাংড়া মাগীর বুড়া জামাই,
আল্লাহ মাপাইছে।
চ্যাংড়া ছ্যাড়ার বুড়া বউ,
আল্লা মাপাইছে ...।
সুন্দর মানসের কালা জামাই
আল্লাহ মাপাইছে।

পারিবারিক ছড়া

১
গাছ চায় লতাপাতা
মাছ চায় পানি,
ছেলেরা চায় ভালোবাসা
মেয়েরা চায় স্বামী।

২
পুকুর যখন কেটেছি

www.pathagar.com

মাছ আমি ধরবোই,
ভালো যখন বেসেছি
বিয়ে আমি করবোই।

৩

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছে মৌ,
এত ডাকি তবু কথা
কও না কেন বউ।
কইবো কথা কি ছলে
কথা কইতে গা জ্বলে।

৪

ছাগল গিরি ভাই, ছাগল গিরি
কি কস ভাই, লক্ষ্মী ঘিরি
তোর না ছাগল খাইছে ধান।
খোয়া থাকলে বান্ধি আন
হায় বুলবুলি হায় মালা,
কার বিয়া কার বিয়া।
আফসানার বিয়া আফসানার বিয়া
কি দিয়া কি দিয়া
মাইক্রো দিয়া মাইক্রো দিয়া।

৫

আতা গাছে তোতা পাখি
ডালিম গাছের মৌ;
গত রাতে স্বপ্ন দেখি
তুমি আমার বউ।

৬

পুতুলের মাও কান্দে
নাস্তা পালা ধইরা,
ছাই মাটি তুললো
পুতুলের বিয়া।
আমি কলা পাতার শাড়ি পরমু না
বাঁশের খাটে বসমু না,
রেল গাড়িত চড়মু না।

৭

আশা কাশা ভাতের কাশা।

www.pathagar.com

ভাত নিয়া যায় চরায় চরায়,
মারে কই কিসের জ্বালা
বাপে কই বিয়া দিমু।
নানি কয় কার সাথে?
নানা কয় মন্ডলের সাথে।
মন্ডল মন্ডল প্যাক প্যাক
পাক্কা আছে বের করি,
মন্ডল গেল দিয়ারে
আল ফুটাইল শিয়ারে।

৮

ত্যাজ ত্যাজ ত্যাজ পাড়া
হ্যাপির বিয়া কোলকাতা
হ্যাপির সাথে যাবে কে?
তিন কন্যা সেজেছে।
এক কন্যা যাবে না,
হ্যাপির বিয়া হবে না।
হ্যাপির বাপ দারোগা
ডিম পেরেছে তেরোটা।
একটা ডিম নষ্ট,
হ্যাপির বাপের কষ্ট।

৯

আলিফ বে তে সে
মা চারডো ভাত দে।
মা গেল ঐ পাড়া
ভাত হইল কর করা।
মা কইল আসি
ভাত হইল বাসি।

১০

হলদি কুটি চাক চাক,
কুটুম আসল ঝাঁক ঝাঁক।
আর হলদি কটমু না
গেদি বিয়া দিমু না।

১১

জামায়ের নাইগা
রান্ধিলাম নাস্তা।
জামাই খাইব রসে,
তাইতো জামাই

www.pathagar.com

খায় না নাস্তা।
মুসুলা দিয়া ঠাসে
এমন সুন্দর,
মিয়োজে দিলাম
বুড়া ভাতারের সাথে।

১২

ঘুগু মরলা ঘুগু মরল আলো চাউল খাইয়া,
ঘুগুর বিয়াত যামু আমি
লাল শাড়ি পইড়া।
মায়ে দিল তেল সিঁন্দুর,
বাপে দিলো বিয়া।
রাজার ব্যাটা নিবার আইল
মাল কোচা দিয়া।
মাল থুইল ভাঙ্গা ঘরে
মাল নিও চোরে,
দুই মাইজি ক্যান্দাছে
ডালিম গাটোর গোরে।
ডালিম গাছডো ভাঙ্গিয়া পড়ল
ফুল ধুপ ধুপ করে।

১৩

রাস্তায় রাস্তায় যাইয়া বাপজান
রাস্তাক সেলাম বাইর।
বাইবুরী যাইয়া বাপজান
শ্বশুরের সেলাম কইর।
রান্ধুন ঘরে যাইয়া বাপজান
শাশুড়িকে সেলাম কইরো।
বড় ঘরে যাইয়া বাপজান
অরস কোলে নিও।
আমি কি জানি বাপজান
মা জান আছে ঘরে,
আপনার আরস বিলা
তুইলা নিসি ঘরে।[২৪]

খেলাধুলা বিষয়ক ছড়া

সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর অঞ্চলের ছেলে-মেয়ে, কিশোর-কিশোরীরা বিভিন্ন গ্রামীণ খেলায় অভ্যস্ত। যেমন : কুত কুত, গোল্লাছুট, বদম বা রেডি, গুলডাঙ্গ খেলার ছড়া–

www.pathagar.com

১

আয়লো সখি কুস্তি করি
এক হাতে তোর খোপায় ধরি
আরেক হাতে তুলবো মুখ
ঘুচ্চ্যা যাবে মনের সুখ।[২৫]

২

ঠিক দুপুরে ভাস্যা আসে
ভরা গ্যাঙ্গে ভাদাল ঘাসে
ভাদাল ঘাসের ফুলে
তিনডো পোকায় দোলে।[২৬]

৩

বেলুনী লো বেলুনী
হাত দিন খেলুনী
তোর ভাতার আসলো
বাইর বাড়ি কাশলো
আসুক গা
খানকায় বসুগ গা।[২৭]

৪

ছি কুতুকুত ছাতানি
লাইলী আমার মামানি
মজনু আমার ভাই
হাজাহানের গাড়িত চড়্যা
মোক্কায় যাই।

৫

মেলা রে মেলা, আমরা করি খেলা
একটি মেয়ে বসে আছে।
তার কোনো বান্ধবী নেই
তোমার হাতে কি?
ফসলা।
তোমার পায়ে কি?
ঝুমকো।
আকাশ বিলা তাঁকাও
চোখের পানি মুছো
যাকে পাও তাকে ছোঁও।

৬

এক- এ ঋতু
দুই- এ ডাবল টু

www.pathagar.com

তিন- এ ঘোড়ায় চড়ি,
চার- এ চার নাত্তা ধিনা ধিন।
পাঁচ- এ কদম ফুলী ঝুমকায় দোলে
ছয়- এ স্পিপ কাঁটা।
সাত- এ মাথা ঘোরে ভন ভন
আট- এ আইসেন তো দুলাভাই।
বইসেন তো চেয়ারে,
শরবত খেতে কি কি লাগে
চুক্কা চুক্কা চিনি লাগে।
বড় মামীর হাত লাগে,
নয়- এ বাঁশের বাতা নড়েচড়ে
হিরার কথা মনে পড়ে।
হিরাক যদি দেখতে চাও,
একটি পত্র পাঠিয়ে দেও।
দশ- এ টেবিলের উপর আয়না,
বউ দেখা যায় না।
এগারো- তে এক ঠ্যাং।
বার- তে আমরা দুটি ভাই
বাঘ বাগানে যাই,
বাঘের বিচি তুইলা আনে
হারিমনি বাজায়।
তের- তে চম্পা রে চম্পা, গলায় গামছা
হাতে বালতি,
কাকে কলসি।
চৌদ্দ- তে টুনটুনি পাখি
নাচো তো দেখি,
না বাবা নাচব না
পড়ে গেলে বাঁচব না।
বড় আপুর বিয়ে
লাক্স সাবান দিয়ে।
পনের- তে অল্প দামের কল্পনা,
বেশি দিন টেকে না।
ষোল- তে উপর দিয়া যায় কি,
হেলিকাপ্টার।
টিবি দিল বাঁজে কি?
ট্যানজেস্টার।
সতের- তে ছাঁই ফালাইবার গেছিলাম।

www.pathagar.com

মালা পইড়া পাইছিলাম,
মালার মধ্যে লেখা আছে
হাডুডু খেলা আছে।

৭

পালার মধ্যে গোস্ত
নানী আমার দোস্ত
আম গাছে গামছা
দেখ না বুড়ির তামশা।
টিনের তইলা পয়সা থুইয়া
ইমার বিয়া ঠিক করে।

৮

মীনা মীনা মীনা
মীনা যখন ছোট ছিল
তখন তার স্বভাব ছিল,
তখন ওয়াও ওয়াও ওয়াও।
মীনা যখন আর একটু বড় হলো
তখন তার অভ্যাস ছিল?
লেখাপড়া।
মীনা মীনা মীনা
আর একটু বড় হল কুট কুট ফুট
মীনার আর একটু বড় হলো।
মীনার তখন বিয়ে হলো,
তার তার অভ্যাস ছিল
ঘুমটা দেয়া।
মীনা মীনার যখন
মরে গেল তখন তার
অভ্যাস ছিল,
ঘুম...।

৯

উস্তা ভাজি চাক চাক
বিয়ান আইল ঝাঁক ঝাঁক।
ও বিয়ান বইসেন,
দু'টি কথা শোনেন
আপনার মিয়া ঘাটে যায়।
লোকের সাথে কথা কয়,
লোক হইল বাজি
মিয়া হইল পাজি।

www.pathagar.com

১০

উপাইস কোম উপাইস কোম পাইসকুম
নাইন টেন টেইসকুম।
সুলতানা বিবি আনা,
সাহেব বিবির বৈঠক খানা।
আস বাড়িতে যাইতে,
পান সুপরি খাইতে।
পানের আগায় মরিচ বাটা
ইসকুরোপে ছবি আঁকা।
যার মণি মালা
তাকে দিব মুক্তার মালা।

১১

০১৭ এই নাম্বারে কল
দিলে আমাকে পাবেন।
ছোট ওয়ান-ফুলের বাগান,
বড় ওয়ান-দেদ্দারা।
গুটাই না ওয়ান।
টু-আল্লার বন্ধু,
থ্রি-এক টানা খায় তিন বিরি।
ফোর-হেট মাষ্টারের
জুতা চোর ব্যাড়া,
ভাঙ্গা মারে দোর।
ফাইভ-কলের পাইপ,
সিক্স-খায় কিচমিচ।
সেভেন-আপনে কি
বিয়ে করবেন।

১২

I am মিতা
মাথায় পড়ি ফিতা
কানে পরি দুল
প্রিয় আমার ফুল।
পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলি না।
তার সাথে আরি
যাই না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ি দোতালা
করে শুধু ঈশারা।

www.pathagar.com

মাগো তোমার পায়ে পড়ি
বউ এনে দাও খেলা করি।
বউয়ের মাথায় লম্বা চুল
বেঁধে দিবো গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের সুগন্ধ
জামাই বাবুর আনন্দ।[২৮]

ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক ছড়া

১

একটা কুঞ্চি অ্যাহা ব্যাহা।
ফুল ধরে ঝোপা ঝোপা
খাদিজার মায়ের পিচকা চুল,
তেল দিলি কুচকুচ করে
পাল খালি বুলবুল করে।

২

পাকা আঙ্গুর কেদুর
তিন শয়তানের নেঙ্গুর।

৩

ফিরার তলে সাপ,
মেম্বার তোর বাপ।

৪

বাঁশের পাতা,
তোমার গোয়ার মধ্যে এত ছাতা।

৫

পাটা?
গুয়ার মধ্যে দেও ন্যাটা।

৬

শিল?
গুয়ায় মারমু কিল।

৭

কলা?
বাইদানী তোমার বড় খালা।

৮

হাত দাও?
বাইদানী তোমার মাও।

৯

কাঁচি?
বাইদানী তোমার চাচী।

www.pathagar.com

১০
জাওলো জাওয়া,
তোমার নাইগা
পরাণ পরে বাইয়া পাও।

১১
সনির মারে কুরকা নিল,
হোটকা শেয়ালে
ও সনি তোরা দৌড়া সকলে।

১২
ছাদকা ছাদকা ছাদকার বউ
কি জানি কি করতাছে?
তাই দেইখা শাপলা চম্পা
চিক্কুর পাইরা ক্যানতাছে
চিং পানটিং ছুট।

১৩
বাদলের বাপের নাম তাজা
পথে পাইল খাজা
আত দিয়া দ্যাহে নরম,
তুলে দ্যাহে গু,
কোন ব্যাটা শালা হাইগা থুইছে
রুটির ন্যাহাল গু
থ্যাক থ্যাকা ভ্যোগা ভ্যাগা ভুগ গা।

১৪
সাগর আলী গোয়ার তালি।
ডিম পাড়ে হালি হালি,
একটা ডিম নষ্ট
সাগর আলীর কষ্ট।
সাগর আলী কুমকুম
চাককুম কু চাককুম।

১৫
আলো মাগীর দরজা,
ডিম পাড়ে বারটা।
একটা ডিম নষ্ট
আলো মাগীর কষ্ট।

১৬
আশার মায়ের কাঁসা হারায়ছে,
মাইচ তলায় কাঁসা।
থুইয়া নাড়াই বাজাইছে।

www.pathagar.com

১৭

চিমাটি দিলি কেন?
দুক্ষু পাইলাম কে,
মাইচ তলায় কোলা ব্যাঙ
তোর নানীর চার ঠ্যাং।

১৮

আবু বক্কার
গোয়া ফাঁক কর
গোয়ার মধ্যে নখ দিয়া,
আল্লাহু আকবার।

১৯

হাইয়া আলাল ছালা
ডাব পাড়ে কোন শালা।

২০

আদি বাড়ির পাদী নাম।
পান ধুইনী ছেরীর নাম,
দ্যাখাড়া তোর মায়েক জিজ্ঞাস কর
পদ নিয়াইছে তার অ্যান।

২১

বিশা আগতি পায় না দিশা
হুচতি পায় না পানি
গোয়ার মধ্যি ইটা লইয়া
করে টানাটানি।[২৯]

নির্বাচনী ছড়া

১

চেয়েছিলাম যাহা পেয়েছি তাহা
আর কিছু চাই না।
বেঁচে থাক যত দিন,
তোমায় যেন ভুলি না
তোমার নাম রেজাউল করিম রোকনী,
আমরা জানি তুমি অনেক জ্ঞানী।
তোমার জ্ঞান দিয়ে করবে ইউনিয়ন পরিষদ পরিচালনা
এটাই আমাদের ইউনিয়নবাসীর কামনা।

২

একদফা এক দাবি
এরশাদ তুই কবে যাবি।[৩০]

www.pathagar.com

শক্তি পরীক্ষামূলক ছড়া

১

জোর আছে?– আছে
তালি জোর করো রে জোর করো।
জোর করো হুজুগ দিয়া
এই জোর যে না করবো
তার নানীর সাথে
আমার বিয়া অইবো।

২

ওইরে আল্লা বলো হাঁই ও;
সাবাশ জোয়ান হাঁই ও;
জোরে টানো হাঁই ও;
নামবো তরী হাঁই ও;
খেলার মুড়ি হাঁই ও;
ভাদুর মাসে হাঁই ও;
তালের পিঠা হাঁই ও;
শ্বশুর বাড়ি হাঁই ও;
নাশতা মিঠা হাঁই ও;
ঐ বোল রে হাঁই ও;
হাঁই ও হাঁই ও।

এই ছড়াটি যে শাহজাদপুরের কিশোর-কিশোরীদের কাছে সর্বদাই অতি জনপ্রিয় বরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের ২৮ সংখ্যক পত্র পাঠেও তা বুঝতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা– 'ডাঙ্গার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়েছিল- গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলোবর সহকারে সেই টাকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তাহলে খুব একটা নতুন এবং আমোদজনক খেলার সৃষ্টির হয়। যেমন : মনে আসা অমনি কায়ারাস্ত্র। সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মরো ঠেলা হেঁইয়ো' মাস্তুল যেমন এক পা ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দে উচ্চহাস্য।[৩১]

এছাড়া শাহজাদপুর অঞ্চলে আরো বিভিন্ন ধরনের ছড়ার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। যেমন–

১

ইটার ক্ষ্যাতে মিষ্টি আলু
কোদাল মারে জফের খালু
জফের খালু পাগলা
ঘুর‍্যা ব্যাড়ায় একলা।

www.pathagar.com

২

কোরোপ আলীর বাড়ির পাশে
কলমি লতা পানিত ভাসে
পানিত ভাসা ঢ্যাপের ফল
সোঁত চললি রসাতল।

৩

আয়লো সখি আয় সোজনী
মিয়া ডাঙার কেচ্ছা শুনি
কেচ্ছা চলে চিত চটানে
ভরলো জাহান আলোর বানে
উঠান ভরা শক্ত মাটি
পাতা আছে শেতোল পাটি
ঘিরা্যা বস্যা কেচ্ছা শোনে
এক দুই তিন একুশ জনে।

৪

ঐ ছ্যামরারে ধর, চুঙ্গার মোদদি ভর
চুঙ্গা যানি লড়ে না, ছ্যামরা যানি পড়ে না
চুঙ্গা গ্যালো ফাট্ট্যা, ছ্যামরা গ্যালো আট্ট্যা।

৫

ছেঁড়ি বড় রসিকা
খিলখিলাইয়া হাসে রে
কার লাগ্যা গাঁতে মালা
কাক ভালবাসে রে।

৬

কাল্যা রাত ঘোর ঘোর
এক ঘরে একলা
বাও ছোটে সাঁই সাঁই
আককাশ ম্যাগলা।

৭

রোগা ছোড়া করে প্যাট টিন টিন
এডা খাও ওডা খাও ভর দিন।

৮

গুন গুনানী বল্লায়
একটো কতুর কল্লায়
কল্লার চালে
ঠিক দুপুর্যা তালে
ঠিক দুপুরে ভাস্যা আসে
ভরা গাঙে ভাদাল ভাসে

www.pathagar.com

ভাদাল ঘাসের কুলে
তিনডো পোকার কোলে।[৩২]

বিবিধ ছড়া

১
ইটের উপর ইট,
তারই উপর ইট।
তুমি বন্ধু চলে গেলে
মনে লাগে হিট।

২
দয়াল বাবা কলা খাইবা
গাছ লাগাইয়া খাও।
মানসের কলা দেইখা কেন
মিট মিটাইয়া চাও।

৩
ওহিদুল ভাইয়ের দোকানে
এ ট্যাক করমু চারজনে,
পাপ্পু, পারভেজ, হিমেল,
ময়দানে..... ।

৪
বিড়ি খাবি খাঁ,
মইরা যাবি যা
প্রচারে সাজেদুল মতে খাঁ।

৫
মামু তুমি স্বাক্ষী,
পানির তলে পক্ষী।
নোটা আন পোটা দেই
কলসি আন ব্যাবার নেই।
কোনার মাও পোঁকা খায়
তল মুইহা ধূয়া যায়।
কোনার মধ্যে কর কি?
দুধের আটা চড়াইছি।
পান আন পান খাই
ঘোড়া আন বাড়িত যাই।[৩৩]

৬
খুদুমণি রায়,
জুরাণ গাছা যায়।

www.pathagar.com

সে একটু রাজা মশাইয়ের
সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়।

৭

যদি পড়ি বাংলা
হয়ে যায় আগলা।
যদি পড়ি অংক,
হয়ে যায় আতঙ্ক।
যদি পড়ি সমাজ,
নাই কোনো বসবাস।
যদি পড়ি বিজ্ঞান,
হয়ে যাই অজ্ঞান।
যদি পড়ি ইংরেজি,
মাথা দেই ডিগবাজি।
যদি পড়ি ধর্ম,
নাই কোনো কর্ম।

৮

ওয়ান, টু, থ্রি
পেলাম একটা বিড়ি,
বিড়িত নাই আগুন
পেলাম একটা বাগুন।
বাগুনে নাই বিচি,
পেলাম একটা কেচি।
কেচিত নাই ধার
পেলাম একটা হার।
হারে নাই লকেট
পেলাম একটা পকেট।
পকেটে নাই টাকা,
চইলা আইলাম ঢাকা।
ঢাকায় নাই গাড়ি,
ফিরা আইলাম বাড়ি।
বাড়িত নাই ভাত,
মারলাম একটা পাদ।
পাদে নাই গন্ধ,
হাই স্কুল বন্ধ।
হাই স্কুলে যাব না
ব্যাতের বারি খাব না।
ব্যাত গেল ভাঙ্গা
স্যার গেল কান্দা।

www.pathagar.com

৯

What is chatoi pitha
One side পোড়া পোড়া
Others side ফোঁড়া ফোঁড়া
It is a চেতই পিঠা।
Some bamboo খাঁড়া খাঁড়া
Other bamboo পাড়া পাড়া
One inch পর পর তারাকাটা গাড়ি।[৩৪]

১০

নাম আশা,
গ্রাম ভালোবাসা।
পোস্ট প্রেমপুর
জেলা বহুদূর।

১১

টুনটুনি টুনটুনালো
সাত রাণী নাক কাঁটা গেল।
এক রাণীর গুয়া কাটা গেল।

১২

তাল গাছে লাল গামছা
কইয়া দিল কে?
ছয় বছরের ছল হইল
নাম থুইল কে?

১৩

কাঠবিড়ালী কাঠাল খায়
দাঁতগুলো তার দেখা যায়
রাজার মেয়ের বিয়ে হয়
লম্বা লম্বা শাড়ি পায়
শাড়ির ভেতর গোমা সাপ
লাফ দিয়ে ওঠে কনের বাপ
কনের বাপের নাম কি?
পান খাওয়া জিলাপী
নানীর বাড়ি যাবো না
পোড়া মুড়ি খাবো না
নানী দিলো পোড়া মুড়ি
খাতি খাতি মোল্লা বাড়ি
মোল্লা দিলো ভাঙ্গা ঘর
আল্লাহ্ আকবর।

www.pathagar.com

১৪
আপেল শক্ত
বেদনার রক্ত
গোল্লার ঝোল
কাপা কাপা তোল
অরেঞ্জের ভাবি
পিঠা কুটবার যাবি
পিঠা নিলো চোরে
বর আসবি ভোরে।
১৫
টুপটাপ আলুর চপ
একটা লিচুর বাগানে
একটা লিচু পরে আছে চাউলার দোকানে
ও চাউলা ও চাউলা দোকান খোল না
স্টেশনের বউ এসেছে দেখতে যাবে না?
না না না হাতে লেডিস ঘড়ি
চোখে চশমা পড়ি
এসো আমরা সবাই মিলে খেলা করি।
১৬
কাঠলের পাতা ছেবাড়া
বউ আনছে মুর্শিদা
ক্যা মুর্শিদা কান্দিস ক্যা
ঝন্টু ধরে মারছে
ক্যা ঝন্টু মারছু ক্যা
ঢাকার শাড়ি চায় ক্যা
আমার বাড়ি যাইও
আম কাঁঠাল ভেঙ্গে দেবো
ডালে বসে খাইও
ডালে পরলো মাছি
কোদাল দিয়ে কাছি
কোদাল হলো বাঁকা
কামাড় দিয়ে দেখা
কামাড় বললো পারবো না
ঝন্টু বললো ছাড়বো না।[৩৫]
১৭
শাস্তির শাক তুলতে গেলাম
পা পিছলে পড়ে গেলাম

www.pathagar.com

ভাসুর এসে দেখে গেলো
তাওতো ভাসুর চিনলো না
কালা ভাই মারছে
হাতের চুড়ি ভাঙছে
হাটে যেনো যাওয়া হয়
চুড়ি যেনো আনা হয়
আনবারকচি সোনার চুড়ি
আনছে হইলো বাইদার চুড়ি
বাইদার চুড়ি কি পড়া যায়
বাপের বাড়ি কি যাওয়া যায়।

১৮

বৃষ্টিরে বৃষ্টি তোর না বলে বিয়া
কে কইলো মা কে কইলো
ঐ পাড়ার টিয়া
মরার টিয়া মরে না
হলদি বড়াই সয় না
হলদি হলো বাসি
আশি টাকার খাসি
নব্বই টাকার দই
চিড়া মুড়ি খই
আকাশের তারা ঝিকিমিকি করে
পাবনার ছেরিরা কুতকুত খেলে
ও ডিস্কো ভাবি পিঠা কুটবার যাবি
পিঠা নিলো চোরে
বর আসবি ভোরে
বরের নাম জব্বার
আল্লাহু আকবর।

১৯

একখান কুঞ্চি একাবেকা
ফুল ধরে ঝোপা ঝোপা
সেই ফুল মামার বাড়ি
মামার বাড়ি ফেকচা চুল
তেল দিলে কুচকুচ করে
সিদুর দিলে বুলবুল করে
লোটা আনো ফোঁটা দেই
মেয়ে আনো বিয়ে দেই
মেয়ের জামাই বিড়ি খায়

www.pathagar.com

গাল ভরে ধুমা দেয়
ধুমার ভেতর পক্কি
মজনু ভাই সাক্ষী।

২০

ছোট্ট একটি বরই গাছ অনেক বরই ধরে
টিয়া পক্কি ঠোকর দিলে ঝুপঝুপিয়ে পড়ে
কলেজের ছেরিগরে লম্বা লম্বা চুল
চুলের সাথে লেখা আছে ভালোবাসার ফুল।

২১

হাওমিলো চুলো চুলো
বেজিময় পিনবয়
সাত সমুদ্র পেরিয়ে
ভাবি এলো বেড়িয়ে
ভাইয়ার কাছে বলো না
চিড়িয়াখানায় চলো না
চিড়িয়াখানায় হাতি নাই
আমার কোনো সাথি নাই
সাথি ছাড়া বাঁচবো না
এ জীবন রাখবো না।

২২

একখান পক্কি রান্ধে বাড়ে
দুইখান পক্কি খায়
অনাহারের মেয়েরা চাল কুড়াতে যায়
চালের ডালা ফেলে দিয়ে বউ দেখতে যায়
বউয়ের নাম নাজমা
ঝুমুর ঝুমুর বাঁজনা
উল্লাপাড়ার ছেরিরা হাফ প্যান্ট পড়ে
উল্লাপাড়ার ছেরারা হাফ ডুস পড়ে।

২৩

ছি ছি ছি দাদু পান সুপারি খায়
পান সুপারি খেতে খেতে হাট বাজারে যায়
হাটে ছিল খেপা কুত্তা কামড় মেরেছে
সেই কামড় খেয়ে দাদু গাছে উঠেছে
গাছে ছিল কাঠবিড়ালী চিমটি মেরেছে
সেই চিমটি খেয়ে দাদু পানিতে পড়েছে
পানিতে ছিল ধোড়া সাপ ছোবল মেরেছে
সেই ছোবল খেয়ে দাদু ছাদে উঠেছে

www.pathagar.com

ছাদে ছিল ডাইনি বুড়ি ধাক্কা মেরেছে
সেই ধাক্কা খেয়ে দাদু বাড়িতে গিয়েছে
বাড়িতে ছিল টোনাটুনি খেপে গিয়েছে
আকাশে ছিল নীল পরি বৃষ্টি দিয়েছে
সেই বৃষ্টি খেয়ে দাদু প্রেমে পড়েছে।

২৪

মেহেদি গাছে উঠছিলাম
ডাল ভেঙ্গে পড়ছিলাম
উশি উশি পাতা
সোনালী তলা
ডগডগা ফুল
সখি বলোনা কবুল।

২৫

এতোবড় উঠান ঝাড় দেবো কখন
ফুল পড়ে ঝড়ে গেলো খুটবো কখন
ঐ পাড়া গেছিলাম ডালদিয়া ভাত খাছিলাম
ডাল হলো ঘন আমার নাম মনো।

২৬

এ কাউয়া তোর পাখার তরে কি
ডিম পেড়েছি
ডিম করলি কি
বেচে ফেলেছি
টাকা করলি কি
পান কিনেছি
পান করলি কি
খেয়ে ফেলেছি
পিকচি করলি কি
ছোট নানী বড় নানীর পাছায় মেরেছি।

২৭

হলদি গাছের তলে টিয়া পাখি ডাকে
অতো ডাকা ডেকো না
স্বামীর গলা ভেঙ্গো না
স্বামী গেছে বিদেশে
একটি শাড়ি এনেছে
ও শাড়ি কি পড়া যায়
বাপের বাড়ি কি যাওয়া যায়।

www.pathagar.com

২৮

হাঁসের বাচ্চা চই চই
ও গেদা তোর বাড়ি কই
বাড়ি আমার রংপুর
বেচি আমি চানাচুর
চানাচুরের দাম কত
আট আনা চার আনা
যাতি আসতি বার আনা।

২৯

আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পড়ি দুল
বাবলা গাছের ফুল
পাশের বাড়ি সেলিনা
তার সাথেতো খেলি না
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ি দোতলা
করে শুধু ইশারা
ইশারাতো বুঝি না
কারোর সাথে মিশি না
মাগো তোমায় বলি
পুতুল এনে দাও খেলনা করি
পুতুলের মাথায় লম্বা চুল
বেধে দেবো গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলের গন্ধ
হাইস্কুল বন্ধ।

৩০

আমগাছ তলা একটি ঘর
ভূতে কয় বাড়াবান
সাত ঘুঘু মুসলমান
এক ঘুঘু মরলো
ওসমান এসে ধরলো
ওসমান গেলো হাটে
গাই বিয়ালো মাঠে
গাইয়ের নাম ধনি
বাছুরের নাম টুনটুনি

www.pathagar.com

মা মরছে শিশুকালে
বাপ করছে নিকা
সৎ মাও ভাত দেয়
গালে চিবি দিয়া।

৩১

মামুন ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিবো কিসে
ধান ফুরালো প্রাণ ফুরালো খাজনার উপায় কি
আর কয়টা দিন সবুর করো রসুন বুনেছি।

৩২

ট্রেন ট্রেন বাইশ ট্রেন
রাজবাড়ি দিয়ে যাচ্ছে
পান সুপারী খাচ্ছে
পানের আগায় মরিচ বাটা
হাইস্কুলের চাবি আটা।[৩৬]

ছন্দ

১

ছাত্র জীবন সুখের নয় কষ্ট করে পড়তে
হয় যদি কষ্ট সফল হয় ছাত্র জীবন সুখের হয়।

২

হাফ প্যান ডোরা ডোরা ফুল প্যান্ট টায়িট
তোমার আমি ভালোবাসি এই কথা রাইট।

৩

পুকুর যখন কেটেছি মাছ আমি ছাড়বই
ভালো যখন বেসেছি বিয়ে আমি করবোই।

৪

ফুলকে ভালোবেসে ফেলে দিও না
মানুষকে ভালোবেসে ভুলে যেও না।

৫

কচি কচি পাতা কচি কচি মন
সব চেয়ে ভালো লাগে ছাত্রীর জীবন,
আমি চাই ভালোবাসা দিনা চায় গোরুর
মাথা খাবে সে গুড় মুড়িয়ে একটু আমায় দেবে না সে।[৩৭]

www.pathagar.com

ছড়ায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ

পালাই	:	পালিয়ে যাওয়া
গ্যাদা	:	ছেলে
কান্দে	:	কাঁদে
নয়ার	:	সঙ্গী
যাপুর	:	পুকুরে ঝাঁপ/লাফ দেয়া
শ্যামা	:	ছায়া
কওনা	:	বলনা
কইবো	:	বলব
গা জ্বলে	:	শরীর জ্বলে
কস	:	বলা/বলিস
খাইছে	:	খেয়েছে
খোয়া	:	খোঁয়াড়
বান্ধি	:	বাঁধা
বিয়া	:	বিয়ে/বিবাহ
বিলা	:	দিকে
ছোঁ	:	ছুঁয়ে দেয়া
আসেন	:	এসো/আসবেন
বইসেন	:	বসো
চুক্কা	:	টক
ট্রানজেস্টার	:	রেডিও
পইড়া	:	পড়ে
অ্যাহাব্যাহা	:	আঁকাবঁকা
ঝোপাঝোপা	:	অনেক
দিলি	:	দিলে
কুচকুচ	:	কালোকালো
খালি	:	খেলে
মাও	:	মা
পালা	:	পাতিল
পরমুনা	:	পরব না
বসমু	:	বসবো
চরমু	:	চড়বো
কাশা	:	ঢাকনা
চরায়	:	ক্ষেত
কিসের	:	কার
বাপে	:	বাবা
দিমু	:	দিব

www.pathagar.com

কয়	:	বলে
পাক্কা	:	পক্ক
ফুটাইল	:	ফুটল
হেলানী	:	নেড়ে দেয়া
অ্যাড়া বেড়া	:	আঁকা বাঁকা
দোস্ত	:	বন্ধু
তইলা	:	নিচে
করকরা	:	ঠাণ্ডা
কুটি	:	কাঁটা
ঝাঁকঝাঁক	:	অনেক
গেদি	:	মেয়ে
নাইগা	:	জন্য
খাইব	:	খাবে
ভাতার	:	স্বামী
মরল	:	গেল
যামু	:	যাব
ব্যাটা	:	ছেলে
নিবার	:	নিতে
গোরে	:	কাছে
সেলাম	:	সালাম
বাইবুরী	:	বাহির বাড়ি
রান্ধুন	:	রান্না
তুইলা	:	তুলে
নিসি	:	নিয়েছে
ছল	:	ছেলে
ফুচ্চি	:	ফিরে তাকালো
দিশা	:	টের/স্বরণ
হরির	:	শাশুড়ির
কুরকা	:	মুরগি
চাও	:	তাকাও
চিক্কুর	:	চিৎকার
আত	:	হাত
ন্যাহাল	:	মত
এট্যাক	:	আক্রমণ
মাগী	:	মেয়ে মানুষ
থুইয়া	:	রেখে
নাড়াই	:	ঝগড়া

www.pathagar.com

দুক্ক	:	ব্যথা
নোটা	:	বদনা
কোনার	:	আড়ালে
উস্তা	:	করলা
আইল	:	আসল
মিয়া	:	মেয়ে/কন্যা
আগা	:	সম্মুখ ভাগে
দ্দেদারা	:	নরম
ব্যাড়া	:	বেড়া
দোর	:	দৌড়
ছেরী	:	মেয়ে/কন্যা
বাগুন	:	বেগুন
চইলা	:	চলে

লোককবিতা

লোককবিতা লোকজ সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য ধারা। লোককবিতা সাধারণত স্থানীয় ঘটনা প্রবাহ, মানুষের জীবন জীবিকা, আবহাওয়া এবং আর্থ-সামাজিক বিষয় নিয়ে রচিত হয়। কবিতাগুলো নাতিদীর্ঘ হয়ে থাকে। এসকল কবিতার রচিয়তারা স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ করে থাকেন। অনেক সময় এগুলো হাটে-বাজারে এবং কোনো অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এ ধরনের কবিতা গ্রামে-গঞ্জে বেশ জনপ্রিয়। নিচে সিরাজগঞ্জ জেলার কতিপয় লোককবিতা উল্লেখ করা হলো :

১

ওরে আইস্যা গেলো কলির কাল
ভেড়ার চাটে বাঘের গাল
ঔষধ ভালো নিমের ছাল
বিয়ে বাড়ি নারীর পাল
ভাদদুর মাসে পাঁকে তাল
মোদের দেশে পাওয়া যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে খাইতে ভাল পাটারি গুড়
তামুক ভালো মতির চুর
কলের গায়ানের নতুন সুর
মিষ্টি আলু অনেক দুর
সস্তার পক্ষে বাংলার ফুল
আরো আছে কলকাতায়

www.pathagar.com

ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে ফুল ভালো গোলাপ ফুল
নারীর সভা মাথার চুল
দেখতে ভালো হাওড়ার ফুল
হাওয়া ভালো গাংয়ের কূল
খেলতে চাম পুড়ে যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে আলতা দিলে হয় বউ খুশি
বিড়ি দিলে হয় রাখাল খুশি
ঘোড়া চুলে উকুন বেশি
পাড়া-পড়শির মায়া বেশি
বিপদকালে পাওয়া যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে ভাজা মাছে বিড়াল পাগল
শিশুরা হয় দুধে পাগল
কার্তিক মাসে কুকুর পাগল
যুবতি দেখলে হয় যুবক পাগল
ঐ যে আরে টারে কথা কয়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে হাতি দমন লোহার শিকলে
বাতাস দমন হেরিকলে
ইদুর দমন কেচিকলে
মশা বন্ধন মাগরি জালে
সাপে দমন উদে খাইলে
পাগল দমন কিল গুতায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
পুরুষ দমন নারীর কলে
বলদ দমন হাল জুড়িলে
লাউ কুমড়া ঘরের চালে
বাড়ি বাড়ি পাওয়া যায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে বাক্স বন্ধন চাবি তালা
তিলের আশায় ভরলে ছালা
ধানের আশায় দিলে পালা
ধানের আশা থাকলে ভালা
মুড়ি ভাইজা ভড়ে কোনা
মচমচাইয়া খাওয়া যায়

www.pathagar.com

ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে আঙ্গল দিলে হয় ঘের্ত নষ্ট
মায়ের বাড়ি ঝি নষ্ট
ধোপার কাছে কাপড় নষ্ট
খেওয়ার ঘাটে নৌকা নষ্ট
অন্ধ লোকের বড় কষ্ট
ঘাটায় পথে উছাট খায়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥
আরে নতুন নতুন বিয়ে করি
যাওরে দাদু শশুর বাড়ি
কিনে লওগা সাইকেল গাড়ি
যাইতে পারবা তারাতারি
চোখে চশমা হাতে ঘড়ি
মনে তখন কিবা কয়
ভেবে দেখেন কথা মিথ্যা নয় ॥[৩৮]

২

আর....আল্লার নামটি স্মরণ করে
আমি কিছু ভাবিলাম দেলে
ওরে আল্লা যারে দান করে
ফুরায় না তার এই ভবে।
আল্লার রাস্তায় দান করিলে
ও ব্যাটা পাইবা পরোকালে ॥
আর মফিজ হাজী নামটি শুনি
শ্যামবাড়িয়া তিনির বাড়ি
সেও কথা সবাতে বলি
ওরে তার ঘরে পুত্র এলো
ওরে নাম রাখিল মোখলেস আলী
দেশ-বিদেশে থাকে ব্যাটা
ও ব্যাটা টাকারি খনি ॥
গুপিনাথপুর বসত করে
মোখলেস বলে সবাই ডাকে।
বাড়িত আনে চুক্ষ শিবিরি
ওরে টাকা পয়সা নেয়না বলে
ছাড়লো সবাই ঘর-বাড়ি
ওরে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করে
ও ডাক্তার আইন্যা তার বাড়ি ॥

www.pathagar.com

আর সেই কথাটি শুইনা আমি
বসলাম পুকুরের ঐ পাড়ে
ওরে সারি সারি কত লোকও
ওরে আসতাছে আর যাইতেছে
লক্ষ্য কইর‍্যা দেখলাম আমি
ঔষদের বাণ্ডিল তার হতে ॥
আর আশা কইরা আসলাম আমি
দু-টা কথা বলবো তার সাথে
ওরে সেও ভাগ্য হলো না আমার
আমি চিন্তা করলাম তাতে
ওরে ফিরে আমি বাড়িত যেয়ে
ও বইশ্যা ভাবিলাম দেলে ॥
আর দানের কথা বলতে আমার
হৃদয় যায় ফেটে যায়।
ওরে তিনি যখন বাড়িত আসে
দেশের লোক সব যায় ছুটে
কিভাবে সে দান করে
ও বৃষ্টির পানি যেমন জমিনে পড়ে ॥
আর দান পেয়ে খুশি হয়ে
সবাই বসে পরামর্শ করে
ওরে এমনও দয়ালদাতা
ওরে পাব লয় আমরা এই ভবে ॥
মরলে যেন জান্নাতি হয়
এই দোয়া করি সকলে ॥
আর হরিরামপুর বসত করি
নামটি আমার আজির উদ্দি
ওস্তাদ আমার তায়জাল মিয়া হয় ॥
ওরে বিদ্যাবুদ্ধি নাইকো ধরে
ওরে কি দিয়ে ধুয়া মিল হয়
এ পর্যন্ত করলাম খ্যান্ত
ও দোয়া করিবেন সবাই ॥[৩৯]

৩

সখিরে বন্ধু বিনা প্রাণ রয়না ঘরে প্রেম জাতনা
আমার শ্যাম সেই কালো সোনা
আমি সদয় থাকি বাহা চাইয়ারে
আমার প্রাণে ধৈর্য মানে না

www.pathagar.com

নিষ্ঠুর কালা দিচ্ছে জ্বালা
সেতো আর ব্রজে এলো না।
প্রাণবন্ধু বংশীদারী কেন ফাঁকি দিলে
ঝাপ দিয়ে মরবো আমি যমুনার জলে
তোমার কারণে সব গুপীগণ কানছে বসে গোকুলে
সেও কথা কি হয় না স্মরণ
যাবার কালে কি বলেছিলে।
প্রেম জ্বালা ভীষণ জ্বালা সহেনা অন্তরে
বন্ধুর কারণ দিবা নিশী দুই নয়ন ঝড়ে
আমি অবলা সরলা বালারে ভাসাইলে সাগরে
শোনলো বিন্দা কই তোমারে
এনে দেও মোর প্রাণ বন্ধুরে
নইলে ঘরে রই কেমন করে।[৪০]

৪.

আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঢাকা গেলাম জেগে দেখি বেলা নাই
কোন পথে প্রেম বাজারে যাই
প্রেম বাজারে যাবো বলে ঘর বেঁধেছি নিড়ালে
হঠাৎ কামেশ্বরীর দেখা পেয়ে পথ গেলাম ভুলে
দেখি পঞ্চদিকে পঞ্চরাস্তা কোন দিকেতে পা বাড়াই
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঢাকা গেলাম জেগে দেখি বেলা নাই।
কোন রাস্তাতে কেমন লক্ষণ চিনবো আমি কি করে
কোন কাটাতে ওজন করে প্রেম রতন কেনে আর বেঁচে
আমার দেশে ছয় ষোল জনে যুদ্ধরণে বাদ্য নাই
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঢাকা গেলাম জেগে দেখি বেলা নাই।
কামেশ্বরীর দেখা যদি পাইতাম জীবনে
অন্তরের ক্যামেরা দিয়া রাখতাম গোপনে
ছকির বলে আয়না চলে আমি প্রেম দুলালী দেখে যাই
আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ঢাকা গেলাম জেগে দেখি বেলা নাই।[৪১]

৫

প্রাণ বন্ধুরে পিরিতি করিয়া নামানিচিতে
আমার জনম গেলো কান্দিতে
প্রাণ বন্ধুরে পিরিতি করিয়া নামানিচিতে।
তুমিরে বন্ধু অতি যে নিষ্ঠুর
তুমি আমি দুইয়ের মাঝে ভিন্ন কতদুর
তোমার রাঙ্গা পায়ে সোনার নুপুর

www.pathagar.com

মন চায় আমার দেখিতে
পিরিতি করিয়া নামানিচিতে।
তুমি বন্ধু থাকো মথুরায়
আমি অভাগিনী কান্দি পাগলিনী প্রায়
পাড়ার লোকে গাইয়া বেড়ায়
কলঙ্কিনী জগতে
পিরিতি করিয়া নামানিচিতে।
তুমিরে বন্ধু থাকো যে সুখে
আমি অভাগিনী কান্দি দেখুক জগতে
কাদলে কাদিতে হবে রজব কয় বিচার মতে
পিরিতি করিয়া নামানিচিতে।[৪২]

৬

কালার বাঁশির সুরে মন উদাসী ঘরে রইতে পারি না
কালা যখন বাঁজায় বাঁশি আমি তখন রানতে বসি
মন হয় উদাসী
বাঁশির সুরে মন হরে গো ঘরে রইতে দিলি না
কালার বাঁশির সুরে মন উদাসী ঘরে রইতে পারি না।
পুরুষ লোকের এইনা ধর্ম বোঝে না সে নারীর মর্ম
পুরুষ জানে না
আমি নারী কুলে জর্নম নিয়া সইলাম কত বেদনা
রইতে পারি না।
এবার মরলে পুরুষ হবো কালারে নারী সাজাবো
মনের বাসনা
আমি পুরুষ হয়ে বাঁজাবো বাঁশি
বুঝবে নারীর কি বেদনা
রইতে পারি না।
মন পুরিলে সবাই দেখে মনের আগুন কেউ না দেখে
সে আগুন দেখা যায় না
বনের আগুন জল দিলে নেভে
মনের আগুন নেভে না
রইতে পারি না।[৪৩]

৭

কৃষ্ণ যখন বাঁজায় বাঁশি রাধে তখন রানতে বসে
কদমতলায় থেকেরে কৃষ্ণ বাঁজায় মোহন বাঁশি
বাঁশি বাঁজিলো রাধে আসিলো কৃষ্ণ তখন যায় তাড়াতাড়ি

www.pathagar.com

আবার রাধে করে কান্নাকাটি।
রাধের কান্নাকাটি শুনিয়ারে কৃষ্ণ বসিয়া ভাবে মনেমনে
তুমি যাবে সেই বিন্দাবনে আমি যাবো তোমার সনে
আমি সেখানে যাবো চরণে রবো বলিযে তোমারে
আবার রাধে গেলো সেই বিন্দাবনে।
বিন্দাবনে যায়ারে কৃষ্ণ রাধের কাছে গেল
রাধে তখন কান্দে ওঠে কৃষ্ণর পায়ে পড়িল
অধম ছকির উদ্দিন বানছে ধুয়া একি জ্বালা হলো
কৃষ্ণ মামীর সঙ্গে প্রেম করিল।[৪৪]

৮

বিন্দা আমায় শিখিয়াছে সই
মান করে থাকো ও নন্দিনী
আগে কি সই এতোই জানি
মানতে হয় প্রেমের হানি
আগে কি সই এতোই জানি।
কৃষ্ণ প্রেমে এমনি ধারা
জিয়ন্তে হয়েছি মরা
কাল আসবে বলে গেল চলে
এলো না সেই যাদু ধ্বনি
আগে কি সই এতোই জানি।
আমার কি হইতে কি হইলো ও সই
সিঁথির সিঁদুর চন্দনমাখা মুছে গেলো
আসবে বলে গেলো হরি
শূন্যকরে ব্রজপুরী
আগে কি সই এতোই জানি।
ছকির তাই ভেবে বলে
আমার জরনম গেলো ভুলে ভুলে
আমি ভুল করিয়া এই ভুল হলো সই
শুকায়না চোখের পানি
আগে কি সই এতোই জানি।[৪৫]

৯

শোনো রাধে বলি তোমারে
উলঙ্গ বেশে যমুনাতে কি জন্য এলে
সব রাখালে নিয়েছিলো সেই কদম্বমূলে
তোমার না ছিল বসন

www.pathagar.com

তোমার রূপ দেখিয়া ঠিক না রবে
ভুলবে কত মনির মন।
মথুরার শ্যামের লাগাইয়াছো বাজার
সকল সখিকে সঙ্গে করে করছো পাড়
তুমি ভজলানা পতি ও দূর্গতি
পরার সনে দিতাছাও বাহার
তোমার এরূপ যৌবন ঠিক না করে
শেষে হবে দধি বেঁচা সার।
ছকির উদ্দিন বলে গেছে তাই
উলঙ্গ বেশে রেখেছি তোমায়
তাইতো আমায় জেলে দিতে চাও
চলো দেখি রাজার হুজারী
ওসুন্দরী আমি নিবেদন জানাই
তোমার বসন নিয়েছি বলবা তুমি
তাতে আমার লজ্জা নাই।[৪৬]

১০

আরে ও ভাটি গাঙ্গের নাইয়া
কোনবাদেশে চলছাওরে বন্ধু আমারে যাও লইয়া।
বাতাসেতে আনলো বয়ে তোমার গানের সুরে
মনোমাঝে দোলালাগে ঝংকারে বন্ধুরে
সাত সমুদ্র তের নদী আইলা পারি দিয়া
মরা গাছে ফুল ফুটেছে বন্ধু তোমার আশ্বাস পাইয়া
ভাটি গাঙ্গের নাইয়া
কোনবাদেশে চলছাওরে বন্ধু আমারে যাও লইয়া।
সোনার দেশের বন্ধু তুমি সোনার বাঁধা লাও
সোনার ঘাটে লাও ভিড়াইয়া আমার প্রাণে চাও
সোনার মুখে মধুর বাণী যাওরে শুনাইয়া
সোনার যৌবন করলাম ভাটি তোমারও লাগিয়া
ভাটি গাঙ্গের নাইয়া
কোনবাদেশে চলছাওরে বন্ধু আমারে যাও লইয়া।
কতযে ভেবেছি বন্ধু কতযে কেঁদেছি
বুকের মাঝে দুঃখের আঘাত কতযে সয়েছি
কতযে বেদনা ভরা আছে হিয়ার মাঝে
ছকির বলে কূল পাইলাম না তোমারি লাগিয়া
ভাটি গাঙ্গের নাইয়া
কোনবাদেশে চলছাওরে বন্ধু আমারে যাও লইয়া।[৪৭]

www.pathagar.com

১১

শহরবানু কেন্দে বলে আমার দুধের শিশু মারা যায়
পিপাসায় কি আগুন লাগলো কলিজায়।
মায়ের বুকে দুগ্ধ নাই
পিপাসাতে হইলো ছাই
কথা বলার শক্তি নাই
মুখ শুকাইয়া যায়
হোসেনের নিকটে যাইয়া
শহরবানু কয় কান্দিয়া
দুধের শিশু যায় মরিয়া
বসে আছো কোন কামনায়
পিপাসায় কি আগুন লাগলো কলিজায়।
শিশু ছেলে লইয়া কোলে
উঠাইয়া ঘোড়ার কোলে
হোসেন নদীর কূলে যায়
নদীর কূলে যাইয়া দেখে
এজিদের লোকজন আছে ঘিরে
হোসেন বলে করজোড়ে
একবিন্দু পানি দাও আমায়
পিপাসায় কি আগুন লাগলো কলিজায়।
মুসলমানে কেউ যদি থাকো
এই শিশুরে জীবন রাখো
দুধের শিশু করে নাই অন্যায়
এজিদের সৈন্য কয় হোসেন তুমি
জন্মের মতো খাওরে পানি
এ বলিয়া তীর নিক্ষেপ করে
আজগরের বুকে লেগে মারা যায়
পিপাসায় কি আগুন লাগলো কলিজায়।
মরা ছেলেরে নিয়ে কোলে
হোসেন সীমরে যায় চলে
দৌড়ে এসে দেখে আজগরের মায়
ছেলের বুকের রক্তধারা মায়ের কলিজায়
ছকির বলে ঘাতকেরা বুঝবি তোরা শেষ বেলায়
পিপাসায় কি আগুন লাগলো কলিজায়।[৪৮]

www.pathagar.com

১২

জয়বাংলা জয়বাংলা বলে কানছে মুজিব জেলখানায়
সোনার বাংলা শ্মশান করলো ইয়াহিয়া খান
ইন্দিরা দেবি দয়াল অতি বাংলায় দিলো সিকি রতী
আরও দিলো যন্ত্রপাতি বিমান দিলো ৬০ খানা
দুনিয়ার বুকে কাণ্ড দেখে ভেবে বাঁচি না
জয়বাংলা জয়বাংলা বলে কানছে মুজিব জেলখানায়
সোনার বাংলা শ্মশান করলো ইয়াহিয়া খান।
ছাত্রনেতা লতিফ মির্জা স্কুল কলেজের মুক্তিযোদ্ধা
বাংলার বুকে বাঘের সর্দার শিকার পেলে ছাড়ে না
দুনিয়ার বুকে কাণ্ড দেখে ভেবে বাঁচি না।
লতিফ মির্জার বাহাদুরি নওগাঁ মারছে মিলিটারি
মেজরকে ধরে এনে শুট করে মুক্তি সেনা
জয়বাংলা জয়বাংলা বলে কানছে মুজিব জেলখানায়
সোনার বাংলা শ্মশান করলো ইয়াহিয়া খান।
শনিবারে আমি গয়হাট্টা হাটে বসেছিলাম দোকান পেড়ে
সাইরে সাইরে বিমান দেখে ভয়ে আমরা বাঁচি না
কেউবা পালায় ঘরের কোণে কেউবা পালায় জালের টোনে
কেউবা বসে তজবিহ গোনে আল্লাহ বিনা বাঁচি না
জয়বাংলা জয়বাংলা বলে কানছে মুজিব জেলখানায়
সোনার বাংলা শ্মশান করলো ইয়াহিয়া খান।
পিঠের ওপর মুগুর মারে চামড়া কেটে লবণ ভরে
মারে মারে বলে কান্দে মরে গেলাম দেখলা না
পাক সৈন্য দেশে এলো লাইন করে মানুষ মারলো
মা বোনের ইজ্জত মারলো ভেবে আমরা বাঁচি না
জয়বাংলা জয়বাংলা বলে কানছে মুজিব জেলখানায়
সোনার বাংলা শ্মশান করলো ইয়াহিয়া খান।[৪৯]

১৩

সিরাজগঞ্জের সিরাজী
ইসমাইল হোসেনর সিরাজী।
আমরা সবাই করি যে সম্মান
আমরা জানি আমরা মানি
সিরাজগঞ্জ তীর্থভূমি
সিরাজগঞ্জে শুইয়া আছে

www.pathagar.com

আফজাল শাহ পরাণ।
সিরাজগঞ্জের সিরাজী
মাওলানা ভাষানী
আব্দুল হামিদ নাম,
আর আছে তর্কবাগিশ, জুয়েল, হেলানির নাম।
শাহজাদপুরে শুইয়া আছে
মখদুম শাহ পরাণ
আমরা সবাই করি যে সম্মান
উত্তর বঙ্গের ক্যাপ্টেন মনসুর,
বাংলার নয়ন মণি।
তাহার পুত্র সুসন্তান
মোহাম্মদ নাসিম তাহার নাম
আমরা সবাই করি যে সম্মান।
বাংলাদেশের জ্ঞানী যারা
তাদের তারিফ করি,
কিভাবে যে যমুনা সেতু
হইল তাড়াতাড়ি।
সেতু মঞ্জুর করল যারা
তাদের আমরা দিব মণি
আমরা সবাই করি যে সম্মান।[৫০]

১৪

বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা
হয় রে বাংলাদেশে নাম করি
এমন সেতু তৈয়ার করল,
যার তুলনা চলে্ না।
বাংলাদেশের নাম
বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা।
সেতুর কখন খুঁটি গাড়ে
আর দাপুর দাপুর শব্দ করে,
ছোট-বড় মাছ গুলো কয়
চিন্তা আমরা বাঁচি না।
পানিতে লাইগাছে যুদ্ধ
ও যমুনা আর থাকব না
বাংলাদেশের নাম
হায় রে বাংলাদেশে নাম করিল
বঙ্গবন্ধু সেতু যমুনা
উনে পঞ্চাশটি খুঁটির দ্বারা

www.pathagar.com

ঐ সেতুটি করল খাঁড়া
ভূয়াপুর আর সিরাজগঞ্জ
হইল তাহার ঠিকানা
মেশিন দিয়া কাম করে
মানুষের দরকার পড়ে না
বাংলাদেশের নাম।
ক্যাপ্টেন মনসুরের এ অবদান
বঙ্গবন্ধু সেতুর এই নাম,
রশিদ বাউলের এ মিনতি
সলিমে জানাই এখনাই।
ওরে একটি পয়সা কম পরিলে
ভাড়া কিন্তু ছাড়বে না।[৫১]

তথ্যনির্দেশ

১. শাহজাদপুরের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/ বাংলা বাজার, ঢাকা।
২. পূর্বোক্ত।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. মো. আব্দুস সালাম মোল্লা, গ্রাম : আদাচাকী, পোস্ট : আদাচকী, থানা : বেলকুচি, জেলা :সিরাজগঞ্জ।
৫. ময়ান আলী, পিতা : মৃত. জয়ান শেখ, পাঙ্গাসী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কৃষক।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. মো. আমজাদ আলী মণ্ডল, পিতা : মেছের আলী মণ্ডল, গ্রাম ব্রজবালা, পোস্ট : তালগাছি, উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬৫ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, সময় : রাত ৮.০০ টা, তারিখ : ১৫.০৩.২০১২।
৮. জয়নাল, গুণের গাঁতী, খোকশা বাড়ি, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, পেশা : তাঁতী।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. মো. নাছিম উদ্দিন, পিতা : মৃত মোসলেম উদ্দিন, গ্রাম : পুকুরপাড়, ডাকঘর : উনুখা, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ বাসভবন, সময় : ১২.৩০ ঘটিকা, বয়স : ৭৫ বছর, তারিখ : ০৭.০২.২০১২।
১১. পূর্বোক্ত।
১২ পূর্বোক্ত।
১৩. মো. মুন্সী ফজলার রহমান, পিতা : মৃত হাড়ান মোল্লা, গ্রাম : বয়ড়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ। স্থান : নিজ বাসভবন, বয়স : ১০৫ বছর, সময় : সকাল ১১ঘটিকা, তারিখ : ০২.০২.২০১২।

www.pathagar.com

১৪ মো. ওয়াহেদ আলী মণ্ডল, পিতা : মৃত চেরু মণ্ডল, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৯০ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, সময় : বিকাল ৩ ঘটিকা, তারিখ : ০৫.১০.২০১১।

১৫. বিশ্বনাথ পাগলা, পিতা : মৃত অভয়চরন দাস, গ্রাম : নওগাঁ, ডাকঘর : শরীফাবাদ, উপজেলা : তাড়াশ, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, স্থান : ভাঙ্গা মসজিদ মাজার সংলগ্ন, সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা, তারিখ : ২০.১১.২০১১।

১৬. সিরাজুল মুনিরা, পিতা : মতিউর আহসান, কালিয়া হরিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এস (সম্মান)।

১৭ মো. মজনু মিয়া, পিতা : মৃত মাজন আলী মিয়া, গ্রাম : নওগাঁ, ডাকঘর : শরীফাবাদ উপজেলা : তাড়াশ, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : মাজার সংলগ্ন দোকান, বয়স : ৫৭ বছর, সময় : সকাল ১১ ঘটিকা, তারিখ : ১১.১০.২০১১।

১৮. আঞ্জুমান আরা, গুণের গাঁতী, সিরাজগঞ্জ সদর, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি, পেশা : গৃহিনী।

১৯. রবীন্দ্র চন্দ্র দাস, ঋশিপাড়া, গুণের গাঁতী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : চৌকিদার।

২০. রেজা রোকনী, পিতা : নওসাদ রোকনী, গুণের গাঁতী, খোকশা বাড়ি, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এস সি, পেশা : চাকুরি।

২১. পূর্বোক্ত।

২২. পূর্বোক্ত।

২৩. মজনু প্রামাণিক, পিতা : গহের প্রামাণিক, গ্রাম : মশিপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : গারিয়াল, বয়স : ৫৫ বৎসর, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৯.০০ টা।

২৪. মোছা. সারমিন খাতুন, বয়স : ১৭ বছর গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সময় : সকাল ১০.১৫ মিনিট। তারিখ-২০.০৮.২০১১।

২৫. পূর্বোক্ত ১।

২৬. পূর্বোক্ত ১।

২৭. পূর্বোক্ত ১।

২৮. মোছা. রত্না খাতুন, বয়স ; ১০ বছর গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট। তারিখ-২০.০৮.২০১১।

২৯. তানিয়া ইসলাম তমা, পিতা, মো. শরিফুল ইসলাম শরিফ, গ্রাম : আগ দিঘলগাঁও, পোস্ট উধুনিয়া, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

৩০. পূর্বোক্ত ২৯।

৩১. পূর্বোক্ত ১।

৩২. পূর্বোক্ত ১।

৩৩. মোছা. মুর্শিদা খাতুন, বয়স : ১৫ বছর গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সময় : সকাল ১০.৩৫ মিনিট। তারিখ-২০.০৮.২০১১।

www.pathagar.com

৩৪ মোছা. সাদিয়া খাতুন, বয়স : ১৪ বছর গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সময় : সকাল ১০.৪০ মিনিট। তারিখ-২০.০৮.২০১১।

৩৫ মোছা. পিংকি খাতুন, বয়স : ১৪ বছর গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সময় : সকাল ১১.০০ মিনিট। তারিখ-২০.০৮.২০১১।

৩৬. তানিয়া ইসলাম তমা, পিতা, মো. শরিফুল ইসলাম শরিফ, গ্রাম : আগ দিঘলগাঁও, পোস্ট উধুনিয়া, উপজেলাঃ উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

৩৭. পূর্বোক্ত।

৩৮. জাহের উদ্দিন, গ্রাম : মশিপুর, পোস্ট : শরিষাকোল, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বৎসর।

৩৯. পূর্বোক্ত।

৪০. পূর্বোক্ত।

৪১. পূর্বোক্ত।

৪২. আজির উদ্দিন, গ্রাম : হরিরামপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বৎসর, তারিখ : ১৭.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৮.২০ টা।

৪৩. পূর্বোক্ত।

৪৪. মো. আবদুল ওয়াহাব, পিতা : মোঃ জয়নাল আবেদীন, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১০.৩০ টা।

৪৫. মো. কাশেম আলী, গ্রাম : হরিরামাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : বৃদ্ধ কৃষক, বয়স : ৭৫ বৎসর, তারিখ : ১৭.০৩.২০১২ সময় : রাত ৮.৩০ টা।

৪৬. পূর্বোক্ত।

৪৭. আব্দুস সবুর আলী বয়াতি, গ্রাম : দূর্গাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, সময় : রাত : ১০.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।

৪৮. পূর্বোক্ত।

৪৯. মো. ছকির উদ্দিন প্রামাণিক, পিতা-মৃত. কলিম উদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ বাসভবন, বয়স : ৬৮ বছর, সকাল ৯ ঘটিকা, তারিখঃ ১০/০৭/২০১১ ইং।

৫০. মো. জফের আলী ফকির, পিতা-মৃত. কাদের আলী ফকির, গ্রাম : ধরইল, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ। বয়স : ৭০ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী, সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা তারিখ : ২০/০৮/২০১১ ইং।

৫১. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

মূলত পুথিগত শিক্ষার বাইরে অশিক্ষিত কারিগর যে সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সৃষ্টি করে এবং সেই বস্তু যখন সমগ্র সমাজের ও দেশের সামগ্রী হয়ে ওঠে তখন সেগুলোকে বস্তুগত লোকসংস্কৃতি বলা চলে। উদাহরণস্বরূপ পূর্বে গ্রাম্য ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙল, জোয়াল, মই প্রভৃতির নাম করা হয়েছে। এছাড়া কৃষক ও মজুরদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্য বহু জিনিসের নাম এই তালিকাভুক্ত হতে পারে। লোকযান, লোকশকট বা লোকবাহন (Folkcurts) যেমন-গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদিও এই পর্যায়ের। তাছাড়া লোকশিল্প অর্থাৎ Folk Arts and Crafts- এর সামগ্রিক আবেদন বস্তুকে কেন্দ্র করে প্রতিভাত হয় বলে এগুলো বস্তুগত লোকসংস্কৃতি। যদিও এই পর্যায়ের মধ্যে অঙ্কন শিল্পগুলোকে বস্তুকেন্দ্রিক না বলে শিল্প বা সাহিত্যকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি বলা যেতে পারে। যেমন একটি মাটির পাত্রে যখন একজন গ্রাম্য শিল্পী ছবি আঁকে তখন সেই ছবির যেমন একটি আবেদন অনুভব করা যায়, তেমনি পাত্রটিকে ছবি থেকে বিচ্ছিন্ন করাও অসম্ভব। আবেদনটুকু সাহিত্য পর্যায়ের। কেননা, তা আমাদের বস্তুর অতীত একটি সৌন্দর্যের জগতে, একটি অতীন্দ্রিয়লোকে নিয়ে যায়। অনুরূপভাবে নক্‌শিকাঁথা, বাঁশের ফুলদানি, নক্‌শা করা টুপি প্রভৃতি বহু জিনিসের নাম করা যেতে পারে। নক্‌শা ছাড়াও গ্রাম্য বা অশিক্ষিত মানুষ এমন অনেক জিনিসপত্র তৈরি করে যেগুলোকে আমরা কুটির শিল্পের অন্তর্গত বলে মনে করি, সেগুলোও বস্তুগত লোকসংস্কৃতি হিসেবে বিচার্য।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি পূর্ব-পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষের নিকট, সমাজের একজনের একটি থেকে সমগ্র সমাজের নিকট এবং এক দেশ বা সমাজ থেকে অপর দেশে বা সমাজে কতকগুলো উপায়ে প্রচারিত, প্রবর্তিত বা অনুসৃত হয়-(ক) মুখে মুখে শুনে অনেক জিনিস প্রস্তুত করার পদ্ধতি প্রচারিত হতে পারে। এছাড়া (খ) দেখেও শিখতে পারে- যেমন ঘরবাড়ি, বেড়া, লাঙল, জোয়াল, মই ইত্যাদি প্রস্তুত-পদ্ধতি। (গ) অনেক সময় অনুকরণের মাধ্যমেও শিখতে পারে। যেমন মাটির পাত্রে নক্‌শা করা বা Folk Arts and Crafts এর অন্তর্গত উপকরণসমূহ।

লোকশিল্প

লোকসংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শাখা হলো লোকশিল্প। অধ্যক্ষ তোফায়েল বলেন, ‘লোকশিল্প সাধারণ লোকের জন্য সাধারণ লোকের সৃষ্টি। একটা তালপাতার ঝুনঝুনি, মাটির পুতুল, শোলার দুইটি কদমফুল এই তো লোকশিল্প’। সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহাসিকতার ধারায় এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোকশিল্প। খগেশ কিরণ তালুকদার লোকশিল্প সম্পর্কে যতার্থই বলেছেন ‘আদিম সামাজের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার ও

www.pathagar.com

ঐতিহ্যবাহী শ্রমজীবী জনতার শিল্পকলা লোকশিল্প হিসেবে চিহ্নিত। আদিম সমাজে জীবন জীবিকার বাস্তব প্রয়োজনে উদ্ভূত শিল্পকলা শ্রেণি-সমাজ শ্রম ও জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে তাই, বিপরীত তাৎপর্যে পর্যবসিত অর্থাৎ প্রয়োজনে যার উদ্ভব, পরিণতি তার বিনোদনে।' সিরাজগঞ্জ জেলায় ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এ অঞ্চলের লোকশিল্প অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় যা মানুষের গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে এবং মানুষের চাহিদা ও উপযোগিতা পূরণে সহায়তা করছে। এসব লোকশিল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতিচ্ছবিই প্রতিফলিত হচ্ছে। এসব শিল্পকর্মে শিল্পী তার জীবনাচরণ, কায়িক পরিশ্রম, সৃজনশীল কর্মকাণ্ড, অনুভব, চেতনা ও অভিপ্রায় ধারণ করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়ে আছে বংশ পরম্পরায় ঐতিহ্য। যার টানেই অধিকাংশ লোকশিল্পী এ সকল লোকশিল্পে যুক্ত হয়ে থাকে। এক গভীর আবেগ তাদের মধ্যে বিরাজ করে। এসব শিল্পে একইসাথে মনন ও সৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পগুলো তৈরি করতে সাহায্য করে পরিবেশ, প্রতিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং জীবন ঘনিষ্ঠতা। সিরাজগঞ্জ জেলার প্রতিটি উপজেলার লোকশিল্পের মাঝে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। এ অঞ্চলের লোকশিল্পের মধ্যে মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মৃৎশিল্প

বাংলাদেশের লোকশিল্প অতিপ্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী এবং এর ধারা অতি সহজ-সরল ও স্বচ্ছ। আঞ্চলিকতাভেদে প্রতিটি শিল্পের ভিন্নতর কিছু রূপ এবং নিজস্ব স্বকীয়তা লক্ষ্য করা যায়। লোকশিল্পের বিভিন্ন ধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধারা হল- মৃৎশিল্প, চারুশিল্প, লৌহশিল্প, তাঁত শিল্প, কারুশিল্প, খাদি শিল্প, রন্ধনশিল্প, সূচিশিল্প প্রভৃতি। তবে লোকশিল্প জগতে মৃৎশিল্প একটি অনন্য নাম। মৃৎশিল্পকে লোকশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে আদিম এবং সমৃদ্ধ শাখা বলা হয়। আবহমানকাল থেকে মৃৎশিল্প তার প্রাচীন ঐতিহ্য বলে এখনও টিকে রয়েছে। মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে মৃৎশিল্প অক্ষয় সাক্ষী হয়ে টিকে আছে। সেই আদিম অবস্থা থেকে মিশর, সুমেরু, ব্যবিলন, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো ইত্যাদি মানব সভ্যতায় মৃৎশিল্পের অবদান ছিলো। সৃষ্টির আদিম সভ্যতা উত্তরিত হয়ে সমগ্র মানব ইতিহাসের ধারায় অদ্যাবধি ব্যপ্তি ও গুরুত্বে মৎশিল্পের সঙ্গে অন্যকোনো শিল্পের তুলনাই চলে না। মৃৎশিল্প গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের একটি প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গ এবং দেশের সাংস্কৃতির ক্রমবিকাশে প্রবাহমান।

মৃৎশিল্পের ইতিহাস

মৃৎশিল্প মানব জাতির একটি প্রাচীন শিল্প এবং বিশেষ কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এখানেই মৃৎশিল্পের সার্বজনীনতা পরিলক্ষিত হয়। মানব সমাজের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে মৃৎশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন মৃৎশিল্পের আবিষ্কার মানব জাতির বন্য অবস্থা থেকে বর্বর অবস্থায় উত্তরণ হতে সাহায্য করছে। মৃৎশিল্পের যে ঐতিহ্য আজ বর্তমান তার

www.pathagar.com

ইতিহাস শত সহস্র বছরের পুরানো। এ শিল্পের সূচনা করে প্রস্তর যুগের আদিম মানুষ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যখন সবেমাত্র আগুন জ্বালানোর প্রক্রিয়া আবিস্কৃত হয়েছে, পশুশিকার তখনও একমাত্র জীবিকা তখন থেকেই মানুষ মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরি এবং সেগুলো সূর্যের তাপে শুকিয়ে ব্যবহার করা শুরু করে। লোকমানুষের তৈরি পাত্র নানা রঙের মাটি দিয়ে তৈরি করা হত। কাঁচা হাতে তৈরি হলেও সেগুলো সৌন্দর্য বর্জিত ছিল না।

Dadd and Rogres (১৯৬৭) মৃৎশিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে বলেন- "The real history of pottery begins seven thousand years ago. Men were rapidly turning from their nomdic life of hunters to that of farmers and heresman, they sowed their crops and settled permanently in one place, so the first civilizations began to from."

আরও জানা যায়- The Sanskrit name of the potters are kulal and kumbhakara. In Southern India the potters are called kusaven. The word kumbhakar literally means a maker of earthen jars.

মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতই প্রাচীন মৃৎশিল্পের নিদর্শন সিন্ধু নদীর তীরবর্তী এলাকা, চীন, পারস্য ও এশিয়া মাইনরের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে।

উপমহাদেশে মৃৎশিল্পের ইতিহাস কমবেশি পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অঞ্চল থেকে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে একসময় যেসব আদিম মানব সভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল সেখানেও মৃৎশিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। এর মধ্যে পেয়ালা, বাটি, চামচ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন পণ্ডিতগণ মনে করেন অলঙ্কারকৃত মাটির পাত্র পৃথিবীতে সর্বপ্রথম এ অঞ্চলেই তৈরি করা হত। বাংলাদেশের মৃৎশিল্প ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীন শিলালিপি ও পুরাকীর্তিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন নিদর্শন থেকে জানা যায়- এদেশে একসময় উন্নত ও গুণগতমানের মৃৎশিল্প বিদ্যমান ছিল।

বাংলাদেশের মৃৎশিল্প এদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর ভিত্তি করে রূপলাভ করেছে। নব্য প্রস্তর যুগ থেকে এই অঞ্চলে বসবাসকারী অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি নৃগোষ্ঠী ও পরবর্তীকালে আগত অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর মিলিত ও সমন্বিত জীবন যাপন কেন্দ্রিক বস্তুজাত সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে মৃৎশিল্প বিকশিত হয়। বস্তুজাত সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত মৃৎশিল্প দৈনন্দিন উপযোগিতা ও প্রয়োজন মেটাতে সৃষ্টি হয়েছে। এদেশের আদি নৃগোষ্ঠীর জীবনধারার উত্তরাধিকারী আজকের বাংলাদেশের বৃহত্তম অংশ গ্রামের লোকজীবনের সাধারণ মানুষ মৃৎশিল্পকে চলমান রেখেছে। এবং আজকের মৃৎশিল্পের ধারা প্রাচীন ধারারই অব্যাহত রূপ। এ প্রসঙ্গে ড. নীহাররঞ্জন রায় মন্তব্য করেছেন- "পোড়ামাটির নানা প্রকারের থালা, বাটি, জলপাত্র, রন্ধনপাত্র, দোয়াত, প্রদীপ ইত্যাদি পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, বজ্রযোগীনীর সন্নিকটস্থ রামপালে, ত্রিপুরায়, ময়নামতির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, সাভার ইত্যাদি স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক ও বিস্তৃত মৃৎশিল্পের সাক্ষ্য বহন

www.pathagar.com

করিতেছে।" অর্থাৎ, সাভার, ময়নামতি, বিক্রমপুর, পাহাড়পুর, মহাস্থান বা পুণ্ড্র অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন লাল ও ধুসর শ্রেণির মৃৎপাত্রের অব্যাহত ধারা আজকের বাংলাদেশের মৃৎপাত্র।

মাটির পাত্র প্রস্তুত করেন তাদেরকে 'কুমার' বা 'কুম্ভকার' বলা হয়। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সমকালীন ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে বাংলাদেশে মৃৎশিল্প মূলত আলাদসী (আলিমণ) গোত্রের পাল বংশের পরিচয় বহনকারী কুমার বা কুম্ভাকার সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সাধারণত যে এলাকায় সহজে মাটির পাত্র প্রস্তুতের মাটি পাওয়া যায়, সেই এলাকায় কুমারদের বাস। বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলোতে মৃৎশিল্প বা কুমারদের বসতি গড়ে উঠেছে। নিজেদের বংশগত পেশা এখনো অনেকে ধরে রেখেছেন। পরিবারে নারী পুরুষ এমনকি শিশুরাও মাটির পাত্র প্রস্তুতের কাজে জ্ঞান মৌখিকভাবে বংশ পরম্পরায় শেখানো হয়। সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, রায়গঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ সদরে বেশ কিছু জায়গায় পাল পড়া রয়েছে।

মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও উপকরণ পরিচিতি

যন্ত্রপাতি

নানা রকম মৃৎশিল্প তৈরি করতে নানা রকম উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যুগ যুগ ধরে এ সকল উপকরণ দ্বারা মৃৎশিল্প তৈরি হয়ে আসছে। আঞ্চলিক নামকরণ থাকলেও প্রায় সবখানেই এই উপকরণগুলি ব্যবহৃত হয়। মৃৎশিল্পীরা মৃৎপাত্র তৈরিতে যেসব ছোটখাটো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন সেগুলি হল :

১. **আতাইল বা ছাঁচ :** আতাইল কাঠের তৈরি এবং গোলাকার চাকতির মত। এর নিচের অংশটা সমতল এবং উপরের অংশটা একটু গর্তের মত আকৃতি। আতাইল মূলত ব্যবহৃত হয় গোলাকৃতির জিনিস তৈরি করতে। যেমন- মালসা, হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি আতাইলের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।

২. **পিটনি বা পিটনা :** কাঠের তৈরি পিটনি দেখতে সরু ও লম্বা। এর এক প্রান্ত সরু এবং অপর প্রান্ত চ্যাপ্টা। মৃৎশিল্পের বা মৃৎপাত্রের আকৃতি দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। এটি দিয়ে পাত্রের বাইরে ঠুকে ঠুকে আকার গঠনের কাজ করা হয়।

৩. **বোল্যা বা বইলা :** বোল্যা পাথরের তৈরি। বোল্যা মূলত পাত্রের ভেতরে ঠেকো লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

৪. **কাঠের যন্ত্র বা পাটাতন :** এটি মাটির চাকনা তৈরির সময় ব্যবহৃত হয়। এটি দেখতে গোলাকৃতির পাটাতনের মত।

৫. **দলা :** এটা সাধারণত শিল্পের পাথর দিয়ে তৈরি এর একটা প্রান্ত চ্যাপ্টা ও বিস্তৃত এবং অপর প্রান্ত কিছুটা সরু ও হাতল সদৃশ। এই প্রান্ত হাত দিয়ে ধরে অপর প্রান্ত দিয়ে পাত্র তৈরির পূর্বে ছেনা মাটির উপর আঘাত করা হয়।

www.pathagar.com

৬. **আঠাল :** আঠাল হল পানি রাখা পাত্র। মৃৎপাত্রের গায়ে পানি ও মাটি মিশ্রিত প্রলেপ দেওয়ার জন্য আঠালে পানি রাখা হয়।

৭. **ন্যাকড়া বা ত্যানা :** ন্যাকড়া পুরাতন সুতি কাপড়ের টুকরা দিয়ে তৈরি করা হয়। এটা দিয়ে শিল্পবস্তুর গায়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। পাশে রাখা আঠাল-এ কাদাযুক্ত পানিতে এই ন্যাকড়া ভিজিয়ে মৃৎপাত্রের উপর লেপে ফিনিসিং দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হয়।

৮. **ফর্মা বা ফ্রেম :** চাড়ি, কুয়ার চাক প্রভৃতি ফর্মার সাহায্যে তৈরি করা হয়। চাড়ির জন্য চাড়ি আকৃতির ফ্রেম এবং কুয়ার চাকের জন্য চাক আকৃতির ফ্রেম ব্যবহৃত হয়। ফর্মা সাধারণত মাটির ও কাঠের হয়ে থাকে।

৯. **চাক :** মৃৎশিল্প প্রস্তুতকর্মে অত্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্র হল চাক। এটি কাঠ, মাটি, পাথর ও ইটের টুকরা দিয়ে তৈরি। এটা দেখতে গরুর গাড়ির চাকার মত। এর ব্যাস ২ ফুট ৮ ইঞ্চি, ভিতরের অংশের ব্যাস ২ ফুট ১.৫ ইঞ্চি, ভিতরের অংশের পাশের অংশ ৬.৫ ইঞ্চি চওড়া, এর পুরুত্ব ৪ ইঞ্চি এবং পরিধি ৮ ফুট ৬ ইঞ্চি। চাক-এর সাহায্যে হাড়ি, পাতিল, কলসি, ব্যাংক, মাটির প্রদ্বীপ বা খুড়ি প্রভৃতি তৈরি করা যায়। চাক সাধারণত গজারি কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। এতে সাধারণত চারটি পাটি থাকে। মাঝখানে চাক যেটার উপর ঘুরে সেটাকে 'আল' বলে। এটি তেঁতুল কাঠের আল দিয়ে তৈরি। সম্পূর্ণ চাকার উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। চাকটি পাথরের উপর ঘুরে। আলের কেন্দ্রে পাথরটি বসানো থাকে। চাকটি প্রায় পৌনে দুই হাত লম্বা হয়ে থাকে।

১০. **ছোট টোয়ারী :** এটি দেখতে অনেকটা জর্দ্দার কৌটার মত। এটা কাঠের তৈরি। শিল্পবস্তু তৈরির সময় যখন অল্প পরিমাণ পানি লাগে তখন তা এই টোয়ারীর মাধ্যমে ঢালা হয়।

উপকরণ

গ্রাম বাংলার সরল-সাধারণ শিল্পীরা হাতের কাছে যেসব উপকরণ পেয়েছেন সেগুলোকেই ব্যবহার করেছেন মৃৎশিল্পের রূপ সৃষ্টির কাজে। এ কারণেই মৃৎশিল্পের উপকরণ অতি সাধারণ। এক্ষেত্রে সিরাজগঞ্জ জেলার মৃৎশিল্পীরাও ব্যতিক্রম নয়। মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত উপরিউক্ত যন্ত্রপাতি ছাড়া আরো কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা হয়। যেমন :

১. **মাটি :** মৃন্ময় বা মাটিই মৃৎশিল্পের প্রধানতম উপকরণ। মৃৎশিল্পে সাধারণত দু'ধরনের মাটি ব্যবহার করা হয়। (ক) বেলে মাটি, এবং (খ) এঁটেল মাটি। এ মাটি নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। যেমন-বিল, ধানের জমি, মাঠ এবং নদী থেকে। মাটিই যেহেতু মৃৎশিল্পের প্রধানতম ভিত্তি তাই মাটির ধরনের উপরই নির্ভর করে মৃৎপাত্রের গুণগতমান।

২. **রং :** মৃৎপাত্রকে রঙিন ও সুন্দর করতে রং ব্যবহৃত হয়। মৃৎশিল্পীরা সাধারণত বিশেষ এক প্রকার গাছের ছাল থেকে সনাতন পদ্ধতিতে রং তৈরি করে এবং এ রং মৃৎশিল্পকে রাঙানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে।

www.pathagar.com

৩. **বাঁশের সূচালো চটা :** নরম মৃৎপাত্রের গায়ে বাঁশের চটা দিয়ে অনেকাংশে নকশাঁ করা হয়। কলসি ও হাঁড়ির কান্দা নকশা করতে এটির ব্যবহার করা হয়।

৪. **জ্বালানি :** মৃৎপাত্রকে পোড়ানোর জন্য জ্বালানির ব্যবহার করা হয়। জ্বালানির কাজে কাঠ, খড়ি, কাঠের গুঁড়া, ধানের গুঁড়া, খড়, পাট কাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

৫. **পইন বা ভাটা :** অনেকগুলো মৃৎপাত্রকে একসঙ্গে পোড়ানো হয় পইন বা ভাটায়।

মৃৎশিল্পের কাচামালের যোগান

মৃৎশিল্পীরা বংশ পরম্পরায় মৃৎশিল্প তৈরি করে চলেছেন। মৃৎশিল্পের কাঁচামাল খুব বেশি দুর্লভ নয়। এজন্য মৃৎশিল্পীরা কাঁচামালের যোগান করেন তাদের আশপাশের পরিবেশ থেকেই। মাটির উপর ভৌগলিক অবস্থা এবং জলবায়ুর অনুকূল প্রভাবের ফলে দেশের সর্বত্র মৃৎশিল্পের উপযোগী মাটি পাওয়া যায়। মৃৎশিল্পের আবশ্যকীয় কাঁচামাল হল এঁটেল মাটি। এই মাটি রোদে শুকালে শক্ত এবং পানিতে ভিজালে কাঁদায় পরিণত হয়। এই ধরনের নরম কাদামাটি দিয়ে যেমন খুশি তেমন ধরনের আকৃতি প্রদান করে মৃৎশিল্পকর্ম প্রস্তুত করা সম্ভব।

এই মাটি মৃৎশিল্পীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিনে নিয়ে আসেন অন্যের জমি থেকে কিংবা বিল, নদীর কিনারা থেকে। এঁটেল মাটির সাথে বেলেমাটিও মৃৎশিল্পের অন্যতম কাঁচামাল।

মৃৎশিল্পে আরো প্রয়োজন হয় জ্বালানি কাঠের, ধানের গুড়া বা তুষ, কাঠের গুড়া, পাঠ কাঠি প্রভৃতি। মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত জ্বালানি হিসেবে এই কাঁচামালটি কিনতে হয়।

মৃৎশিল্পের প্রস্তুত প্রণালী

লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক মৃৎশিল্পীরা যে ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতিতে মাটির কাজ করে থাকে তাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন:

ক. মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
খ. মাটিকে পাত্র তৈরির উপযুক্তকরণ
গ. চাকের সাহায্যে অথবা হাতের সাহায্যে পাত্রের আকৃতি দেওয়া
ঘ. রোদে শুকানো
ঙ. আগুনে পোড়ানো।

উপরোক্ত ধাপগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হল :

ক. মাটি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

মৃৎশিল্পীর প্রথম কাজ মাটি সংগ্রহ করা। মাটি সংগ্রহের কাজ সাধারণত শুকনো মৌসুমে করা হয়। পুরুষেরাই প্রধানত মাটি সংগ্রহের কাজ করেন। মাটি তোলার কাজে কোদাল, খন্তা, শাবল ব্যবহার করা হয়। একজন অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী মাটি দেখে সহজেই বুঝতে পারেন কোন মাটিতে ভাল মৃৎপাত্র প্রস্তুত করা যাবে। সাধারণত ৪/৫ ফুট মাটি খনন করার পর এঁটেল মাটির স্তর পাওয়া যায়। এ মাটি মৃৎপাত্র প্রস্তুতের জন্য উপযুক্ত মাটি। জমি থেকে মাটি সংগ্রহের পর সংরক্ষণের কাজ শুরু। সাধারণত খোলা

www.pathagar.com

আকাশের নিচে মাটি রাখলে উষ্ণ বা আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে মাটির গুণাগুণ বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটি বিভিন্নভাবে সংরক্ষণ করা হয়। তবে এই এলাকায় মাটিতে গর্ত করে মাটি রাখা হয় এবং গর্তের ওপর কচুরিপানা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যাতে রোদ বৃষ্টি প্রবেশ করতে না পারে। আবার কোন এলাকায় ছাউনিযুক্ত ঘরের মধ্যে মাটি সংরক্ষণ করা হয়। এভাবে সংরক্ষিত মাটির গুণগতমান ঠিক থাকে।

খ. মাটিকে পাত্র তৈরির উপযুক্তকরণ

দ্বিতীয় ধাপে মাটিকে পাত্র তৈরির উপযোগী করার কাজ শুরু হয়। প্রথমে স্তূপীকৃত মাটি থেকে কোদাল দিয়ে পরিমাণমত মাটি ঘরের বা উঠানের কোন জায়গায় রাখা হয়। পানি দিয়ে ঐ মাটিকে ভিজিয়ে নরম করা হয়। এরপর লৌহ নির্মিত আঁচড়ার সাহায্যে মাটিকে পাতলা করে কাটা হয়। কাটার পর চাটাইয়ের উপর পরিমাণমত বালি ছিটিয়ে তার উপর মাটি রেখে পা দিয়ে মাটিকে মাড়ানো হয়। মাটিকে মাড়ানো বা ছেনার সময়-মাটির মধ্যে থেকে পাথর, কাঁকড়, ধান, কাঠের টুকরা ইত্যাদি বের করে নেওয়া হয়। এভাবে কয়েকবার মাটি পাতলা করে কাটা ও মাড়ানোর পর একেবারে মসৃণ হয়ে যায়। এরপর পাত্র তৈরির সমপরিমাণ মাটি গোল করে "বুটি বা দলা" তৈরি করা হয়।

গ. চাকের সাহায্যে অথবা হাতের সাহায্যে পাত্রের আকৃতি দেওয়া

বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র চাকের ব্যবহার দেখা যায়। মাটির প্রক্রিয়াকরণ শেষ হলে মাটির গোলক বা বুটি তৈরি করা হয়। প্রথমে একটি ছোট লাঠির সাহায্যে চাকে পাক দেয়া হয়। সম্পূর্ণ গতি আসার পর চাকের মাঝখানে গোলাকৃতি মাটি দেবার পর ঐ গোলাকৃতি মাটি চাকের সঙ্গে ঘুরতে থাকে। কারিগর তার ইচ্ছানুযায়ী লাঠি দিয়ে চাক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাত্রের আকৃতি দেয়। চাক যত দ্রুতগতিতে ঘুরবে পাত্র তত বেশি মসৃণ হবে। পাত্রের সব জায়গায় যাতে সমান পরিমাণ মাটি থাকে সেজন্য চাক ঘুরার সময় একটি কাঠি দিয়ে মাটি চাঁছা হয়। কয়েকটি পাত্র একসঙ্গে চাকে তৈরি করা যায়। সেজন্য কয়েকটি পাত্র তৈরির উপযোগী মাটি চাকে তোলা হয়। একটি পাত্র সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে ঐ পাত্রটি নিচের অবশিষ্ট মাটি থেকে সুতা দিয়ে কেটে বের করে আনা হয়।

কলসি ও হাড়ি-পাতিলের কান্দা চাকে তৈরি হয় এবং গোলাকার তথা হাতের সাহায্যে ছাঁচে তৈরি করে কান্দার সাথে যুক্ত করা হয়। যেকোন পাত্র চাকে তৈরি করতে এক থেকে দেড় মিনিট সময় লাগে। তবে ছাঁচে কাজ করতে অনেক বেশি সময় লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মহিলা মৃৎশিল্পীরা ছাঁচের কাজ করে। পাত্রের আকৃতি তৈরি হওয়ার পর পাত্রের গায়ে নক্‌শা ও অলঙ্করণ করা হয়। মৃৎশিল্পী হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে টিপে টিপে বা রেখা টেনে পাত্রের গায়ে নক্‌শা করে থাকেন।

ঘ. রোদে শুকানো

পাত্রকে নির্ধারিত আকার দেওয়া এবং মসৃণ করার কাজ শেষ হওয়ার পর পাত্রগুলি রোদে শুকানো হয়। কমপক্ষে ৮-১০ ঘণ্টা রোদে শুকানোর পর পাত্রের গায়ে রং দেওয়া হয়। সাধারণত মৃৎশিল্পীরা ঐতিহ্যগত পদ্ধতিতে এই রং প্রস্তুত করেন। এই রং তৈরির

www.pathagar.com

কাঁচামাল দেশের সর্বত্র প্রায় একই রকম। এতে ব্যবহার হয় খয়েড়, কাপড় কাঁচার সোডা এবং লাল মাটি। এগুলো একসঙ্গে মিশানো হয়। আবার কোথাও কোথাও এ মিশ্রণের সাথে বিশেষ গাছের বাকল ব্যবহৃত হয়। বিশেষ পদ্ধতিতে এগুলো মিশিয়ে সিদ্ধ করে যে স্বচ্ছ তরল পদার্থ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাত্র রং করা হয়। মাঝে মধ্যে কাপড় দিয়ে রং লাগানো হয় নয়তো বা পাত্রগুলো মিশ্রণে ডুবানো হয়। এরপর এগুলো আবারও রোদে শুকানোর পর আগুনে পোড়ানো হয়।

ঙ. আগুনে পোড়ানো

রোদে শুকানো পাত্রকে পুনরায় রং দেওয়া হয়। এরপর পাত্র আগুনে পোড়ান হয়। মৃৎশিল্পী সম্প্রদায় পাত্র পোড়ানোর চুলাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। সাধারণত অঞ্চলভেদে এর নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তবে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে মৃৎপাত্র পোড়ানোর স্থানকে 'পইন' ও ভাটা বলে থাকে। পুশিলের ভিতর প্রায় তিন হাত গভীর। তৈরি পাত্রগুলোকে চুলার ভেতরে চারিদিকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো হয় এবং পাত্রের ফাঁকে ফাঁকে খড়কুটা এবং গাছের ডাল ইত্যাদি রাখা হয়। সাজানোর পর পইনের মুখ খাপড়া দিয়ে ঢাকতে হয় এবং মাটির প্রলেপ দিয়ে পাত্রগুলো ঢেকে দেওয়া হয়। এই প্রলেপের চারিদিকে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে যাতে ধোঁয়া বের হয়ে যেতে পারে। চুলায় আগুন দেওয়ার পূর্বে মৃৎশিল্পীগণ কিছু নিয়ম-সংস্কার পালন করেন। যেমন- চুলার আগুন দেওয়ার পূর্বে চুলার চারিদিকে ধুপ দেওয়া, সোনা রূপার পানি চুলায় ছিটিয়ে দেয়া, চুলার এককোণে ঝাড়ু রাখা ইত্যাদি।

এরপর খড়ি-কাঠি দিয়ে ধীরে ধীরে আগুন জ্বালানো হয়। সমস্ত পইনে বা ভাটায় আগুন ধরে গেলে নিচের দিক থেকে জ্বালানী দেওয়া বন্ধ করতে হয়। পাত্র যখন পুড়ে লাল বর্ণ ধারণ করে সাধারণত তখন পোড়ানো বন্ধ করা হয়। সাধারণত পোড়ানোর উপর পাত্রের রং অনেকাংশে নির্ভর করে। পাত্রকে যদি কালো রং দিতে হয় তবে অধিক সময় ধরে পোড়াতে হয় এবং পুশিলের সমস্ত ফুটা বন্ধ করে দিতে হয়।

আগুনে পোড়ানোর পর পুশিল ঠান্ডা হয়ে গেলে উপরের মাটির প্রলেপ সাবধানে ভেঙে মৃৎপাত্রগুলি বের করা হয়। বের করার পর সাধারণত ঘরে সাজিয়ে রাখা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলার মৃৎশিল্প

সিরাজগঞ্জ জেলার মৃৎশিল্পীগণ হাড়ি, পাতিল, কলসসহ সাধারণত সবকিছুই তৈরি করে থাকেন। যেমন : ফুলের টব, কুয়ার চাক, হুলোই বা মালসা, বিভিন্ন ধরনের ও আকৃতি তাওয়া (পাঁচ তাওয়া, তিন তাওয়া), ছোট-বড় আকৃতির চাড়ি (নাদা), সড়া, ঢাকুন, ঢুকসা, ধূপ দেওয়া ধূপোচি, মুড়ি ভাজা ঝাঁঝড়, লালিগুড় রাখা পাত্র, টুপো, দই রাখা মালসা, মঙ্গলপ্রদ্বীপ (খুড়ি), বিভিন্ন আকৃতির ঘট, খেলনা পুতুল, বিভিন্ন আকৃতির মাটির ব্যাংক প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় নানা রকমের মৃৎপাত্র তারা তৈরি করে থাকে।

এছাড়াও কোন কোন মৃৎশিল্পী দেবদেবীর প্রতিমাও গড়ে থাকেন। তবে প্রতিমা নির্মাণ হয় মূলত মৌসুমভিত্তিক। পূজার মৌসুমেই সাধারণত শিল্পীরা সুন্দর ও সাবলীল দেব মূর্তি বা প্রতিমা গড়ে থাকে। এ সকল প্রতিমার সাথে জড়িয়ে রয়েছে হিন্দু

www.pathagar.com

ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় ভাবনা। মৃৎশিল্পের মধ্যে সবচেয়ে লাভ বেশি প্রতিমা তৈরিতে। প্রতিমার রয়েছে প্রচুর জনপ্রিয়তা। বিভিন্ন দেবদেবীর প্রতিমা বাংলাদেশে তৈরি হয়ে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। মৃৎশিল্পীরা তাদের নির্মিত প্রতিমার অধিক বাস্তবানুগ রূপ এবং অলংকারের অতিশয্যে তাদের নগরের ক্রেতাদের আকৃষ্ট করার সর্বতো চেষ্টা করে। মৃৎশিল্পীদের এ যৌথ সৃষ্টি কেবল স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশেই নির্মাণ করা সম্ভব।

মৃৎশিল্পে শিল্পীর নান্দনিকতার পরিচয়

সহজ-সরল গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে সৃষ্ট বলে মৃৎশিল্পের আবেদনও অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছ-সাবলীল। কিছু আকৃতি ও ছন্দকে কেন্দ্র করে অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি এসব মৃৎশিল্পের মধ্যদিয়ে আমরা লোকসমাজের নান্দনিক ও শিল্পবোধের প্রকাশ দেখতে পাই। প্রত্নস্থান থেকে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রগুলোও ছিল অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত। অতীতেও মৃৎপাত্রকে শিল্পীরা সাজাতো সাধারণ লাল, গাঢ় পিঙ্গল, হলুদ, সাদা, ধূসর, মসৃণ কালো ইত্যাদি রঙে। তার উপর চিত্র এঁকে নক্শা করতো। লাল এবং কালো পাত্রে মাঝে মাঝে সেভরন, ফোটা, অর্ধচন্দ্র আকার, ক্ষুদ্র রেখা ইত্যাদি দিয়ে অঙ্কিত হত। এমনকি উৎকীর্ণ কালো পাত্রে দেখা যায় একটি ময়ূয়ের ঠোঁটে আঁকা বাঁকা কিছু, হয়তো সাপ; আবার দেখা য়ায় জলের মত নক্শার নীচে "এক সারি মাছ"। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে, "এইভাবে শুরু হয়েছিল আকার ও আয়তনের বৈচিত্র এবং চিত্রণের মধ্যে দিয়ে ব্যবহার্য বস্তুকে আনন্দদায়ক করে তোলার প্রচেষ্টা, যাকে আমরা আজকের পরিভাষায় "কারিগরি শিল্পে সৌন্দর্য প্রকাশের রীতির প্রবর্তন বলতে পারি। এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সুন্দর আকারের চিত্রিত পাত্রগুলি গ্রামীণ কুম্ভকার-শিল্পীদের সৃষ্ট লোকশিল্পের অসাধারণ নিদর্শন।"

মৃৎশিল্প ভাবালোকের রূপময় অভিব্যক্তি এবং রূপকল্প অবলম্বনে তার সৃষ্টি। গ্রামীণ সাধারণ মৃৎশিল্পীগণ তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্ট বস্তুসমূহ রাঙিয়ে থাকেন এবং তাতে ফুটিয়ে তোলেন নানা ধরনের সুন্দর আল্পনা। শুধু তাই নয় সিরাজগঞ্জের মৃৎশিল্পীরা মৃৎপাত্রকে প্রস্তুত করার পর তাতে সূচালো বাঁশের চটা দিয়ে নানা নক্শা এঁকে থাকেন। মাটির তৈরি খেলনাগুলো অপরূপ আকৃতি দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন। মাটির তৈরি বিভিন্ন শো-পিচ ও ব্যাংক তৈরি করেন হরেক রকম আকৃতিতে। যেমন- গ্রাম বাংলায় প্রাপ্ত নানা রকম ফলের আকৃতি, হাঁস, ময়ূর, হাতি, ঘোড়া প্রভৃতি আকৃতির শো-পিচ ও ব্যাংক তারা তৈরি করেন এবং এর সঙ্গে মিল রেখে রং করেন। প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিমাগুলো যেন রঙ্গে ও রূপে হয়ে ওঠে জীবন্ত ছবি। এর মাধ্যমে মৃৎশিল্পীর কারিগরি ও শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ পায়। মৃৎশিল্পীরা আমাদের সাংস্কৃতির ধারক। আমাদের শিল্পকলার ইতিহাসে মৃৎশিল্পীরা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে চলেছে। জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি থেকে আসে শিল্পের মূল প্রেরণা। মূলত একজন শিল্পী তার সমগ্র সত্তায় অন্তর বহির্জগতের সুষমার সমন্বয় ঘটান । শিল্পীর জীবনবোধ থেকে জন্ম নেয় তাবৎ মহৎ সৃষ্টিকর্ম। শিল্পী কেবল একজন আবেগহীন অনুকারী নন বরং বিধাতার ব্যক্তিত্বের আংশিক অধিকারী।

www.pathagar.com

সে হিসেবে একজন মৃৎশিল্পীও সীমিত অর্থে একজন স্রষ্টা। মৃৎশিল্পী তার সৃষ্টিকর্ম দিয়ে যেমন সাধারণ মানুষের সেবা করেন তেমনি নিজের মনের খোরাক মিটিয়ে থাকেন। শিল্পকর্মকে সুন্দর রূপ দিয়ে। এখানেই মৃৎশিল্পীর নান্দনিকতার জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়।

বিপণন ব্যবস্থা

বাজার বলতে সাধারণত এমন স্থানকে বোঝানো হয় সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতারা উপস্থিত হয় ক্রয়-বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে। তবে বাজারে ক্রেতার হাতে সৃষ্ট দ্রব্য পৌছানোর আগে কয়েকটি ধাপ পার করতে হয়। ধাপটি হল: মৃৎশিল্পী→ পাইকারী→ ক্ষুদ্রব্যবসায়ী→ ক্রেতা।

মাঝে মাঝে মৃৎশিল্পীরা নিজ উদ্যোগে পণ্য পৌঁছে দেন ক্রেতার কাছে। এর মাঝে কোন মধ্যস্থতাকারী না থাকায় মৃৎশিল্পীদের লাভ হয় বেশি। কেননা এতে করে ক্রেতার সাথে শিল্পীর সরাসরি ভাব বিনিময় হয় এবং ঠকার কোন সম্ভবনা থাকে না। এক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়ী তার বাড়িতে এসে পাইকারী বা কম দামে তৈরি পণ্য নিয়ে যায়। মৃৎশিল্পী ক্রেতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে না। মালামাল বাজারজাতকরণের ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল থাকে এবং শিল্পী দ্রব্য কম মূলে পাইকারকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

সমীক্ষাকৃত অঞ্চলের বেশ কিছু বিপণনকেন্দ্রে এই মৃৎশিল্পের যথেষ্ট চাহিদা থাকায় পাইকারীরা কম মূল্যে মৃৎশিল্প গ্রামের শিল্পীদের নিকট থেকে কিনে এনে অপেক্ষাকৃত বেশি দামে এ সকল বিপণনকেন্দ্রে বিক্রি করে অধিক লাভ করে থাকে। ফলে মৃৎশিল্পী এই লাভ থেকে অনেকাংশে বঞ্চিত হয়।

তবে খুব কমই দেখা যায়, কিছু মৃৎশিল্পী বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করেন। তারা নিজেদের কাঁধে করে মৃৎপাত্র নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়, আবার হাটে নিয়ে বিক্রি করে। তবে এভাবে বাজারজাতকরণ মৃৎশিল্পীর পক্ষে অনেকটা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন মেলা উপলক্ষে মৃৎশিল্পীরা মৃৎশিল্প মেলায় নিয়ে গিয়ে পসরা সাজায়। তবে বর্তমানে আধুনিক যুগে তৈরি পণ্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মৃৎশিল্প দ্রব্য অনেকটা টিকতে পারে না। ফলে মৃৎশিল্পীরা তাদের মৃৎশিল্প কম মূল্যে বিক্রি করে খুব বেশি লাভবান হতে পারেন না।

প্রতিমা শিল্পীরা ক্রেতার সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। ক্রেতারা অনেক সময় শিল্পীর বাড়িতে এসে প্রতিমা কিনে নিয়ে যায়, আবার শিল্পীরা বিভিন্ন বাড়ি বা স্থানে গিয়েও প্রতিমা নির্মাণ করে আসেন। এক্ষেত্রে তাদের লাভ হয় বেশি।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দূরত্ব, যানবাহন, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সরাসরি ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান

সমস্যা

ঐতিহ্য নির্ভর মৃৎশিল্প বর্তমানে সমস্যামুক্ত নয়। এ সমস্যাসমূহ মৃৎশিল্পের উৎকর্ষ সাধনে বাঁধার সৃষ্টি করছে। ফলে সম্ভাবনাময় আমাদের নিজস্ব এ ঐতিহ্য যুগের সাথে তাল মিলাতে হিমশিম খাচ্ছে। মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পের কাঁচামাল যেমন : মাটি, রং, জ্বালানী ক্রয় করতে হয়। আবার অনেক সময় দেখা যায় এ সকল কাঁচামালের সরবরাহ সহজলভ্য নয়। ফলে মৃৎশিল্পীকে অনেক দূর-দূরান্ত থেকে কাঁচামাল যানবাহনের সাহায্যে আনতে হয়। এতে কাঁচামাল ও যানবাহন খরচসহ শিল্পীর অনেক পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে যায়।

মৃৎপাত্র পোড়ানো পইন বা ভাটা নির্মাণ করতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ মৃৎশিল্পীর একার পক্ষে বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

আধুনিক যুগে কলকারখানাজাত ধাতব দ্রব্যের অধিক ব্যবহারের কারণে মৃৎশিল্প দিন দিন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। ফলে মৃৎশিল্পের চাহিদাও হ্রাস পাওয়ায় শিল্পীরা এ শিল্পের প্রতি জড়িত থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। অনেক মৃৎশিল্পী বর্তমানে মৃৎশিল্পের নাজুক অবস্থা দেখে পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ক্রমেই দক্ষ মৃৎশিল্পীর অভাব হয়ে পড়ছে। মৃৎশিল্পের বাজার বিস্তৃত না হওয়ায় মৃৎশিল্পীরা তাদের প্রস্তুতকৃত শিল্পকর্ম বাজারজাতকরণে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। এছাড়া বাজারজাতকরণে দূরত্ব ও যাতায়তের সমস্যার কারণে বাজারজাতকরণ সম্ভব হয় না। ফলে মৃৎশিল্পীরা খুচরা ও পাইকারীভাবে তাদের মৃৎশিল্প দ্রব্য বিক্রি করছে। ফলে তারা লাভের মুখ দেখতে পায় না।

মধ্যস্থকারী ব্যবসায়ীর অস্তিত্ব মৃৎশিল্পের একটি বড় সমস্যা। মৃৎশিল্পীরা নিজেরা সরাসরি বাজারজাতকরণে অংশগ্রহণ করতে পারছে না ফলে তারা বিভিন্নভাবে পাইকারী বা মধ্যসত্ত্ব ব্যবসায়ীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে বাজারজাতকরণের জন্য। ফলে পাইকারী ব্যবসায়ী মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে কম মূল্যে শিল্পবস্তু কিনে নিয়ে বাজারের বিপনিকেন্দ্রে অধিক দামে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। ফলে মৃৎশিল্পী পরোক্ষভাবে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মৃৎশিল্পীরা তাদের পূর্বপুরুষের জাত ব্যবসা টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সরকারি, বেসরকারি বা সামাজিকভাবে কোন অনুদান পায় না। এমনকি ঋণ পাওয়াও তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মৃৎশিল্পীর একার পক্ষে মৃৎশিল্পে সংশিস্নষ্ট যাবতীয় খরচ বহন করা সম্ভব হয় না এবং তাদের শিল্পের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

এঁটেল মাটি মৃৎশিল্পের প্রাণ। অর্থাৎ মৃৎশিল্পের কাঁচামাল হচ্ছে এঁটেল মাটি। এই মাটি মূলত পাওয়া যায় খাল, বিল, হাওড় ও জলাভূমিতে। একমাত্র শুকনো মৌসুম অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল ছাড়া অন্য ঋতুতে এসব স্থানে পানিতে ভরপুর থাকে। তখন মৃৎশিল্পের মূল উপাদান এঁটেল মাটি খুব সহজে পাওয়া যায় না। তখন এই মাটি সংগ্রহ করতে হয় দূরদূরান্ত হতে। ফলে প্রয়োজন হয় পরিবহণ ও মজুরি খরচ।

নদী তার নাব্যতা হারানোর কারণে নদীতে জেগে উঠছে বালু মাটির চর যা মৃৎশিল্পের কাঁচামাল মাটি সংগ্রহের জন্য সহায়ক নয়।

মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এখন সময়ের দাবি। কারণ এটি আমাদের যেমন নিজস্ব সংস্কৃতির উপাদান তেমনি এর বিলুপ্তি আমাদের আত্ম পরিচয়ের হুমকিও বটে। তাই এ শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যত দ্রুত সম্ভব পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। নিম্নোক্তভাবে মৃৎশিল্পে বিদ্যমান সমস্যাসমূহের সমাধান করা যেতে পারে:

www.pathagar.com

মৃৎশিল্পে ব্যবহৃত যাবতীয় কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত ও সহজসাধ্য করতে হবে। যেমন : মাটি, রং ও পোড়াবার জ্বালানি।

মৃৎপাত্র পোড়ানোর পইন নির্মাণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যার মূল লক্ষ্য হবে একটি মৃৎশিল্প এলাকা গড়া।

-মৃৎশিল্পীদের মৃৎশিল্প পেশায় উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

-মৃৎশিল্পীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে।

-মৃৎশিল্পীদের মৃৎশিল্পের জন্য বাজার ব্যবস্থাপনার সম্প্রসারণ করতে হবে। যাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিক্রয় পরিমাণ বাড়বে।

-প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে দেশের সকল মানুষকে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন ও উৎসাহিত করতে হবে।

-মৃৎশিল্পকে গৃহে শোভা বর্ধনের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

-আমাদের মৃৎশিল্পের গুণগত যে মান আছে তা বিদেশী পর্যটকদের নিকট তুলে ধরার মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে হবে।

-মৃৎশিল্পের গুণগত মান বাড়িয়ে তা বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎসব, মেলায় - প্রদর্শনের ব্যবস্থা করলে বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে।

-মৃৎশিল্পীরা যাতে দক্ষ কারিগর হয়ে উঠে সেজন্য তাদেরকে বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

মৃৎশিল্পীর হাতে তৈরি পাত্র

www.pathagar.com

-সমাজের প্রতিটি মানুষকে মৃৎশিল্পীদের পেশার প্রতি মূল্যায়ন করার জন্য অভিযান চালানো দরকার।

-লোকশিল্পের গবেষণা ও নতুন সৃজনশীল চিন্তাভাবনার সাথে নতুন কর্মপদ্ধতি ও নতুন নতুন প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এই শিল্পকে সমৃদ্ধ করা যেতে পারে।

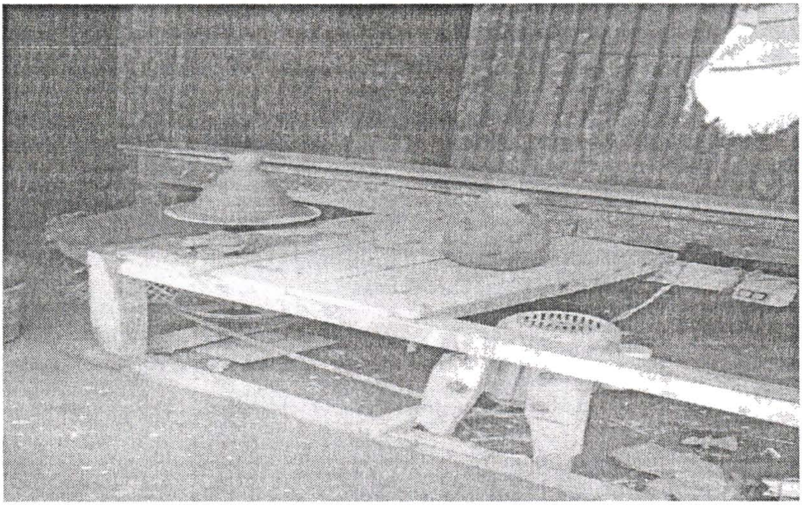

পাত্র তৈরির চাকার সাথে বৈদ্যুতিক মটর সংযুক্ত

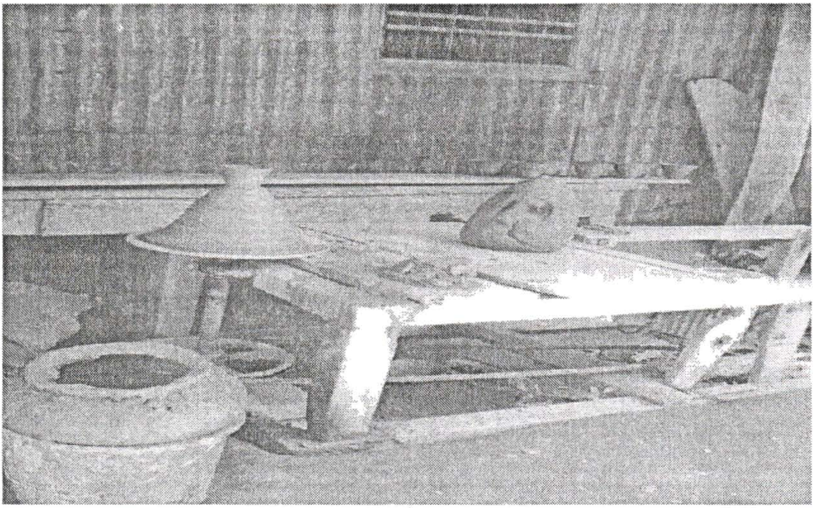

পাত্র তৈরির চাকা

www.pathagar.com

আংশিক প্রস্তুতকৃত পাত্র মাটিতে শুকানো হচ্ছে

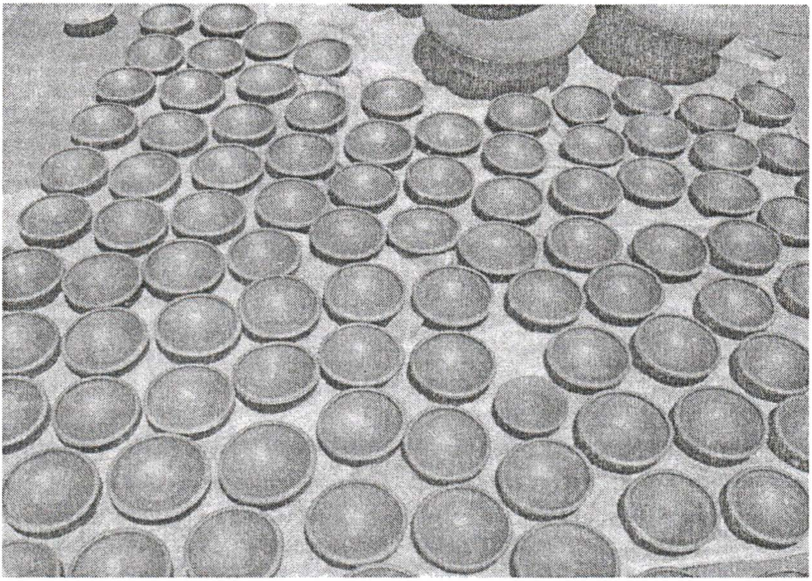

মাটির পাত্রে রং লাগানোর পর রৌদ্রে শুকানো হচ্ছে

www.pathagar.com

মাটির পাত্র রৌদ্রে শুকানোর পর রং করা হচ্ছে

পাত্র তৈরির পর রৌদ্রে শুকানো হচ্ছে

www.pathagar.com

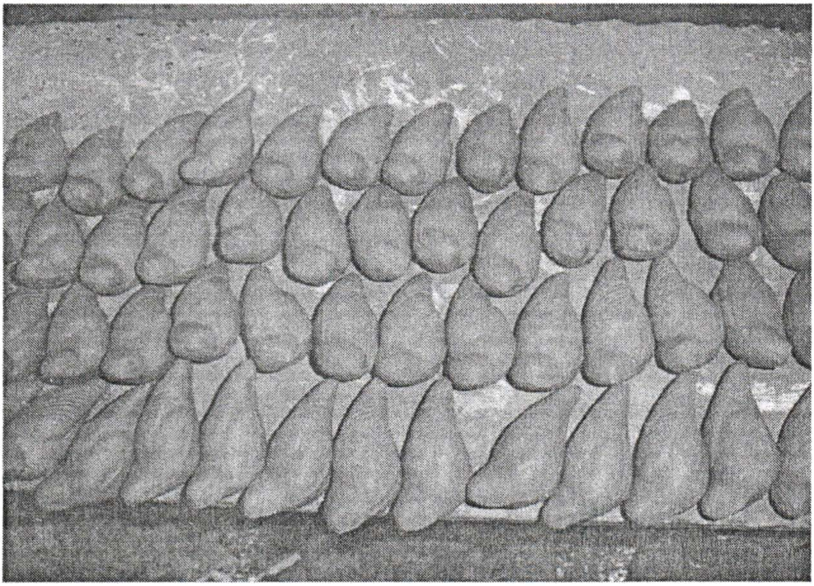

মাটি দিয়ে পাখি তৈরি

প্রতিমায় অলঙ্করণের কাজে একজন মৃৎশিল্পী

www.pathagar.com

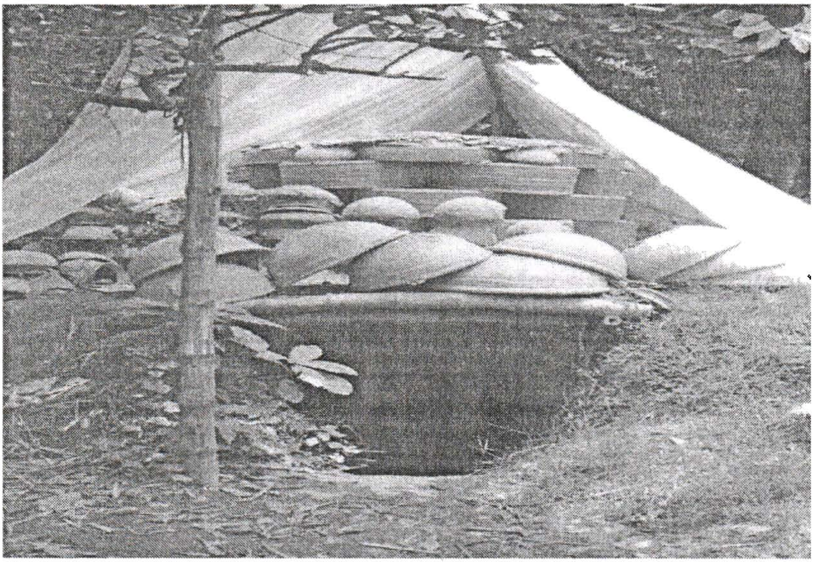

মাটির পাত্র পোড়ানোর চুলা/ভাটা

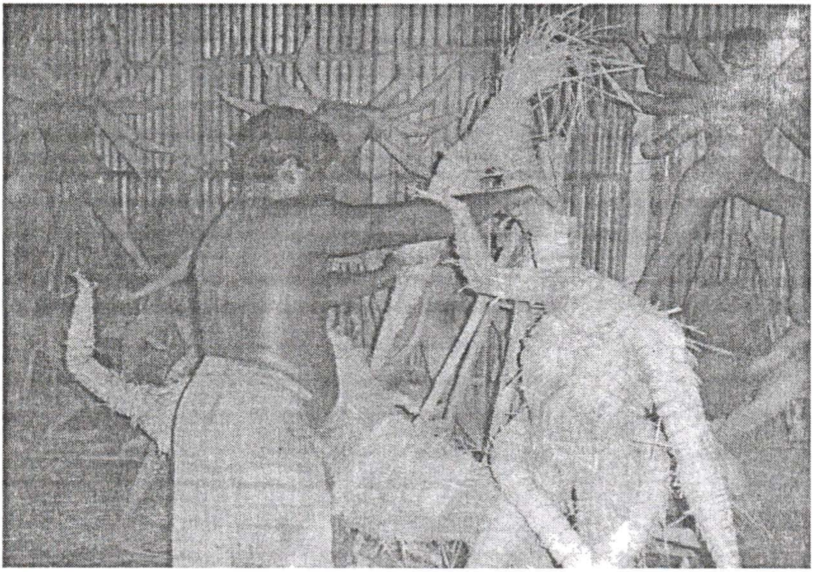

প্রতিমা তৈরির প্রাথমিক অবস্থা

www.pathagar.com

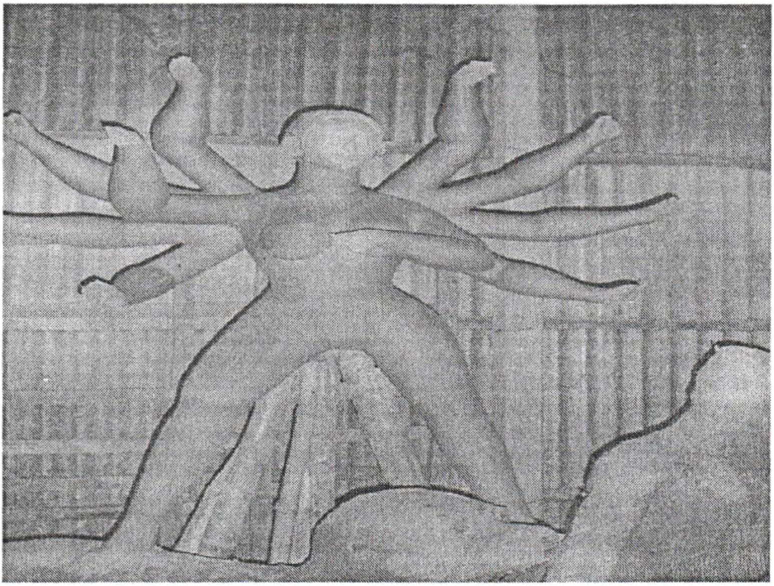

প্রতিমা তৈরির দ্বিতীয় অবস্থা

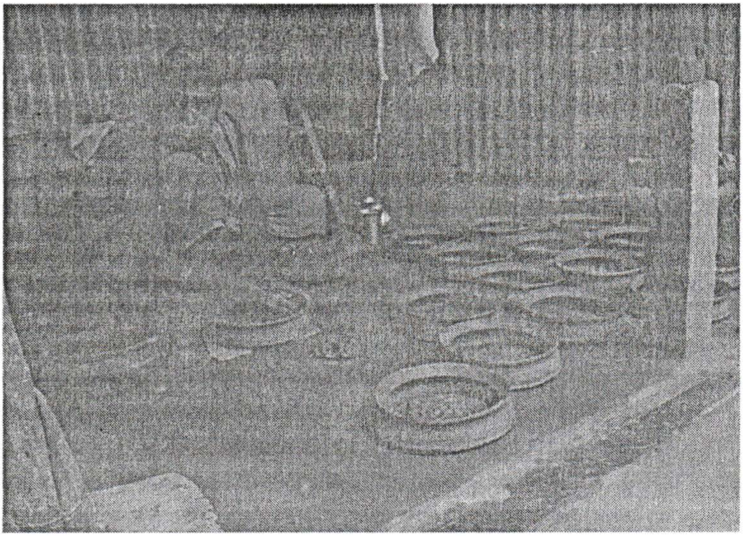

পাতিল তৈরির প্রাথমিক অবস্থা

www.pathagar.com

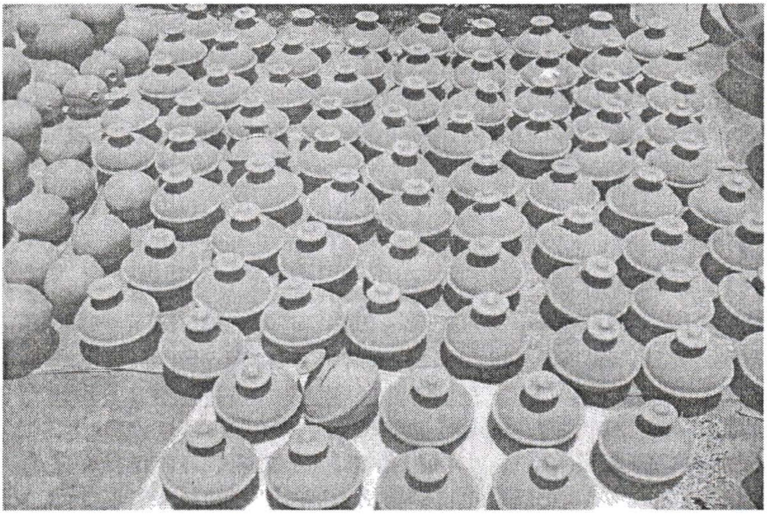

মটি দিয়ে তৈরি সড়া

প্রতিমা

- প্রাথমিক কাঠামো দান
- চূড়ান্ত আকৃতি দান
- রং দেয়া
- সাজ-সজ্জা।

প্রথমে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে কাঠামো তৈরি করা হয়। যার উপরে ধানের খড় বাঁধা হয় এটি করতে একদিন সময় লাগে, তার উপর মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। তাই কাজগুলো চলে অত্যন্ত ধীর গতিতে। মাটির কাঠামো তৈরি হয়ে গেলে আস্তে আস্তে চলে চূড়ান্ত আকৃতি দান। যখন পুরো কাঠামো তৈরি হয়ে যায় তখন শিল্পী অনেকগুলো ক্ষুদ্র ছাঁচ ব্যবহার করে কাজের সম্পূর্ণতা আনে। মুখের জন্য ছাঁচ ব্যবহার হয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রতিমার ছাঁচ রয়েছে, এই ছাঁচ গুলোও তারা নিজেরাই তৈরি করেন। ছাঁচ ব্যবহারে সঠিক ফলাফল অল্প সময়ে নিশ্চিত। হাত গুলো হাত দ্বারাই নির্মিত এবং হাতের মুদ্রা ও প্রতিটি আঙ্গুলের সৌন্দর্য পুরো হাতের কোমলতার নিপূণ হাতের স্পর্শে নির্মাণ করে থাকেন। এভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন অংশের আকৃতি দিয়ে থাকেন শিল্পী। মূর্তিটি একটি কাঠির সাহায্যে মসৃণ করা হয়। রং করার পূর্বে রোদে শুকানোর সময় বিভিন্ন স্থানে ফাটল দেখা দিতে পারে, সেগুলো মেরামত করা হয়। ফাটলগুলো মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়, মাটি গুলানো পানিতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে তা লাগিয়ে দেয়া হয়। প্রতিমাটিকে আবার এঁটেল মাটির প্রলেপ দেয়া হয়। প্রতীমা তৈরি করতে ৭ দিন সময় লাগে।

প্রতিমা গড়ার কাজ শেষ হলে তা রং করার পূর্বে পুরো কাঠামোতে সাদা রঙ্গের প্রলেপ দেয়া হয় এবং তার উপর রং দেয়া হয়। অতীতে খড়ে মাটি দিয়ে সাদা রং করা

www.pathagar.com

হতো। বর্তমানে জিংক অক্সাইড বাজার থেকে কিনে এনে ব্যবহার করে দেব-দেবী অনুযায়ী বিশেষ রং দেয়ার রীতি আছে। যেমন : দূর্গার বিভিন্ন রূপ মনসা হয়ে থাকে হলুদ। কালী কালো রঙ্গের। ব্রাশের সাহায্যে এই রং প্রতিমার গায়ে লাগানো হয়। এরপর মূর্তিকে রোদে শুকানো হয়। প্রতিমা রং করা হয়ে গেলে চলে এর সাজ সজ্জার কাজ পোশাক, গয়না পরানো হয়।

লৌহ শিল্প

লৌহ শিল্পের প্রস্তুত প্রণালী

কামাররা যে সমস্ত লোহার জিনিস তৈরি করে তা হল দা, বটি, কুড়াল, খোন্তা, কোদাল, ঘুপরি, তীর, বর্শা, লাঙ্গলের ফলা, হাসুয়া ইত্যাদি নানা রকম উল্লেখযোগ্য। তারা যে সমস্ত জিনিস তৈরি করার জন্য প্রথমে লোহা নির্বাচন করে। তারপর সেই নির্বাচিত লোহা থেকে তারা প্রয়োজন মতো লোহা ছেনি দ্বারা কেটে নেয়। তারপর তা হাপরের সামনে স্তূপ করে রাখা আগুন সমৃদ্ধ লাল টকটকে কয়লার ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এ সময় বাম হাত দিয়ে হাপর দড়ি টানা হয়। ফলে বাতাস সৃষ্টি হয় এবং তা কয়লাকে আরো আগ্নিগুণ সমৃদ্ধ করে। এক সময় লোহার টুকরাটিও লাল টকটকে হয়ে যায়। তারপর সেটিকে লোহার তৈরি "চিমটা" দ্বারা ধরে তা পাটার উপর রেখে উত্তম রূপে পেটানো হয়। এবং পুনরায় পেটানো হয়। মূলত এভাবে লোহার জিনিস তৈরি করা হয়।

লৌহ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

হাপর

হাপরকে অনেকেই হাওয়া কল বলে। লোহা পোড়ানোর মতো দরকারী কাজটি হাপরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। চুলাতে কয়লা দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ উত্তাপ আনার জন্য কয়লার আগুনে বাতাস দিতে হয়। এই বাতাস দেওয়ার জন্য হাপর ও চুলার সংযোগ স্থলে পাইপ থাকে। হাপরের সাথে দুই চেন এবং দুপাশে দুটো বাঁশ লাগানো থাকে। একটা চেন বা শিকলের প্রান্তদেশে লোহার বালা আছে, যা ধরে টানলে হাপরের মধ্য দিয়ে চুলায় বাতাস যাবে। পূর্বে হাপর গরুর চামড়া দিয়ে তৈরি করা হত কিন্তু বর্তমানে গাড়ির টায়ার, কাঠ, লোহা দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। চুলা ও হাপরের মাঝখানে মাটির তৈরি একটি ছোট দেয়াল থাকে, কারণ ভাতির বাতাসে কয়লা যেন দূরে উড়ে না যায় তার জন্য দেয়ালটি বাধার কাজ করে একটা হাপর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

পাটা

গরম লোহা পেটানোর জন্য কর্মকারদের বিভিন্ন সাইজের পাকা লোহা বা ইস্পাতের তৈরি জিনিসপত্র রয়েছে। তার মধ্যে পাটা অন্যতম। ট্রেনের যে সমস্ত লাইন নষ্ট হয়ে যায়, সেখান থেকে দিয়ে রেল কর্তৃপক্ষ অকশনে সেসব 'রেলপাট' বিক্রি করে। ১২ ইঞ্চি বা তারও বেশি রেল পাটার উপরে লোহা রেখে হাম্বর বা হাতুড়ি দিয়ে পেটানো

www.pathagar.com

হয়। ইস্পাতের তৈরি এই 'পাটা' মাটির সাথে শক্ত কাঠের উপর লোহার ক্লিপ দিয়ে শক্ত করে আটকানো থাকে। পাটার লোহা পিটিয়ে চওড়া ও চ্যাপ্টা করা হয়।

নিন (নিয়াই)

নিন হলো "পাটার" মতোই পাকা লোহার তৈরি, যার উপরে রেখে পোড়ানো লোহাকে পিটিয়ে লম্বা করা হয়। নিনের উপরিভাগ চ্যাপ্টা এবং বাবলা কাঠ দিয়ে মাটির সাথে সংযুক্ত। বাবলা কাঠে সহজে পঁচন ধরে না বিধায় মাটির মধ্যে স্থায়ীভাবে পুতে রাখা হয়। লোহার প্রথমে 'নিন' এর উপরে রেখে পিটিয়ে লম্বা করে তবেই পাটার উপর রেখে চ্যাপ্টা করা হয়।

হাতুড়ি

লোহা পেটানোর কাজে কামাররা তিন ধরণের হাতুড়ি ব্যবহার করে। হাম্বর, হাতুড়ি এবং দোয়াত। হাম্বর হলো সবচেয়ে বড় এবং ভারী হাতুড়ি, যার ওজন পাঁচ থেকে দশ কেজি। গমর লোহার উপর হাম্বর দিয়ে পিটিয়ে লোহাকে লম্বা কিংবা চ্যাপ্টা করে। মূল কর্মকার হাতুড়ি দিয়ে লোহার কোন জায়গায় কখন কিভাবে পেটাতে হবে তার দিক নির্দেশনা দেয়, তবেই শ্রমিক নির্ধারিত স্থানে তালে তাকে হাতুড়ি দিয়ে পেটায়। তাহুড়ির একদিক ছোট, পাতলা এবং চ্যাপ্টা হয় এবং অপরদিক গোল ও সলিড থাকে। দোয়াত আরেক ধরণের হাতুড়ি বিশেষ যার দ্বারা বড় বাঁকা লোহা সোজা করা হয়।

ছেনি

দেড় বা দুই ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের ছেনির মুখের অংশ অত্যন্ত ধারালো। ছেনি দিয়ে ধান কাটা কাস্তে বা কাঁচি ও খড় কাঁটা বটির মুখে ধার দেওয়া হয়। ধার দেওয়াকে "আল কাঁটা বা খাঁজ কাটা" বলা হয়। খাঁজ কাটার নিয়ম হলো, ছোট পাটের উপরে এক টুকরা টিন থাকবে তার উপরে কাস্তে কিংবা বটি রেখে ছোট হাতুড়ি দিয়ে ছেনির উপরে আস্তে আস্তে বাড়ি মেরে বটির মুখটা সূক্ষ্মভাবে কাটা হয়।

ঘষা কাঠ

এটা "ফিনিশিং কাঠ" নামেও পরিচিত ফাইল বা উখো দিয়ে সর্বশেষ ধার দেওয়ার সময় দাবা বটিকে এই ঘষা কাঠের উপরে রেখে লোহার হুক বা স্যুরশের সাথে আটকিয়ে খিল ঢুকিয়ে টাইট করা হয় এবং ফিনিশিং দেওয়া হয় বলেই কাঠটির এই নামকরণ।

চিমটা

আগুনে পোড়ানো উত্তপ্ত লোহা ধরে পেটানোর জন্য চিমটা ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

লৌহজাত যন্ত্রপাতি তৈরিরত কর্মকার (কামার)

তাঁতশিল্পের বিবর্তন ও আধুনিকায়ন

তাঁতশিল্প বাংলাদেশের একটি অতি প্রাচীন এবং ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প (Folk Industry)। এই শিল্পের উদ্ভাবন, উন্নয়ন, প্রসার এবং কাল প্রবাহে বিবর্তনের মাধ্যমে একে সময়োপযোগী করে টিকিয়ে রাখা– এ সবই করেছে এ দেশের অশিক্ষিত–অল্প শিক্ষিত জনগোষ্ঠী। হস্তচালিত যে তাঁত এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কুটির শিল্প মূলত একটি জনপ্রিয় লোকশিল্প। কারণ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে এর উদ্ভাবন ঘটেনি, জীবনের প্রয়োজনে আদিকালে মানুষ এর সৃষ্টি করেছে। তারপর থেকে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই মানুষের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনে বংশ পরম্পরায় এই শিক্ষা চলে আসছে। কাজেই এটি যে একটি লোকশিল্প সে বিষয়ে কারো দ্বিমতের অবকাশ নেই।

জীবন-যাপন এবং সভ্যতার প্রয়োজনে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই সারা বিশ্বেই এই শিল্প কমবেশি গড়ে উঠেছে। বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ অঞ্চল হিসেবে বাংলাদেশের খ্যাতি প্রাচীন ও মধুযুগ থেকেই। বাংলাদেশের সর্বত্রই তাঁতশিল্পের প্রচলন রয়েছে। এর মধ্যে কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লাসহ আরো কয়েকটি জেলা তাঁতশিল্পের জন্য বিখ্যাত। সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার তাঁত শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

শাহজাদপুরের তাঁতের কাপড় সমগ্র রাজশাহী-রংপুর বিভাগের মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত। শুধু রাজশাহী, রংপুর বিভাগ নয়, সমগ্র দেশে এবং দেশের বাইরেও শাহজাদপুরের কাপড়ের বাজার রয়েছে। এখানে উৎপাদিত কাপড়কে কেন্দ্র করে

www.pathagar.com

শাহজাদপুরে দুইদিন শুধু কাপড়ের বিশাল হাট বসে। প্রতি হাটে শতাধিক কোটি টাকার বেচাকেনা হয়। এই বড় দুইদিনের যোগান হিসেবে হাটের আগের দিন দুপুরের পর থেকে হাট বসে যায়। তা হলে সপ্তাহে চারদিন কাপড়ের হাট বসছে শাহজাদপুরে। এই কাপড়ের হাট শাহজাদপুরের পারিবারিক, সামাজিক ,সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে। মানুষজন হাটের সঙ্গে এতোটাই সম্পৃক্ত যে, হাটের দিনে সাধারণত কোনো অনুষ্ঠানাদি হয় না এখানে।

এই কাপড়ের হাট সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কার রয়েছে। যেদিন হাটে অনেক বেশি কাপড় কেনা-বেচা এবং সোরগোল হয় সেদিন হাটে পরি নেমেছে বলে তারা মনে করে। তাদের বিশ্বাস পরিরা এসে কাপড় কেনার কারণেই এতো বেশি কাপড় বিক্রি হয়েছে।

তাঁতবস্ত্র বুননরত তাঁতি

শাহজাদপুরে উৎপাদিত এই বিশাল পরিমাণ কাপড় প্রধানত হস্তচালিত তাঁতে উৎপন্ন হচ্ছে। এই তাঁত কুষ্টিয়া 'চিত্তরঞ্জন কটন মিলস'–এর তাঁতের মডেলে তৈরি বলে তা 'চিত্তরঞ্জন তাঁত' নামে পরিচিত। চিত্তরঞ্জন তাঁত বর্তমান ভারত ভূখণ্ড থেকে আমাদের দেশে এসেছে। ১৯৫৫ সালের দিকে একটি চিত্তরঞ্জন তাঁতের মূল্য ছিল মাত্র ২০ টাকা থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। বর্তমানে এ রকম একটি নতুন তাঁত তৈরি করতে কমপক্ষে ১৫,০০০ (হাজার) টাকা লাগে। কিন্তু আগের তাঁতের যন্ত্রপাতি ভালো ছিল। চিত্তরঞ্জন তাঁত প্রধানত কাঠ, লোহার রড, লোহার পাত এবং কিছু বাঁশের জিনিস দিয়ে তৈরি। এই তাঁতে ঘরের মেঝের উপরে কাপড় বোনা যায়। কিন্তু আরেক প্রকার তাঁত আছে

www.pathagar.com

তাকে খট্‌খটি তাঁত (Pitloom) বলে। চিত্তরঞ্জন তাঁতের আগে শাহজাদপুরে সব খট্‌খটি তাঁত ছিল। খট্‌খটি তাঁতে মেঝেতে গর্ত করে বিশেষ উপায়ে কাপড় বোনা হয়। এই তাঁতে সাধারণত গামছা, লুঙ্গি এবং এই জাতীয় ছোট কাপড় বোনা হয়। খট্‌খটি তাঁতেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। চিত্তরঞ্জন তাঁত এবং খট্‌খটি তাঁতের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ কাঠ মিস্ত্রি, লোহার কামার এবং বাঁশের কাজে দক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। শাহজাদপুরে ব্যবহৃত 'চিত্তরঞ্জন তাঁতের' বিভিন্ন যন্ত্রাংশের নামের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

১.	পায়া	৪টা (৬ইঞ্চি×৬ইঞ্চি)	৩০.	বল্টু ২.৫ ইঞ্চি	১২টা
২.	লম্বাপাশি	২ টা	৩১.	কামার সেট	১ "
৩.	সুতাপাশি	২ "	৩২.	টানা	১ "
৪.	চারকুট পাশি	২ "	৩৩.	কবজা	২ "
৫.	খাড়াপাশি ৪ ফুট	২ "	৩৪.	সাইড টানা	২ "
৬.	মাথার কাঠ	১ "	৩৫.	ব্যাংগা	১ "
৭.	নিশান কাঠ	২ "	৩৬.	ডাঁশা	২ "
৮.	৩ ফুট পাশি	২ "	৩৭.	চিমটা	১ "
৯.	কাতলা কাঠ	২ "	৩৮.	তেকাঠা	১ "
১০.	প্যাডেল	২ "	৩৯.	কড়া	৫ "
১১.	প্যাডেলের কান	২ "	৪০.	হুক	২ "
১২.	কাঠের নোরদ	১ "	৪১.	কান জোত	২ "
১৩.	কোল নোরদ	১ "	৪২.	পাউড়ি	১ "
১৪.	কাঁটার নোরদ	১ "	৪৩.	পাউড়ি চিমটা	১ "
১৫.	সিলের নোরদ	১ "	৪৪.	ম্যাড়ার শিক	২ "
১৬.	রোলার	১ "	৪৫.	সিটের ডাঁশা	২ "
১৭.	ভারা কাঠ	২ "	৪৬.	হুইলের রড	১ইঞ্চি ৬পিচ
১৮.	কোল নোরদের কান	২ "	৪৭.	বড় হুইল	২ "
১৯.	দোপ্‌তি	১ "	৪৮.	৬ সুত রড	৩ "
২০.	মুখ কাঠ	১ "	৪৯.	প্যানিয়াম	৩ "
২১.	হ্যান্ডেল	১ "	৫০.	রোলারের শিক	২ "
২২.	পাখা কাঠ	২ "	৫১.	ম্যাড়া	২টা
২৩.	বাক্স কাঠ	২ "	৫২.	শানা	১ "
২৪.	পুতুল কাঠ	২ "	৫৩.	বও	১ "

www.pathagar.com

২৫.	ঠ্যাং কাঠ	২ "	৫৪.	মাকু	১ "
২৬.	বল্টু ৬ ইঞ্চি	২২ "	৫৫.	ছিটা	১ "
২৭.	বল্টু ৫ ইঞ্চি	৪ "	৫৬.	মুঠি	১ "
২৮.	বল্টু ৪ ইঞ্চি	৪ "	৫৭.	বোবিন	অনেক
২৯.	বল্টু ২ ইঞ্চি	১১"	৫৮.	লেঙ্গুস	অনেক

ম্যাড়া যন্ত্রাংশটি আগের দিনে গণ্ডারের চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। এই ম্যাড়া বেশ টেকসই। এরপর মহিষের চামড়া দিয়ে তৈরি হতো। বর্তমানে প্লাস্টিকের তৈরি ম্যাড়া ব্যবহৃত হয়। এগুলোর দাম কম, কিন্তু শব্দ হয় বেশি। এছাড়াও তাঁতের কাজে ব্যবহৃত ছোটখাটো অনেক যন্ত্রাংশ এখন প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি হচ্ছে।

তাঁতের শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা ও তোয়ালের নকশার বিভিন্ন ধরন রয়েছে। এই নকশার জন্য নিচের যন্ত্রাংশগুলো ব্যবহৃত হয়। –

১. ডোবি (প্রয়োজনে এটাকে ছোটবড় করা যায়)
২. জ্যাকার্ড (জ্যাকেট নকশার জন্য ব্যবহৃত হয়)
৩. হুক জ্যাকার্ড
৪. হাতে তৈরি বুটিক

বর্তমানে হস্তচালিত তাঁতের জায়গা দ্রুত দখল করে নিচ্ছে পাউয়ারলুম–অর্থাৎ বিদ্যুৎ চালিত তাঁত। তাই হস্তচালিত তাঁত এক সময় হয়তো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেই সাথে আগামী দিনের তাঁতিরা ভুলে যাবে হস্তচালিত তাঁতের যন্ত্রাংশের নাম। সে কারণেই এর একটি তালিকা উপরে উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাউয়ারলুম সম্পূর্ণটাই লোহার তৈরি। এ তাঁতের দপ্তি, কোল নোরদ ও কাঁটা নোরদ কাঠের তৈরি। আর বাকি সবই লোহার। একটা হ্যান্ডলুমে প্রতিদিন স্বাভাবিকভাবে দুইটা শাড়ি বোনা যায়, খুব বেশি হলে তিনটা। আর পাউয়ারলুমে এর তিনগুণ উৎপাদন হয়। হ্যান্ডলুমে উৎপাদন কম, কিন্তু মজুরি বেশি। অন্যদিকে পাউয়ারলুমে উৎপাদন বেশি, মজুরি কম। এই উভয় প্রকার তাঁতেই উৎপাদিত কাপড়ের পিস্ হিসেবে মজুরি দেওয়া হয়। তুলনামূলকভাবে যেহেতু উৎপাদন অনেক বেশি তাই শ্রমিকরা হ্যান্ডলুম ছেড়ে পাউয়ারলুমের দিকে ঝোঁকছে। পাউয়ারলুমে শারীরিক পরিশ্রম কম, উপার্জন বেশি। এছাড়া মাথার উপর ফ্যান ঘোরে। তাই শ্রমিকরা পাউয়ারলুমে কাজ করতে বেশি আগ্রহী।

কিন্তু পাউয়ারলুমের বিকট শব্দ শ্রমিকদের জন্য বিরক্তিকর। শুধু বিরক্তিকর নয়, এই উচ্চ শব্দ তাদের কান, মস্তিষ্ক এবং হৃদযন্ত্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এই অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনের তাগিদে তারা নিজেরাই একটা উপায় উদ্ভাবন করেছে। যে হেডফোন কানে দিয়ে গান শোনা যায় সেটাকে তারা কানের সিঁপি হিসেবে ব্যবহার করে শব্দের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় বের করেছে।

তাঁত একটি প্রাচীন লোকযন্ত্র। কিন্তু যুগ প্রবাহে এ শিল্পের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছুর নানা রকম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ঘটছে।

www.pathagar.com

যেমন–আগের দিনে তাঁত শ্রমিকরা শ্রমের ক্লান্তি ভোলার জন্য গলা ছেড়ে গান গাইত। সে গান প্রধানত পল্লিগীতি এবং লোকসংগীত অঙ্গের। যেমন– 'আমার গলার হার খুলে দে ওগো ললিতে/হার পরে আর কি ফল হবে প্রাণ বন্ধু নাই ব্রজেতে' ইত্যাদি। তারপর তাদের কণ্ঠে শোনা গেল সিনেমার গান। যেমন– 'নানি গো নানি আমারে নি লইয়া যাইব্যা ভাইসাবের বাড়ি' ইত্যাদি। অতঃপর একসময় কম দামে এক ব্যান্ড রেডিও পাওয়া যেত। নিজেরা গান না গেয়ে সেই রেডিও চালিয়ে দিয়ে গান শুনতে শুনতে তাঁত বুনতো শ্রমিকরা। বর্তমানে সেই রেডিওর স্থান দখল করেছে মোবাইল ফোন।

এইভাবে তাঁতশিল্প এবং এর সাথে যুক্ত অনেক বিষয়ে আধুনিকায়ন হচ্ছে। কিন্তু এ শিল্প সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার আজও সম্পূর্ণরূপে উঠে যায়নি। এখনো প্রতিদিন কাজ শুরুর আগে মুসলমান শ্রমিকরা তাঁত সালাম কোরে এবং হিন্দু শ্রমিকরা করজোরে তাঁত প্রণাম কোরে কাজ শুরু করে। তাদের বিশ্বাস এতে দিনের কাজ নির্বিঘ্ন হবে।

তাঁতবস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে 'ত্যানা' (টানা) প্রস্তুত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাপড় বোনার আগে সুতাকে প্রয়োজন মতো টান কোরে নিয়ে একটা মোটা লম্বা কাঠের সাথে অথবা ড্রামের সাথে জড়ানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় সুতা টান করে নেওয়া হয় বলে এর নাম 'টানা'। এই 'টানা' শব্দই লোক-উচ্চারণে 'তানা' বা 'ত্যানা' হয়েছে। ত্যানা প্রস্তুত প্রক্রিয়াকে 'ত্যানা কাড়ানো' বলে।

আগের দিনে একটা লম্বা ফাঁকা জায়গাতে ত্যানা কাড়ানো হতো। দুই দিকে দুইটা খুঁটি গাড়া হতো এবং মাঝে মাঝে কাঠি পোতা থাকতো । এই কাঠিগুলো প্রধানত তাল বা সুপারি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি। কখনো বা বাঁশের শক্ত বাতা দিয়েও তৈরি হয়। হাতে ত্যানা কাড়ানোর জন্য দুটো খাঁচা থাকে–এর একটা 'আই খ্যাচা' এবং অন্যটি 'বোবিন খাঁচা'। এই খাঁচা দুটো হাত দিয়ে ধরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায় এবং এইভাবে বার বার ঘুরে ঘুরে সুতা টান করা হয়। ত্যানা প্রস্তুত প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে ড্রামের সাহায্যে ত্যানা কাড়ানো হয়। এই ড্রাম ১২ হাত বা ১৩.৫ হাত ব্যাসের। এটা কাঠ এবং পাতি লোহা দ্বারা নির্মিত। এই ড্রামের সাহায্যে ত্যানা কাড়ানোর জন্য ফাঁকা জায়গার প্রয়োজন হয় না– একটা বড় ঘরের মধ্যেই এর সাহায্যে কাজ করা হয়। হাতে ত্যানা কাড়ানোর চেয়ে ড্রামের সাহায্যে ত্যানা কাড়ানো সহজ এবং এতে পরিশ্রমও কম।

বাংলাদেশের লোকসমাজে– বিশেষ করে নারীদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে যে পিঠা, মাছ-মাংসের ভালো তরকারি, মুড়ি ভাজার সময় মুড়ি ইত্যাদি কোনো কোনো মানুষ মন্ত্রবলে নষ্ট করে দেয়। একইভাবে সদ্য প্রসূতি গাভীর ওলানের দুধও নষ্ট করে। আবার মানুষের শরীরের কোনো কাটা বা ক্ষতস্থান নষ্ট করে। একে তারা 'মুখদোষ' করা বলে। এর ফলে পিঠা তৈরি করা যায় না, তরকারির ঠিকমতো স্বাদ হয় না, গরুর ওলান শক্ত হয়ে বাঁট দিয়ে দুধ বেরোয় না এবং মানুষের শরীরের ক্ষত শুকায় না। ঠিক সেরকম তাঁতের ত্যানাও মানুষ নষ্ট করে বলে তাঁতিদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করে।

www.pathagar.com

তাদের বিশ্বাস এর ফলে কাপড় বোনার সময় প্রচুর সুতা ছিঁড়ে যায় এবং তাঁতে কাপড় বোনা কষ্টকর এবং প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এটা নিছক একটি লোকবিশ্বাস মাত্র। এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আসলে সুতা রং করা, মাড়ি করা ইত্যাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় ত্রুটির কারণেই এরকম হয়ে থাকে। এখনকার দিনে অনেকেই এই ত্যানা নষ্টের ব্যাপারটি ভিত্তিহীন বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁতিদের একটি অংশ বিশেষ করে নারীরা এখনো এটা বিশ্বাস করে। এমন কি যারা পাওয়ারলুম চালায় তাদেরও একটি অংশ ত্যানা নষ্টের ব্যাপারটি বিশ্বাস করে। কাজেই তাঁতশিল্পকে কেন্দ্র করে যে সব লোকবিশ্বাস ছিল তা এখনো সম্পূর্ণ চলে যায়নি। আসল কথা, মানুষ যত শিক্ষিত বা বিজ্ঞান মনষ্ক হোক না কেন লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হবে না।

তাঁতে কাপড় বোনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সুতা রং করা। লাল, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো– যে কোনো রং করার জন্য নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ বা কেমিক্যালস্ প্রয়োজন হয়।

১. হাইড্রো সালফেট (হাইড্রোজ)
২. কস্টিক সোডা
৩. এলুমিনিয়াম পাথর
৪. নাইট্রিক সল্ট
৫. সালফিউরিক এসিড
৬. লবণ (খাবার লবণ)

উপরিউক্ত কেমিক্যালস্ ছাড়া কোনো রং করা সম্ভব না। এগুলো গরম পানি বা ঠান্ডা পানি উভয় প্রকারের রং করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। রং পাকা করার জন্য কড়াইয়ে দিয়ে ভালোমতো জ্বাল দিতে হয়। যত জ্বাল দিবে রং ততো পাকা হবে। শেষে ভালো করে ধুয়ে কেমিক্যালস্গুলো বের করে ফেলতে হয়।

আগে তাঁতিদের বাড়িতে বাড়িতে সুতা রং করা হতো। এখন আর এই নিয়ম নেই বললেই হয়। বর্তমানে রেডিমেড রং করা সুতা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। তবে এ সুতার পরমায়ু কম। কারণ রং করার আগে মেশিনের সাহায্যে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ও ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সুতা প্রসেস করা হয়। সঠিকভাবে প্রসেস করা না হলে সুতা দুর্বল হয়ে যায়। বাজারে রং করা বেশির ভাগ সুতার ক্ষেত্রেই প্রসেসের ত্রুটি থাকে বলেই এ সুতা দুর্বল হয়।

সুতা রং করার বিষয়টিরও আধুনিকায়ন ঘটেছে। হাতে সুতা রং করা একটি শ্রমসাধ্য কাজ। তাছাড়া যারা হাতে রং করে রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে তাদের শরীরের নানা রকম ক্ষতি হয়। এ সব দ্রব্যের স্পর্শে এবং ধোঁয়া বা ভাপের কারণে শরীরের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই বর্তমানে বয়লার মেশিনে এবং অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে সুতা রং করা হচ্ছে। এতে হাতের স্পর্শ ছাড়াই অল্প সময়ে অনেক সুতা রং করা সম্ভব।

www.pathagar.com

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প–তাঁতশিল্পের নানা রকম বিবর্তন ও আধুনিকায়ন ঘটছে। কিন্তু কাজ নিরাপদ করার জন্য তাঁত সালাম করা বা প্রণাম করা, ত্যানা নষ্ট করা, হাটে পরি-নামা ইত্যাদি লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার এখনো এ শিল্পকে কেন্দ্র করে অনেকাংশে রয়ে গেছে। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংস্কৃতির যতই প্রসার ঘটুক মানুষের মনে আবহমানকাল থেকে যে-সব লোকবিশ্বাস এবং সংস্কার রয়েছে সেগুলো কখনোই সম্পূর্ণরূপে চলে যাবে না। যেমন–শিক্ষা ও বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে এখন অনেকেই ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু ভূত না থাকলেও ভূতের ভয় ঠিকই রয়েছে। সে রকম তাঁতশিল্প সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসও কাল-প্রবাহে যথারীতি প্রবহমান থাকবে।

শীতল পাটি

শীতল পাটি বাংলাদেশে এক ঐতিহ্যবাহী শিল্প হিসেবে বিবেচ্য। এই শিল্পের প্রসার এবং জনপ্রিয়তার জন্য তা আজ পর্যন্ত টিকে থাকতে সক্ষম। শীতল পাটির সন্ধান পাওয়া যায় সিরাজগঞ্জ জেলায় রায়গঞ্জ উপজেলায়। এককে এলাকায় এককে রকমের নাম পাওয়া যায়। ময়মনসিংহে বলা হয় পাইতারা, সিলেটে বলা হয় মোর্তা প্রভৃতি। শীতল পাটির মূল উপকরণ হলো বেত। এই বেত চাষ করা হয় নিজ আঙ্গিনায় কিংবা ক্ষেতে। চারা বুনতে হয় মূলত বাঁশের মতই। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাসে এই চারা রোপণ করতে হয়। চারা রোপণের তিন বছর পর থেকে বেত তোলা যায়। যখন প্রাপ্ত বয়স হয়ে যায় তখন প্রতিবছরই গাছ কাঁটা যায়। প্রায় ৭ থেকে ৯ ফিট লম্বা হয়। শুষ্ক স্থানে হলে গাছের জন্য ভালো বলে ধরে নেওয়া হয় তবে পানিতেও হয়। বেত কাটা হয় মূলত কাঁচি বা বেত কাঁটার দিয়ে। সর্বপ্রথম গাছ কেটে শুকিয়ে নিতে হয় মাত্র ২/৩ ঘণ্টা। তার পর মাঝখানে দিয়ে চিড়তে হয় যাকে বলা হয় শৈলিই। এই গাছ শুধুমাত্র কার্তিক মাস থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত কাটা যায়। কিন্তু বাকি সময় গুলোতে কাটাকৃত গাছই শুকিয়ে সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহার করে থাকে। শুকনো গাছগুলোকে সর্বপ্রথমে ৭/৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। এই এলাকায় দুই ধরনের পাটি তৈরি করে শীতল পাটি আর আউলা পাটি।

প্রথমে বেতগুলো থেকে বাইন তুলতে হয়। বাইনগুলো তুলতে একটা বেতকে প্রথমে ৪ ভাগ করে বাইন তুলতে হয়। তারপর বেত পাতিগুলো-তেঁতুলের পাতা, চাল ধোয়ার পানি, ভাতের মার দিয়ে মোড়ানো বেতি জ্বাল দিতে হয়। এতে বেতির রং একটু সাদাটে হয় আর বেতির মসৃণতা বাড়ে। অনেক শীতল পাটি তৈরি করতে রঙের ব্যবহার বিদ্যমান। তবে মূলত নীল, সবুজ, গোলাপী ইত্যাদি রং ব্যবহার করে নক্‌শা তৈরি করা হয়। তাই প্রথমে গরম পানির মধ্যে রং দিয়ে তারপর বেতিগুলো দিয়ে রং করতে হয়। পাটি বোনার জন্য প্রথমে কর্ণার থেকে ৬টা বেতি দিয়ে বুননের কাজ শুরু করা হয়। তারপর আস্তে আস্তে বেতি সংযুক্ত করে পাটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বাড়ানো হয়। প্রথমে ভিত্তি হিসেবে ২ ফিট করতে হয়। তারপর সেটা বৃদ্ধি করে থাকে। তারা ৫ থেকে ৭ ফিট পাটি তৈরি করতে ৪ থেকে ৫ দিন সময় লাগায়। আবার ৩/৪ ফিট

www.pathagar.com

আয়তনের পাটি তৈরি হতেও প্রায় ৩ দিন সময় লাগে। এভাবে সাধারণত ডিজাইন ব্যতীত পাটি তৈরি করা হয় আবার নক্‌শা যুক্ত ও থাকে অর্থাৎ অনেক শীতল পাটিতে নানা রঙের বেতি ব্যবহার করা হয়। যেমন- নীল, সবুজ, মেজেন্টা রঙের প্রাধান্য বেশি। এছাড়া মোটিফ হিসেবে ব্যবহার করা হয় জ্যামিতিক মোটিফ। মাঝে মাঝে বোরফির মধ্যে ছোট ছোট ফুলেও নক্‌শাও করা হয়। পাটি তৈরি করার পর তা আবার রোদে শুকতে দিতে হয়। কিন্তু একটা বিষয় খেয়াল রাখা উচিত যাতে করে বেশি রোগ না পরে কারণ এতে পাটি ভেঙ্গে যাবার সম্ভাবনা থাকে। যেহেতু ঘরে বসেই এই কাজ সম্ভব তাই ছেলে মেয়ে উভয়ই এই কাজ করে থাকে। তবে বেত ক্ষেত বা অঙ্গিনা থেকে তোলার দায়িত্ব পুরুষের উপর পড়লেও বাকি কাজ গুলো উভয়েই করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে অন্য গোত্র থেকে বিবাহিত নারী এখানে এসেই এই কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে।

পাটি তৈরি করতে প্রথমে নিজের কিংবা অপরের জমিতে বেত বুনে থাকে। একটি পাটি তৈরি করতে প্রায় ১০০ টা বেত লাগে। প্রতি বেতের দাম ১ টাকা। আবার অনেকে যাদের বেতের বাগান নেই তারা কাটানো ও কোরানো বেতি কিনে তাকে দাম পড়ে ১৫০ টাকার মত। যারা বাইন করে তাদের দিতে হয় ১০০ টাকার মত। তাই আউলা পাটির দাম পড়ে ৩০০ থেকে ৪৫০ টাকার মত। শীতল পাটির দাম ৪০০ থেকে ৭০০ টাকা। এর আয়তন ৩ থেকে ৮ হাত। আবার অনেক শীতল পাটির দাম ২০০০ টাকার বেশিও হয় সেটার গুণগত মানের দিক থেকে বিবেচনা করা হয়।

এই পেশা মূলত ঐতিহ্যগত প্রাপ্ত। বংশ পরম্পরায় এটি চলে আসছে। তাছাড়া এটা ছাড়া অন্য কোনো পেশার সাথে তারা জড়িত নয় বিধায় এই পেশায় তারা নিয়োজিত রয়েছে। এই পাটি সব সময় তৈরি করা হলেও বর্ষকালে একটু কম কাজ হয়। শুধুমাত্র আবহাওয়া জনিত কারণে। এই পাটির জনপ্রিয়তা সিলেট কিংবা অন্যান্য জায়গার মত না হলেও এ কদর অনেক বেশি। তার ফলস্বরূপ এর জনপ্রিয়তা তাকে টিকিয়ে রাখতে আজও সক্ষম। এই পাটির ব্যবহার শুধুমাত্র যে নান্দনিকতার প্রয়োজনস্বরূপ তা নয় এর ব্যবহারিক দিকও বিদ্যমান। তাই সার্বিক দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে দিনে দিনে এই পাটির বর্তমান অবস্থা বেশি উন্নতর পর্যায়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র আর্থিক স্বচ্ছলতা এবং শ্রমের মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখা সক্ষম।

নক্‌শি পাখা

আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে তাকালে বিশাল এক জায়গা জুড়ে রয়েছে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সফলতার ধ্বনি। এরই মাঝে যেমন গ্রামীণ সমাজে পাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তেমনি শহরে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর গরমের বাতাস নিবারণের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বেশ সমাজগত। পাখা মূলত দুই প্রকার হাত পাখা এবং টানা পাখা। আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো হাত পাখা সম্বন্ধে। হাত পাখার সঙ্গে জড়িত উপকরণ এবং জনবল অনেক সহজ লভ্য। তাই পাখা তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে- ব্যবহৃত

www.pathagar.com

পুরাতন কাপড়ের একাংশ বাঁশের বেড়া এবং ডাটি, সুঁতার কাজে সজ্জিত করা হয় এক একটা পাখা। এই পাখাগুলো তৈরি করা হয় একটা বাঁশের ডাটি এবং বেড় নেওয়া হয় তাতে কাপড় জড়ানো হয় যাতে নক্‌শা করা হয়। তার ভেতরের অংশে নানা রকমের গাঢ় রং দ্বারা নক্‌শা করে বুনন করা হয়। এতে অনেক সময় ছন্দ বা নাম লেখা হয়। এছাড়া নক্‌শা গুলোতে নানা ধরনের মোটিফের ব্যবহার লেখা যায়। নানা ধরনের ফুল, পদ্মসহ জ্যামিতিক নক্‌শা যেমন- বোরফি ব্যবহার করা হয়। পাতা, পাখি ইত্যাদির নক্‌শাও থাকে। এই পাখাগুলো মূলত গ্রামীণ নারীরা তৈরি করে থাকে এবং অবসরে তাদের ব্যস্তময়তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি চলে আসছে। এই পাখার খরচ তেমন নেই কারণ ঘরে ব্যবহৃত পুরাতন কাপড় যেহেতু ব্যবহার করা। শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবহারের জন্য তারা তৈরি করে থাকে কিন্তু আজকাল নানা জায়গায় এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে নক্‌শি পাখাগুলো বাণিজ্যিকভাবে তৈরি হচ্ছে।

তথ্যনির্দেশ

১. শ্রী রতন চন্দ্র পাল, পিতা : মৃত রাখাল চন্দ্র পাল, গ্রাম : বড়গোজা (পালপাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২১-০৮-২০১১ সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।
২. শ্রী সুজিৎ কুমার পাল, পিতা : পরেশচন্দ্র পাল, গ্রাম : বড়গোজা (পালপাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩০, শিক্ষা : নিরক্ষর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ২.০৫ ঘটিকা।
৩. শ্রী কালিপদ পাল, পিতা : মৃত গিরিশচন্দ্র পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৭, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২২-০৮-২০১১ সময় : সকাল ১১.১৫ ঘটিকা।
৪. সুশান্ত কুমার পাল, পিতা : মৃত জতিন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫২, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ১২.১৪ ঘটিকা।
৫. শ্রী জয়দেব চন্দ্র পাল, পিতা : শ্রী সুবল চন্দ্র পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩০, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ০১.৩৫ ঘটিকা।
৬. নিতাই চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি।
৭. গৌতম চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩২, শিক্ষা : এস এস সি।
৮. দিলীপ চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২৮, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি পাস।
৯. মীনা রাণী, গ্রাম : পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২৬, শিক্ষা : ষষ্ঠ শ্রেণি পাস।

www.pathagar.com

১০. ড. মযহারুল ইসলাম, ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন-পঠান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।

১১. মো. আমজাদ আলী, পিতা : মোঃ করিম শেখ, রেলওয়ে কলোনী, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কামার।

১২. মো. শামসুল আলম, পিতা : মোঃ জমসের আলী শেখ, ধীতপুর কানু, বহুলী, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : কামার।

১৩. মো. আল-আমীন, পিতা : মমতাস, ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

১৪. মো. গোলজার হোসেন, বয়স : ৬৪ বছর, পেশা : তাঁত ব্যবসায় (বংশানুক্রমে), গ্রাম : মনিরামপুর, পোঃ ও উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

১৫. হাফেজ মো.আকরাম হোসেন, বয়স : ৫৩ বছর, পেশা : তাঁত ব্যবসায় (বংশানুক্রমে), গ্রাম : মনিরামপুর, পোঃ ও উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

১৬. আলহাজ মো. কোবাদ হোসেন, বয়স : ৮০ বছর, পেশা : তাঁত ব্যবসায় (বংশানুক্রমে), গ্রাম : পুকুরপাড়, পোঃ ও উপজেলা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসংস্কৃতির সমৃদ্ধতম ধারা 'লোকসংগীত'। সমগ্র বাংলাদেশে কত প্রকারের লোকসংগীত প্রবাহমান রয়েছে তা যথার্থভাবে এখনও গণনা করা সম্ভব হয় নি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রচলিত লোকসংগীতের সংখ্যা আট শতাধিক। বাংলাদেশে বাঙালি সমাজের পাশাপাশি বসবাস করছে প্রায় অর্ধশতাধিক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। তাদের জীবনেও প্রবাহমান রয়েছে প্রায় দেড় শতাধিক লোকসংগীতের ধারা।[১]

লোকসংস্কৃতি সরাসরি বৃহত্তর লোকজীবনের সাথে সম্পৃক্ত। যুগ যুগ ধরে প্রায় প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে এবং সেই জ্ঞান নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার প্রভৃতিতে ব্যবহার করে লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে আসছে। পূর্বেই বলা হয়েছে লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে লোকসংগীত। লোকসংগীত মাত্রই আঞ্চলিক; এর রয়েছে নিজস্ব সুর, তাল, লয় ও বৈচিত্র্য। একটি অঞ্চলের মানুষের আচার-ঐতিহ্য-বৈচিত্র্য-শিল্পবোধ-ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি প্রায় সকল কিছুই প্রতিফলিত হয় লোকসংগীতের মধ্য দিয়ে। লোকসংগীতকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়, তবে পরিবেশনাগত দিক দিয়ে প্রধানত দু'টি শাখাতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, যথা- আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত ও অনানুষ্ঠানিক লোকসংগীত।

আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত : বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উৎসবকে কেন্দ্র করে যে লোকসংগীত পরিবেশিত হয়ে আসছে তাই আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত। সাধারণত কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান বা উপলক্ষ্য করে আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত পরিবেশন করা হয়। যেমন : বিয়ের গান, কীর্তন, পালা গান, কিচ্ছা গান, কবিগান, রামলীলা, বেদের গান, যাত্রা গান, নৌকা বাইচের গান, বেঙ বিয়া, গরুর বিয়া, গম্ভীরা, গাজন, ভাদুই, মাগন, পাঁচালি, হোলি প্রভৃতি। বিয়ে, সাধভক্ষণ, ঝুলনযাত্রা, ভাসানযাত্রা, অন্নপ্রসনসহ নানা লৌকিক অনুষ্ঠানে সাধারণত আনুষ্ঠানিক লোকসংগীত পরিবেশিত হয়।

অনানুষ্ঠানিক লোকসংগীত : আমাদের সমাজে চলমান সমাজ ব্যবস্থা-সংস্কৃতি-কৃষ্টির সঙ্গে সমান্তরালভাবে কিংবা কাজে কর্মের অবসরে ও বিনোদনের অংশ হিসেবে অবিরতভাবে লোকসংগীতের যে শাখাটি চলে আসছে তাই অনানুষ্ঠানিক লোকসংগীত। এই লোকসংগীতের ক্ষেত্রে উৎসব কিংবা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন পড়ে না। এটা যেকোনো সময়ে কিংবা যেকোনো পরিস্থিতিতে পরিবেশিত হয়ে থাকে। এজন্য আলাদা কোনো প্রস্তুতি বা আনুষ্ঠানিকতার তেমন প্রয়োজন পড়ে না। আমাদের সমাজে প্রচলিত অনানুষ্ঠানিক লোকসংগীতের মধ্যে তত্ত্ব সংগীত, প্রেম সংগীত, বিচ্ছেদ সংগীত, ভক্তি সংগীত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুর্শিদি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, মারফতি, দেহতত্ত্ব, বারাসে, ধুয়া, মাইজ-ভাণ্ডারি গান ইত্যাদি উক্ত শাখার অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রচলিত রয়েছে লোকসংগীতের অর্ধশতাধিক ধারা। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মেয়েলিগীত, ধুয়া, জারী, সারি, মুর্শিদি, বাউল, মারফতি, বারাসে, কীর্তন, জাগ, গাজন, ভাসান, নৌকাবাইচের গান, ধানকাটা গান, পাটকাটা গান, রাখালিয়া গান প্রভৃতি। এসব সংগীতের কোনো কোনোটা বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত; আবার কোনো কোনোটা এখনও সজীব ধারায় প্রবাহিত।[২] প্রচলিত এসব লোকসংগীত রচয়িতারা কেউই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন। অধিকাংশই বর্ণ পরিচয়হীন। এসব সংগীত মুখে মুখে সৃষ্টি এবং মুখে মুখে এর প্রসার ঘটে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলা লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার বিশেষ। যান্ত্রিক সংস্কৃতি তথা রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, সিনেমার সর্বগ্রাসী প্রভাব উপেক্ষা করে এখনও এ অঞ্চলের লোকজীবনের পাতায় পাতায় লোকসংগীত, লোককাহিনি, লোকছড়া, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধার মতো লোকসাহিত্যের দুর্লভ সম্পদগুলো আত্মরক্ষা করে চলছে; লোকমানসকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উজ্জীবিত রেখেছে।

১. মেয়েলিগীত

শাহজাদপুর অঞ্চলে মুসলিম ও হিন্দু পরিবারের বিয়েতে মেয়েলিগীত পরিবেশন করা হতো খুব ধুমধাম করে। এক্ষেত্রে বর কনের গায়ে হলুদ, কনে সিংড়ানো, বর পক্ষকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ, বিবাহোত্তর কনে বিদায়, বধুবরণ, বাসীগোসল ইত্যাদি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পরিবারের এবং পাড়া প্রতিবেশি মেয়েরা নেচে-গেয়ে গীত পরিবশেন করতো। আধুনিককালে গ্রামীণ জীবনেও মেয়েলিগীত পরিবেশনের সেই যৌলুস চোখে তেমনটা পড়ে না। বর্তমানে মেয়েলিগীত এ অঞ্চলে ঘটা করে পরিবেশিত হয় না ঠিকই কিন্তু নারী জীবনের অস্তিত্ব থেকে তা সম্পূর্ণভাবে আজো বিলীন হয়ে যায় নি। এ অঞ্চলে মুসলিম সমাজে বিয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো 'গায়ে হলুদ'। এই অনুষ্ঠানটি বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যায় বর-কনে উভয়ের বাড়িতে ঘটা করে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এতে বর-কনের নানী-দাদী, বোন-ভাবি এবং পাড়া-পড়সি মেয়েরা নেচে-গেয়ে এখনও গীত পরিবেশন করে এবং গায়ে হলুদ মেখে থাকে। এই অনুষ্ঠানে পরিবেশিত একটি গীত নিম্নরূপ :

পূবে থিনি উঠলো ব্যালা রে
লাল বরণ হয়্যা না রে কে,
পরচিমে যায়্যা ডুবলো বেলা রে
হলুদ বরণ হয়্যা না রে কে।
কাঁচা হলুদ বাইট্যা খলিল রে
যাচ্ছেন শ্বশুর বাড়ি না রে কে,
শ্বশুর বাড়ি যায়্যা খলিল রে
কি কি পাইল দান না রে কে।
পাইয়াছিল্যাম পাইয়াছিল্যাম রে
আপন দাদী শাউরিক দানে নারে কে,

www.pathagar.com

আপন দাদা শ্বশুর হইল ব্যাজার যে
থুইয়া আইলাম ঘরে না রে কে।[৩]

বিয়ের পূর্বের দিন গায়ে হলুদের আগে নাপিত এসে বরের হাত-পায়ের নখ, মুখের দাড়ি কেটে দিতো। সে সময় নাপিতকে নিয়েও কিছু গীত পরিবেশন হতো। যেমন :

তোমার কি দ্যাশে লাপিত নাই
ফালাও নাই মুখের দাড়ি না রে কে,
আছে লাপিত পয়সা নাই
ফালাই নাই মুখের দাড়ি না রে কে।
তোমার কি দ্যাশে লাপিত নাই
ফালাও নাই হাতের আঙুল না রে কে,
আছে লাপিত পয়সা নাই
ফালাই নাই হাতের আঙুল না রে কে।
তোমার কি দ্যাশে লাপিত নাই
ফালাও নাই পায়ের আঙুল না রে কে,
আছে লাপিত পয়সা নাই
ফালাই নাই পায়ের আঙুল না রে কে।[৪]

নাপিতকে নিয়ে এরূপ আরেকটি গীত প্রচলিত আছে

সোনার দ্যাশের লাপিত রে
আমার দ্যাশে আইস রে
বাপ সোহাগে ব্যাটা রে
মুড়ায়ে কামায়ে দে।
কামান যদি হ্যালে রে
কামান যদি ঢোলে রে
তোমার কানও মোচা মোচা
করবো না রে কে।[৫]

বিয়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হলো গায়ে হলুদের মতো বর-কনের হাতে-পায়ে মেহেদি দেওয়া। এ অনুষ্ঠানে যে ধরনের গীত পরিবেশিত হতো তার এটি এরূপ :

মেন্দি তোলো যায়্যা শেলি
তোলো সোনার মেন্দি কি না রে,
সোনার মেন্দি তুল্যা কিনা
যায় বড় ঘরে কি না রে।
বড় ঘরে যায়্যা রে শেলি
পারে পাটা শীলও কি না রে,
পাটা শীলও পাইত্যা শেলি
বাটে সোনার মেন্দি কি না রে।
সোনার মেন্দি বাইট্যা রে শেলি

www.pathagar.com

যায় দিঘীর ঘাটে কি না রে,
দিঘীর ঘাটে যায়্যা কি শেলি
ধোয়া হাতের মেন্দি কি না রে।[৬]

তাছাড়া বিয়েতে আনা বর পক্ষের উপহার সামগ্রী নিয়েও অনেক সময় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ বা বিরোধ ছিল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কোনো কোনো সময় সামান্য এই সব উপহার সামগ্রী নিয়ে বিয়ে পণ্ড পর্যন্ত হয়ে যেতো। এ সম্পর্কে প্রচুর গীতের পরিচয় পাওয়া যায় শাহাজাদপুর অঞ্চলে। কনে পক্ষের আয়োরা বর পক্ষকে কি ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোক্ত গীতটিতে

ছি রে আদম ছি,
এমন যে বেন্যা বাড়ি
কাম জোরা ছি,
ত্যাল আনবার কইছি আদম
ত্যাল আন নাই।
তোমার কি দ্যাশে একটু
পানিও মেলে নাই।
চুনো আইনব্যার কইছি আদম
চুনো আনো নাই,
তোমার কি দ্যাশে আদম
গুও মেলে নাই।
ছি রে আদম ছি,
এমন যে বেন্যা ঘরে
কাম জোরা ছি।[৭]

বিয়ের সকল অনুষ্ঠানই সম্পন্ন হয় আনন্দঘন পরিবেশে। বিষাদের করুণ রাগিনী ধ্বনিত হতে শুরু করে একমাত্র কন্যা বিদায়কালে। কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়ে অশ্রুসজল হয়ে পড়ে কনের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সকলে। বরপক্ষের লোকদের বার বার তাগিদ সত্ত্বেও অতিসহজে কনে বিদায় পর্ব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কনে বিদায়কালীন এমন একটি সকরুণ সংগীত হলো :

কাউয়া করে টলো রে মলো রে
কোকিল ডাকে ডালে তে,
রাত পোহালে যে;
কোথায় রইলো আম্মা
জলিক বুঝায়ে দ্যান ও যে,
ক্যামন করে বুঝাবো রে বেটি
অন্তর ফাটিয়া যায়ও যে,
কোথায় রইলো আব্বা
জলিক বুঝায়ে দ্যান ও যে,

www.pathagar.com

ক্যামন করে বুঝাবো রে বেটি
অন্তর ফাটিয়া যায়ও যে,
কোথায় রইলো ভাই ও জলিল
জলিল বুঝায়ে দ্যান ও যে,
ক্যামন করে বুঝাবো রে বেটি
অন্তর ফাটিয়া যায়ও যে।[৮]

কনে বিদায়কালে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের হৃদয় ভারাক্রান্ত হলেও পরিবারের একজন মাত্র ব্যক্তি পুলকিত হয়; সে হলো ভাইয়ের স্ত্রী। এরূপ বিশেষ দৃষ্টান্তমূলক একটি গীতির পরিচয়ও এ অঞ্চলে লক্ষ্য করা যায় :

দুপুর রাতের সময় রে পালকি
চলছে ধীরে ধীরে রে,
চলছে ধীরে ধীরে;
পালকির দুয়ার খুল্যা রে দ্যাখে
দ্যাখে আম্মাজান আইছে সাথে রে;
পালকির দুয়ার খুল্যা রে দ্যাখে
ভাইজান আইছে সাথে রে;
আইছেন ভাইজান ভালুই করছেন
ভাবিজান ক্যামন আছে রে।
তোমার ভাবি করুণা যে করে
আমার বাড়ির দুশমন গ্যাছে রে।[৯]

শাহাজাদপুর তাঁতশিল্প প্রধান অঞ্চল। এই শিল্পের অনেক কিছুই জীবনের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। বিয়ের গীতেও এই শিল্পের পরিচয় নতুন মাত্রা লাভ করেছে :

মাও বুনায় টানের সুতা
বাপ বুনায় গামছা রে
গামছার উপর ফুল ফুট্যাছে;
সেই না গামছা লিয়্যা রে ফারুক
চললো শ্বশুর বাড়ি রে
গামছার উপর ফুল ফুট্যাচ্ছে;
নাস্তা দিবার আইস্যা রে শউরি
গামছা করলো চুরি রে
গামছার উপর ফুল ফুট্যাছে;
গামছা যদি না দ্যাও রে শউরি
টান্যা তুলবো কোলে রে
গামছার উপর ফুল ফুট্যাছে;
গামছা যদি না দ্যাও রে শউরি
ফিরা যাবো বাড়ি রে
গামছার উপর ফুল ফুট্যাছে।[১০]

www.pathagar.com

নববধূ শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সব সময়ই যে সমাদৃত হবে এমনটা প্রত্যাশা করা যায় না। কখনো কখনো তাকে শ্বশুর বাড়ির প্রতিটি মানুষের কাছে নিপীড়নের শিকার হতে হয়। এ কারণে সামান্য ত্রুটির কারণেই নববধূর হৃদয় কম্পিত হতে থাকে। এ ধরনের একটি হৃদয়-বিদারক সংগীত হলো :

শান বান্ধা ঘাটে রে বাপজান
আছমান আর জমিন রে
আছারে ভাঙ্গ্যাছে কলসি রে,
ভাঙছে তোমার মাটির কলসি
দেবো সোনার কলসি রে
আছারে ভাঙ্গ্যাছে কলসি রে;
শান বান্ধা ঘাটে রে আম্মাজান
ভাঙ্গ্যাছে মাটির কলসি রে
ভাঙ্গিছে তোমার মাটির কলসি
দেবো সোনার কলসি রে
আছারে ভাঙ্গ্যাছে কলসি রে।[১১]

শাহজাদপুর অঞ্চলে এরূপ আরো অসংখ্য মেয়েলিগীতের প্রচলন রয়েছে। এগুলো সংগ্রহ করলে সামাজিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল উঠে আসতে পারে।

২. ধুয়া গান

বাংলা লোকসংগীতের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা। এ গানের এরূপ নামকরণ হওয়ার কারণ, এতে একটি স্থায়ী অংশ থাকে যা ধুয়া (ধ্রুবধুয়া) নামে পরিচিত এবং যা সংশ্লিষ্ট গানের মধ্যে বারবার গাওয়া হয়। এই স্থায়ী অংশটি গানের সূচনাতেই থাকে।

ধুয়া গান একক অথবা দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। কখনও দুই দলের প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও এ গান পরিবেশিত হয়ে থাকে। এতে দুজন বয়াতি বা গায়েন থাকে। তাদের একজন গানের সুরে প্রশ্ন করে, অপরজন গানের সুরেই তার উত্তর দেয়। অনেক সময় উত্তরদাতাও পাল্টা প্রশ্ন করে। এই দুজনের প্রশ্নোত্তরের ফাঁকে ফাঁকে উভয়ের সহকারীরা ধুয়া গেয়ে নিজ নিজ বয়াতিকে সাহায্য করে এবং সেই সঙ্গে গানের ধারাবাহিকতাও রক্ষা করে। বয়াতিদের এই প্রশ্নোত্তর বিষয়ে ধুয়া গানের সঙ্গে কবিগানের বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়।

সাধারণত গ্রীষ্মকালের জ্যোৎস্নারাতে বসতবাড়ির উঠানে এ গানের আসর বসে; তবে মাঠে-ঘাটে কিংবা নৌকায়ও আসর বসতে পারে। এ গানে যারা অংশগ্রহণ করে তারা বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিধান করে। একতারা, দোতারা, খোল, করতাল সহযোগে উদাত্ত কণ্ঠে ধুয়া গান পরিবেশন করা হয়। অনেক সময় এতে নৃত্যেরও ব্যবস্থা থাকে।

ধুয়া গানে নির্মল হাস্যরস পরিবেশিত হয়। এতে ধর্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সামাজিক অন্যায়-অবিচার ইত্যাদি বিষয়ে সহজ ভাষায় আলোকপাত করা হয়। আধুনিক

www.pathagar.com

নগরজীবনকে ব্যঙ্গ করেও ধুয়া গান রচিত হতে দেখা যায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে অনেক ধুয়া গান রচিত হয়েছে।

ধুয়া গান এ দেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কমবেশি প্রচলিত; তবে ফরিদপুর, পাবনা, যশোর ও ঢাকা অঞ্চলে এর প্রচলন বেশি। যুগ যুগ ধরে গ্রামবাংলার অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত কবিয়ালরা এ গান রচনা ও পরিবেশন করে আসছেন। এ গান বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান।[১২]

শাহজাদপুর অঞ্চলে মেয়েলিগীতের পরপরই স্থান 'ধুয়া' গানের। এক সময় ধুয়া গানের প্রখ্যাত বয়াতি হিসেবে নাম ছিল বলদিপাড়ার জবেদ আলী বয়াতি, দূর্গাপুরের তালেব বয়াতি, গাড়াদহের খোরজান বয়াতি, যুগনিদহের নুরুল বয়াতি, চিনাধুকুরিয়ার রজব বয়াতি, সৌরভপুরের ময়েজ বয়াতি প্রমুখ। এদের সঙ্গে প্রায়ই পাল্লা হতো উল্লাপড়া থানার মনোহারা গ্রামের জিলীম বয়াতি, নলসোন্ধার ভাজা বয়াতি, ধুলারচরের রজব বয়াতি, বারুইপুরের মুখদুম বয়াতি, নওকোইরের হাকিম বয়াতি, প্যাস্তকের গাজী বয়াতি, বেলকুচি থানার জামতৈলের কেফাত বয়াতি প্রমুখের। তারা আজ নেই কিন্তু তাদের গানের ধারা এখনও লালন করে আসছে শিষ্য-প্রশিষ্যরা। বর্তমানে যারা ধুয়া গানের পরিবেশক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে তারা হলেন :

বলদিপাড়ার শহীদ বয়াতি, আব্দুস সাত্তার বয়াতি, আকবর আলী বয়াতি, গাড়াদহের এমান আলী বয়াতি, সেকেন্দার আলী বয়াতি, হানিফ আলী বয়াতি, তোরাপ আলী বয়াতি, কুদ্দুস বয়াতি, দূর্গাপুরের সবুর বয়াতি, হরিরামপুরের কাশেম বয়াতি, আজিরউদ্দি বয়াতি, মশিপুরের জাহের বয়াতি, মজনু পরামণিক প্রমুখ। এছাড়া বয়াতিয়ার পাড়া, জামিরতা, পোরজনা, শ্যামবড়িয়া অঞ্চলেও রয়েছেন এখনও অনেক নামকরা বয়াতি।[১৩] ধুয়া গান অনুষ্ঠিত হয় দু'পক্ষের বয়াতিরদের উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে। এক পক্ষের গায়েন যখন বলেন :

১

সভাতে নতুন ধুয়া করি প্রচার
ওসমান উদ্দিন বানছে ধুয়া
মানে কয়ে দেও এবার;
আজব এক মকসো রে ভাই
পয়দা করিছে পরোয়ারদেগার
পেট ছাড়া লাড়ি ভুড়ি
দেখতে ভয়ঙ্কর;
কোন যুগেতে সেই পয়দা হলো
কি নাম বলে দাও আমায়।
আর একটি মকসো রে ভাই
আছে ভবের উপর,
তার আগা পাছা নাই ঠিকানা
পাগড়ি বাধা মাথার উপর।

www.pathagar.com

ওরে মধ্যিলায় কপাট মাইর্যা
বইস্যা আছে সদাগর;
নিচে আছে কুটির একটা
দেকতে চমৎকার;
কও দেখি ভাই ধুয়ার মানে
না বললে ছাড়বো না তোমায়।
আর একটি মকসো রে ভাই
সোয়াশে তার পাও আছে
মাথার উপর সিং দুইটি
তাই বিধি দিয়েছে,
গাও দিয়া তার চ্যাংটা গন্ধ
জন্ম তার উড়া বাতাসে।[১৪]

২

বলি চাঁদ সভায়
আপনারা শোনেন বসে দশ জনায়
এই আসরে রাবণ রাজা বাহার লিয়া যায়।
ওরে খাটবে না তোর বাহাদুরি
এই চাঁদ সভায়, রামচন্দ্র জমও তাহায়
সাবধানে বলিশ কথা নইলে তোর
ঘটবে বিষম দায় ॥
ওরে যদি সাবধানে তুমি কথা না বলো
তবে কেন সভায় এসে বাজাইছো কলো।
ওরে সত্য কইরা বল তোমার পিতা কে হলো
রামচন্দ্র জিজ্ঞাস করিলো
এক ছাপ্পড়ে ভাঙ্গবো মাথা
তাই যদিল সত্য না বলো ॥
রাবণ রাজা তুমি থাইকো শতক্ষণ
কাতুর দেলে গোবে ডালি আসরে আইলো
রাবণের সিবত শালী বাদশা করিবো
রাবণ মনে কইরা থাইকো
পইড়াছো আজ রামের হাতে
আজ তোমায় পাল আদায় করবো ॥[১৫]

বয়াতি প্রথমটিতে উড়োজাহাজ, কলের গান আর ট্রেন বোঝাতে এবং দ্বিতীয়তে রাবণ রাজা বলে ধীক্কার দিয়ে অপরপক্ষের বয়াতির উপর এই চাপান সৃষ্টি করেছে। প্রতিপক্ষের বয়াতি এর উত্তরে দিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপক্ষকে চাপান দিয়েছে :

www.pathagar.com

১

তোমরা শোনো রে ভাই
দশেরও চরণে জানাই
লোকে বলে হাকিম উল্লার
বুদ্ধি আছে ছাই।
ওরে মক্কা শরিফ কে তয়ার করলো
বয়াতির মিস্ত্রির নাম চায়।
ওরে আদমকে বেহেস্তে লিয়া
কে গন্ধম খাওয়ালো
কিভাবে সে ভবে আইলো,
কোথায় লাঙ্গল জোয়াল পাইলো
কোথায় পাইলো লাঙ্গলের ফাল।
কামার কে আছিলো।
বলদ হয়্যা কে লাঙ্গল টানলো
বয়াতি তার মানে বলো।
ওরে বুকে দন্ত পিঠে চোখ
ও দেইখ্যা ভঙ্কর;
ওরে দুইখান পাংখা আছে তার
খোদার সনে কইছে কথা
হাজার হাজার।[১৬]

২

আরে শোন শোন শোন বয়াতি বলি তোমারে
ওরে আমার ধুয়ার উত্তর দিয়ে
পিছে চাপান গাও মোরে
ওরে বারে বারে করি মানা
করনা ঢুকাই না তোরে
ভেড়ার মতোন যিকির ছাড়
আইস্যা আসরে,
ওরে আমি বলি কোন রাজার ঘুড়ি
সভাতে চেচায়ে মর ॥
ওরে আইস্যা গাও নাম জারি ভাই
নাম রাখো বারি
ওরে দ্যাশ বিদেশে ঘোর ফেরো
বায়না লয়ে গাও জারি ॥
ওরে আমার মনে বলে দ্যাখে আসি
জারি গাওয়ার যে ছিড়ি
আরেকটা বিদ্যা দেকলাম রে

www.pathagar.com

তোর গলায় ঘ্যারঘেরি
ওরে পছন্দ হয় কদমা বাগা
ও বাগায় লাগাবো খামচি ॥[১৭]

এ প্রসঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক আরো দু'টো গানের পরিচয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হলো :

একটি কথা বইল্যা যাই
দশের কাছে
আমার বলতে কথা হাসি আসে,
আমি বইল্যা যাই শোনো ওরে ভাই
শোনো সকলে।
তোর মাও ছিলো অকুমারী রে
তোমার জরমো দিল কে ?
কোন স্থান দিয়া বাহির হইয়্যা
কি নামটি ধরে।
ওরে কে উহার মাতা
তাই বলো আমায়,
অধম নছিম উদ্দিন তাই শুনতে চায়।
বিনি ফিতায় জরম লিয়া
কিসে পবিত্র হয়
সে কোন যুগেতে জরম লিয়া রে,
কতো যুগ সে ভবে রয়
সেই কথা সত্য কইর‍্যা
দিবা পরিচয়
যে রূপে শাস্ত্রে আছে
গাও না ভাঁধ্যা গান
তোমার রূপেতে
যদি অশাস্ত্র গায়্যান বাঁধারে
আমার মস্তক খাবি রে
আমার কথা চিরদিন যান
মনে থাকে রে।[১৮]

বিপরীত পক্ষের বয়াতি এর উত্তরে বলেছে :

শোনো ভাই সেই ধুয়ার জবাব বলি
দুরবাসা নামে মুনি ছিলো
গ্যালো ভোজ রাজার বাড়ি,
ও ভাণ্ডারখানার কর্তা ছিলো
তার কন্যা কুন্তী সতী
দুরবাসার কাছে মন্ত্র সেই নিলো
হলো শিক্ষতি।

www.pathagar.com

সে মন্ত্র কুন্তীর মনেতে ছিলো
এক দিন সে সূর্যের নামটা স্মরণ করিলো।
তখন মন্ত্র গুণে সূর্য আইস্যা রে
তারে পোরলোভন দিয়া বলিল
মনের আশা পুরণ করো
কুন্তী তা স্বীকার করিলো।
সূর্য়ের আকর্ষণে কুন্তী গর্ভ হইলো।
অকুমারীর কর্ণ দিয়া ছেলে বাহির হইলো।
তখন ছেলে হয়্যা লজ্জা পাইয়া
বলে কুলের কন্টক হইলো।
তাই ভাবিয়া সেই ছেলেকে
তাম্বুল হয়্যা জলে ভাসাইলো।
এক মুনি যমুনায় করে স্নান
সে দিন জলে ছেলে ভাসে বিদ্যমান।
ছেলে লয়া গৃহে যায়্যা,
ছিলো রাধা নামে ভার্য্যা তার,
সেই ছেলেকে পালন কইর‍্যা রে
সুরেশন নাম রাখিল তার।
অব্যয় কুন্তী নামে কবোজ ছিলো তার
সেই কবোজটি দান চাহিলো
মুনি পুরোনদার।
নিজের অঙ্গ কাট্যা দিয়্যা
কর্ণ নামটি হলো তার
অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে
দাপোর যুগে মরণ হইলো তার।[১৯]

ধুয়া গানের বয়াতিরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অভিজ্ঞ না হলেও তারা তাদের ওস্তাদের নিকট থেকে কোরান-পুরান সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হতো। এছাড়া সমকালীন ঘটানা তাদের সংগীতের বিশেষ উপাত্ত হিসেবে স্থান পেতো। এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ ধুয়া হিসেবে তালগাছী হাট প্রতিষ্ঠা নিয়ে বয়াতিরা যে কথাগুলো উপস্থাপন করেছেন তার পরিচয় উপস্থাপন করা হলো :

কলিকাতার ঠাকুর বাবুর জমিদার
বইল্যা যাই সবার মাঝার
মাঝখানে লাইট বাতি তার।
ঠাকুর বাবু ভাগ্যগুণে
তালগাছী লাগাইছে চাঁদের বাজার।
রবিবার দিন হাট বইসে
দ্যাখেন ভাই আজব চমৎকার।

www.pathagar.com

সেই হাটের এসহাক সাহেব এজারদার
আমি বইল্যা যাই সাবার মাঝার।
ইট কাটিয়া খামবা কইর‍্যা
তাহার সনে লাগাইছে লোহার তার।
চার মুরা চার দরজা রাখ্যা
রাখছেন কতই পাহারদার।
সেই হাটের অনাথ পোদ্দার হালাইকার
আমি বইল্যা যাই সবার মাঝার।
তোরাপ পণ্ডিত স্কুলের জোগার
উহার কাছে কালিপদ
তুইল্যাছে মুদিখানার ঘর।[২০]

শত শত বছর পূর্বে থেকে এই ভীতিকর নাম 'ছাওয়াল ধরা' বা 'ছেলেধরা' জনমনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে এবং তা আজও অব্যাহত আছে। এমন একটি গান :

ওস্তাদে কয় সবুর আলী ছাওয়াল ধরা আইলো বাংলাতে
দেশ বিদেশে হুলুস্থূল পথে ঘাটে
তা শুনে পোয়াতির প্রাণ কাঁপে ডরে
ওরে ছাওয়াল ভুলায় কলা দিয়ে
এ এ ওরে ধরে ছাওয়াল ভরে ছালাতে
এ এ ওরে সাড়ার ঘাটে নরবলি
নিক্ষুত ছাওয়াল লাগে পুজাতে ॥
ওর চর পাড়ার রহিমুদ্দি
যাইতেছিল মেয়ের বাড়িতে
পাকা কলা ছেড়া ছালা ছিল সাথে
যাবে সে বেছন আনিতে
ওরে ধইরা গুরায় চরার কামলাতে
এ এ ওরে এইতো ব্যাটা ছাওয়াল ধরা
এই বলে কিল গুড়ি তার পিঠে ॥
ওরে এক যে নারী কেন্দে কেন্দে স্বামীর কাছে কয়
দয়া করে একটি ছেলে দিছে আল্লায়
তা যদি ছাওয়াল ধরায় নেয়
ওরে আমরা মরবো ছাওলের শোকে
এ এ ওরে ছাওয়াল লিয়্যা শুইয়া থাকবো
কাজ কাম সেরে সমুদয় ॥
ওরে এক বুড়ি কয় বাড়ি বাড়ি
তোদের আমি বলি
খুতা ছাওয়াল ল্যায়না বোলে মা কালি
এখন আমরা এক কাম করি
ওরে বাড়ি বাড়ি সারি সারি ছাওয়ালের নাক কানে দেয় বালি ॥[২১]

www.pathagar.com

এদেশে ইংরেজ শাসনের সময় এদেশের প্রধান কৃষি পণ্য পাট বিদেশে রপ্তানি বা কেনা বেচাকে কেন্দ্র করে বেশি মুনাফা লোটার মানসে ইংরেজ সরকার ও জমিদারদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায় এবং বাংলায় চরম দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এ সময়ের ধুয়া গান :

হায়... আর সন ১৩৩১ সন আষাঢ় মাসে
কোস্টার দর গেল কষে ১১ টাকা দর
বেচলাম বাড়িত বসে।
কলকাতাতে ১৪ টাকা দর
৩০ টাকা দর আছে জার্মানির দেশে।
ইংরেজ কয় জার্মানির কাছে
কোস্টার দাম আরও বৃদ্ধি চাইছে ॥
হায়... আর ইংরেজরা জার্মানিকে কয়
যদি কোস্টার দর বৃদ্ধি দাও আমায়
বাংলাদেশে কোস্টা পাওয়া যায়।
তাই শুনিয়া জার্মানি কোস্টা কিনতে কেনাল পাঠায় কলকাতায়
১৪ টাকা দর পাইয়া কোস্টা জার্মানি আরৎ করতে চায় ॥
আ আর ইংরেজরা ভাইবা গুইনা কয়
যদি জার্মানি আসে কলকাতায়
কোস্টা যদি নিজেই কিনা নেয়।
আমরা যে সব কিনবো কোস্টা
সে সব কোস্টা লিয়া বেচবো কোন জায়গায়
মোটা বুদ্ধি করে ইংরেজ
জার্মানিকে তারাইয়ে দেয় ॥
হায়...আর জার্মানির কেনাল মাইর খাইয়া যায়
যায়্যা জার্মানিকে কয়
থাইক পইরা কোস্টা জান বাঁচান দায়
কত অপমান আর অপদস্থ
জান বাঁচাইয়ে চইলা আইলাম আপনার দোয়ায়
যত কোস্টা কিনে ছিলাম
ফালাইয়ে আইলাম সেই জায়গায় ॥
হা...আর তাই শুনিয়া জার্মানি ক্ষেইপা গেল
এত অপমান করিল
ভাইব্যা গুইনা রোম দেশে গেল
রোমের সাথে যোগাযোগ করে ইংরেজদের ঘেরা দিলো
ইংরেজদের জাহাজ যত জার্মানি ঠেকাইয়া দিল ॥
হা...আর ইংরেজ জার্মান যুদ্ধ বেধে যায়
বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়
জিনিস পত্রের অভাবে বাঁচা হলো দায়।

www.pathagar.com

এক টাকার জিনিস তিন টাকা হলো
খাদ্যাভাবে মানুষজন মারা যায়
দিনে দিনে মরা মানুষ
ভেসে ভেসে নদী দিয়ে যায় ॥
হা...আর এক যে নারী ছেঁড়া কাপড় পড়ে যায়
একদিক টান দিলে আরেক দিক উদলা হয়।
কাপড় যদি না আইনা দ্যাও
ভাত রাধবে মোর বাইয়া পায়
কোন সুখে করছিলি বিয়া
মুরাদ নাই ছাইড়া দ্যাও আমায় ॥
হা...আর তাই শুইনা মিনসা ক্ষেইপা যায়
দুই মন কোস্টা হাটে ল্যায়
পাঁচসিকা দর আড়াই টাকা যে হয়
আটআনা ব্যাগোরে হলোনা কাপড়
সুই একটা কিইনা লিয়া বাড়িত যায়
তালি দিয়া পরো কাপড়
কিনা দিবো সস্তা যেদিন হয় ॥
ঐ নারী অমনি এক ভেকচি মারি
ছেঁড়া কাপড় তোর টান দিয়া ফাঁড়ি
সংসারে তোর ছাই পইড়্যাছে
আজ আমি চইল্যা গেলাম বাপের বাড়ি
আবার যদি আনবার যাস তোর
মুখে মারবো মুরা ঝাটার বাড়ি ॥
হা...আর এক যে নারী ক্যাথা পরেছিল
তার বাড়িতে জামাই এলো
লজ্জা পাইয়া ঘড়ে যাইতেছিল ক্যাথা খান খইসা গিয়া ॥[২২]

৩. জারিগান

'জারিগান' এ অঞ্চলের লোকসংগীতের আরেকটি জনপ্রিয় ধারা। 'জারি' শব্দের অর্থ 'শোক'। কিন্তু এ অঞ্চলে পরিবেশিত বয়াতিদের জারিতে শোকের কোনো প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। কায়েমপুর ইউনিয়নের সস্তাবাজ গ্রামের তুফন উদ্দিন বয়তির দু'টো জারি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাচ্ছে :

১

আমার নাম তুফান উদ্দিন
লোকের নাম জারি করি
বাড়ি আমার সস্তাবাজ গেরাম।
যে ব্যক্তি যে কাজ কর্যাছে

www.pathagar.com

করয়াছে তার বিধান
শ্যাষ নাম্বার রাসুলুল্লাহ
করয়া গ্যালে কি কাম।
খাজুরের পাতায় ঘর বানাইয়্যা
শিকায়্যা গেল লোকেক
দিন দুনিয়ার ভালো কাম।[২৩]

২

লইপুরের ভাদুর বয়াতির বাড়ি
আমরা গাইতে যাবো জারি
ভাজন আইস্যা সম্বাদ দিলো রে
দ্যাখো তোমারা সব আইসো তাড়াতাড়ি।
ভাদুর পরিবার শুনব্যার চাইতো জারি
হে বাড়িতে গাইলে জারি
পাওয়া যায় পানি খাইক্যা ঝাড়ি।
আমরা জারি গাওয়ার আসে
গেলাম সবে জুটে
যায়্যা রইল্যা কচির চরে রে।
দ্যাহো চাঙা এক
লোহা আনল্যাম টান্যা
ভাবছি বস্যা না পায় দিস্যা
ভাদুর পরিবার উঠ্যা বলে
আজ আমার নুনদ্যা জামাই আইছে রে।
শুনো হে নুনদ্যা জামাইর কথা
আমার যে হৃদয় আছে গাঁতা
চইত মাস্যা পরব রে।
সেই পরব রলো কোথা
আম পরবে রে অইলো দেহ্যা
মুর্খমতি তুফান বলে
আজ আমার পালটি গাওয়ার পালা।[২৪]

৪. ভাটিয়ালি গান

ভাটিয়ালি গান এক প্রকার লোকগীতি। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সুরের দীর্ঘ টান ও লয়। প্রচলিত মতে মাঝিমাল্লাদের গান থেকে ভাটিয়ালি সুরের উৎপত্তি। নিকট অতীতে নদীবিধৌত বাংলাদেশে সাধারণত নদীর ভাটির স্রোতে নৌকা বাইতে মাঝিদের তেমন বেগ পেতে হতো না। তাই সেই অবসর ও আনন্দে তারা লম্বা টানে গলা ছেড়ে গান গাইত। কালক্রমে এই গানই ভাটিয়ালি গান নামে পরিচিতি লাভ করে।

www.pathagar.com

ভাটিয়ালি একক সংগীত। প্রেম ও ঈশ্বর এর প্রধান বিষয়। এতে একদিকে লৌকিক প্রেমচেতনা, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক চেতনা প্রতিফলিত হয়। বিষয় ও অবস্থাভেদে এর অনেক শ্রেণীভেদ আছে। এক সময় বাংলাদেশে ভাটিয়ালি গানের পাঁচটি ধাঁচ প্রচলিত ছিল। তবে এই ধাঁচগুলির কয়েকটি বর্তমানে লুপ্ত। সচরাচর মুর্শিদি ও বিচ্ছেদী নামে পরিচিত দুধরনের গানই ভাটিয়ালির অন্তর্গত। বাংলা লোকনাট্যে, বিশেষত গাজীর গানে বহুস্থলে ভাটিয়ালির দুএকটি ধাঁচের সাক্ষাৎ মেলে।

অনেক ক্ষেত্রে গানের বিশেষ চরণের সুর নির্দেশক হিসেবে 'ভাটিয়ালি' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত পালা বা পাঁচালির বন্দনা অংশে প্রথম চরণ উজান ও দ্বিতীয় চরণ ভাইটাল বা ভাটিয়ালি নামে আখ্যাত হয়, যেমন: পুবেতে বন্দনা করলাম পুবের ভানুশ্বর। একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর ॥

বাংলা লোকসংগীতের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আঞ্চলিক গানে ভাটিয়ালি সুরের প্রয়োগ আছে। প্রাচীন বাংলায় ভাটিয়ালি রাগের প্রচলন ছিল। সেখশুভোদয়া গ্রন্থে বিধৃত ভাদু গান ভাটিয়াল রাগে গেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও ভাটিয়ালি গানের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৫]

অন্যভাবে বলা যায় ভাটিয়ালি সংগীত লোকসংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। শাহজাদপুর অঞ্চলের মানুষের মধ্যে অনেকেই চাকুরি বা ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে দেশের বাইরে অবস্থান করে। দূর দেশে অবস্থানরত বন্ধুর জন্য বান্ধবী বা প্রেমিকার আহাজারি নিয়ে একটি সংগীত :

বন্ধু আমার চাকরি করে
ওই না নীল সাহেবের কুঠিতে
মাসে মাসে চিঠি লেখে
আমার তো বই বন্ধু এলো না।

একবার লিখন দুইবার পাঠাই হে
আমার তো বন্ধু এলো না
বন্ধু রসের ডালিম পরে খাইলো হে
আমার বন্ধুর ভাগ্যে হইলো না।

বন্ধু যায় রে পানসি লায়ে
ঐ না পাথর কয়লা আনিতে
এবার কেনে এতো দেড়ি হে
বুঝি জল নাই বন্ধুর নদীতে ॥[২৬]

৫. মারফতি গান

এ অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে 'মারফতি গান' এর কদর সুদূর অতীতকাল থেকে। এসব গানে ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। হলদিঘর গ্রামের শের আলী সরদার এক সময় মারফতি গানের গায়ক হিসেবে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর গান এখনও এ গ্রামের অনেকের কণ্ঠে পরিবেশিত হতে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে শের আলী সরদার পরিবেশিত দুটো গান উল্লেখ করা হলো :

www.pathagar.com

১

হক নাম স্মরণ করো রে মনা
যে নামের গুণে তোমার যাইবে যাতনা।
নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই রে মন
কখন জানি আইসে শমন
হক নাম যার হয়রে করণ
করো মনে বাসনা,
যে নামের গুণে তোমার যাইবে যাতনা।
হক নামেতে ধিয়ান করো
রূপ তাহার নেহার করো
মন মুকামে তার জায়গা রাইখো
পুরবে তোমার বাসনা
যে নামের গুণে তোমার যাইবে যাতনা।
হক নাম ভরসা করে
যে জন সদায় জেকের করে
দুঃখ তাহার হয়না কভু
ভবে ধন্য হয় সেজনা
যে নামের গুণে তোমার যাইবে যাতনা।[২৭]

২

একদিন তুই ভাবলি না রে
কেমন কইরা হবি পার,
চুলের মতোন চেকোন সাকু
ও তার হীরার মতোন ধার।
দণ্ডের তরে ভরসা নাই
পারের পয়সা করলি কামাই
দম ফুরালে সব যাইবে ফাকি
কান্দ্যা হবি যারে যার।
সাকোর পারে মানুষ আছে একজনা
সদায় করে সে আল্লার নাম যপনা
ওলী-আল্লা পাইলে যেজন
বক্ষে কইরা করে পার,
তুই রে পাপী অধম বান্দা
দেনার দায়ে পড়বি বান্ধা,
উকিল তুই ধরলি না রে
দোহাই তখন দিবি কারে,
একদিন তুই ভাবলি না রে
কেমন কইরা হবি পার।[২৮]

www.pathagar.com

৬. মুরশিদী গান

ইসলামি তত্ত্ব সংগীতের আরেক উচ্চতর ধারা 'মুরশিদী গান'। 'মুরশিদ' আরবি শব্দ। এর অর্থ 'আধ্যাত্মিক গুরু'। সুফি ও বাউল সাধনায় গুরুকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। আর এ কারণেই এ সাধনাকে গুরুবাদী সাধনা হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুফিরা দীক্ষাগুরু, রাসুল এবং আল্লাহকে কখনো কখনো অভিন্ন সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। লালনের একটি গানে এ সম্পর্কে স্পষ্টত বলা হয়েছে :

আপনি খোদা আপনি নবী,
আপনি হন আদম ছবি;
অনন্ত রূপ করে ধারণ
কে বোঝে তার লীলার কারণ,
নিরাকার সাঁই নিরঞ্জন
মুরশিদ রূপে হয় ভজন সাধন।[২৯]

শাহজাদপুর অঞ্চলে প্রচলিত মুরশিদী গনে একই রূপভাবের অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয় :

১

গুরু পদে প্রেম ভক্তি হলো না মোর হবার কালে
যখন ফুলে মধু ছিল রে
ভ্রমর আসতো দলে দলে
ওরে আর কি আসিবে ভ্রমর
কোমল কলি শুকাইলে
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হলো না মোর হবার কালে ॥
হাট বাজারে গেলে রে মন
কত মনি মুক্ত মেলে
ওরে শেষ বাজারে গেলে পারে
কি জানি মেলে কপালে
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হলো না মোর হবার কালে ॥
কাননে এক বৃক্ষ ছিল রে
ফল ধরতো কালে কালে
ওরে অকালে ফল ধরলে পারে
বিনাশ হয় তা ফলে মূলে
গুরু পদে প্রেম ভক্তি হলো না মোর হবার কালে ॥[৩০]

২

ছালাম লও গো মুরশিদ
প্রণাম তোমার চরণে,
কোথায় তুমি কোথায় আমি
বাধো গো এক বন্ধনে।

www.pathagar.com

তোমা ছাড়া নাইকো গতি
অধমে রে দাও সুমতি
তুমি আমার মাথার মুকুট
তুমি গলার গজমতি।
ও মুরশিদ মুরশিদ রে
তোমার হার গলে পড়ে,
পুলসিরাত হইবো পার
যপি তোমায় অন্তরে।
নবীর কালেমা পড়ে
মুরশিদের নাম ধরে
আল্লার নাম জপ করো
ও ভাই সকলে।[৩১]

৩

আমার মুরশিদ পরশ মনি গো
লোহারে বানাইলা কানচা সোনা
মুরশিদ রতন অমূল্য ধন
সময় থাকতে চিনলাম না ॥
আজ মুরশিদ রতন যে করলো স্মরণ
বিনা দুধে দই পাকাইয়া তুইলাছে মাখন
সেই সে মাখন কর ভক্ষণ
ভব ক্ষুধা থাকবে না তোর
প্রেম ক্ষুধা থাকবে না
লোহারে বানাইলা কানচা সোনা ॥
আমার ঋদ কাননে, যখন ফুটবে ফুল
ফুল ভ্রমরা ঘ্রাণ ছড়াতে হইবে আকুল
দেখবি ছবি পাগল হবি
কাবু বাঁধা থাকবে না
লোহারে বানাইলা কানচা সোনা ॥
কালা সাই কয় শোনরে অভুজ মন
সরলে গরল মিশাইয়া হারালি রতন
সরল দেশে গেলে তোমার
গরলের ভয় থাকবে না
লোহারে বানাইলা কানচা সোনা ॥[৩২]

৪

মুরশিদ চিনে পথ ধরো রে
পাক কোরানে বলে,
মুরশিদ না চিনিলে পরে

www.pathagar.com

বাঁচবি ভবে কার বলে,
পাক কোরানে বলে।
পাক কোরানে খোদা লেইখ্যা দিলো
শয়তান তোমার সঙ্গে গ্যালো,
ভুলাইবে তোমায় দুইনার পরে
খুলে বলে কলেবে,
পাক কোরানে বলে।
মুরশিদ না চিনলে পরে
পরব্যা তুমি তাহার ফ্যারে,
ভুল্যা থাকব্যা ভবের মাথায়
কানব্যা শ্যাষে পারের কালে,
পাক কোরানে বলে।
তুমি যতোই করো আনাগোনা
মুরশিদ বিনা যায়না গুনাহ্,
যায়না কভু তারে চেনা
দেহ পুরান না হলে,
পাক কোরানে বলে।
মুরশিদ চিন্যা পথ ধরো রে
পাক কোরানে বলে।[৩৩]

মাঠে-ঘাটে কাজ করার সময় শাহজাদপুর অঞ্চলের কৃষকেরা দরাজ কণ্ঠে এক প্রকারের গান গেয়ে থাকে। এই শ্রেণির গানকে বলা হয় 'বারাসে'। বারমাসির অপভ্রংশ হিসেবে এসছে 'বারাসে' শব্দটি। সাধারণত প্রবাসী স্বামীর জন্য স্ত্রীর অন্তর বেদনায় বাণী অভিব্যক্তি পেয়ে থাকে এ জাতীয় সংগীতে :

এত সগের বাগান আমার
না অইল যতন,
ওর পথ পানে চাইয়া থাকে
মালির কারণ রে
বাগানে ফুইট্যা থাকলো ফুল।
বাপ মায়ে দিল বিয়া
বিদেশীর হাতে,
ওরে খাট পালঙ্গে থাকি শুইয়া
মন ভেজে কি তারে রে
বাগানে ফুইট্যা থাকলো ফুল।
যুবতী নারী ঘরে যুদিল
না থাকে তার পতি,
ওরে কি অইব তার রূপ যৈবন
কি অইবে তার গতি রে,

www.pathagar.com

বাগানে ফুইট্যা থাকলো ফুল।
ভাদ্দুর মাসে বষ্যা যেমন
নদী ভরা কুল,
ওরে বসন্ততে যুবতী নারীর
প্রাণ করে আকুল
বাগানে ফুইট্যা থাকলো ফুল।[৩৪]

৭. বারাসে বা বারোমাসি গান

বাংলা বারোমাসের বর্ণনাযুক্ত বিরহবেদনার গান। এ গানে বছরের বারোমাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং আশা-নিরাশার কথা বর্ণনা করা হয়। বারোমাসি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ গান। সাধারণত বৈশাখ মাস থেকে এ গানের বর্ণনা শুরু হয়। এ গান পরিবেশনের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বছরের প্রায় সব ঋতুতেই এ গান পরিবেশিত হয়। এ গানের পরিবেশক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী, যে বারো মাসের প্রাকৃতিক বর্ণনাসহ নিজের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা গানের মাধ্যমে বর্ণনা করে।

বাঙালি সংস্কৃতির মৌল উপাদান বারোমাসি গানের মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ দেবদেবীর বন্দনা, পৌরাণিক, ঐতিহ্যিক বা সামাজিক ঘটনা, প্রেম এবং কৃষিকর্ম বারোমাসি গানের বিষয়। বাংলা বারোমাসি গানগুলি সাহিত্যিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বারোমাসি গান জনপ্রিয়। এ দেশের গ্রামে গ্রামে কৃষাণিরা ক্ষেত-নিড়ানির সময় শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে সমবেতভাবে কোনোরকম বাদ্যযন্ত্র ছাড়াই মনের আনন্দে এ গান পরিবেশন করে। এ অর্থে বারোমাসি গানকে কর্মসংগীতও বলা যায়। বারোমাসি গানের সুর বিচ্ছেদমূলক। এ গানে কোনো নির্দিষ্ট সুর নেই, সাধারণত আঞ্চলিক সুরে এ গান গাওয়া হয়।

ষোলো শতকের কবি মুকুন্দরামের কালকেতু উপাখ্যানে আছে ফুল্লরার বারোমাসি। এতে অভাবগ্রস্ত পরিবারে ফুল্লরার বারোমাসের দুঃখ-বেদনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।[৩৫] প্রবাসে অবস্থানরত ভাইয়ের জন্য বিরহ-কাতর ভাবিকে কিভাবে দেবর সান্ত্বনা দিয়ে থাকে তার অপূর্ব বর্ণনা উঠে এসছে আরেকটি বারাসে সংগীতে :

ভাইজান গ্যালো বিদেশেতে ছয়মাসের পতে
ও তোর বুকের উপর
জোর কমেলা ভাবিজান,
গলায় মোহন মালা রে
একবার ওঠো, ওঠো ভাবিজান রে।
ছোট খাট ভাবিজান আমার রে
লম্বা মাথার ক্যাশ,
ও তোর ক্যাশের উপর উইঠ্যা দেখি
বাপও ভাইয়ের দ্যাশরে,
একবার ওঠো, ওঠো ভাবিজান রে।

www.pathagar.com

খাটুখুটু ভাবিজান আমার রে
মাজ্জাখানি সরু
তোমার জন্য ছাইরা আইচি ভাবিজান
চৌদ্দ হালের গরু রে,
একবার ওঠো, ওঠো ভাবিজান রে।
আম খাওয়াইলাম রসে রসে ভাবিজান
কাঁঠাল খাওয়াইলাম কসে
কলা বাগানে কলা খাওয়াইলাম
চুঁচা থুইলাম গাছে রে,
একবার ওঠো, ওঠো ভাবিজান রে।[৩৬]

৮. নৌকা বাইচের গান

বর্ষাকালে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উল্লাপাড়া শাহজাদপুরের অধিকাংশ এলাকায় বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। ততদিন কৃষকের গোলা ভর্তি হয় শত শত মণ ইরি ধানে। সে সময় গ্রামে কারো হাতে কাজকর্ম থাকে না বললেই চলে। আর এ কারণে কোনো কোনো গ্রামের উদ্যোগী যুবকেরা নৌকা বাইচের আয়োজন করে থাকে। তাতে নিজস্ব এলাকা ছাড়া দূর-দূরান্ত এলাকা থেকেও অনেক পানসি নৌকা আসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য। জয়-পরাজয় যারই হোক না কেন নৌকা বাইচ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় নৌকার বাইচাল ও মাঝি সকলে মিলে গান করতে থাকে। এ অঞ্চলের মানুষের কাছে নৌকা বাইচের গান খুবই জনপ্রিয়। এ প্রসঙ্গে নৌকা বাইচের একটি গান উল্লেখ করা হলো :

আরে ও সোনার বাইচ্যাল ভাই
আল্লা বইল্যা নাও ছাড়লাম,
চলো বিদেশ যাই
আমার সোনার বাইচ্যাল ভাই।
আল্লা আল্লা বইল্যা রে ভাই
খুললাম নায়ের দড়ি,
তাড়াতাড়ি বাও রে বাইচ্যাল
বেলা আছে মাত্র তিন ঘড়ি।
বইট্যা গায়ের মেম্বর সাহেব
বাইচের খেলা দিচে,
দ্যাশ-বিদেশের বাইচে তরি
সেথায় খেলতে গ্যাচে,
বেলাবেলি যাইতে হবে
খেলা হইবে শুরু
ওরে সোনার মেডেল আনবো আমরা
ভরসা দয়াল গুরু।

www.pathagar.com

গুরু যদি দয়া করে
রাখবো দ্যাশের নাম,
নতুন কইরা গড়বো আবার
সোনার ডিঙ্গা খান।
হামেদ আলী জারি গাইবো
জোরে টানো ভাই
বেলাবেলি যাইতে হইবে
বেলা বেশি নাই।[৩৭]

নৌকা বাইচের গান রচয়িতারা সমাজের স্বল্প শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ হলেও তার দেশের রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি গানে লোককবি স্বাধীনতা উত্তরকালীন বাংলাদেশের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কিভাবে শ্রদ্ধা করেছেন; কিভাবে ধিক্কার জানিয়েছেন পাকিস্তানের দুঃশাসনকে তা উঠে এসেছে :

আল্লা বইল্যা খুলো নায়ের দড়ি
ছাড়ো রে ভাই বাইচের তরি
একবার হেঁই ও বলো সবে।
সিরাজগঞ্জে যাইবো মোরা
তরি করে উড়া উড়া
নাও বাইচ খেলবো মোরা বাংলার উৎসবে।
ধন্য ধন্য বলো সবে
ধন্য বলো শেখ সাবে রে
বাংলার নাম লেহাইলো ভবে।
ওরে শেখ সাবে বুদ্ধি কইর‌্যা
বাংলাদেশ ভাই আনলো লড়্যা
ধন্য ধন্য বলো দ্যাশের সবে।
পাকিস্তান ছিলো দ্যাশের রাজা
ওরে গরীব মাইর‌্যা লুটতো মজা
এবার মুক্তি পাইলো সবে।
বাংলাদেশ ভাই আল্লার দান
রাইখো সবে দ্যশের মান
মুহিরুদ্দি কয় বাংলার উৎসবে।[৩৮]

লোকসংগীত লোকমানসের সাংগীতিক সুধা নিবৃত্ত করে, চিত্রিত করে লোকসমাজ ও লোকজীবনকে। সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রচলিত লোকসংগীতে এই দ্বিবিধ চেতনাই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে এখনো প্রচলিত কিছু ধুয়া, মুর্শিদি, মারফতি, বারাসে, রথের গান, দেহতত্ত্ব, ভাটিয়ালি ও জারি-সারি গান উল্লেখ করা হলো :

www.pathagar.com

১

আমার ভাঙ্গা পাও পইড়াছে খালে
সাড়া জনম বইলামরে জাল
মাছ বাঝে না ছেঁড়া জালে
আমার ভাঙ্গা পাও পইড়াছে খালে ॥
বউ গিয়াছে বাপের বাড়ি
বাড়িত আসার খবর নাই
বউয়ের উপর রাগ করিয়া
ভাত পোড়াইয়া করি ছাই ॥
ছোট শালী আছে ঘরে
তার উপুরে পেশার বাড়ে
আদর কইর‌্যা চড় মারিলাম
ছোট্ট শালীর লরম গালে ॥
চিন্তা-ভাবনায় ভাল লাগে না
জাহের আলী আমার নাম
দোকানে দোকানে রুটি বেচা
এইতো আমার আসল কাম ॥
হাতে নাই মোর পয়সা কড়ি
বউ কিনে চায় সোনার চুড়ি
সবুর কইর‌্যা দিমু কইলে
পেঁচার মতো ভেকচি মারে ॥
মশিপুর গ্রামে বাড়ি
গুচ্ছগ্রাম বসত করি
নামটি আমার জাহের আলী
দিন কাইট্যা যায় কোনো হালে
আমার ভাঙ্গা পাও পইড়াছে খালে ॥
সাড়া জীবন বইলামরে জাল
মাছ বাঝে না ছেঁড়া জালে
আমার ভাঙ্গা পাও পইড়াছে খালে ॥[৩৭]

২

আরে ভেদা মাছে আলা ক্যাদো খায়
আবার খইলশ্যা মাছে পান চ্যাগায়
টেপা মাছে প্যাট ফুলাইয়া রয় ॥
এরে কাতল মাছের মধ্যে মোটা
পাঙ্গাস মাছের তিন কাঁটা
ছাইতান এসে বাজাইচে ল্যাটা

www.pathagar.com

তার পোনাগুলো অইরকা-বইরকা রে
শেষে ফ্যানফ্যানায়া যায় ॥
আরে আবার শোল মাছের গায়ে বড় জোর
তার পোনাগুলো গুতাখোর
জিয়াল মাছের কাঁটায় বড় তোর ॥
এরে কই মাছেও তেরা কাঁটা
মজগুর মাছে কাঁটায় শোর
বাইম মাছের ঐ লাভির কাঁটায় জোর
খইলশ্যা উইঠ্যা বলে রে
আমার লাকে নাই বাশোর ॥
এই আবার দাইরকা বলে আমি ডাঙ্গাদার
আবার ইলশ্যা মরলো শাংলার পাড়
লওলা মরলো কোচের কালের পাড়।
এরে সোবন-সড়কি মাছ উইঠ্যা বলে
বোনো জালের কোন উপায় কি?
গোচুই মাছ উইঠ্যা বলে রে
আমায় আর তুইলো না দুইনায় ॥
আবার ট্যাংড়া মাছ আরও তিন কাইনা
ওরা শুর ধরে বড় টাইনা
পাবদা বলে গাইতে পারি না ॥
এরে ওরা গায়ান গায়া গেল
আমরা গাইতে পারি না
গজার বলে আরতো হাইসো না।
ক্যাতাফলি মাছ উইঠ্যা বলে রে
আমি আর গোসসায় বাচি না ॥
এ আবার বোয়াল মাছের মুখে চাপ দাড়ি
আবার বাইটক্যা বাজায় খুনজুরি
তিতপুটি কয় লাচিতে পারি ॥
এরে চেলা মাছে করে খেলা
বাতাশি মাছে দেয় ঝাড়ি
খসলা কয় ফাল পাইরা মরি।
বাইলা মাছ উইঠ্যা বলে রে
আমি আর চলতে না পারি ॥
এ আবার জাহের আলী করছে রচনা
আপনারা বইস্যা শোনেন দশজনা
না বললে তো আমায় ছাড়ে না ॥
এরে মাছের একখান গায়ান বানছি

www.pathagar.com

আসরে তা গাইলাম না
ছ্যাড়ারা কয় গায়ান শুনাও না
চ্যাং মাছ উইঠ্যা বলে রে
আমি আর পিছলা খেলবো না ॥[৪০]

৩
আর...ইব্রাহিম এক নবী ছিল
তার ঘরে পুত্র হলো
ইসমাইল নাম রাখিল তার ॥
আরে একে একে সাতটি বছর স্বপ্নও দেখাইলো
জানেরও পিয়ারা তুমি কোরবানী করিও
উট দুম্বা ছাগল ও বখড়ি কোরবানী কইর‍্যা দিল
খোদার পছন্দ তা না হলো ॥
এরে একে একে স্বপন দেখে
শুইয়্যা পালঙ্গেতে
কোরবানী হলো না তোমার।
এরে জানের চেয়ে ভালোবাসা যেজন আছে তোমার
তা কোরবানী কইর‍্যা দিও খোদার হুকুম আমার
তাই শুইনা ইসমাইলকে
জিয়াপুত খাওয়ার ছলনাতে নিয়া যায় মিনাবাজার ॥
এরে মিনা বাজারে গেল
শয়তান দাগা বাজাইলো
কি করলি ও সর্বনাশী।
তোর আপন পুত্র ছাইড়্যা দিলি গলায় দিতে ছুড়ি
হাজিরা সতী উইঠ্যা বলে
তাতে আমি খুশি।
দূর হইয়্যা যাও শয়তান দাগাবাজ
তোমার কথা শুনলে আমার, হইয়া যাবে সর্বনাশ ॥
এ রে মিনা বাজারে যাইয়ে
ইসমাইলকে ডাইক্যা বলে
শোনরে বাছারে আমার।
হেরে তোমাক কোরবানী কইর‍্যা দেব
খোদার হুকুম আমার।
ইসমাইল কয় ওগো আব্বা
এই অনুরোধ আমার
হাত পাও বন্ধন করে
ছুড়ি চালাও আমার গলে

www.pathagar.com

বলে আল্লাহ্ আকবর ॥
এরে আপনার চুক্ষ বেঁধে
ছুড়ি চালাও হলকমেতে
একে একে সাতওয়ার পড়ে
এরে খোদার হুকুমে তাহার পশম নাহি কাঁটে
রাগ করিয়া ছুড়ি দিল পাহাড়ে ফেলিয়ে
পাহাড় কাইট্যা দুওভাগ হলো
মুর্খ তালেব বলে দুম্বা কোরবানী হইয়্যা গেল ॥[৪১]

৪

আরে একদিন হজরত আলী
রণ হতে আসে বাড়ি
ফতেমার সম্মুখে গ্যালো।
ওরে দুই-চার কথা বেশি-কুমি
তাহার শোনে হলো।
আজ পাটনির মিয়ার বিয়া কইরা
জাতি কুল গেল।
ফতেমারও গোস্‌সা হইলো
নবীর কাছে কাইন্দা কাইন্দা
সবকথা খুইল্যা কইলো ॥
আমার নবী বলে মা ফতেমা
তোমারিও আছে জানা
ও কথায় বেজার হইও না।
যেদিন আমার উম্মাত
পাড় হইবে ফুল সুরাতের ঘাটে
কে পাড় করিবে
মাওরে তাই বল আমারে।
আমি হব জগতের পাটনি
আপনি তরি হইবা মাওরে
আমি হবরে হাইলার মাঝি ॥
মাওরে ঈমাম হোসেন দাড় টানিবে
শোন মাগো কই তোমারে
হজরত আলী মস্তুলও হবে।
আরে শ্যামাদাড় বাদাম হবে
কইয়্যা বুঝাই তোরে
নিরাঞ্জন বাতাস হইয়্যা
পৌছিবে কিনারে।

www.pathagar.com

বলছে তালেব মুর্খমতি
উম্মাতের লাইগ্যা দয়াল নবী
পাটনি হবে হাসরে ॥[৪২]

৫

এরে মা ফতেমা কুলসুম বিবি
আর হলো নবীর বিটি
কোরআনে আছেরে লেখা।
ওরে মা ফতেমার বিয়া হলো
হজরত আলীর সনে
কুলসুম বিবির বিয়া হলো
ওসমান গনির সাথে
ওসমান গনি মালদার ছিলো
ফতেমা গরিব দেইখ্যা তাহার
আসা যাওয়া না ছিল ॥
এরে একদিন সে ওসমান গনি
মদিনা দাবাত করিল
আমার রাসুল্লাহর দাবাত দিয়া
ফিরা বাড়ি আইল
ফাতিমা গরিব দেইখ্যা দাবাত নাহি দিল
মদিনা রওনা হলো
তা দেইখ্যা ঈমাম হোসেন দুইভাই
ফতেমার কাছে গেল ॥
মাওরে খালার বাড়ি দাবাত খাব
চল মাগো আমরা যাব
ফতেমা কান্দিয়া বলে।
এরে আমরা হলো গরিব দুঃখিনী
দাবাত নারে দিলো
ঈমাম হোসেন কাইন্দা বলে
নানার সাথে যাব ॥
এই পথ দিয়ে যাইবে নানা
ঈমাম হোসেন দুইভাই ওরা
পথ পানে চাইয়া রইলো।
এরে অন্যও পথ দিয়ে নবী
গেলেন কুলসুমের বাড়ি
লোকজন বসিতে দিলো।
হেরে খাবার জন্য যা কিছু

www.pathagar.com

তৈয়ার করে ছিল
ঢাকুনি তুলিয়া দ্যাখে সব-ই কয়লা হইয়া গেল ॥
কুলসুম বিবি কান্দিয়া বলে
হায়রে নবী আব্বা আমার
এখন উপায় কি হইল
আমার নবী বলে কুলসুম বিবি
যাও তুমি তারাতারি
ফতেমাক আনো ভুলাইয়ে ॥
এরে নবীর হুকুম পাইয়া বিবি
চলে ধীরে ধীরে
ফতেমার ঐ পায় ধরিয়ে বিনয় করে বলে
ঈমাম হোসেন সঙ্গে নিয়ে
চল বুনরে আমার বাড়ি
মাফ কর আজ আমারে ॥
আমার মায়ের বড় দয়া ছিল
কুলসুম এর বাড়িত গেল
যাইয়া সে কোন কাম করিল।
ওরে খোদারও আরস পানে দু হাতও তুলিল
ফাতেমা বলিয়া আমার নাম রাখিল কেন?
আমার দোয়া কবুলও করে
ওসমানি খানা দাও খাইয়ে
ওহে আলাহ গফুরও ॥[৪৩]

৬

আরে এই সভাতে ব্যাখ্যা করি
মানব জাইতের কি বুদ্ধি
তা বলতেছি সবার মধ্যে
দেখে হত বলব কত কি কুদরতি,
দোহার বোন বলে দিনপত্তি
ওরে নতুন ধুয়া পাইলে হয় খুশি
ওরে তাইতো হাতে কলম ধরে
খোদার নাম স্মরণ করে
বানছি ধুয়া শনিবারে রাতি ॥
আরে উপর দিয়ে চলে ফেরে
এরোপপ্লেন জাহান খান
ভাইরে মানবের কি মাথার জ্ঞান
শব্দ ভারি, মনে করি ভুইকম্ব বয়ান

www.pathagar.com

তার আমি পাইনারে সন্ধান
ওরে ঘন্টায় শুনি ৫০০ মাইল যান
ওরে যদি দেখি দুই নয়নে
ফট কইর‍্যা পালায় কোনে
দশের কাছে কইর‍্যা যাই বয়ান ॥
ওরে কত অওরত মওরত যুবতীরা
যায় জাহাজের সেখানে
হাইল্যা হাল ছাড়ে কামলাগণে
পোয়াতিরা ছাওয়াল ছ্যাড়ে কামলাগণে।
আর একটি কথা হলো মনে
নদী ঝাঁইপ্যা আসে কতজনে
ওরে খেওয়ার নৌকায় লোক ধরে না
এদিকে দেড়ি সয় না
উইড়্যা গেলে দেখবো কেমনে ॥
যুবতীরা যায় জাহাজের সেখানে
দেখে চৌদিকে হেঁটে হেঁটে
দড়ির বেড়া আছে ঘেরা
মানে নাকো
জাহাজে নাই কোনো পেট্রোল
ওরে ড্রাইভারের মুখে নাইরে বোল
ওরে শনিবার দিন টেলিগ্রাফ করে
শাহজাদপুর বাতিয়ার চড়ে
মহাফেরে পইড়্যা আছি গো ॥
আরে খবর শুইন্যা আরেক জাহাজ
আসিল মঙ্গলবারে
বেলা ১০-১২ ঘন্টার পরে
তাই দেইখ্যা লোক ভিতু হইয়া দৌড় পারে।
জাহাজখান চৌদিকে ঘোরে
ওরে দেখলে চিনি নাম জানিনা ভাই
ও ভাই লোকে তাহাক প্যারাস্যুট বলে।
ওরে তাহার সনে জের বাধিয়া
সহজে নিচমুহা দেয় ছেড়ে ॥
ওরে আরেকটি কথারে ভাই যতকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করি
কত বিলাইচে সেকরেট বিড়ি
দশের কারণ দিলেন মাত্র ও বাণ্ডিল ছাড়ি
তা লিয়া হয় পাড়াপাড়ি
ওরে গ্রাণ আইলো মশিদুরদের বাড়ি

www.pathagar.com

আমি অতি মুর্খ জাহের
স্থানিয়া বসত গুচ্ছগ্রাম বাড়ি ॥[৪৪]

৭

আমি কেনে বা পিরিতে করলাম
আমার কানতে জনম গেল রে
আমার ভাবতে জনম গেল রে
আমি কেনে বা পিরিতিরে করলাম ॥
আগে যদি জানতাম বন্ধু
প্রেমের এতো জ্বালা
ঘর করিতাম বৃক্ষ তলে
থাকিতাম একেলা রে
আমি কেনে বা পিরিতিরে করলাম ॥
বড় বাড়ির বড় ঘর ভাই
কইরা ছিলাম আশা
রজনি বা রাতের কালে
পাখি ছাড়লো বাসা রে
আমি কেনে বা পিরিতিরে করলাম॥
আগে যদি জানতাম বন্ধু
যাইবা রে ছাড়িয়া
আমি দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম
মাথার কেশও দিয়া রে
আমি কেনে বা পিরিতিরে করলাম ॥[৪৫]

৮

আমি গিয়াছিলাম উত্তর মুলুকে
আবার ধানের খেপের আশাতে
পঁচচল্লিশ সন ভরা ভাদদুর মাসে।
এরে উল্লাপড়া, কালিগঞ্জ, কামারখন্দ বায় ফেলে
তার উত্তুরে পাঙ্গাশী আছে
দারুডাঙ্গার হাটখোলাতে ভাই
সে জাগায় ছিলাম এক রাতে।
মশার জ্বালায় প্রাণ তো বাঁচে না
আমি কইরা যাই তার বর্ণনা
খেদাই মশা নিষেধ মানে না।
এরে গুন গুন কইরা গান করি
নারি চারি হাতখানা

www.pathagar.com

খেদাই মশা নিষেধ মানে না
সেই গ্রামের এক বৃদ্ধা ছিল
ভাই বয়াতি ছিল একজনা ॥
আবার বাড়ি তাহার পূর্ব দেশে হয়
আইসা ছিল পাটের লায়
সেই বয়াতি গায়ানের জব দেয়।
এরে বাপ চাচা মোর ছিল সঙ্গে
তাই ঠেকিলাম বিষম দায়
গায়ানের জব না দিলে তো লয়
আগা লাও ছাড়িয়া দিয়ে রে
যায়া বসলাম পাছা লায় ॥
এরে দু দলেরি পালা যে হল
আবার বয়াতিটা বেশ ভালো
লোকে শুইনা তারিপ করিলো।
ভাগনারে তোর গায়ান শুইনা
কুত্তাহুদ্দা বুঝিলো
ধুব্বু ধুব্বু শব্দ যে হলো
এবাদ বলে ভাই সকলে
সের পাঁচিক গলায় ঘ্যাগ ছিল ॥[৪৬]

৯

এরে কোরানেরও কথা শুনে
ও ভাই আমার পরাণ উইর‍্যা যায়
এরে ফুলসুরাত তো হীরের ধার
আমাবশ্যা হবি অন্ধকার
নবী বিনে ঐদিন আমায় কে করিবে পাড়
নবী বিনে কে পাড় করিবে
ওরে ভাইরে সেই কথা শুনাও আমায় ॥
এরে ফুলসুরাতের ঘাটে যাইয়ে
নিবরে কানছি বইসে
উনিশটো ইস্টিশিন হবে
এরে আঠারোটো থানা কোট ভাই বসবে ঐ জায়গায়।
একটু নেকি কম হইলে
মোচা দিয়ে ফেইলে দিবে
ও ভাই দোযকেরই নিচ তলায় ॥
ওরে আমার ওস্তাদ তায়জাল বলে
আজির উদ্দি কই তোমারে

www.pathagar.com

তুমি আমার কথাই লেও।
এরে ধুয়া, জারি ছ্যেড়ান দিয়ে
তুমি মোমিন হয়ে যাও।
বারে বারে করছি মানা
গায়ান আর গাইয়ো না
আসরেতে গায়ান গাইলে
ওরে বেটা, লোকে তোরে মন্দ কয় ॥[৪৭]

১০

ও কি হলো ভাই কলির শেষে
রাত্র দিন ভাবছি বসে
শয়তানের দল হয়েছে ভারি।
ওরে লোক সব লিবি দোজখে যত দুষ্ট নারী
অন্দরে থাকে না তারা
ফেরে বাড়ি বাড়ি
ঝগড়া বিবাদ রাতদিন করি
তারা থাকে না দেয়া স্বামীর তাবেদারী ॥
এরে এখনকার দুষ্ট নারী
আপনার স্বামী ছাড়ে
পর পুরুষের আশা করে
ওরে এচা শাস্তি দেবেন আল্লা
দোগুনা কবরে।
জমদুত এসে ঠাঁইশা ধরে
লোহার গুর্জ মারে
সাড়েশ দিয়ে চোখ ফুটাবে ভাই
জিহ্বা টাইনা লিয়া উল্টাইবে ঘারের পৃষ্ঠে ॥
এরে ছিল এক আইয়ুব নবী
তার স্ত্রী রহিমা বিবি
সে যে স্বামী সেবা করে
ওরে ঘাও হইয়া পোকা পইলো
তবুও নারে ছাড়ে
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা আইনা
পতি সেবা করে
অহেদ সরকার দিছে ধন্যবাদ
এমন নেককার বিবি কারো
ও হবে না ভবের পাড়ে ॥[৪৮]

www.pathagar.com

১১

আজকে মরলে কালকে দুইদিন
করলি না স্মরণ
ক্ষুনকা জীবন লইয়া তোমার
কত আয়োজন রে মনা
কত আয়োজন ॥
সোনারও পালঙ্ক ছেড়ে
যেতে হবে মাটির ঘরে রে ॥
বন্ধ হবে দমের আঁখি
রাখলি না স্মরণ
ক্ষুনকা জীবন লইয়া তোমার
কত আয়োজন রে মনা
কত আয়োজন ॥
কাছের মানুষ বন্ধু জনা
নিদান কালে কেই যাবে না রে ॥
যত্নে গড়া তোমার দেহে
ধরবে রে পচন
ক্ষুনকা জীবন লইয়া তোমার
কত আয়োজন রে মনা
কত আয়োজন ॥
আজকে মরলে কালকে দুইদিন
করলি না স্মরণ
ক্ষুনকা জীবন লইয়া তোমার
কত আয়োজন রে মনা
কত আয়োজন॥[৪৯]

১২

পীর মুরশিদ পালন করে রে
ওরে খাটি ইসলাম ধর্ম ॥
ওরে তুমি ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে
ওরে তুমি কইর‍্যাছো কু-কর্ম ॥
টুপি মাথায় সুফি লেভাজ
পড় তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ
কর ধর্মেরই কাজ
ওরে তুমি ইসলাম ধর্মের
দোহাই দিয়ে
ওরে তুমি কইর‍্যাছো কু-কর্ম

www.pathagar.com

ওরে খাটি ইসলাম ইসলাম ধর্ম ॥
আল্লা যুদি দেখতাম চোখে
ওরে ভয় থাকতো আমার বুকে
সুপথ ধরতো লোকে
হায় হায় ওরে আবার ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে
ওরে তুমি কইর‍্যাছা কু-কর্ম
ওরে খাটি ইসলাম ধর্ম ॥[৫০]

১৩

দেশেতে মেশিন এসে
রঙের দফা করলো সাড়া
ও মেশিন বুনাইছে যারা
বউয়ের মাইরাছে তারা
তাই দেখিয়ে ধোপা লাপিত ক্ষিৎ বোষ্টম যারা
গলেতে রোমাল বেধে রাস্তা দিয়ে হাইটা যায় তারা ॥
সাড়াদিন কাজ করে, কাম করে
সন্ধ্যায় যায় বাড়ি
রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে
অমনি ঘোমে ঠাইশ্যা ধরে
তার প্রিয়সীকে ডাইকা বলে
বেছনা দাও পেড়ে
ওরে তাঁতের গুতায় জ্বর এসছে
হাতপাও দাও টিপে
বইসো মোর কাছে ॥[৫১]

১৪

দু-দিনের ভিসায় মিছা দুনিয়ায়
কেন পাঠাইলো রে ও আল্লায়
কেন পাঠাইলো রে ও আল্লায় ॥
দিয়া ঐ সুখ জ্বালা
পাঠাইলো একেলা
এ কেমন খেলা আল্লায় খেলাইলো রে
কেন পাঠাইলো রে ও আল্লায় ॥
ছিলাম বা কোথায়, মনেতে পড়ে না
এলাম বা কোথায়, বুঝিতে পারি না ॥
যাব বা কোথায়, তাও তো জানি না
এ কেমন ভেজালে আল্লায় ফালাইলো রে

www.pathagar.com

কেন পাঠাইলো রে ও আল্লায় ॥
কয় সরকার শাহ আলম
আমি আমার করি
আমি কার কে আমার
চিনিতে না পারি ॥
তোমায় দেওয়া নম্বরী
আমি খুঁজে মরি
আমি না আমারে চেনালো রে
কেন পাঠাইলো রে ও আল্লায় ॥[৫২]

১৫

তুই বড় রঙ্গিলা বাওয়াই রে
ও বাওয়াই কত জাদু জানো।
নিজের ইচ্ছাই ঘর বানাইয়্যা
বসে বসে থাকো রে
তুই বড় রঙ্গিলা বাওয়াই রে ॥
ও বাওয়াই রে
বাতাস উঠিলে বাওয়াই খেলা ধুলা কর
নিজের ইচ্ছাই ঘর বানাইয়্যা
বসে বসে থাকো রে
তুই বড় রঙ্গিলা বাওয়াই রে ॥
ও বাওয়াই রে
সকল পাখির উপর বাওয়াই
তোমার হলো বাসা
বাওয়াই তোমার হলো বাসা ॥
সকল পাখি বৃষ্টিতে ভেজে
তুমি দ্যাখো মজা রে
তুই বড় রঙ্গিলা বাওয়াই রে ॥[৫৩]

১৬

পাগল পাগল সবাই পাগল
শোন বলি পাগলের কথা।
পাগল বিনে এ জগতে ভাল হয় কেডা ॥
ওরে এক পাগল যে শিব সন্ন্যাসী
তাজ্য করে কৈলাসকাশী
খায় ভাং, ধুতরার গোটা।
আরেক পাগল যে নারদমনি

www.pathagar.com

বিনাদোষে বাজায় ল্যাটা।
হরিনোটে হয় পোলাপান পাগল
সন্ধ্যাতে তুলসী তলা যায় একা ॥
দম্পতিতে মাদার পাগল
গর্ভে পাগল গর্ভকার।
প্রসব বেদনায় মাতা পাগল প্রসব করিবার।
ওরে ধাত্রী পাগল নাড় কাটিতে
জ্যোতিষ পাগল নাম রাখিতে
শিশু পাগল মায়ের দুধ খাওয়াইবার।
ওরে মাতা-পিতা হচ্ছে পাগল স্কুলেতে পাঠাইবার
পড়ার জন্যে মাস্টার হয় পাগল
ছেলে পাগল পরীক্ষায় পাস করিবার ॥
পরীক্ষায় পাস করিয়ে খোঁজে নানান চাকুরি
উকিল, মোক্তার, জজ ব্যারিস্টার, কেউ হয় মহুরি।
ওরে হাকিম পাগল হুকুম দিতে
উকিল পাগল ছল জোটাতে
চোর পাগল করতে চুরি ॥
ওরে জ্বরের জন্যে ডাক্তার পাগল
দান করে জ্বরের বড়ি।
ঐ যে রাধার জন্যে কৃষ্ণ হয় পাগল
রাই পাগল শুনতে কালার বাশরি॥
সাধু পাগল সত্য বলতে
মাতাল পাগল মদেতে।
মুধুর নেশায় ভ্রমর পাগল
উইরা বেড়ায় ফুলেতে ॥
ওরে চোর গুণ্ডা বদমায়েশ যারা
পর নারীতে পাগল তারা
মোল্লা পাগল দাওয়াতে।
কত যোগী ঋষি হচ্ছে পাগল
বইশা থাকে ধ্যানেতে
কেউ পাগল মরার আগেই মরিতে ॥
আমি গোলজার তোমার পাগল
মাফ কইরো গো দয়াময়
কি কইতে কি বললাম
পাগলে কি না কয়?
মানব তরি ডুবুডুবু
দিবা-নিশি জল চোয়ায়

www.pathagar.com

ওরে কখন জানি পাকে পড়ে রে
ও গুরু সদাই থেকো আমার নায় ॥[৫৪]

১৭

ওরে গেলাম ছুটে নতুন বাজারে
ধুয়া গায়ান শুনিতে
বইশ্যা আসরে
ওরে নতুন ধুয়া শুনবো বলে
সকলে আশা করে
ধুয়া প্রথম দিলাম আসরে
কথায় আমার মিল পড়ে ভাই
কি ধুয়া বলবো আসরে ॥
ওরে পারমনহরা দুর্গাপুর মিলে
আবার হরিরামপুর যুক্তি করে
বাজার লাগাবো ইস্কুলের সামনে
ওরে মিটিং করে দিন ফালাইলো
শুক্কুর বারের বিকালে
মিটিং হবে ইস্কুলের সামনে
লব্দপাড়া গোপিনাথপুর মিলে সকলে ॥
ভাইরে বেরদোপালা স্বরূপপুর মিলে
আবার সরতুল যুক্তি করে
মুরুটিয়া তাহার নিকটে
ওরে কুমারগাড়া, চিনাধুকুরিয়া ডুবডাঙ্গা
যুক্তি করে মাঝখানে শ্যামবাড়িয়া আছে
মনি সরকার বড়ই বুদ্ধিমান
ভাই সালাম রাখি চরণে ॥
ভাইরে রাজমান গ্রামে বয়াতি আছে
আমি বলে যাই দেশের কাছে
তারাই আমার সঙ্গেতে আছে ॥
ওরে মশিপুর আর বাতিয়ার পাড়া
কায়েমপুর আছে নিকটে
সেই গ্রামে চেয়ারম্যান আছে
নতুন বাজার দেখিয়ে যেয়ে
তিনি আমায় সাহায্য করিবে ॥
ভাইরে মুর্খমতি তালেব আলী কয়
আমি সালাম জানাই দশের পায়
মিথ্যা কথা বলবো না সভায়

www.pathagar.com

খোদার রহম হয়েছে নিশ্চয়
একথা আমার প্রাণ বাচে না হায়
কি ধুয়া বলবো রে সভায় ॥[৫৫]

১৮

চৈত্র মাসের আটাশও তারিখে
মনটা যায় রে ভাটিয়ার দেশেতে
সাপও ধরিতে ॥
ঐ এক দিবসে স্বপ্ন দ্যাখে
শুইয়া নৌকাতে
সাদা একটি পাখা লাগবে
ওরে ভাইরে, সেই সাপ ধরিতে ॥
যখন বলে সাপেরই কথা
গাদায় থেকে উঠায়রে মাথা
বলে হায় রে হায় ॥
ও এক মুষ্ঠি ধুলা পইড়্যা দিল
সেই সাপের মাথায়
ধুলা পড়া লেয় না সাপরে
ওরে ভাই রে প্যাচ দিলো গলায় ॥
গলাতে প্যাচ দিয়া না সাপ রে
হাড়ে মাংশ একতার করে
চলে বাও ঘরে ॥
ষোলটি বাঁশেরি আগায়
মোরণ দেয় কষে
ঝলকে ঝলকে পড়ে রক্ত
ও রে ভাইরে সেই বাঁশের গোড়ে ॥
আয়ানের ভাই জয়ান রে উদ্দি
তার ভাই ছিল মফিজ উদ্দি
সেই বাশ কাঁটতে যায় ॥
ও এক ফোটা রক্ত পড়লো
মফিজ উদ্দির গায়
উড়া লাফে দিল খবর
ওরে ভাই রে নিবারণের লায় ॥
খবর পায়া ও না রে নিবারণ
উঠিয়া বসিলো তখন
বলে হায় রে হায় ॥
সিথানের সিন্দুরের কৌটা কপালেতে লয়

www.pathagar.com

আখি খুইলা দ্যাখে মুখ রে
ওরে ভাই রে সেন্দুর মইলাম হয় ॥
সাদা পাখা লিয়া না নিবারণ
সেই বাঁশ ছোপে যায়
মেরনা মেরনা সাপ রে
পতি কষ্ট পায় ॥
প্যাঁচ কাটা এক মনতর দিয়ে
ওরে ভাই রে পতিকে নামায়
মরা পতি লিয়া না নিবারণ
দেশে চলে যায় ॥
ফুল তোলার বন্দরে যায়্যা
ধুয়া বাধে গায়
আটচল্লিশ হাত নোম্বা সাপ রে
ওরে ভাইরে নামে অর্জুন রায় ॥[৫৬]

১৯
বিধাতার অপার লিলা
ধুয়া বাঁইধা আর কি বলিব,
এ রে বাউলার চড়ে শুকনা ছিল
সাপুড়া কবিরাজ ভালো
তেরশো বিয়াল্লিশ সনে
আষাঢ় মাসে সাপ ধরিতে গিয়াছিল
রবিবার বিশসুদবারে
সাপ ধরিতে ওস্তাদের নিষেধ বটে ছিল ॥
ওস্তাদের নিষেধ না মানিয়ে
রইবারে সাপ ধরতে গেল।
এ রে সাপ ধরতে যায় পোড়া বাড়ি
পঞ্চাশ টাকা পুরুণ ছিল
যায়্যা সে অফিস ঘরে
মনতর পড়ে, বাঁশি বাজান শুরু দিল
বাঁশিরও আওয়াজ শুনে, সাপের কানে
সাপ উইঠ্যা নিকটে আসিল ॥
ওরে সেই না সাপরে মাথায় রে ভাই
পদ্মাদেবীর আসন ছিল।
এরে গুরু মনতর সব কিছু মানে না
সাপুড়িয়াকে কামুড় দিলো
সাপুড়িয়া কাইন্দা বলে ভাই সকলে

www.pathagar.com

আজ বুঝি মোর মরণ হলো
কোথায় ভাই কাদের আলী তোরে বলি
আমার খবর মায়ের আগে দিয়ো ॥
এরে আমি মরলে দিয়ো না মাটি
ধর্ম্মের দোহাই দেই তোমারে।
এ রে কলা গাছের ভুড় বাঁধিয়া
ভাসাইও সাগরের জলে
জ্বলায়া মোমের বাতি
শিতল পাটি নতুন ধুতি ফেনদাইয়ো
ওস্তাদের দেশে যাব
জেন্দা হব ছয় মাস পর
ঘুরে আসবো দ্যাশে ॥
এরে সাপুড়াকে মাটি দিলো
শোন রে ভাই গোড়ের কথা।
এরে খোদার কসম না মানিল
এমন পাপিস্ট তারা।
সে সব লোক মরলে পরে
বিনি হিসেবে দোযকে হবে রে তার বাসা ॥
এ রে চারদিন পর শুকনালের ওস্তাদ
শুকনালেক জিয়াইতে আইলো
এ রে খোনতা কোদাল সঙ্গে কইরা
গোরস্থানের মাঝে গেল
তাহার ভাই কাদের আলী হচ্ছে বড়ি
খোনতা কোদাল কাইরা নিল
বাচিলে অংশ নিবে
দেলে ভেবে শুকনালেক জিয়াইতে না দিলো ॥
শুকনালের বোন কাইন্দা কয়
ও মিয়াভাই, ভাই বলে ডাক দেব কারে
শুকনালের মায় কাইন্দা কয় ও সোনার চান
মা বলে ডাক দেও আমারে ॥
আমারে বৃদ্ধকালে যাদুমনি
আমায় ফেলে যাবে কোনে
ধুয়া বাঁনছে আহেদ আলী
সবায় বলি এই ধুয়া গাইবেন ভাই সকলে ॥[৫৭]

২০

আরে ওরে কোকিল ডাকিস না রে আর
ও বসে বৃক্ষ ডালের পাড়

www.pathagar.com

ওরে যার বাসরে নাইকা পতি
হায়রে পোড়া কপাল তার ॥
আরে ও যাহার পতি বিদেশে
ও রইলো কার মায়ায় ভুলিয়ে
ওরে কে আমারে বাসবে ভাল
হায়রে অবলা বলে ॥
আরে ও সোনার গয়না লোচে গায়
ও সোনার ধান তাবিচ গলায়
ওরে হাইটা যাতি ঢইলা পড়ে
যমন আহ্লাদের জ্বালায় ॥
আরে ও আমি সত্য রাজের ঝি
ও সত্য পালন করতাছি
ওরে শ্বাশুড়ি তো দেয় না জ্বালা
হায়রে জ্বালায় ননদি ॥
আরে ও গুণের শউড়ি মইরা যাক
ও ছোট দেওড়া বাইচা থাক
ওরে কাল সাপিনী ননদিনীক
হায়রে বাঘে ধরে খাক ॥[৫৮]

২১

প্রথমে সালামগো জানাই আল্লা নবীর পায়
তারপরে সালামগো জানাই দশজনের পায়
তারপর সালামগো জানাইগো ও আমার ওস্তাত যেজন হয় ॥
এরে নবীর বেটি দুনিয়ার খাটি বেহেস্তের দায়নদার
ফুল সুরাতের হীরের ধারে আপনে করবেন পাড়
নামের জোরে আইছি চলে গো ও মা যা কর এবার ॥
হেক্ত ছিলা গোপ্ত হইলা দেখিনা নয়নে
অধম তরিকুলা ডাকছে তোক হরদমে দমে
কিঞ্চিৎ দেও পদছায়া গো ওমা রাইখা চরণে ॥
এরে ঈশরাফিল ফুকাবে সিঙ্গ দোনিয়া হবে পানি
অধম তরি হইয়া ভাসবে মা তোর উম্মাতের ধবনি
মসলমানের বরকোতেনি গো ওমা হেন্দু ভবানি ॥[৫৯]

২২

পহেলা আসরে এসে অধম সে জফের উদ্দিন কয়
ভুল কইরো না ভাই সাহেবরা সালাম জানাই পায় ॥
ও দয়াল সে আল্লা মালেক সাই
ওরে আমি অতি মূর্খমতি ভাই

www.pathagar.com

ও ভাই আমার তো বিদ্যাবুদ্ধি নাই
ওরে জগৎ মাতা সরস্বতী
আজগার আসরে তোমরে চাই ॥
মা তোর অধম ডাকে কাতর দেলে
তারাও মা জগৎ জননী
পইরা পাকে বিষম ফ্যারে ডাকি আমি
আমি অধম ভজন সাধনা জানি
ওরে ইমাম হোসেন দুটি পুত্র মা
ও মা ঐরকম বাসবেন আপনি ॥
ওরে মায়ের দুগ্ধ খাইয়্যা জীবন রক্ষা
তবু মা পাইনা চরণখানী।
ওরে কারবালায় যাইয়া হোসেন
ভয়ানক পরলো সঙ্কটে
ফোরাত নদী দারুণ এজিদ রাখছে ঘিরে।
ওরে কত লোক মরলো পানি বিনে
ওরে কারুর ছাও কারুর মাও কারও ভাই পইড়া রণভূমে ॥[৬০]

২৩

শীত গেল বসন্ত এলো রে
ও বন্যা এলো রে
সামনে ফালগুন মাস
বিরোহিনীর মনের আগুন জ্বলে বার মাস ॥
দূর দেশে যাইবা, ও প্রাণ বন্ধ রে
সঙ্গে লিবা না
থুইয়া গেলে এ রূপ যৌবন
আইসা পাইবা না ॥
চারা গাছে ধরছে, ঐ না ডালিম রে
রসে টলমল
সেই না ডালিম মুখে দিলে রসে ভরে গাল ॥
বিদাশেতে চাকরি ও না করে রে
সাধু সওদাগার
কোন বা নারী খাওয়াছে তোমায়
কাঁচা দুধের সর ॥
ঐ দুধও মিঠা দু'দিন
ও না মিঠা রে, মিঠা দুধের সর
তাহার চাইতে অধিক মিঠা
যুবক নারীর ঘর ॥

www.pathagar.com

নিম তিতা নিম, ও না তিতা রে
তিতা পানের খর
তাহার চাইতে অধিক তিতা
দুই সতিনের ঘর ॥
ডালে বইসা ডাকছে
ঐ না কোকিল রে
গাইছে মধুর গান।
ঐ আর ডাকিস না কালো কোকিল
ঘরে রয়না প্রাণ ॥
ঐ কোকিল যদি মানুষ
ও না হতো রে
যৌবন করতাম দান
সোনা দিয়া বাইন্ধা দিতাম কোকিলার দুই কান ॥[৬১]

২৪

কি মজা রথ গড়েছে ভব তরঙ্গ মাজারে
ভয়ংকার চাকা দুইখান আছে
ও রথের তিনশ ষাট জোড়া তাতে
রথ খাড়া মন
ও রথ পবন হেলোনে হেলতেছে
চাকা ঘুরতাছে
দিবা-নিশি বিনা তৈলে দুইটি বাতি জলতেছে ॥
রথখানা দেইখা না আকুল
মাপলে হয় চরাশি আঙ্গল...
তা দেইখ্যা জ্ঞানী লোক ব্যাকুল
ওরে আমি অতি মূর্খমতি মন...
ও তাতে রথ মালিকের সমুতুল
দেখো তাহার ভুল
কত প্রেমা, বৃষ্ণু, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ হইছে না আকুল ॥
রথের পাশে জরিপ সাড়া
কলের রথ দেখবি তোরা আয়
আমি ফয়েজ ভেবে হই হারা
ও রথের প্রধানমন্ত্রী বিন্দু ছাড়া মন
ও রথ ঘুইরা বেড়ায় পাড়া পাড়া
আইস্যা দ্যাখ তোরা
ও যেদিন আসবে জোয়ার
পড়বে ভাটি রথে খসবে সব জোড়া ॥[৬২]

www.pathagar.com

২৫

বেশ বলি মজার কথা
মাইটা তক্তা হাড়ের গাঁথা
চামের ছাইনি ॥
ওরে সে বিনে পুড়া সার মিশাইছে
ছুতর গুণ মনি দিন তারিণী
গো তারিণী তরাও এ ভবে
সেই নৌকা গড়ছে শতেক খানি ॥
সেই নৌকা বোঝাই আছে
হীরা কাঞ্চন মানিক আছে অমূল্য রতন
ও তাই বইসা আছেন ভাই সাহেবরা
যত মোমিনগণ পিছে সোমন
সোমন আইসা বাঁধবে রে কষে
সেই দিন তোর বুইজ্যা লিবে আসল ॥
চারখান বইঠ্যা কলে পাড়া
মাঝি মালা যাচ্ছে বয়ে
উজান পানির পাড়
ও যেদিন আসবে জোয়ার পড়বে ভাটি
পইড়া রবে চারখান দাড়
সেই নৌকার পাড়
মাঝি মালা সব দেবে সাতার
ঠেকবেন সেই জালমামুদ সওদাগার ॥[৬৩]

২৬

চৈত্র গেল বৈশাখ মাসে জাহাজ নামে নরিনা গ্রামে
বৈশাখের পঁচিশা তারিখ রবিবারে ॥
ও জাহাজ খান নামলো বালুর চড়ে
ওরে ভাই কত লোক যায় দেখিবারে
ও ভাই আমরা দেখলাম জাহাজে চড়ে
ওরে পোচ্চলিশ হাত নাম্বা
পাশে তার পনোরো হাত আছে ॥
জাহাজখান মাটিত নাইমা আকুল হয়ে
সংবাদ পাঠায় বিলাতে
তাই শুনিয়ে আরেক জাহাজ আইলো চলে ॥
আরেকটা জিনিসটা দিলো ছাড়ে
ওরে নাম জানি না দেহলি চিনি ভাই
ও ভাই লোকে তাক প্যারাস্যুট বলে

www.pathagar.com

ওরে তারির সনে জের বাধিয়া
সহজে নিচমুহা দেয় ছাড়ে ॥
কত যুবতী নারীগুলি যায়া নদীর ঘাটেতে
পাছা পাইড়া কাপড় ফিদা রোমাল হাতে
ও যমন হাইট্যা যেতে, যমন ঢইল্যা পড়ে
যমন যৌবনের ভরে,
ওরে পান খাইয়্যা ঠোট করছে লালও
ফিতা লাগায় টিনটিনার উপড়ে ॥[৬৪]

২৭

বন্ধু আমার চাকরি করে হে
ওই না নীল সাহেবের কুঠিতে
মাসে মাসে চিঠি লেখে হে
আমার তো বই বন্ধু এলো না ॥
একবার লিখন দুইবার পাঠাই হে
আমার তো বই বন্ধু এলো না
বন্ধু, রসের ডালিম পরে খাইলো হে
আমার বন্ধুর ভাগ্যে হইলো না ॥
বন্ধু যায় রে পানসি লায়ে
ঐ না পাথর কয়লা আনিতে
এবার ক্যানে এতো দেড়ি হে
বুঝি জল নাই বন্ধুর নদীতে ॥[৬৫]

২৮

ঘর জামাতা দুঃখের কথা ভাই
আমি সভার স্থলে বলে যাই ॥
ওরে যেজন থাকে ঘর জামাতা
তাহার দুঃখের সীমা নাই
ওরে পাইট খাটে পাইট্যালের মত
তাহার রাতে শোয়ার জাগা নাই
নিজে হাতে লয় বেছনা পাইরে
তরাশি কয় না বউয়ের ঠাঁই।
ওরে শাশুড়ি বলে ও ল্যাড়ের বেটা
ও তোর ছোট মুখের বড় কথা ॥
ওরে মিয়া আমার পূর্ণিমার চাঁদ
তোর নাই কোনো ক্ষেমতা
তোমার মত কত জামাই

www.pathagar.com

পইড়্যা রইচে গাছতলায় আর বাশ তলায়
তুমি জামাই না থাকিলে রে
মিয়ার মোর আছে যোগ্যতা ॥
তামুক থেকে আগুন যদি চায়
ও বউ গাল ফুলাইয়া বইসা রয়
মায়ের কাছে কাইন্দা কাইন্দা কয়।
তোমার জামাইর এমনি রীতি
তামুক খেতে আগুন চায়
ও মা বাদীর মত গণ্য করে
তাই কি আমার প্রাণে সয়, প্রাণে সয়
ফাসি লইয়া এ জানকে দিব
নইলে ঝাপ দিবো দরিয়ায় ॥[৬৬]

২৯

ফুল তুলিতে গিয়াছিলাম রে
ঐ না ফুলের বাগানে
ফুল তুলিতে হলো দেখা রে
ওই না হালকা জাইলার সনে
মোর নসিবে এই ছিল ॥
হালকা জাইলা ভোলকা জাইলা রে
ঘাটে বাঁধারে লাও
সুন্দর দেইখ্যা করছাও প্রেম রে
ও এখন আইস্ট্যা গোধায় গাও
মোর নসিবে এই ছিল ॥
আগে জাইলা যেমন তেমন রে
মধ্যের জাইলা রে ভালো
সন্দর করছাও প্রেম রে
ও আইস্ট্যার গোধায় গাও
মোর নসিবে এই ছিল ॥
সাত ভাইয়ের ভগ্নি আমি রে
থাকি কোলে কোলে
জাইলার সনে কইরা প্রেম রে
ও আমার জাত কুল মান গেল
মোর নসিবে এই ছিল ॥
জালের মাথায় জাল ধরি রে
আমার মাথায় রে ডালি
মাছ বেচিতে যাইতে হলো রে

www.pathagar.com

ওই না গারোস্তরও বাড়ি
মোর নসিবে এই ছিল ॥[৬৭]

৩০

ওরে প্রেম প্রেম করো সবে
কোন প্রেমের কি নাম ধরে
প্রেম কর এই ভবের পাড়ে ॥
ওরে যার সনে করিবা প্রেম
সে বা রইল কোনে
তারে না পাইলে প্রেম
করিব কেমনে॥
যার প্রেমে মন পরোকাল পাবো
পাগল মন এই সংসারে আমি
খুঁইজা পাই না তাহারে ॥
ওরে দিন দুনিয়া ভুজের খেলা
থাকবে না রসের মেলা
ডুবিলে হবে অন্ধকার ॥
ওরে যার হুকুমে আইছো বান্দা
এই না দুনিয়ার পাড়ে
তার হুকুমে যাইতে হবে
গোড়েরও মাঝারে
মনকা একিন দুইজনা এসে
তোমায় জেন্দা কইর্যা আল্লা
শুইনা লিবে জব সোয়াল ॥
ওরে জব সোয়াল করিবে যখন
কি জবাব দিবি তখন
জবাবের কার্য করলি না
ওরে জবের সোয়াল না পাইলে
মারবে দুরমুজের কোনা
হাড়ে মাংশ মিলনও করে
মূর্খমতি জবেদ বলে
হায়রে বিধি রব্বানা ॥[৬৮]

৩১

ওরে নীল দরিয়ার মাটি দিয়ে
আদমকে সৃষ্টি করিল ॥
ওরে আদমেরি কলবের ভিতর রূহু দান করিল

www.pathagar.com

খোদার কাছে রুহু তখন কান্দিতে লাগিল
এমনও অন্ধকার রাস্তায়
আল্লা আমায় কেন পাঠাইলো ॥
ওরে আল্লা বলে শোন রুহু, তুমি ঠিক হয়া থেকো
ওরে যেদিন আমি আজরাইলকে পাঠাইয়ে দিবো
সেইদিন আমার কাছে চলিয়া আসিও
সেইদিন তোমার ছুটি হইবে
আইশ্যা সদর খানায় থাকিও ॥
ওরে সদর খানায় থাকো পাখি
মূর্খ ওহেদ আলী কয়
ওরে কখন জানি যাবে পাখি আমারে ছাড়িয়ে
দিন থাকিতে তওবা পড়িও
নইলে হাসারের মাঠে ঘটবে রে তোর বিষম দায় ॥[৬৯]

৩২

হে রে দেখলাম আমি ভবের পরে
কি মজার এক আজব কারখানা
ওরে বলছে ফকির জেন্দার আলী
সভায় করি তার বর্ণনা ॥
হে রে বাড়ি আমার
লইলারো গাও পাবনা জেলা
শাহজাদপুর আছে রে ঠিকানা
আমি মিথ্যা বলবো না
একটি কতা জিজ্ঞাস করি
বয়াতি ভাঙ্গা ক্যা বলোনা।
হে রে ওযু কইরা নামাজ পড়ে
সকলের তা ঠিক আছে জানা ॥
ওরে যেজন করে ইমামতি
সেই নামাজের সেজদা দেয়না
এ রে সকলি ল্যায় আল্লার নাম
একজন শুধু ক্যানে কথা কয় না
ওস্তাদ মোর ম্যাগা পাগলা
পারে কেবলা বেদ পুরাণ তার আছে জানা
আমার শুনতে মনের বাসনা
খালি মাটিত শুয়া থাকে
হে মানুষ হলো রে কোন জনা ॥
ওরে কেহ পারে ধুয়ার মানে

www.pathagar.com

চাঁদ সভার মাঝে
আমি মামা বলে ডাকবো তারে
বলছি কথা সভায় এসে
হে রে যদি বল মিথ্যা কথা
বাপ হবে তোর মায়ের বেটা
তুমি ছেলে হইব্যা কারে
আমি বলছি কতা সভাতে
বুদ্ধিহারা নিদান গাধা
না বললে ছাড়বো না আজ তোরে ॥[৭০]

৩৩

এ রে ধুয়া বলে যাই ধর্ম রাজ সভায়
আমি সালাম জানাই দশের পায়
বয়াতি একজন ধুয়া জারি গায়
আমি সবর, রাজার জয়ান পশমেরই যোগ্য লয়
বস বয়াতিক নিন্দা করে সবায়
বস বয়াতিক নিন্দা করে
তা শুনে বাচি না লজ্জায় ॥
এ রে কোথায় রে তোর রাম নামের ধনি
আবার কুনে ব্যাঙের ঘ্যানঘ্যানি
কাইয়াক নিন্দায় খঞ্জন খঞ্জানি।
ওরে জুনি পোকা মানিক নিন্দায়
দ্যাখায় বাঘের জিলকানি
সাপের কাছে ব্যাঙের লাচুনি
রাজ-রাণীকে নিন্দা করে
ঢুইলা বাড়ির বিব্‌দা ফোকিন্নি ॥
এ রে সাগর নিন্দায় পাগাইড়্যা পানি
ঝাঝুর নিন্দা করে খই চালুনি
জারের নিন্দা মাইট্যা বদনা শুনি
রাজ-রাণীকে নিন্দা করে
ঢুইলা বাড়িরও ফোকিন্নি
খসখইশা ব্যাঙ কয় রূপ আছে মনি
চিকা গাদিক নিন্দা করে
যমন সে আতর গোলাপ পানি ॥
এ রে যোগ্যের ঘি তো কুত্তায় চাটে
আবার বিলাই বসে বাদশার খাটে
ফরাশের পাড় ছাগলে হাটে

www.pathagar.com

এ রে এই রকমেই তোমার স্বভাব
বসবে অতি নিকটেরে
চোর যায়া বসলো জজ কোর্টে
বিড়ালকে ধরিতে ইদুর
সবাইকে জেলে দিতে পুতে ॥[৭১]

৩৪
মওলা হাত তুলিলাম তোমার কাছে
বড় আশা করে, হাত তুলি তোমার দরবারে
এ হাত ফিরাইয়ো না ওরে খোদা
মাফ করো আমারে
তোমার আরশের পাল্লা জরায়ে ধরে
কানছি জারে জারে
তোমার নাম খালেক মালেক
কোরানে লেখা আছে
গুণা মাফ করে দেও আমারে ॥
আমি দোয়া দরূদ পাঠ করিয়ে
হাত তুলি তোমার কাছে
গুণা মাফ করে দেও আমায় ॥
এরে এই ছোয়াব পোঁছাইয়ে দিয়ো
নবীজীর রওজায়
ঈমাম হোসেন বংশধর যারা
মরলো পানি বিনে
তাঁদের উপর ছোয়াব পোঁছাইয়ে
যার ছোয়াব পোঁছাইয়ে দিয়ো
সাড়াজাহানের কবরে ॥
এরে নবীর সনে দেখা না করে
মৃত্যু দিয়ো না মোরে
এর আগে মৃত্যু লেখ না ॥
তুমি বেহেস্তের দরজা খোলশা কর
দোযক করো হারাম
বেদায়েতকে হেদায়ায়েত করো
মালেকও সোবহান
বেঈমানকে ঈমান এনে দাও
এক লাখ চব্বিশ হাজার
পয়গাম্বারের এই ছোয়াব পোঁছাইয়ে দেও ॥
ওরে এই আসরের শ্রোতাগণের

www.pathagar.com

মা-বাবা গেছে মরে
এই ছোয়াব পোঁছাইয়ে দেও ॥
তারা এতিম হয়ে পড়ে আছে
একেলা কবরে
হিসাবকালে ওরে আল্লা ত্বরাইয়ো তারে ॥
মূর্খমতি সবুর আলী কয়
আমার গুণা মাফ করে দেও
ওহে আল্লা দয়াময় ॥[৭২]

৩৫

শোনরে মন পাগেলা
তোমারে করি মানা
বদ পথে তুমি চইলো না ॥
এ যে বদ পথেতে গেলেরে মন
খাইবেরে যাতনা
হায়রে মন পাগেলা বুঝে ক্যান বোঝ না
চার কালেমা, নামাজ, রোজা ক্যানে পড় না ॥
এরে শোনরে মন তোরে বলি
তুমি হইবে বাদি, হাসরের মাঠেতে য্যায়ে।
এ যে দেহের মাঝে নয়জন সাক্ষী
খোদার কাছে গিয়ে
আমায় দিয়ে নাফারমানি কাজ ভবে কইরাছে
হস্ত, পদ চোখও তোর মন, সাক্ষী দিবে শেষ দিনে ॥
এরে আমার নাম তালেব আলী
শোন দেহ তোমায় বলি
আমায় জ্যান দিয়ো না ফাঁকি।
এযে হাসরেরও মাঠে যায়া তুমি দিও সাক্ষী
তা না হলে তালেব আলীর ঘটবেরে কোন গতি
লিয়া যাবে দোযকের মাঝে
শোনরে দেহ তোরে বলি, সঙ্গে আমার কে যাবে ॥[৭৩]

৩৬

লায়লাহা ইলাল্লাহু মুহাম্মদ রাসুল
হে দুনিয়ায় আইশ্যা বান্দা সব করিলা ভুল
খোদা তোমার নামেরও মহিমা
ওরে নিরানব্বই নামটি তোমার
কোরানেতে আছে জানা
শুনোরে মালেক রব্বানা

www.pathagar.com

কোন নামে ধইরা ডাকি
পাইনারে ঠিকানা ॥
ডাকি অতি কাতরে, দয়া করিবেন মোরে
তোমার নাম খালেক মালেক
কোরানে তাই আছে।
আল্লা তোমার দোস্ত মুহাম্মদ নবী
উম্মাতের ভার দিলেন তাঁরে
ওরে তাহার মেয়ে মা ফতেমা
জগতেরি হবে রে মা
যখনি হাত বাড়াবে, ফুলসুরাত পাড় করিবে
বান্দাগণ ডাকবে সেদিন মা মা মা
তুমি পাড় কর আমারে ॥
ফেরাউন বাদশা ছিল
খোদায় দাবি সেও করিলো
মুছা নবী তারাইয়া নীল দরিয়ায় নিল ॥
হেরে আপনারি আশা মেরে
সুন্নাতে মোর হয়ে গেল
ওরে ফেরাউন সে নীল দরিয়ায়
আবুডাবু কইরা মরলো
মূর্খ তালেব কইলো
এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বরারের পদধূলি চাইলো ॥[৭৪]

৩৭

ওরে দেশ বিদেশের ভাবটি দেখে
কইয়া যায় মূর্খ তালেব
দেশেতে কি হইলো আমি ভেবে বাচি না
হে রে আমার রাসুলুল্লাহর হাদিস কোরান
শরিয়ত ভাই কেউ মানে না
স্ত্রীলোক থাকবে ঘরে বাহির হইলে
পর পুরুষের মুখ দেখিলে,
ভাইরে কবিরা গুনা লেখে
বেহেস্তে যাওয়ার নাইরে আশা
তা লেখে হাদিস আর কোরানে ॥
হে রে মেয়ে লোক সব পাইলো রাজ্য
বলে যাই দশের পূজারে
ওরে রাস্তা পথে চলে ফেরে
কি চমৎকার শাড়ি পড়ে,
শুনছি সব হাওয়া ভরে গল্প করে

www.pathagar.com

ফিরবো আমরা মটরেতে
মহিলা সিট যেখানে রয়েছে
ড্রাইভারের সনে আলাপ করে
তা দেখলাম মটরে বসিয়ে ॥
হে রে শুনলাম আমি লোকের মুখে
টাউন বন্দরে কি কাজ হইতাছে
এ যে পুরুষ মানুষ বাসায় থাকে
মেয়ে লোক সব বাজার করে
সন্ধ্যাতে রিক্সা চড়ে হাওয়া খাইছে
কয়জনা ভাই ভাড়া খাটে
রাত ল্যায় চুক্তি করে টাকা দিয়ে
এ কথা আজ বলবো কারে
শরিয়ত সব দিলো ভাই ডুবাইয়ে
মেয়ে লোক সব হলো পুলিশ
তা আমি শুনলাম লোকের মুখে ॥
বাংলায় কলমের চল হলো বেশি
কলম দিয়ে মানুষ মারতেছে
এ যে বাংলার সরকার সাহায্য করে
গরিব নাচারকে বাঁচাইতে
মেম্বর কয় সিটের যারা এমপি তারা
তারা খায় ভাই ভাগ করিয়ে
গ্রামের প্রধান যারা খাইছে তারা
গরিবের হয় দফাসারা
ঘুষখোর আছেরে চৌদ্দ আনা
টাকা না হলে কথা কয় না
পাবলিকের হলো কি যন্ত্রণা ॥[৭৫]

৩৮

ইস্রাফিল ফুকাইবে সিঙ্গা
দুনিয়ায় কেউতো রবে না ॥
এ যে দুর্গ জুরে রব উঠিবে
সারা দুনিয়া জুড়ে
তোর গাছ, বৃক্ষ, পশু পঙ্খি, মানুষ
যাবে ভাই মইর‍্যা ॥
চল্লিশ দিনও এই রব থাকবে
কোরানে লেখা আছে সেদিন
এই দুনিয়া রবে না ॥

www.pathagar.com

হে রে নিরাকারও হয়ে যাবে
খোদা তায়ালা জিজ্ঞাস করে
আজরাইল ফেরেস্তার কাছে ॥[৭৬]

৩৯

এরে হাদিস কোরানের কথা
শুইনা ভাই লাগে ব্যাথ্যা
এ মানুষ মরে কেমনে ॥
যেদিন আজরাইল আসিয়া তোমার জান লিবে টানিয়ে
মনে কর মানুষ বুঝি গিয়াছে মরিয়ে
মরে না ভাই থাকে বেহুসে
ও তার ওঠা বসা জবানটি তার না থাকে ॥
ভাইরে বাপ মা তোমার কান্দে বসে
মেরতা তাই শুনতে পারে
জবাব না দিতে পারে ॥
এ যে তিনজনা ধরিয়া যখন ঘড়ের বাহির করে
মেরতা বলে বাপ মাও আমায় কোথায় নিয়ে যাবে।
ওযু গোসল যখন করাবে
মেরতা বলে, বাপ মাও আমায় নিয়ে যাবে ঘরেতে ॥
হায়রে তোমায় যখন খাটে নিবে
কাফনো গায় পড়াবে
মেরতা তখন বলে কি?
এ যে আহারে দরদের বাপ মা আমারে ছাড়িলি
জানাজাতে খাড়া হলো যত সব মুসুলি
তোমার জানাজা শেষ হইয়া গেলে
চারজনা কান্দে লইবে সেদিন লায়লাহা কালমা পড়ে ॥
হায়রে মেরতা তখন চিন্তা করে
এরাই মোর সঙ্গে যাবে
যাবে সে কবরের মাঝে ॥
এ যে তিনজনা ধরিয়া যখন শোয়াইবে গোড়ে
মেরতা বলে এই তিনজন মোর সঙ্গের সাথী হবে।
উপরে চাঙ্গারি দিয়ে তিনজনা উঠবেরে
তখন মেরতা কাদবে রে যারে যারে ॥
এরে মূর্খমতি তালেব বলে
শোনরে ভাই সকলে
ওস্তাদে বলে আমায় কি?
এ যে হাদিস কোরানের কথা তোমার কাছে বলি

www.pathagar.com

মেরতাক যখন গোড়ে থুবে তাহার উপায় কি
মাটি তখন কি কাজ করিবে
দুই মুরা চাপা দিয়ে তোমার ভাইঙ্গা দিবে হাড়গুলি ॥[৭৭]

৪০

ওরে নীল দরিয়ার মাটি দিয়ে
আদমকে সৃষ্টি করিল।
ওরে আদমেরি কলবের ভিতর রূহ্ দান করিল
খোদার কাছে রূহ্ তখন কান্দিতে লাগিল
এমনও অন্ধকার রাস্তায়
আল্লা আমায় কেন পাঠাইলো ॥
ওরে আল্লা বলে শোন রূহ্ তুমি ঠিক হয়া থেকো
ওরে যেদিন আমি আজরাইলকে পাঠাইয়ে দিবো
সেইদিন আমার কাছে চলিয়া আসিও
সেইদিন তোমার ছুটি হইবে
আইশ্যা সদর খানায় থাকিও ॥
ওরে সদর খানায় থাকো পাখি
মূর্খ ওহেদ আলী কয়
ওরে কখন জানি যাবে পাখি আমারে ছাড়িয়ে
দিন থাকিতে তওবা পড়িও
নইলে হাসরের মাঠে ঘটবে রে তোর বিষম দায় ॥[৭৮]

৪১

এরে এক কথা পড়লো মনে
ভাবি তাই রাত্র দিনে
যখন লংকা পুইড়া যায়।
এরে লংকা পুইড়া যা হনুমান
রাম রাজারে ডাইকা কয়
লম্ফ দিয়ে উঠবোরে তোর
ডালিম গাছের আগায়
দুইটা ডালিম টানিয়া ছিড়বো
ওহে রাবণ রাজা রে তুই
মরবিরে পুড়নির জ্বালায়।
এরে আমার নাম বীর হনুমান
আমার তো ডাকা বাজি খান
ডালিম না পাড়লে ছারবো না।
এরে দুই হাত দিয়া ডালিম ছিড়ে
লিয়া যাব অযোধ্যায়

www.pathagar.com

টানের চোটে ডালিম ফাটে
জহির উদ্দি তাই কয়
মুখ ভরিয়া মুতিয়া দিবো
ওহে রাবণ রাজারে তুই
ধোক্কে ধোক্কে গিলা খায়।
এরে তোমার নাম রাবণ রাজা
তুমি তো বড় গাধা
খাইলারে হনুমানের পানি।
পানি বিনা মুখ খুলিয়া কর টানাটানি
জহির উদ্দি কয় কথা মিথ্যা লয়
পুরানে তাই শুনি
ওস্তাদ আমার রাজলক্ষ্মি ভাই
আমি তার জবানে এই শুনি ॥[৭৯]

৪২

শোন শোন মা বোনেরা ঘুমাইওনা আর
সেহরি পাকের সময় হলো উঠনা এবার ॥
নামাজ পড় রোজা কইরো, পাক কোরানের বাণী ধর ॥
আল্লা পাকের জিকির কইরো বইসা নিরালয়
পশু পাখি জেগে করে জিকিরও আল্লার ॥
নামাজ পড় পাঞ্জেগানা, গুনাহর কাজ কেউ কইরোনা ॥
হালাল খেয়ে রোজা কইরো, হারাম খাইওনা
মুমিন বান্দা সদাই করে জিকিরও আল্লার ॥
কোরআন পইরো, পর্দা কইরো, পরের গিবত না করিও ॥
জুলুম অন্যায় যাহাই করো হিসাব হবে তার
কবর মাঝে শাস্তি দিবে ফেরেস্তা আল্লার ॥
শোন যত মা ভগ্নিগণ, স্বামীকে করিবে যতন ॥
সেবা যত্নে দিয়োগো মন, ভুলিও না আর
স্বামী সেবার হিসাব হবে হাশরও মাঝার ॥
এই সংসারের মায়ায় পড়ি, নামাজ রোজা যেওনা ভুলি ॥
ঝগড়া ফ্যাসাদ যতই করবি, কঠিন শাস্তি তার
পাপী বান্দার যাইতে হবে দোযখও মাঝার ॥
তওবা করে ক্ষমা চাইবি, আল্লাতায়ালার করুনা পাবি ॥
নুর নবীর তরিকায় চললে, শাফায়াত পাবি তার
নিজ জমিনে পার করিবে জান্নাতও মাঝার ॥[৮০]

www.pathagar.com

৪৩

শোনলো বিন্দাধৃতি গাবত সম্প্রতি ভারতও পুরাণও জানা
আমি জগত হরির নামটি ধরি ভক্তি করে পুরাই বাসনা।
দুই বাগের উদরে জন্ম দেখলো দেখ জন্ম করিলাম গ্রহণা
কংস নামে এক রাজা ছিল ভাগ্নেকুল তার বিনাস হলো দৈবাগিনী প্রাণ বাঁচে না।
আমি কংস রাজার ভগ্নি হয়ে পুত্র পালন করতে পারলাম না
হায় ! হায় ! কংস জ্বালায় প্রাণতো বাঁচে না।
মনের কষ্টে দৈবাগিনী কানছে হরি হরি বলে
কংস পণ্ডিত ছিল ভাগ্নি কূল বিনাস হলো দৈবাগিনীর প্রাণ বাঁচে না।
কংস রাজা জানতে পারলে নিয়ে যাবে সে জম রাজার ঘরে
দেখলো দেখ কংস পেলে ছাড়বে না।
যে যাহা আসা করে হরি তা পূর্ণ করে বইসা শোনেন এই দশজনা
আমাবস্যা প্রতিবাদে মেঘ তুফানে করিল ঘটনা।
কৃষ্ণ জখিলো তা কংস জানে না
মনের কষ্টে দৈবাগিনী দেখলো দেখ কানছে হরি হরি বলে।
তাই বলছে খলিল উদ্দিন যে কথা জিজ্ঞাসিনী সংকটে কই প্রকাশ করে
কংস রাজা জানতে পারলে নিয়ে যাবে সে জোম রাজার ঘরে।
মা বোল বলতে পারিনা কংসীর ডরে
পিতার নামটি বসুদেব শোনলো শোন ধৃতি বলি যে তারে।[৮১]

৪৪

আমি হারায়ে এ জীবনে আর কি দেখা পাবো তারে
আগে না জানিয়া ভুল করেছি তোমারে নাহি চিনে।
বাড়ির ধারে বাবলা তলা বাঁজাও বাঁশি দুপুর বেলা
আমার প্রাণে লাগে ধোলা ধোলা
তোমার কাঞ্চা বাঁশির টানে
হায় আমি হারায়ে এ জীবনে আর কি দেখা পাবো তারে।
দেখে তোমার মুখের হাসি
ওরে বন্ধু গলে পড়লাম প্রেমের ফাঁসি।
আমি হবো বলে প্রাণদাসী তোমার রাঙা চরণে
আমি হারায়ে এ জীবনে আর কি দেখা পাবো তারে।
কাজলা বিলের শাওলা ফুলে গেথে রাখলাম মালা
না আসিলা নিঠুর বন্ধু মালা হলো জ্বালা।
ওরে জ্বালায় জ্বালায় অঙ্গ কালা ঘরে জ্বালা বাইরে জ্বালা
প্রেম জ্বালা বিষম জ্বালা বন্ধু সহেনা আর প্রাণে
আমি হারায়ে এ জীবনে আর কি দেখা পাবো তারে।[৮২]

www.pathagar.com

৪৫

উক্ষুর মনি রথে চলল হায় কৃষ্ণ চললেন মথুরায়
যতসব গুপিগণ রথ ধরে করছো রোদন।
প্রাণনাথ যেওনা কোথায়
ওহে হরি বন বিহারী আমি সাধন করি।
গুপি তাই নয়ন না ফিরায়
নয়ন বলছে কমেলাকি সব সখি দিয়ে ফাঁকি।
কৃষ্ণ চললেন মথুরায়
অরণে আসবে গোপাল কানছে গোপালের গোপালী।
গগনে উপায় কি এখন
ধেনু বস্ত্র বান্ধা রইল আহার করার তার নাইকো মন।
কানছে জনো জোন
কৃষ্ণ বিনা মরি প্রাণে আহার নাই রাত্রো দিনে।
ধরাতে হয় পত্তন
কৃষ্ণপূর্ণ কেমন বৃন্দাবন আমি বলছি বিবরণ।
গাছমূল বৃক্ষ ডালে কানছে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
হয়েছি পরারীই অধীন।
আমার চলে গেছে সুখের দিন আর হবেনা সেদিন
মোগদোম বলে এই গোকূলে যদি নসিবে থাকে আসবে সেই দিন।[৮৩]

৪৬

শোনরে রাধে শোন সত্য যুগের কথা কিছু করি জিজ্ঞাসন
সত্য যুগে সত্য রাখে তুলসী হলো কি কারণ।
কে তোলে মালতির ফুল কে তোরে দিলো জরনম
লেংটা হয়ে স্নান করিলি ও তোর নাই লজ্জা সরম।
রাধে তোর মনের ভাবনা বেশি কমি কথা কিছু আমায় বলোনা
ও তুই লেংটা হয়ে স্নান করিলি করিলি এই না ঘটনা।
ও তোর চেলা মাছে কাম সারিল পাইলা যত যন্ত্রনা
ওর তোর তলপেটেতে দেখ আছে নিশানা।
আমি তো পরের ভিক্ষারী
পার হইতে চাইছো তুমি আইসো পার করি।
যমুনাতে খোপ না গেরে সেই জায়গাতে বাস করি
পার করো পার করো বলে ডাকছো ওলো সুন্দরী
তুমি বসো ডওরা যেতে আমি বাইচ করি।[৮৪]

৪৭

ছকির বলে ঠকোনা মন ভবের বাজারে
কি নিয়ে আছো ভবে কি নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ওরে আসতে কালে করাল দিয়েছিলো
সেই কথা নাই মনে।
কি বলে জবাব দিবে তোমার ঐ মালিকের কাছে
ভবেতে আইসারে মন করো কেনাবেচা।
নিয়ে এলে সব ষোলা আনা
যাবার কালে করলারে মন মহাজনের দেনা।
তুই কি দিয়ে ঋণ শোধ দিবেরে হিসেব নিয়ে রবক্ষানা
হিসাবকালে ঠগবেরে মন সেদিন পাবে না কূল কিনারা।
ভবেতে আইসারে মন করলা ডাকাতি
শয়নে শুয়ে নিদ্রা বলি ছয়চোরা বোমব্যটা।
তোর ঘরে করে মনো চুরি
কে তোমারে দেয় পাহারা তুই কেন নিদ্রা গেলি
এখনওকি তোর ঘুম ভাঙেনা চেয়ে দেখ আখেরের সব হারালি।[৮৫]

৪৮

পরবাসীরে কোন দিনে তোর আসবে গ্রেফতারি।
সেদিন তোমার কেউ রবেনা শুণ্য হবে পুরি
মালেকুল মউত যেদিন কাছেতে আসিবে।
সাত সমুদ্র পানি যত শুকায়ে যাবে
সেদিনেতে প্রাণ পাখি কর মাতাম জারি।
এক পলকে ছাড়তে ভবে ভবের জমিদারি
কোথায় রবে পাকা বাড়ি কোথায় সিংহাসন।
কোথায় রবে সুন্দর পোশাক এ সুন্দর বদন
কোথায় রবে দারা সৃত কোথায় সখের নারী
এক পলকে ছাড়তে হবে ভবের জমিদারি।[৮৬]

৪৯

আজব এক কলের বিল্ডিং গড়ছে বাড়ে তালা
রে মন গড়ছে বাড়ে তালা।
চার রংঙের করে মাটি মাটি করে পড়িপাটি
নিচে তার দুটি খুটি মধ্যে চৌদ্দতালা।
ষোলজন দেয় পাহারা নয় দরজা খোলা আছে
বাতুনী এক দরজাতে বানছে রসের তালা।
ঘরে বাইরে তালা রে মন গড়ছে রসের তালা
পাওয়া হজ্জ নাভিমূলে দুই দিকে পাখা চলে নাসিকাতার খেলা।
ইলেকট্রিকের দুটি বাতি করছে উজালা
সেখানে মন মানুষে বানছে রসের তালা।

www.pathagar.com

গড়ছে বারে তালা
রে মন গড়ছে বারে তালা।
চূড়ায় তাহার তাজাল্লিচিন সহজে চলে বিল্ডিং
হইলে রাত্রে মরলিং সূর্য করে উজালা।
মাঝখানে এক বড়সর তিন দিকে তিন নালা
ছকির বলে গভীর জলে মন পবনের খেলা।
গড়ছে বারে তালা
রে মন গড়ছে বারে তালা।[৮৭]

৫০

আগে মারো ফতের দেশে যদি জাবি
রে মন মারো ফতের দেশে যাবি।
সেই দেশেরও এমনি রীতি গুরুরে করেন ভক্তি
দিবে তোরে আসল মতি নিঘুম ঘরের চাবি।
ঘরের খুললে তালা দেখবি খেলা জ্যোতির্রময় রূপের ছবি
আগে মারো ফতের দেশে যদি জাবি।
রে মন মারো ফতের দেশে যাবি
কলেপের রূপের খনি নাই সেখানে দিন রজনী।
হরদোমে জিকির ধনী কানে শুনতে পাবি
ঘরের খুললে তালা দিখবি খেলা জ্যোতির্ময় রূপের ছবি।
আগে মারো ফতের দেশে যদি জাবি
রে মন মারো ফতের দেশে যাবি।
গুরুকে করিয়া সখা যদি মন যেতে চাও ঢাকা
সর্বময় বন্ধুর দেখা পাবি।
অধম ছকির বলে ভোগ লাগিলে নামের সুধা খাবিরে
আগে মারো ফতের দেশে যদি জাবি
রে মন মারো ফতের দেশে যাবি।[৮৮]

৫১

মনের কথা বইলা ছিলারে সেদিন নদীর কূলে
সেদিন তোমার চরণ ধোয়ালাম আমার দুই নয়নের জলে
সেদিন নদীর কূলে।
বন্ধু আমার নয়নের মাঝি
আমাকে করিলা রাজি তোমার মধুর প্রেম ছলে
কতজনা নিলা পারে আমাকে কেন যাও ফেলে
সেদিন নদীর কূলে।
সাক্ষী আছে গাঙ্গের পানি

www.pathagar.com

ঢেউ খেলে যায় দিন রজনী
চলে ঢেউ উজান আর ভাটী
তুমি মন দিয়ে মন কেড়ে নিলারে
আমায় নিঠুর দাগ লাগাইয়ারে
সেদিন নদীর কূলে।
চাতক রইলো মেঘের আশে
মেঘ বসে অন্য দেশে
আমি রই বন্ধুর আশে
আমার ফুলের মধু রইলো ফুলে
ভ্রমর বিনে যায় শুকিয়েরে বন্ধু
সেদিন নদীর কূলে।
আগে যদি জানতাম আমি
নির্দয় নিষ্ঠুর তুমি
বন্ধু আমায় যাও ভুলে
তোমার দুই চরণ বাধিয়া রাখতামরে
আমার কেশের ঐ চুলে
সেদিন নদীর কূলে।[৮৯]

৫২

আমি কান্দি নদীর কিনারায়
বেলা বয়ে যায়
সেদিন নদীরও কূলে তুমি কথা দিয়েছিলে
ওরে বন্ধু আসিবে বলে
তোমার আশায় আশায় রইলাম চেয়ে
আশা নদীর কিনারায়
বেলা বয়ে যায়।
কতজনায় নিলারে পারে আমি অভক্ত বলে
ওরে বন্ধু আমায় যাও ফেলে
দিনযে গেলো সন্ধ্যা হলো
ভাবতে ভাবতে দিন ফুরায়
কানতে কানতে দিন ফুরায়
বেলা বয়ে যায়।
তোমার মুখেরী বাণী কোনদিন আইবারে তুমি
শোনবো তোমার মধুর বাণী
আমার কানতে কানতে জনম গেলো
নয়ন জলে বুক ভাসাই
বেলা বয়ে যায়।[৯০]

www.pathagar.com

৫৩

যেকথা বললা বিন্দা সজনী
তোমার ধুয়ার জবাব দিয়ে যাই আমি
গুলান দেখে ভয় করি না ও যাদু ধ্বনি
তুমি কলসি কাঙ্কে রঙ্গে চলছাও সই
আছোও যত গুপীণি
তোমার মাইটা কলসি করবো ছ্যাদা
বেজায় যেনো হয়োনা সজনী।
আমারে কাজ্খেতে দিলা খোঁচা
তুমি করলা ভালো ব্যবস্থা
সাবধানে থাকিও কৃষ্ণা পাইবা তার মজা
তুই কি দিয়া দিবি খোঁচালো সই
তোর মাঝখানে দেখি বোচা
দিবি খোঁচা পাবি মজা
শেষে তোর সান্ধাবি গোজা।
আমারে কুকুর বলে গালী দিলে তাই
আমি কুকুর ভালো জিনিস খাই
আমার মতো গোসাই ঠাকুর শ্রী জগতে নাই
তুই ছিকের ওপর ননীর ভাড় থুছুলু
আমি সেইখানেতে মুখ ডুবাই
সেইখানেতে মুখ ডুবাইয়া ননীগুলো আচ্ছামতো খাই।[৯১]

৫৪

ছকির বলে এইনা ঘরে বসত করি আমি
দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই না পাইলাম ঘরামী
যদি ঘরামী পাইতাম সারিয়া নিতাম যত বেশি আমি
ঘরের উঁচু নেওয়াল কোণাকানি।
ঘরের মধ্যে চব্বিশ বাতি সদরওয়ালার খেলা
যেদিন উঠরে পশ্চিমা ঝড় মারবে ভীষণ ঠেলা
সেদিন পড়িয়া রবে এই সাধের ঘর মিছা ধুলার খেলা
কেবল বন্দি রবে সদরওয়ালা।
ঘরের মধ্যে অনেক নদী দেখে প্রাণ কাপে
কত মনমোহনতো জব করতাছে সেই না নদীর ঘাটে
আমি শুনেছি মুর্শিদের মুখে
শুনে পরাণ চুমকে চুমকে ওঠে
আল্লাহ কখনবা নদীর তুফান ওঠে।[৯২]

www.pathagar.com

৫৫

আমি নদীর কূলে বালুর চড়ে একা একা কান্দি হায়
পার করো পাটুনি ভাইরে পার করো আমায়
পুরাণ হাওয়া থেকে থেকে ঢেউ ওঠে মনে বাগে
ভব নদীর তরঙ্গ দেখে প্রাণ কাপে ডরে
মন ধোলে আর প্রাণ ধোলে, ধোলে গাঙ্গের পানি হায়
পার করো পাটুনি ভাইরে পার করো আমায় ।
বেলা নাই মাঝি ভাই ভরা নদীর জল
তোমার করির বদলে দেবো আমার শাড়ির আচল
মাঝি বলে শোনো মনি বোঝাই আমার তরি
তোমায় নেবো না চিনি না কন্যা কোন গাঁয়ের রমনী হয়
পার করো পাটুনি ভাইরে পার করো আমায় ।
আমি ছিলাম খাচার মাঝি তুমি খাচার পাখি
সেদিনকার কথা বুঝি ভুইলা গেছো নাকি
ভুইলো না ভুইলো না রে মাঝি ভুইলো না আমারে হায়
পার করো পাটুনি ভাইরে পার করো আমায় ।[৯৩]

৫৬

যে ধুয়াটি জিজ্ঞাসনা করলি আমারে
ধুয়া বাইন্ধা যাই আমার ধুয়ার অর্থ জিজ্ঞাস করলি আমারে
শোন বলি দেহের কলিরে
আছে মিছু ডুম্বর গাছ তলে
সেইখানেতে চোখ মাঞ্জুন হয়
ত্রিভুবন দেখেন সকলে।
৩৬০ জোড়ারে ভাই তিরপিনি
তার রগে রগে আছে হাইতানি
আফোর জ্বালায়ে বসে আছে কামার গুণমণি
তার রগে রগে উঠতাছে ধুমা
সূর্য জোগায় তার পানি ওরে
সারদ হয়ে কল চলছে
মস্তকে বসে মহামনি।
আমি যেভাবেতে মায়ের পেটে জনম নিলাম
সাগরের জলে ভেসে বেড়ালাম
অর্থ মধু খাইয়া মায়ের জীবন বাঁচালাম
আমি দক্ষিণ শিউরে শুয়ে যে ছিলাম
ভূমস্তে পড়িয়া আগে আজরাঈলের মুখ দেখেছিলাম।
আজরাঈলে হাত ধরিয়া থুয়া যায়

www.pathagar.com

থাকো ছকির থুইয়া গেলাম তোমায়
আবার এসে নিয়া যাবো সেই বেলা ডোবার সময়
তুমি তাই ভেবে করো কেনাবেচা
তুমি ঠগ বাজারে ঠইকো না
ঠগ ব্যাটারা বড় ঠ্যাটা
কাইরা নিবে পথের ষোল আনা।[৯৪]

৫৭

আমার এ দেহ তরি গড়াইছে কোন মিস্ত্রি
তাই বলো ও ভাই বয়াতি
মিস্ত্রি কোথায় পেলো হাতুর বাটাল
কোথায় পাইলো জাত দড়ি
বিনে চানকায় সাইর মিলাইয়াছে ছুতোর গুণোমণি।
আমার এ দেহ তরি চালায় কয়জনা
ঐ তরি চালায় আবার কেন চালায় না
কোনজনা বান হাল ধইরা রয়
দাড়টেনে দেয় কয়জনা
কোনজনা বান গুণ টাইনা যায়
পাল বাদাম উড়ায় কয়জনা।
আমার এ দেহ তরি হয়ে গেছে কমজুরি
বান চয়ায়ে ওঠে জল এসে গেছে খোজতালি
মিস্ত্রির নাগাল পাইতাল সারিয়া নিতাম
যত আছে খোঁজতালি
অধম ছকির বলে পড়িয়া পাকে
কখন বান ডোবে তরি।[৯৫]

৫৮

আমার এই ভবেতে নাইরে আপন আর
আমি যারে বলি আপনারে আপন
সেই হলো মোর বেশি পর
আমার এই ভবেতে নাইরে আপন আর ।
আপন ছিল আমার পিতা
মুখের আহার দিতো খাওয়াইরে
সে মোরে ছাড়িয়া গেলো
আর কি দেখা পাবো তার
আমার এই ভবেতে নাইরে আপন আর।
আপন ছিল মা জননী

www.pathagar.com

১০ মাস ১০দিন গর্ভে রাখলেন তিনি রে
সে মোরে ছাড়িয়া গেলো
আর কি দেখা পাবো তার
আমার এই ভবেতে নাইরে আপন আর।
আপন ছিল প্রাণ পাখি
কত যত্ন করিয়া রাখিরে
খাঁচা ছাড়িয়া চলিয়া গেলো
পাখিকি খাঁচায় আসবে আর
আমার এই ভবেতে নাইরে আপন আর।[৯৬]

৫৯

শোন ভাই নাট মন্দির ঘরের নাম
সে ঘর আট কুঠুরি আঠোর মোকাম
চোখ চলে না ঘরের মধ্যে মন মানুষ করে আরাম
চালের ছাউনি ঘর উজানি কি ঘরামির কাম
দিন থাকিতে হও হুশিয়ার সার করো ঘরামির নাম।
সে ঘর বাতাস এলে পরে না
ঘরের মধ্যে বলছে রব্বানা
জলের মধ্যে জ্বলছে বাতি আজব ঘটনা
ঘুম আসিলে বাতাসে মেশে
সেও বাতি নেভে না
সে বাতি নিভিয়ে গেলে
মন মানুষ আর ঘরে রবে না।
সে ঘর এখনও নতুন আছে
ছকির উদ্দিন তাই রাত দিন ভাবতাছে
অমূল্য ধন বোঝাই আছে সেই ঘরের মাঝে
সে ঘর জল ছিটালে নেয় না পানি রে
মটকাতে আটকানো আছে
আমি রিপুর আসে রইলাম বসে
গেলাম না ঘরামীর কাছে।[৯৭]

৬০

চল চল চলরে ভাই প্রেমের হাটে যাই
দোকান পসার সারি সারি গায়েক মেলে নাই
চল চল চলরে ভাই প্রেমের হাটে যাই।
ভক্তি করে কিছু যদি কিনতে চাও

www.pathagar.com

মুর্শিদেরই বাজারে গিয়ে ভালো মন্দ বেছে নেও
সেই বাজারে ছয়টি চোরা ব্যবসা তাদের পকেট মারা
সুযোগ পেলে করবে সারা সাবধানেতে থাকা চাই
চল চল চলরে ভাই প্রেমের হাটে যাই।
সেই বাজারের দক্ষিণ পাশে আছে একটি মিনাবাজার
মাইয়া মাইয়া বেঁচাকেনা পুরুষের নাই অধিকার
সেই বাজারে যেতে হলে জীবন্ত হতে হবে
ভাবুক না হলে সেই বাজারে যেতে দিবে নাই
চল চল চলরে ভাই প্রেমের হাটে যাই।
মনাকান্ত এজাদ্দার জ্ঞানবাবু হয় চৌকিদার
নিক্তির কাঁটা ঠিক রেখেছে চিন্তামনি আড়তদার
করলে তাদের সঙ্গে ভালোবাসা চোরারা পাবে না দিশা
ছকির বলে রং কি শীষা ছাঁটাই করো তাই
চল চল চলরে ভাই প্রেমের হাটে যাই।[৯৮]

৬১

পলকে পলকে বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে
আগে না জানিয়া ভুল করেছি তোমারে নাহি চিনে
কি কথা কইয়া ছিলে ওরে বন্ধু হিজলতলী বইয়া
সেদিন হতে তুষের আগুন জ্বলে রইয়া রইয়া
বুক ফোটে মোর মুখ ফোটে না
ওরে বন্ধু সহেনা আর প্রাণে
পলকে পলকে বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।
তোমার প্রেমের আগুন দিয়া আমার দেহ দিলে পোড়াইয়া
আমি তোমার আত্ম হইয়া দেখা দিও নির্জনে
পলকে পলকে বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।
তুমি আমার আমি তোমার ওরে বন্ধু হইতে যেন পারি
তুচ্ছ আমার সাত রাজার ধন সাজিবো ভিক্ষারী
অধম ছকির বলে রাখবো তোমায় হৃদয়ের কোণে
পলকে পলকে বন্ধু তোমার কথা মনে পড়ে।[৯৯]

৬২

জটিলা কয় শোনো শোনো রাধে
সন্ধ্যা বেলা যাও নদীর ঘাটে
প্রেম করেছো যমুনার ঘাটে
জলের মধ্যে কলের খেলা খেলতাছাও মনোরাগে
নন্দের ব্যাটা গোপালের সাথে

www.pathagar.com

কুল মজালী ও কলঙ্কীনি ও সেই রাখালের সাথে।
জটিলা কয় শোনো শোনো রাধে
তুমি সন্ধ্যাবেলা যাও জলের ঘাটে
জলের ঝারি গামছা নেও হাতে
নন্দের ব্যাটা চিকন কালা
বাঁশি বাঁজায় কদম ডালে
বাঁজে বাঁশি রাধা রাধা বলে
জলের ঝারি গামছা নেও হাতে।
রাধে সখি কান্দিয়া আকুল
গালি দিও না আমার কুল
সত্য মিথ্যা জানে আল্লাহ রাসুল
ফুল তুলিয়া না মাকুল
আমি সূর্য পূজা করি বলে
বনে আনতে গিয়াছিলাম ফুল
নন্দের ব্যাটা চিকন কালা কেড়ে নিলো সব ফুল।[১০০]

৬৩

রাধের দাসী বিন্দা আমার নাম
তুমি চেনোনাহে বাঁকা শ্যাম
সুপথ পথে জানাও হে প্রণাম
কাল আসবে বলে গেছে হরি
তেজ্জ করে ব্রজ দাম
অসাধারণ হয়েছে রাধের নাম
তুমি ছিলা রাখাল হইলা গোপালরে
তোমার অসাধ্য কি কাম।
ও শ্যাম মথুরাতে রাজা হয়েছো
কই কেরানি পায়াছো
আদর করে বামে বসাইয়াছো
তোমার হাতে দেখি অনন্ত বালা
রং এর বসন পড়েছো
আচ্ছা মাজার বাহার দিতেছো
ধরাইয়াছে মোহন বাঁশি শ্যাম।
ও শ্যাম কোথায়রে গেছো
তোমার নাম শুনেছি অবংশিদারী
লজ্জা নাই শ্যাম তোমারি
মামীর প্রেমে মজেছো ভারি
যেদিন উদ খোলাতে জমদা এসে হস্তে দেবে দড়ি

www.pathagar.com

সে সব কথা মনে নাইকো শ্যাম রাজা হয়েছো মধুপুরি
মামীর প্রেমে মজেছো ভারি।[১০১]

৬৪

শোন ভাই কলির কালে অধম সে ছকির বলে
উল্টা বাতাস বইছে এ ভবে
ছোট লোক সব বড় হইলো
মানির মান না রবে
দেওয়ান দরবারে কথা তারা সম্মান তুলে বলে
মানি লোকের না থাকিবে মান
এমন ব্যবহার এসে গেলো কলির কালে।
পরামাণিক প্রধান যারা
তাদের কথা মানে না তারা
তাদের দল হলো ভারি
ময়মুরুব্বীর কথা শুনে না করে বরাজুরী
বিচার আচার কিছু মানে না নিজের শক্তি বলে
থাকবে না ভাই এ গায়ের শক্তি
যেদিন হাসরে ছিড়িটানা দেবে।
ব্যাটা কয় বাপের কাছে তুমিতো মুরুব্বি বটে
আজও তোমার জ্ঞান হলো না
দেওয়ান দরবারে গিয়ে তুমি কথা বলতে পারো না
কথা বললে তোমার কথা কেউতো শোনে না
ছোট্ট করে নিষেধ করলাম
তুমি দেওয়ান দরবারে আর যেও না।
আমি দরবারে গেলে সর্বলোকে আমায় মানে
আমার জায়গা উচ্চাসনে
আমার ওপর কথা বলার নাই সে দরবারে
আমি যেটা রায় করিবো
শোনে সভার দশজনে।
এক বাপের পাঁচটি পুত্র কেউ খায় ভিন্ন ভিন্ন
বুড়ো বাপ মায়ের হলোরে দুর্গতি
ভালো মন্দ খাচ্ছে তারা পেয়ে দুষ্টুনারী
নারী প্রেমে মত্ত হয়ে পিতা মাতার কথা ভুলে বলি
পিতা মাতা অমূল্য রতন
বুঝবি ভাইরে যেদিন হাসরে হিসাব নিবে।
মাতা পিতা আত্মীয় বন্ধু
তাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ

www.pathagar.com

ধর্ম করে অন্য লোকে সাথে
তারই বাড়ি যাওয়া আসা নিত্য নিত্য করে
গৃহ শত্রু হইয়া দেখো বংশের খারাপ করে
তার প্রমাণ লঙ্কা রাবণে
গৃহ শত্রু হইয়া রাবণ রাজার শত্রু নিপাত করে।
নামাজ পড় রোজা রাখো
পিতা মাতার সেবা করো
আখেরে পাইবে আসান
হজরত রসুল বইলা গেছে
কোরআনে আছে প্রমাণ
পিতা মাতার সেবা করলে বেহেস্তে স্থান
না করিলে পিতা মাতার সেবা
আখেরে যাইবা দোজখ জাহান্নাম।[১০২]

৬৫

ভালোবাসা দিয়া বন্ধুরে মনোপ্রাণ হরিয়া
কেনো যাও ভুলিয়া
কুলের কালি করলাম আমিরে
তোমারও লাগিয়া
কেনো যাও ভুলিয়া।
ছিলাম আমি দিন ভিক্ষারী
বানাইলে রাজরানীরে
এখন কেন যাচ্ছো ভুলে রে
কোন দোষ পাইয়া
কেনো যাও ভুলিয়া।
তখনি না বলেছিলে
ভুলিবো না জীবন গেলে
এখন কেন যাচ্ছো ভুলে রে
কার মুখে চাহিয়া
কেনো যাও ভুলিয়া।
আগে যদি জানতাম আমি
তুমি এমন মিথ্যাবাদী
তবে কি হইতাম দাসী রে
মনোপ্রাণ দিয়া
কেনো যাও ভুলিয়া।

www.pathagar.com

নাহি দিয়া বনবাসে
আমাকে না ফেলো মেরে রে
কেমনে সহিবো জ্বালারে
গর্ভবতী হইয়া
কেনো যাও ভুলিয়া।[১০৩]

৬৬

কালা আর বাঁজাইওনা বাঁশির গান
আর শুনাইওনা বাঁশির গান
ব্রজের কালাচান।
কালার বাঁশিটি সাদা
বাঁশি বলে রাধা রাধা
ওরে বাঁশি না মানে বাধা
বাঁশির সুরে মনোহরে
ঘরে রয়না মনোপ্রাণ
ব্রজের কালাচান।
তুমি ব্রজেরি হরি
তোমার নাইরে ঘরবাড়ি
ব্রজের যত গুপী ছিল
হরে নিলো মনো প্রাণ
ব্রজের কালাচান।
তুমি মথুরার রাজা
তোমায় দিবো হে সাজা
ওরে কালা খেলছো কত খেলা
রাধের বুকে প্রেমের বান মারিয়া
কূপজাকে দিয়েছো প্রাণ
ব্রজের কালাচান।[১০৪]

৬৭

নবী গুপ্ত ছিল ব্যাত্য হইলো
জীবতরাবার কারণ করলেন মায়া
মক্কা মদীনায় আসিলো কায়া
সেই নবী নূরেরী পুতুল।
সেই নবী ইসলামের মূল
আকাশে মোহাম্মদ রাসুল
জীবতরাবার কারণ করলেন মায়া
মক্কা মদীনায় আসিলো কায়া।

www.pathagar.com

কুরাইশ বংশে নিয়া জরনম
সিদরাতুল মুনতাহায় গমন
উম্মতের লাগিয়া নবী করলেন দয়া
মক্কা মদীনায় আসিলো কায়া।
উম্মতের লাগিয়া নবী কতই করলেন পায়ারূপী
যেদিন উঠবে তপ্ত রবি
লোভী কামী পাপী তাপী মোহাম্মদে যাবে ডুবী
ছকির বলে কাদরে নবী
ধরিয়া আরশের পায়া
মক্কা মদীনায় আসিলো কায়া।[১০৫]

৬৮

আমার এ দেহতরি বোঝাই ভারি
কখন জানি ডুবে যায়
চলছে তরি আকূল দড়িয়ায়।
মনোরে ঐ তরিতে বোঝাই ছয়জন
হাল ধরেছে মোনাই মাঝি বাদাম দেয় পবন
অনুরাগের জাঙ্গাকাছি মস্তুলের মাথায়
মাঝদড়িয়ায় ডুবলে তরি কি হবে উপায়
চলছে তরি অরূল দড়িয়ায়।
মনোরে লবোলঙ্কো ভার আছে তরিতে আমার
তাই দেখিয়া ছয় ডাকাতে করছে হাহাকার
ডাকাতিরা করতে ডাকাতি আমায় দিলো হানা
মাঝ দড়িয়ায় ডুবলো তরি কি হবে উপায়রে
চলছে তরি অকূল দড়িয়ায়।
মনোরে ভয় করিনা ঝড় তুফানে ছয় ডাকাতের দল
শুধুমাত্র খোদার নামটি আমারি সম্বল
কচুরপাতার পানি যেমন টলোমলো খায়
ছকির বলে সোনার দেহ হইয়া যাবে লয়রে
চলছে তরি অকূল দড়িয়ায়।[১০৬]

৬৯

ওরে রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে আপন ঘরে
রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে।
যেমন তোমার হৃদয় মাঝারে নিজেকে সঙ্গেরে করে
দেখবিরে তুই প্রেম নদীর কিনারে আপন ঘরে
রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে।

www.pathagar.com

লাহুদ নাছুদ মালকুত জমরুদ মোকাম
আরও মোকাম হাউত
খোঁজ মোকাম নাহুদেরি পরে
লামাকানে খুঁজলে তালা
দেখবিরে সেদিন রূপের মেলা
সোনার মানুষ সদয়
ঝলক মারে আপন ঘরে
রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে।
তালা মারছে কালেবেতে
চাবি রয় মুর্শিদের হাতে
মুর্শিদ ছাড়া খুলবি কেমন করে
ঘরে তোমার ভাঙ্গা বেড়া
রিপুতে করলে টেরা
মনের বেড়া লাগাও শক্ত করে আপন ঘরে
রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে।
যে হয়েছে ভাবের মরা
চড় মকছুদ তার বন্ধরে করা
মাসুক বিনা কানছে যারে যারে
যেদিকেতে ঘুড়াই আঁখি
সেইদিকে তোমাকে দেখি
আমি অধম চিনলাম না তোমারে আপন ঘরে
রূপসাগরে ডুবলে পাবি তারে।[১০৭]

৭০

আয় তোরা কে যাবি নবীজীর তরায়
নবী বিনা নাইরে কেহ পাড়েরি বেলায়
কে যাবি নবীজীর তরায়।
শরীয়তের শর্ত ধরো কায়েমি নামাজ কায়েম করো
কেনোরে মন ঘোরো ফেরো শয়তানের দাগায়
কে যাবি নবীজীর তরায়।
শরীয়তের সরল হইয়া তরিকতের তরি ধরিয়া
হকিকতের পড় নামাজ নবীজীর রাস্তায়
তোরা কে যাবি নবীজীর তরায়।
ইন্নামা আকারামাকুম আন্দালাহা আতেকাকুমরে
কোরআনেতেও ফরমাইয়াছে আপে দয়াময়
তোরা কে যাবি নবীজীর তরায়
নবী বিনা নাইরে কেহ পাড়েরি বেলায়
কে যাবি নবীজীর তরায়।[১০৮]

www.pathagar.com

৭১

বলো বিন্দারাই কোনঘাটে কলসি লইয়া যাই
আমি যে ঘাটে যাই সেই ঘাটে পাই নন্দের দুলাল শ্যাম কানাই
কোনঘাটে কলসি লইয়া যাই।
শাশুড়ি ননদী বলে কেনো গেলি তুই জলের ঘাটে
রাখালের সঙ্গে প্রেম করিলি কলংকিনী ওলো রাই
কোনঘাটে কলসি লইয়া যাই।
একাতো যাইনাই ঘাটে পঞ্চসখি ছিল সঙ্গেরে
কদম তলায় বাঁজায়রে বাঁশি কালার বাঁশি শুনতে পাই
কোনঘাটে কলসি লইয়া যাই।[১০৯]

৭২

নবী বিনা কে আছেরে মন
উম্মতের লাগিয়া নবী সব দিয়েছে বিসর্জন
নবী বিনা কে আছেরে মন।
কলেমাতে পাইলো খোদা
সর্বরাজ্যে পাইয়া কোথায়রে
ফকির তোমার ধর্মের খাতা
পৃষ্ঠা করো উত্তোরণ
নবী বিনা কে আছেরে মন।
জিজ্ঞাস করি ফকিরের দাঁড়ে
মরা কাবা কারে বলেরে
কয়ভাগেতে ভিত্তি করে
কোন কালাম হয় উচ্চরণ
নবী বিনা কে আছেরে মন।
উড়াইয়া ধর্মের নিশান
শক্ত করো আপন ঈমানগো
ছকির বলে হইবি হয়রান
যেদিন আসবে কালসমন
নবী বিনা কে আছেরে মন।[১১০]

৭৩

ফকির পাগলামী দেও ছেড়ে
গোল টুপি আর লম্বা জামা
দেখলে তোমার যুথ লাগে না
উঠবে ঝোলা ঘাড়ে
ভেল্কি দিয়া ফকির মিয়া আটকাতে চাও মোরে

www.pathagar.com

শরীয়তের ডাণ্ডা দিয়া ঠাণ্ডা করে দেই তোমারে
পাগলামি দেও ছেড়ে
ফকির পাগলামি দেও ছেড়ে।
আমি দোমের ওপর হইলাম খাড়া
সস্তা নয় মোর তাগবির পড়া
নিরাকারে সিজদা করা নামাজ যখন পড়ে
কেরামিন কাতেবিন রয়েছে দুই ধারে
দেল আসনে বইসা তারা ডানে বায়ে ছালাম ফেরে
পাগলামি দেও ছেড়ে
ফকির পাগলামি দেও ছেড়ে।
আমি ওযু করি নদীর জলে
ময়লা কি আর থাকে দেলে
শুদ্ধমতো ওযু হলে ময়লা যাবে দূরে
যেইমতো ওযু গোসল রাসুলুল্লাহ করে
আমি বলি পবিত্র তেমনিভাবে ওযু করে
পাগলামি দেও ছেড়ে
ফকির পাগলামি দেও ছেড়ে।[১১১]

৭৪

এলো হনুমান করে প্রণাম চললো লংকার ভবনে
হনুমান আমার পরাণের পরাণ
চললো সীতার অন্বেষণে
সেখানে গিয়া দেখলো সীতা নাই সেখানে।
কতো চরিন্দা বরিন্দা মনুষী দেবগণ
রাম রাবনে চলে যায়
রামের ঘরামি যাচ্ছে তিনিরে
সেখানে এক সতিকা পায়
যোগীর মন ঐ অনলো গো
সীতাকে বনে হারায়।
সোনার লক্ষণ কেঁদে কয়
ও প্রাণের ভাই চলো আমরা দেশে যাই
মাতা পিতা তেজ্য করেরে
বনে এসে বনফুল খাই
বিধাতার নাই দয়ামায়াগো
সীতাকে বনে হারাই।[১১২]

www.pathagar.com

৭৫

এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান
যার নাম শুনলে চুমকে ওঠে কেঁদে ওঠে মনোপ্রাণ
এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান।
যাত্রা করে কুফায় যেতে গিয়ে পড়ে কারবালাতে
এইকি নিদারুণ আশ্চর্য নিশান
আরে দিকে সাতদিনের পথ
যেদিকে যাই সেদিকেই বিপদ
গগণভেদী গভীর নিনাদ
চুমকে ওঠে মনোপ্রাণ
এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান।
শক্ত মাটির মধ্যে গেড়ে ঘোড়ার পায়ের খুড়া
হায় হোসেন শব্দ করে উঠলো গগণ জোড়া
হোসেন বলে এইখানে শিবির করো না হও অগ্রসর
কেউ গিয়ে কাষ্ঠ আনো কেউ করো পানির সন্ধান
এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান।
কাষ্ঠ যখন কোপ মারে মরা গাছে রক্ত ঝড়ে
চুমকে ওঠে হোসেনেরও প্রাণ
এইখানে জীবন বিনা নাই কারো পরিত্রাণ
এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান।
ফোরাত নদীতে আছে পানি
তোমার জল কে করিবে পান
মহররমের দশই দিনে একবিন্দু পানি বিনে
আমি বলি ঘাতকগণে বুঝবি তোরা শেষ বেলায়
এইকি নিদারুণ কারবালা ময়দান।[১১৩]

৭৬

ওগো দয়াল মুর্শিদ তুই বিনা আর দরদি মোর নাই
তোমার মতো বান্ধব কেহ খুঁজে নাহি পাই
ওগো দয়াল মুর্শিদ তুই বিনা আর দরদি মোর নাই।
লাভের আশায় ভবের হাটে করলাম শুধু দেনা
কিবা আপন কিবা পর হইলোনা মোর চেনা
এখন আসল নিয়ে টানাটানি কেমনে জীবন বাঁচাই
ওগো দয়াল মুর্শিদ তুই বিনা আর দরদি মোর নাই।
অচেনা সমুদ্রের মাঝে ভাসে আমার নাও
তরি যেনো যায়না ডুবে লেগে ঘূর্ণিবাও
দয়াল লেগে ঘূর্ণিবাও।

www.pathagar.com

তুমি আমার আমি তোমার এইকথা গোপনে
হররহ দিবানিশি জাগে আমার মনে
তুমি বিনা নাইকো মোর গতি
দয়াল দেউ চরণে ঠাঁই
ওগো দয়াল মুর্শিদ তুই বিনা আর দরদি মোর নাই।[১১৪]

৭৭

আপনারে শোনেন সর্বজন আমি করি নিবেদন
নৈরাকার ছিলো যখন সাই নিরঞ্জন
না আছিলো আসমান জমিন
রে না আছিলো ত্রিভূবন
না আছিলো স্বর্গমাত্র না আছিলো আদম ও হায়
না আছিলো স্বর্গমাত্র না আছিলো আদম।
প্রভু থাইকা শয়নে তিনি করেন হে মনে
নুর হইতে মোহাম্মদ পয়দা করেন যতনে
সেই নুরেতে ভূমণ্ডল সৃষ্টির খবর আছে কোরআনে
আদমকে করেছেন পয়দা সেই নুরের গুণে ও হায়
আদমকে করেছেন পয়দা সেই নুরের গুণে।
প্রভু জগত জননী আমি বলছি হে বাণী
পুরুষের গর্ভে স্ত্রীলোক পয়দা কোরআনে শুনি
আদম হইতে মহা আত্মারে লেইখাছে কাদের গনি
নমনিষ্ট শ্রীভুবন তার গর্ভেতে শুনি ও হায়
নমনিষ্ট শ্রীভুবন তার গর্ভেতে শুনি।
প্রভু গুণের মহাজন আমি বলছি সে কারণ
আদমকে পাঠালেন ভবে আবাদের কারণে
আদম হইতে মহা আত্মা সৃষ্টি করেছেন নিরঞ্জন
বাও অঙ্গ হইতে হইলেন মা হাওয়ার পত্তন।
আমি জফের উদ্দিন হায় মিছা জিন্দেগি আমার বিফলে যায়
না জানিয়ে আসিবে সমন আমায় বান্দিয়া নিয়া চলে যায়
দিবা নিশি ভাবছি বসে না দেখিয়া উপায় ও হায়
দিবা নিশি ভাবছি বসে না দেখিয়া উপায়।
এই ভাবে যত আপ্তগণ তারা কেউই নয় আপন
শালা সুমন্দি যত আছে সব মাগী গোনা গোনে যেদিন
জমিদারি ছাইরা যাবেরে সেদিন কেহই না হবে আপন
আদমকে পাঠাইছে ভবে আবাদের কারণে ও হায়
আদমকে পাঠাইছে ভবে আবাদের কারণে।
বলি সেই ধুয়ার মানে বুঝে দেখ নিজ প্রাণে

www.pathagar.com

অর্থ কথা ভেঙ্গে দিলে শুনবে দশ জনে
ধুয়ার জব যদি না দিতে পারোরে তোমার ভাগ্নীরে দিবা দানে
মামা শ্বশুর বলে ডাকবো দশের সামনে ও হায়
মামা শ্বশুর বলে ডাকবো দশের সামনে।[১১৫]

৭৮
এক কথা শাস্ত্ররেতে পাই
ডিম্বরূপে দুনিয়া পয়দা করছে মালেক সাই
প্রথমেতে আদম পয়দা জানতে কিছু বাকি নাই
তার পরে মানুষের পয়দা সদয় মনে ভাবছি তাই
বিধির অপর মহিমা নীলা বোঝার সাধ্য নাই।
এখানে ভুল পড়লো কথা প্রথমে আল্লার ছয় লক্ষ ফেরেশতা
তারাই ছিল বন্দেগিতে সদয় বলতো আল্লা আল্লা
সেই ফেরেশতা মাটি ছেনে আদমকে করলো পয়দা
তার ধরে জান দিয়েছে সৃষ্টিকর্তা।
জান ধরে প্রবেশ করিল ফেরেশতারা যত ছিলো তারা সেজদা দিলো
মরহোম নামে এক ফেরেশতা সেই নাকি সেজদা দিলো না
আল্লার হুকুম রদ করিয়া সেই বেটা শয়তান হইলো।
সেই বেটা করে কান্দাকাটি নাফরমানি কাজ করিয়া হলাম দোযগি
বন্দেগি যে কইরাছিলাম নামাজের দেও মজুরি
আল্লা আমায় দান করেছে যা মনে হয় তাই করতে পার।[১১৬]

৭৯
ওকি ভাইরে দেহতত্ত্বের ধুয়া গান একটা বলে যাই
শোনরে বয়াতি ভাই দ্বীন দুনিয়ার ভরসা কিছু নাই
এ দুনিয়া আখের ছানা হয় রাব্বানা
আমি অতি কোরআনে তাই দেখতে পাই।
এ দুনিয়া বসতরে মিছা ফাঁকি
যেদিন বুঝবারে দুই আঁখি
ছেড়ে যাবে পিঞ্জিরার পাখি
খালি খাঁচা পইরা রবে কোথায় বান রবে সাঝের ঘরবাড়ি।
আজরাইল বাইন্দা নিবে কেহই না হবে তোর সঙ্গের সাথী।
এ দুনিয়া বসত রে সব কুয়াকার
ছিল যখন নৈরাকার
চলে আইলে দুনিয়ার মাজার
অন্ধকার ধন্দকার ছাড়িয়া গেলো তোমার কোয়াকার
কি বলে জবাব দিবা ও সেই কবরের মাজার।[১১৭]

www.pathagar.com

৮০

ওকি ভাইরে দেহতত্ত্বের ধুয়া গান আরেকখান বলে যাই
শোনরে বয়াতি ভাই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই
তোমার দেহের মধ্যে কোরআন শরিফ
কোন জগতে সৃষ্টি করেছে মালেক সাই।
কয় হরফে দেহ পয়দা না বললে ছাড়া ছাড়ি নাই।
প্রথম জন্ম নিলাম বাপের মস্তকের
সেই খান থেকে মনি হয়ে জলে ভাসী মায়ের শেকড়ে
দশমাস দশদিন ভাসলাম জলে
রক্ত মাংস জমা হয়ে রই তাতে
একশ বিশ দিন পরে দেখো আমার জান দিছে ধরে।
ওকি ভাইরে দেহ দরিয়া মহাআত্মা রয়
ও দেখ পিতার আসন সেই জায়গায়
চারটা চন্দ্র করছে আলোময়
কত মনি মহাজন পড়ছে কোরআন
বইসা থেকে জব করতাছে সর্বদায়
যেদিন চন্দ্র ডুবে যাবে ভবেতে দেখবি অন্ধকার।[১১৮]

৮১

১৩৪৫ সন শোনেন কথার বিবরণ
আজব এক রং হইলো গঠন
আমসরা গ্রামে ঘর নাম তাহার হালিমা খাতুন
ওরে ছয়জন রিপু সঙ্গে নিয়ে প্রাণপতির বধ করে জীবন।
মাহামরে প্রাণে মেরে রিপুগণসব হুতাশ হয়ে
এ লাশ রাখবো কোথায় বলো
বাড়ির দক্ষিণ দিঘী ছিল
তাহার মাঝে কাটা ছিল
ওরে সেই জায়গাতে রাখোগা পতিরে
এ নিশি প্রভাত হইলো।
তিনদিন পরে লাশ ভাসিলো
শিয়াল আর শকুনে খাইলো
সংবাদ পেয়ে যায় হালিমা
মাহাম যে জায়গায় ছিল
ওরে রোদন করে কাঁনছে বসে
আমার এ পতিরে কে মারলো।
বেগমপুরের বেলাত আলী
হালিমা হয় তার ধর্মবেটি

www.pathagar.com

হালিমাকে কোলে তুলে নিলো
ওরে আর কান্দোনা ও হালিমা
থানাতে এজাহার লেখো
আরে আসবে পুলিশ করিবে গুন্দিশ
তোমার এ পতিকে কে মারলো।
হানেফ আর তালেপ আলী
এরাই দুইজন মারছে বলি
দারোগা নাম লিখে নিল
ওরে ধুয়া বান্ধে কয় আছের আলী
ঘোষগাতী তাহার বাড়ি
এমন যে বেহায়া আওরত
প্রাণপতির গলায় দেয় ছুরি।[১১৯]

৮২

নৌদার চাঁদ মানুষ ছিল
কোন দোষে কুমির হইলো
শোকে তাহার মা হইলো পাগল
বল দেখিরে নৌদার চাঁদরে
তোকে কে শিখাইলো এ মন্ত্র
বাড়ি কোন শহর।
ওরে কোন ওস্তাদের শিক্ষা নিয়ে
তুই আমারে করলিরে পাগল
প্রচারে গিয়ে নৌদা মন্ত্র শিখাছে
অর্থকথা বলা যায় না আওরতের কাছে
সেই জন্য নৌদার চাঁদ কুমির হয়েছে
নৌদার চাঁদ আছে কোথায় ভাই ভাই
আছে পাচুটার বাঁকে
তা শুনিয়া ওস্তাদ এলো
গাঙ্গেতে জাল ফালাইলো
নৌদাকে তোলে ডাঙ্গার পার
ওরে ঝাড় ফুঁক পানি পড়া
ও তার সামনের দিকে মানুষ আছে
আমি কই দশজনের কাছে
ওরে পিছের দিকে কুমিরের ধ্বজা
তা শুনিয়া ওস্তাদ বলে কাঁচা মাছে খেয়েছে।
নৌদার চাঁদ বনে কান্দে কয় ভাই ভাই
তোর এই ছিল দশা

www.pathagar.com

ফুরাক তোর জীবনের আশা
ওরে কোন ওস্তাদের মন্ত্র শিখে
আবার মানুষের কুল হারালু
ওস্তাদজি ঘাটে ঘাটে ভেসে বেড়ালু।[১২০]

৮৩

নতুন ধুয়া চানশোবাতে কি বলিবো আর
১২ হাত ছেলের দেড় হাত দাঁড়ি কে দেখেছাও ভবের পর
বছর অন্তর একটি সন্তান কেবল হয় তাহার
শাস্ত্রতে তা পাওয়া যায় না বয়াতির গল্প করা সার।
আরেকটি শকসো দেখি ভবেব পার
ছেলে হলে মাথা মরে শুনতে পাই গুরুর কাছে
আরেকটি শকসো রে ভাই সোয়াশো পা তার আছে
মাথার ওপর দুইটি শিং বিধি দিয়েছেন
গা দিয়া তার চেংটা গন্ধ জন্ম তার উড়ে বাতাসে।
আরেকটি শকসো রে ভাই দেখি ভবের পর
আগা পাছা নাইকো ধজা পাকড়ি বান্ধা মাথার ওপর
মধ্যে লায়ে কপাট মাইরা বসে আছে সওদাগর
নিচে কুঠুরি করা দেইখা ভয় পায়
এ শকসো কি বয়াতি চান সবাই
জবাব দেও আমায়।[১২১]

৮৪

জয়নাল কান্দে কান্দে কয় শোনেন দাদী মহাশয়
বান্দির বাচ্চা এজিদ গোলাম ধরে নেয় আমায়
দারুণ এজিদ ধরে নিয়ে মারিবে কুফায়।
কুলসুম সালেমা বলে জয়নাল তোরে কোলে
সময় চিনে আসো রে জয়নাল কাফেরের দলে
ইহার প্রতিশোধ নিবে মোহাম্মদ হানিফা আসলে।
মরলো বাপ আর চাচাজি আরও মরলো ভাই কাশেম আলী
আলী মরলো আজগর মরলো, মরলো সিপাই কতজন
আমি জয়নাল মরলে পরে ও হানিফ এসে করবে কি।[১২২]

৮৫

ভাইরে ভাই কলির শেষে রাত্রদিন ভাবছি বসে
শয়তানের দল হয়েছে ভাড়ি
পুরুষ লোককে নিবে দোজখে যত আওড়ত নারী

www.pathagar.com

অন্দরে থাকে না তারা ফেরে বাড়ি বাড়ি
রাত্রদিনে ঝগড়া ফ্যাসাদ করে তারা
করে না তারা স্বামীর তাবেদারি।
এক ছিল দুষ্টু নারী তারা তো কুলোহারি
পর পুরুষের আশা করে ভারি
ইহার সাজা নিবে আল্লাহ যেদিন নেয় কবরে
ফারাস দিয়ে চোখ খসাবে
জিবহা টেনে নিয়ে আটকাবে ঘাড়ের পরে।
পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড় স্বামীকে ভক্তি করো
৩০টি রোজা যেন ছেড়ো না
স্বামীর বিনা হুকুমে বাইরে গেলে হয় কবিরা গুণাহ
শীঘ্র করে স্বামীর সেবা করো
নইলে হাসরের মাঠে দিবেরে তোকে ছিড়িটানা।
এক ছিল আইয়ুব নবী তার প্রেমে রহিমা বিবি
তিনি তো স্বামীর সেবা করেন
ঘা হইলো পোকা পড়িলো তবু নাহি ছাড়ে
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে পতির সেবা করে
ধন্য ধন্য ওয়াহেদ আলী কয়
এমন নারী কে দেখেছাও ভবের পর।[১২৩]

৮৬

ভবের পর এক সতী নারী পয়দা হয়েছে
৪ দশকে ৪০দিনে বিয়ে হলো তার এই ভবে
৬ মাসের গর্ভরে ভাই সেইনা নারীর উদরে
তবুও নারী সতী নাম ধরে
পতি নিয়ে হচ্ছে গর্ব কে তাকে অসতী বলে।
সেইনা নারী পুরুষের ভাই মানুষ মন্দ না
দিনে খাটে ভূতের ব্যাগার রাত্রে ওদের স্বামী হয়
অধম মফিজ বলে শোনো ব্যাটা পণ্ডিতি করো সদয়
যেমন কানছা ছেলে মায়ের কোলে দুগ্ধ খায়
ঐরকম আওরতের কোলে পুরুষের রজনী পোহায়।
তাও যদি না বোঝ যত আদম ভূত
স্বামী হইয়া পেটে গিয়া ভবে আসে খায়না দুধ
না মরদা মরদ যারা তারাই বুঝবে উল্টা বুঝ
মাগীর জন্য খাটতে খাটতে পিঠ দিয়ে বাড়ায় কুচ
মায়া জালে মত্ত হয়ে পরকাল হারাচ্ছে তাবুত।[১২৪]

www.pathagar.com

৮৭

ঈমাম হোসেন গেলো কারবালার রণে
আবার কয়ে গেলো বিবিগণে
জয়নাল বাছাক রেখো সাবধানে
জয়নাল বাছা বনে গেলে ফিরে তো আর আসবে না
নবীর বংশে বাতি আর জ্বলবে না।
কায়া বলে হোসেন গেলো রে রণে
আবার দেখিলো যত কাফেরে
ওরে মার মার বলে হোসেন রণ দিলো শুরু করে
কাটলো কাফের হাজারে হাজারে।
ওরে কাটলো হোসেন কাফের সর্দার
ফোরাত নদী করলো উদ্ধার
পানি খাইতে গেলোরে হোসেন দরিয়ায়
বিসমিল্লাহ বলে হোসেন চউলে পানি তোলে
পানির দিকে দৃষ্টি করে ভাবে মনে মনে
পানি বিনা সব গেছে মারা
একা খাবো না পানি বলে পানি দেয় ছেড়ে।
হোসেন যখন পানি দেয় ছেড়ে
আবার দেখিলো এজিদও মারা যায়নে
ফের ফিরিলো হোসেন শাহাবে
কত হাজার হাজার তীর ছাড়িল তীর গেলো ডানে বামে
সিমারের তীর এসে লাগলো হোসেনের গর্দানে
সিমারের তীর খাইয়ারে হোসেন ও ঢোলে পড়লো জমিনে।[১২৫]

৮৮

কলির ভাবটি দেখে অবাক হয়েছি
এলোরে বুড়ো মায়ের দূর্গতি
বেটার বউয়ের দুঃখ হলো অতি
শাশুড়ির মাথায় ফেকচা চুল বউয়ের মাথায় তেল চোয়ায়
যেমন ছাই ফেলানোর গবরের টুপরি
ও বউ কাম করে না গাল ফুলায়ে রয়
সে যে ভালো মানুষের ঝি।
ও বউ পান সুপারি আলোপাতা খায়
তিন বেলা পাড়া বেড়ায়
খাওয়ার সময় বাড়াটি ওশায়
এক কাঠা ধান লোটে দিয়া ঢেকির সঙ্গে বাইজ খেলায়
ঢেকি বলে ঢেকলাম ভিষণ দায়

www.pathagar.com

তিন পরান্তে একটি পার দেয়
বউয়ের অলসতা নাই গায়।
বউয়ের স্বামী যখন বাড়িতে আসে
কোলের ছাওয়াল দেয় ফেলে
বিবাদ লাগে শাশুড়ির সাথে
ধান দিলো না সময় মতো
ভাত দেগা তোর বাবাকে
কামের খ্যাতি পড়ে বারিত রয় পড়ে
সিলের গুতোয় দাঁত ভাঙ্গিবোরে
তবেইগা মনের খেদ মেটে।
তার মা কান্দিয়া বেটার কাছে কয়
বাবা একি দুঃখ প্রাণে সয়
তোর সামনে দাঁত ভাঙ্গিবার চায়
আমি নালিশ জানাই ঐ আল্লার দরগায়
বিচার করবেন দয়াময়।[১২৬]

৮৯

আজম বলে ওগো মালেক সাই
তোমার নাম বিনে আর গতি নাই
তোমার নামে ঘুড়িয়া বেড়াই
তোমার নামের এইনা বরকত
কোরআনে তাই শুনতে পাই
দুই হস্তে দুই খঞ্জরী বাঁজাই
অসম্ভব এক কথা শুনে ভেবে বাঁচিনারে আর।
এক পুরুষ এসে জলে নামিলো
আবার ডুব দিয়া কন্যা হলো
সদাগরে ধরিয়া নিলো
বারটি বছরের কালে তিনটি সন্তান তার হলো
ঘুরে কন্যা সেই ঘাটে এলো
সেই ঘাটে কোন শকসো আছে ভাই
বয়াতি তাহার মানে চাই।
পুরুষ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়
মুখে বলছে হায় রে হায়
নাজানিকি হলো রে আমার
পুরুষ হয়ে নামলাম জলে
কন্যা হয়ে উঠলাম লায়
বারবছর খেলাম বাণিজ্যের সদাই

www.pathagar.com

সেই ঘাটে কোন শকসো আছে ভাই
বয়াতি তাহার মানে চাই।[১২৭]

৯০

আজম আলী মূর্খ অতি ধুয়া বাইন্ধে গায়
জগন্নাথপুর গ্রামে একটি খুন হয়েছে ভাই
বউ শাশুড়ি ঝগড়া করে বারি দেয় শাশুড়ির মাথায়
এক বারিতে দফা সারে দেখে তার ধরে জীবন নাই।
সেই কাজটি করেরে বউ ভেবে অস্থির
কি জবাব দেবো আমি নিকটে স্বামীর
স্বামীর আগে কান্দে বলে তালাস করো শাশুড়ির
কলসি নিয়া গেছে ঘাটে এ পর্যন্ত না এলো বাড়ি
তাহার ছেলে ঘোরে ফেরে নদীর কিনারে
নাজানি খাইছে মারে গাঙ্গের কুমিরে
বাপ ভাই সব চলে গেছে অনাথ করে
তুমি মাওজান গেলা চলে আমারে অনাথ করে।
রাত্রনিশিকালে দেখিলো স্বপন
শয়নে বসিয়া মারে করছে তিরোধন
আমার জন্য আর কাদিস না তোমার বউ দিয়েছে বিসর্জন
তখন উঠে ধরিলো কান্দন
কান্দন শুনিয়া বলে তাহার বিবিজান
এতো রাতে কান্দেন বিবি হয়ে পেরেসান
তোমার আমার যেতেই হবে মুখে বলো আল্লার নাম।
ইতোমধ্যে শোনা যায় কুকুরের গোলমাল
গোলমাল শুনিয়া বলে তার বিবিকে
নাজানিকি হলো বাতি লাগাও সকালে
বাতি নিয়া গিয়া দেখে লাশ তুলেছে ওপরে
কি করেছে হারামজাদী আমার মাজানকে ফেলেছে মেরে
হাকিম বেটা বসে আছে আইনের ঘরে
আইন দেখে করবেন বিচার জানবেন সকলে
এই আসামির জেল হবে না দুগ্ধের বালক আছে কোলে
দুগ্ধের বালক মারা গেলে ঠেকিবে আখেরের তরে।
আব্বাছ সর্দারের মেয়ে ছমিরণ তার নাম
মফিজ হলো সঙ্গের সাথী তার সাথে পড়েছে কালাম
শাশুড়ির মাথায় বারি দিয়া দেশজুড়ে হলো বদনাম
এমন কাজটি কেউ করোনা ঠেকিবা দোজখ জাহান্নাম।[১২৮]

www.pathagar.com

৯১

আমি বহু জরনম যার তপস্যা করে
আমার মানব জরনম বৃথায় গেছে
কলিকালে হয়েছিলো বিয়ে পতি মরলো ৬ মাস পরে
যাবো আমরা জুলাপনগরে
এরূপ যৌবন দেখাবো কারে
যৌবন আমার উথলায়ে পরে।
আমার নিকাহ বসিলে মনের দুঃখ ঘোচে
পতি দর্শন পাই কোলে
পুত্র বধুর মুখ দেখিতাম মানুষ করতাম কোলে করে
ভরসা থাকতো মরণকালের
মরণকালে মুখে দিতো পানি হরিণাম দিতো কর্ণমূলে।
আমি শুয়ে থাকি চৌকির ওপরে
কত দুঃখ ওঠে মনে
তুষের আগুন জ্বলে ঘুনে ঘুনে
পতি যদি থাকতো কাছে পান দিতাম তার গাল ভরে
তামাক সাজায়ে দিতাম পতির হাতে
রং বে রং এর কথা কইতাম দুইজন সারা নিশি জেগে।[১২৯]

৯২

ইংরেজ আর জার্মানি বিবাদ করে রাত্রদিনি বিলাত মুল্লুকে
টোপ ছাড়িয়া জাহাজ মারে শোনা যায় গেজেটে
৭টি জাহাজ মারা গেছে শ্মশান নদীর ঘাটে
সুতো লবণ কেরোশিনি না আসতে দিলো
ভারতে আকাল পড়লো কাউন্সিলের আইন দিলো
এস ডি সাহেব হুকুম করে সার্কেল অফিসারে
যাও তোমরা ভোটে চলে
জেনে আসো মেম্বরের কাছে
সুতো লবণ কেরোশিনি কবে পাওয়া যাবে।
উল্লাপাড়ার পশ্চিম পাশে নবীনপুর গ্রাম আছে
শুনি দশের কাছে
সেই গ্রামের বড়লোক একজন প্রেসিডেন্ট হয়েছে
চিনি লবণ কেরোশিনি বেচে দশের কাছে
বেচে সে কেরোশিনি করে সে বেশিকমি
পাবলিক ধরে বেটার কান কেটে দিছে।
উল্লাপাড়ার পূর্ব পাশে বাঘলপুর গ্রাম আছে মফিজখার বাড়ি
কয়েক জোড়া কাপড় বেটা করেছিল চুরি

www.pathagar.com

পাবলিক দিশা পেয়ে নিলো তার বাড়ি ঘিরে
শেষ পর্যন্ত জোবাই করে ফেলায় সড়কে।
চলনের পুবে উলিপুর তাড়াশের রায়বাহাদুর ডাঙ্গাদার ভারি
পাবনা জেলার মধ্যে বেটার সাতখণ্ড কাচারি
তার এক নায়েব ছিল কন্ট্রোলের ডিলার ছিল
চিনি লবণ কেরোশিনি বেচে রাত্রদিনি।
সলংগার নায়েব মশাই তেলকুপির বিদু সরকার
কয়েক জোড়া কাপড় বেঁচলো জহির সরকারের বাড়ি
ফুট কমিটির মেম্বর যত খিদে লেগে মরে
পলায় সব জামাই বাড়ি বেটাকে ধরে গুড়ায় মাছুয়া কান্ধির হাটে।[১৩০]

৯৩

কথা কয় আজম আলী আপনারা শুনবেন সকলি
চ্যাংড়া মিয়ে বিয়ে দিছে হাউসের খ্যাতি
দিন চারি পাঁচ গেলে পরে চিনে নেয় আপন পতি
সত্য ছাড়া মিথ্যা কইনা আমি সভায় বলি।
ও ছেরা চড়ায় চলে যায় ছেড়ি ডাক পারিয়া কয়
কোন চড়ায় যাবেন স্বামী কয়াজান আমায়
শীঘ্র করে আইসো বাড়িত হে পড়ান যে মোর ফেঁটে যায়।
এসংসারে এতো খাটো কয়জন তোমার খায়
তোমার চড়ায় যাওয়ার কামকি তুমি করোগা সিথি
ঘ্যাটা মারকিন ফেলে থুয়া পড়োগা ধূতি
শ্যামাল গামছা কান্ধে ফেলে তুমি পড়োগা ধূতি
তুমি গায়ে লাগাও পাবনাই গুঞ্জি
সড়ক দিয়া হাটো পতি
আমি চাইয়া দেখি।
তুমি যাওগা হাটে আমার মেছি নাই দাঁতে
আমার বড় ভাইয়ের বিয়েতে যাবো ঝুমকা নাইমোর কানেতে
তোমার সামনে হাটবো স্বামী লোকে চেয়ে দেখবে।[১৩১]

৯৪

কলিকালের মিয়াজান বলে একি হলো দায়
হাতে পয়সা করি নাই এখন করি কি উপায়
ঘরের স্ত্রী উঠে বলে কাপড় দেও আমায়
চুপ করে থাকো ও হারামজাদি তুমি সময় চেনো না।
তাই শুনে তার স্ত্রী গোসসা করে রয়
স্বামীকে ভাত পানি না দেয়

www.pathagar.com

শেষে বাপের বাড়ি যায়
পিছে থেকে স্বামী ডাক দিয়া কয়
কি পাইরা আনবো কাপড় সোনা কয়ে দাও আমায়
তাই শুনে তার স্ত্রী হেসে হেসে কয়
পাতলা কাপড় দাও আমায়
কানে ঝুমকা দিতে হয়
খালি নাকে পাড়ার পার গেলে ভাল ঠেকেনা আর।
তিন টাকারে নিয়া জোয়ান হাটে চলিলো
দুই টাকার কাপড় কিনিলো
ছয় আনার চুড়ি কিনিলো
দশ আনার ধান কিনে জোয়ান বাড়িতে এলো
বাড়িতে এসে কয় তারে নারে না
ওসোনা ছালাখান ধরো।[১৩২]

৯৫

গাজী চললো সোনাপুর দেশে দুই ভাই শুয়েছিল পালঙ্কে
পরিরা সব বাতাস দিতেছে
কয়েক পরি বুদ্ধিকরে নিয়ে গেলো সামনগরে
নিয়ে গেলো সেই চাম্পার মন্দিরে।
চাম্পা বলে ওহে মনোচোরা তুমি আসবা কেমনে
চোরারে তুই বড়ই দাগাবাজ না মানিস তুই প্রহরীর ভয়
না মানিস তুই এভব সংসার
দক্ষিণা রায়ের হাতে পড়লে কাটা যাবে তোর গর্দান
কাটা যাবে তোর দুটি কান।
সত্য করে দেওরে পরিচয় তোমার বাড়ি কোন মোকাম
বাড়ি আমার বৈরাটিনগর পিতার নামটি সেকেন্দার
মায়ের নামটি অজুবা সুন্দর
মুসলমানের জাতি আমরা ভাই গেছে পাতালনগর
সত্য করে দিলাম পরিচয় চম্পা চিনে নেও এখন।[১৩৩]

৯৬

বলি ভাই একখান ধুয়া বলে যাই
চেংরা পেংরা গাবে ধুয়া আমারতো শখ নাই
চুল দাঁড়ি সব পাকিয়া গেছে দন্তগুলো নাই
লোকে ছাড়ে নারে ভাই
দায় ঠেকিয়া বানছি ধুয়া কোরআনে যা শুনতে পাই।
সাত আসমান জমিনও সাতখান

www.pathagar.com

আকাশে তারা পাতালে বালু এই ছাড়েজাহান
দিয়ে যাই আরেকটি চাপান
কোন কুলেতে তোমার জরনম সভায় বিদ্যমান।
আমার ধুয়া শুনে লোকে ভাবে মনে মনে
মিথ্যা ধুয়া বানছে মোকদোম ঠেকাইবার জন্য
সত্য ছাড়া মিথ্যা বলবোনা কোনোদিনে
বলে দাও এই ধুয়ার মানে।
মানে যদি নাগো পারো
শুনে আইসো মোকদোমের কাছে
বলে দিবে মানে।[১৩৪]

৯৭

হনুমান যখন যুদ্ধের বিজয় চায়
রাম লক্ষণ আশীর্বাদ করে করিলেন বিদায়
কেমনে হবো দরিয়ায় পার।
মনে মনে ভাবছি সদয়
কোথায় থেকে পবন ঠাকুর
হাত ধরে পার করে দেয়
হনুমান তখন লম্ফ দিয়ে পরিলেন লংকায়।
উড়ো সংবাদ পেয়ে হনুমানে
৮০ হাজার লোকজন সাইজা এলো রাবণের
ব্যাঙ্গা বেঙ্গীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণকাপে হনুমানের
পালাইবার সন্ধান করে উপরে উঠলো উড়ে
ইন্দ্র এজিদ লম্ফদিয়া লেজ ধরে পাড়ে।[১৩৫]

৯৮

পঞ্চবটি বনের মধ্যে যোগী দরবেশ ছিল
সীতা বলে কেমন যোগী ও তোর মনতো বুঝিবো
দুগ্ধের শিশু কোলে করে যোগীর কাছে চলিলো
সীতা বলে ধরো যোগী এই ছেলে দিলাম আমি
জল আনিবার ঘাটেতে যাবো।
যোগীর কাছে ছেলে রেখে সীতা চলে যায়
পেছন থেকে গাঁ ছাপাইয়া চুরি করে নেয়
সীতার ছেলে সীতা নিলো যোগীর কাছে ছেলে চায়
যোগী বলে পরলাম ফ্যারে ছেলে পাই কেমন করে।
সীতার কাছে যোগী আবার দিনের সময় নেয়
বিন্যার একটি ফুল তুলিয়া ছেলের মূর্তি বানায়

www.pathagar.com

যোগীর মুখে বরকত ছিল আল্লাহ তার জানটি দিলো
সীতার ছেলে সীতার কোলে দেয়।

৯৯

হানেফ কয় শোনো বিবি শোনো সোনাভান
তুমি কেনো করো এতো মান
মান করিলে হারাইবা সন্মান
তুমি সেরেকি ছাড়ো কলেমা পড়ো
কলেমা পড়ে হও মুসলমান
সেই নামেতে পাইবা আরাম
ধরো নবীজির কাণ্ডারি আখেরে পাইবা আরাম।
সোনাভান বলে শোনো পালোয়ান
কথা বলিও হয়ে সাবধান
মেরা হাতে হারাইবা জীবন
তুমি যবন হয়ে ব্রাহ্মণের মেয়ে
বিয়ে করতে দিয়েছো স্থান
মেরা হাতে হারাইবা জীবন।
জীবন নিয়ে যাওহে পালিয়ে
শোনোরে নাইড়া মুসলমান
তুমি স্বপ্ন দেখাইলা আমার বাড়ি
সেই জন্য তাড়াতাড়ি ঘটক পাঠাইলাম তোমার বাড়ি
মাথা মুড়া বুড়োর বেটি দিয়েছো কতো পাক নারী
আমার ঘটককে করলি অপমান
আমি সেই দুঃখে মরি।
হানেফ কয় শোনো বিবি যা বলি আমি
লিখেছে কাদের গণি
রদ হবে না আল্লাহ নবীর বাণী
তুমি আগে আইসো পায়ে পড়ো বলিয়া যে স্বামী
গোস্ত রুটি খাইতে মজা আনন্দে থাকিবা তুমি।

১০০

দশের চরণ রাখি স্বরণ জব্বার আলী কয়
ওস্তাদ আমার মোকদম সরকার সভায় দিলাম পরিচয়
ছালাম রাখি দশজনের পায়
রামরাবণের পালা করলাম শুরু
রাবণ তুই রহিলি কোথায়
সীতাকে নিলো চুরি করে

www.pathagar.com

চল যাবো লংকাপুরে
কাপতারাণী দয়া করো আমায়।
লংকাপুরে গিয়ে হনুমান খোকসার পাতা খায়
আর কতো দূর গিয়ে হনুমান মধুফুলের বাগান পায়
এতো লোক কি করো সেথায়
একলা দিবো বাগান পাহারা
বাড়ি গিয়ে দেখাশুনা করো
প্রহরীগণ সব চলে গেলো
বাগানের ফল খাইলো সমুদয়
বাগানের ফল খেয়ে হনুমান ঘুমে নিদ্রা যায়
প্রহরীগণ এসে তখন লেংগুরেতে পাট জড়ায়।
আগুন দিলো মারিবার আশায়
লম্ফে লম্ফে সারা লংকা পোড়ায়
ওর মার্গে যখন তাপ লাগিলো
সীতার কাছে উপদেশ নিলো
আগুন নিভাতে মুখ পুড়িয়া যায়।

১০১

আমি এলাম এই সভায়
আপনারা শোনেন দশজনায়
রাবণ রাজার নামটি ধরে হইলাম উদার।
রামের সীতাকে করলাম চুরি
চুরি করে আনলাম লংকায়
লংকাপুরে আইনা সীতাকে কতো কাণ্ড হয়।
ও তুই শোনরে হনু শোন আমার কথা শোন
লেংগুরেতে পাট জড়াইয়া লাগাবো আগুন
লেংগুরেতে আগুন দিয়ে হে
ও তোর মুখ বানাবো কালো রং
দেশে গেলে লোকে বলবে মুখপোড়া বানর।

১০২

ঈমাম হোসেন দুই ভাই
নবীর নাতি শুনতে পাই
বেহেস্তের চেরাগ দুই ভাই
ফাঁকি দিয়ে এজিদ গোলাম
কারবালাতে নিয়ে যায়
কারবালাতে আমার মরণ

www.pathagar.com

শুনেছি নানার ঠাই।
আমার নানা দ্বীনের নবী
এ কথা মিথ্যা কভু নয়
শোনো ওহে দুলদুলি
কারবালাতে আমি এসেছি।
কারবালাতে আমার মরণ
নানার মুখে শুনেছি
শুকনা ভরে পা দেবে যায় চিহ্ন পেয়েছি
মরা কাষ্ঠে রক্ত বের হয়
এমন সময় প্রাণের ভাই কোথায় রইলো।

১০৩

ছি রে ছি লাজে মরি তোর কথা আর বলবো কতো
জহির উদ্দিন গাইছে ধুয়া তুই ছিলি তার ঘোড়ার মতো
খুঞ্জুরি জুরি কর্তার শানের রুমাল তোর পৃষ্ঠে আর চরবো কতো
মুখেতে নাইরে লাগাম ধরেছাও ফেকাম
রাস্তায় চলো গাভীন ঘোড়ার মতো।
এক বাইরা পোকাড় কাণ্ড দেখে প্রাণকাপে মোর থরে থরে
লও হাত মুখের ডেঙ্গী গিলিলা কেমন করে
মাছরাঙ্গা এক কুমির ধরে তুললো দেরাগডালে
তাই দেখিয়া ফকির বষ্টুমিও পালালো ঝোল্লা থুয়ে।

১০৪

আরে নলকা আর চাটমোহর
হরিপুর আর জুনালগাছা আছে নূরনগর
ওরে হালসা নদীর স্রোত দেখিয়া মনেতে হয়েছে ফাফর
ছিকারপুর গ্রামে দেখি ঘ্যাণ গাছে জুড়েছে বলদ।
আরে বলদনগরের হাটটি বড় চমৎকার
সেই হাটে নাই দোকানদার
সারি সারি যুবতি নারী খেলিতেছে সাঁতার
আউলাকেশে শাড়ি পড়ে কয়জনা করে যে ফেকাম
আরে ছিকারপুর গ্রামে দেখি যতসব বাইদানীর কারবার।
আরে বাইদানীরা কেউ নৌকার লগি ঠেলে
কেউ বসে মালা গাঁথে কেউ দোকান নেয় মাথে
চুড়ি নিবি ও দিদিরা এই বলিয়া ডাক ছাড়ে
আয়না, কাকই, ঝুড়া, চুড়ি আইনাছি তোদের জন্য।

www.pathagar.com

অল্প বয়সের যতো রমনী
ডাক দিয়ে বসায় তখনি
আসমান তারা আইনাছে ব্যাদানী
ওরে বিলাতি হাড়েরও কাকই
ডাক দিলে কইবো না কথা
তুমি আমার কিসের স্বামী।

১০৫

আজব এক রং লাগালো তেতুলার বাবুরা
পলো দিয়ে ধরছে কুমির লোহার খাঁচায় বসে
কুমিরের শব্দ শুনে লোক চলেছে যতো চ্যাংড়া বুড়ো
তোরা দেখগা কুমির ঘুরে ফিরে।
কুমির কুমির বইলারে ভাই শব্দ হলো ভারি
বাবুর মনটার দিকে চেয়ে দেখি এ চান্দের কাচারি
বাবুর রথ খোলাতে লোক চলেছে যতো সারি সারি
বাবুর এ বাজার লাগায় কুমিরে।
বালুর চড়ে উঠে কুমির পড়লো ভীষণ ফ্যারে
জল বিনা গলা শুকালো ঘোর হলো দুই আখি
সাধু লোকে লেজ টানে কুতকুতাইয়া দেখি
ও আল্লাহ কোন অপরাধে বন্দি থাকি।

১০৬

বাড়ির কাছে দীঘি ছিল রে তাতে ছিলাম রে ভালো
গাঙ্গের ঘাটে আইসা আমার কুলমানো গেল
কেন এলাম গাঙ্গের ঘাটেরে।
আগে যদি জানতাম আমি রে
আমায় নিবে রে ধরে
কইতাম আমি বাপের কাছে রে
দশজন সিপাই দিতো সাথে
কেন এলাম গাঙ্গের ঘাটেরে।
আগের লায়ে ঝামুর ঝুমুর মধ্যে লাইরে পানি
আস্তে ধীরে মারো বইঠা পতির কান্দন শুনি
ওরে কান্দোনা কান্দোনা পতি রে চিত্তে করোরে হিয়া
বাকসভরা থুয়া আছি টাকারে তোমার শালিক করো বিয়া।

১০৭

হায়রে খোদার করুনা কে বুঝিতে পারে
বিধির নীলা বোঝা বড় দায়

www.pathagar.com

তিনটি পুত্রের শোকে হোসেন করছে হায়রে হায়
আমার অঙ্গ জ্বলে যায় বিবিরা সব কানছে যারে যার পড়িয়া ধুলায়
আঠারো দিন খায়না খানা পানি বীনা পাকসাক হয়না
কাফেরে রাখছে ঘীরে পানি
ওরে পানি দেও পানি দেও বলে হোসেন রোন বাদ্য করে
শোনে কাফেরে যোগায় পানি
হারামজাদা এজিদ এ বলে তলোয়ারের খাপ খোলে
সীমার কয় এজিদের আজ রণে পাঠাও মোরে সর্দারি ভার দাও মোরে।
হোসেনের ছের কাইটা এনে দেবো তোমার হুকুমের প্রতিজ্ঞা মোরে।
পঞ্চাশ হাজার লোক দিবে এজিদ হোসেনকে ঘিরবো ময়দানে
হোসেন যেদিন রণ পোশাক পড়ে মুখেতে আল্লাহর নাম বলে
লম্ফ দিয়ে চড়ে ঘোড়ার পিঠে
রণ ভূমিতে যাইয়া হোসেন এমন তীর
মারে যেমন কলার বাগান ঝরে।
অধম বাজু বলে ফাগুনের ঝড়ে ছিমুলের তুলা যাচ্ছে উড়ে ।

১০৮

মহিষ রাখে মহিষাল বন্ধুরে ঐরাণ ওপাথারে
ছাতি নাই মাথালও নাই শ্যামাইল গামছা মাথে
মহিষাল বন্ধুর দুঃখ দেখেরে আমি দিলাম ছাতি কিনে
পাড়ার লোকে দিচ্ছে গালি তোক মহিষালী ভাতারে তোর।

আমার বাড়ি যাইও মহিষালরে বসতে দিবো মোরা
জলপানও খেতে দিবো সালনা ধানের চিড়া
সালনা ধানের চিড়া নাইকারে বিন্দি ধানের খই
গাছে পাকা সবরি কলা গামছায় বান্ধা দই।
আমার বাড়ি যাইওরে মহিষাল এই বরাবর ঘাটা
নারকেল গাইছা বাড়িরে আমার পুবে জানালা কাটা
ফুল বিছানা পাইরা দিবোরে আরেক পাঙ্খার বাও
দুইজনা বসিয়া খেলবো যত প্রেমের পাশারে।

১০৯

আরে ও কোকিল ডাকিশনারে আর
বসে ঐ বৃক্ষ ডালের ওপর।
ওরে ও পতি রইলেন বিদেশে কার মায়ায় ভুলে
শাশুড়িনি দেয়না জ্বালা জ্বালায় ননদীনি।
আরে ওছেরি সোনার গড়ন দিচ্ছিস গায়

www.pathagar.com

রূপার ছরড়া দুইখান পায়
হাইটা যাতি চুইয়া পরে ছেরির আহলাদের জ্বালায়।
ছেরার পেট করে টিনটিন
নাক দিয়ে বের হয় শিন
কাছে শুলে ঘুম ধরেনা আমার গা করে শিনশিন।

১১০

আরে ও পদ্মা নদীর পানি
একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও মোর দুঃখের কাহিনী
ঢেউয়ের ওপর ঢেউ লাগিয়ে ঢেউ ভাঙ্গিয়া যায়
আমার বুকের আগুন নেভে নারে জ্বলছে নিরবধি
পদ্মা নদীর পানি।
পদ্মারে তোর গহীন কতো আমি জানি না
তোর খবর তুইরে জানিস আমার খবর জানিস না
একটুখানি দাঁড়াইয়া যাওরে খবর লইয়া
বন্ধুর নাগাল পাইলে কইও আমার দুঃখের বাণী
পদ্মা নদীর পানি।
ওপারেতে বন্ধুর বাড়ি সারি সারি ঘর
আছে কিনা আছে বন্ধু না জানি খবর
বিধি যদি দিতো পাখা যাইতাম বন্ধুর দেশে
বন্ধুর কাছে কইতাম আমি দুঃখেরও কাহিনী
পদ্মা নদীর পানি।
পদ্মারে তোর কূলে আমার বন্ধুর ঘর
তোর স্রোতে ভেঙ্গে নিলি করলি সর্বনাশ
সর্বনাশা পদ্মারে তোর মায়া নাই অন্তরে
ছকির বলে পরবি ভাটা যেদিন আমার মতো হবি
পদ্মা নদীর পানি।

১১১

পড় আওযুবিল্লাহ
পড় বিসমিল্লাহ্
করিয়া একিন
আল হামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বিল আলামীন।
একা ছিলাম যখন
আপে সাঁই নিরাবরণ
কেউ ছিল না তার সঙ্গিলা।
আপনার নিজ নূরে

www.pathagar.com

পয়দা করেন রাসূলে রে
দোস্ত বলে তারে ডাকিলা
নবী সেতারায় থাকিয়া।
ময়ূর রূপ ধরিয়া
আরশে রাখলেন মওলা।
গোপন করিয়া
মা আমেনার ঘরে
পয়দা করেন তারে।
মানব লিলা তারে প্রকাশ করিলেন
বাউল রশিদে বলে বালিয়া
শোন মওলা কিবরিয়া
এই দুনিয়ায় তোমার দেখা
পেলাম না
কঠিন ও হাশরে পাই যেন তোমারে,
আমায় নিও দয়াল পার করিয়া।

১১২

মন আমার দেহ নদী শুখায় যদি
জোয়ার ভাঁটা আর হবে না।
আমি জনম ভরা বইলাম তরি
সে নদীর জেয়ার চিনলাম না।
দেহ নদীর উজান বাঁকে
আছে তিনটি মোহনা,
তিনটা সাধু বসে থাকে।
কার কথা কেউ শোনে না
নদীর এক ধারাতে গেলে পরে
ডাকাতে নৌকা মারে
আর এক ধারায় বন্ধু আছে।
আর এক ধারা নাউই চলে না
দেহ নদীর মাঝখানেতে
ছয় কুমিরে বাস করে
দিবা নিশি থাকে ওরা
অতি গভীরে।
ওরা মাঝে মাঝে ঝংকার মারে
মন কাঁপে অতি ভয়ে
ভয়ে তো মোর প্রাণ বাঁচে না।
দেহ নদীর লোনা পানি

www.pathagar.com

চলে ভাটি উজানি।
নৌকার তক্তা খাইয়া ছিল
নাম হলো তার কামিনী।
বাউল রশিদ তাই ভাবছে বসে
দিন কাঁটাইলাম রঙ রসে
ভাঙ্গা নৌকা ছেঁড়া বাদাম
হায়লে তো আর জল মানে না।
মন আমার দেহ নদী শুখায় যদি
জোয়ার ভাঁটা আর হবে না।

১১৩

আমার মাওলা যারে দয়া করে
তবে তার মত কেউ নাইরে।
তুমি বিনে আর,
আমার দরদি কেউ নাইরে।
তুমি বিনে আর
আল্লাহর নামের মধু সুধা
পান করে আওলিয়া যারা রে।
ভবে জঙ্গল বাসি হইল তারা
তার সমান কেউ নাই রে,
ওয়াস কুরনী পাগল ছিল
স্বপ্নে নবীর দিদার পেল
ভবে জঙ্গল বাসি হইল তবে
ঘোরে বনে বনে রে।
তুমি বিনে আর
আমার দেহ ভাঙ্গা তরি
পাপেতো বোঝাইত ভারি
আমি মওলার নামে ধরলাম পাড়ি
তরি ডুইবা যেন মরি নারে।

১১৪

দিন থাকিতে করো মায়ের সাধনা
ও মায়ের এক ফোঁটা দুধের দাম
দিন থাকিতে কর মায়ের সাধনা
পিতা আনন্দ করিয়া সাগরে ফেলাইয়া
দূরে সরে গেলে পিতা

www.pathagar.com

খবর নিল না
মায়ে অতি যতন করিয়া
গর্ভে নিল তুলিয়া
দশ মাস দশ দিন পায় যে বেদনা
দিন থাকিতে কর মায়ের সাধনা
ছেলে বিদ্যাশেতে গেলে
বিপাকে পরিলে
পাড়া পড়শি জানার আগে
আগে জানে মা.......... ।
সে মায়ের মনে কষ্ট দিলি
যাবে জাহান্নামে
দোজখ ছাড়া বেহেশত তুমি পাইবা না
দিন থাকিতে কর মায়ের সাধনা..... ।
মায়ে একবার প্রসব করে
জিয়ান্ত মরে
তুমিও ছেলের মুখ দেখিলে পায় সন্তান
সে মায়েরে আছো ভুলে
এই দুনিয়ার পরে
কোমিন মোমিন কেও তো বলে না।
দিন থাকিতে কর................. ।
ফকির আব্দুর রশিদ

১১৫

দরদের নবী আমার উম্মতের দেওয়ানা
দিনের নবী গো ও ও ও।
একদিন অমাবস্যা পূর্ণিমায়
দিনের নবীর জন্ম হয়।
নিরালা বসে কাঁদে
মা আমেনা।
দরদের নবী আমার উম্মতের দেওয়ানা,
দিনের নবী গো।
একদিন নবীর মুখে দুগ্ধ দেয়
সে দুধ নাহি খায়।
কান্দিয়া বলে মাতা,
ছেলে বাঁচবে না আর।
নবী বলে মাগো মা
তোমার দুধ খাব না।
তোমার দুধ খাইলে

www.pathagar.com

আমি উম্মত পাব না।
দরদি ই ই ই।
রোজ হাসরের ময়দানে
দারুণ রোদ উঠিবে,
পানি পানি বলে উম্মত কাঁদবে জারে জারে।
উম্মত দিবে মোর দোহাই
পানি মাগো কোথায় পাই।
পানি খাইলে আমি উম্মত পাব না
দরদি ই ই ই
একদিন নবীজি ভবেতে এলেন
দুনিয়া ছেড়ে গেলেন,
তেষট্টি বৎসর কালে ইন্তেকাল করেন।
ছয়জনা তার দল পাঁকায়
কান্দে মাতা আমেনায়।
নবী চলে গেলেন
আসল ঠিকানায়
দরদি ই ই ই।

১১৬

যতদিন ঘুমের ঘোর
না যাবে দূরে
লা ইলাহা ইল্লাহ্ নক্‌শা পড়বে না তোর নজরে।
যতদিন ঘুমের ঘোরে,
না যাব দূরে।
আলিফ লাম মিম তিনটি হরফ
তিন শব্দ বাজাও বিনা।
(মুর্শিদি) চান্দ দরবেশে বলে
পাবি মক্কা মদিনা।
দেহের মোহর চিনলি না
ওরে দিন কানা।
এখনও না চিনলি মোহর
চিনবি কি তুই মরলে
যতদিন ঘুমের ঘোর,
না যাবে দূরে
কালেমার নকশা সূরাত
আছে নকশা গোপনে।
মুর্শিদ বিনা কলমা নক্‌শা,
পাবি তোরা কোনখানে।

www.pathagar.com

একটা কামিল পীরের কাছে যাও
কলমার ভেদ জানিয়া লও।
চোখেতে আঙ্গুলী দ্যাখাইয়া দিবে তরে
যতদিন ঘুমের ঘরে,
না যাবে দূরে
একটা নদীর তিনটি ধারা
তিন ধারে দেয় পাহারা,
অয়না আয়নাতে মিশাইয়া পয়রা।
দেখ খোদার চেহারা
বাউল রশিদে তা কয় মিথ্যা নয়
হাবুডুবু আছাড় পিচার
খাইলা নদীর কিনারে
যতদিন ঘুমের ঘোর
যতদিন ঘুমের ঘোর।

১১৭

আলিফ লাম মিম
আহাদি নূরি,
হলো বই তিন অক্ষরের মর্ম ভারী।
আলিফে আল্লাহ হাদি
আর মিমে নূর মোহাম্মদি
লামের খবর কেউ নিল না।
করল তার নক্‌তা চুরি
ঐ নব্বই হাজার কলমা জারি করলে নবী
রবে বা ভারী।
তিরিশ হাজার বুঝায় শরিয়ত
ষাটে হাজার রয় মারফতি
শাহজালাল কয় শোনরে হটু
ওই জ্ঞানে আল্লাহ্‌ বামে রাসূল
লাম এ মিমে চৌদ্দতলা।
পীরের পদে রয় হে জারি
আলিফ লাম মিম।

১১৮

মক্কা মদিনা যেতে
হয়েছে হাজি
তোমার নামে মওলা
রাহি মুসাফির।

www.pathagar.com

আবু বক্কর, ওসমান ওমর ও আলী
খাতুনি জান্নাত
মা নবীর দুলালী।
সেথায় হাসান আর হোসেন
ও উম্মতকে দিয়া গেছে প্রাণ।
অকাতরে প্রাণ
ও ধরে ঝুরিতাছে
সখি নারও নীড়।
তোমার নামে মাওলা রাহি মুসাফির
আজইও প্রমাণ শুনি আর পাশে শয়দায়
লাখে লাখে ঘুমাইয়াছে যত শহীদান,
সেথায় কাবারও ঘরে
লাখে লাখে সিজ্‌দা করে
একই আল্লাহ রে
ও সেই একই আল্লাহ রে
কোনদিন যেন লুঠাইবে
খালেক দেওয়ানে রশিদ,
তোমার নামে মওলা রাহি মুসাফির।
মক্কা মদিনা যেতে হয়েছো হাজি
তোমার নামে মওলা
রাহি মুসাফির।

১১৯

সেখানে যা লাগে তাই দিয়ারে দুল দয়াল
সেখানে যা লাগে তাই দিয়া
এ বিশ্ব ধরণী
গড়াইয়াছেন রব্বানী
কত সুন্দর করিয়া।
আমার ওস্তাদের নাম স্মরণ করি,
আমার বাউলা ছন্দি শিখাইয়া যিনি,
ওস্তাদ মকবুলের ঐ চরণ বন্ধি।
দোয়া করবেন আমারে
সেখানে না লাগে তাই দিয়ারে দুল দয়াল।
সিরাজগঞ্জ জেলা ধারি।
রায়গঞ্জের অধিবাসী,
পোস্ট অফিস হয় আট ঘোরিয়া
বসতবাড়ি সেই জায়গায়।
সেখানে যা লাগে তাই দিয়া

www.pathagar.com

এ বিশ্ব ধরণী।
বাউল রশিদ নামটি ধরি
দ্যাশ বিদেশি ঘুরি ফিরি।
সাধু গুরুর চরণ ধূলি,
নিয়া আমার
মস্তকে ঠাঁই
সেখানে যা লাগে তাই দিয়া,
এ বিশ্ব ধরণী।

১২০

নূর মোহাম্মদ (সাঃ)
আই মোহাম্মেদ নবী,
তারাইতো পাপি,
নাম রাখিল তোমার কামলিওয়ালা
নূর মোহাম্মদ (সাঃ) ।
নূরে আল্লাহ, নূরে নবী
তারে নূরে, পয়দা সবি।
আল্লাহর আলম ও তামাম মোরে
দরদ ও সালাম ও পড়ে।
ফেজি নবী তোমার তরে
হাজারও হাজারও।
নূরে মোহাম্মদ (সাঃ)
নূরে মোহাম্মদ (সাঃ) কামলিওয়ালা।
আরব দেশে কুরাইশ বংশে
জন্ম নিল হাবিবুল্লাহ রে।
হায় রে মাতা আমেনা,
পাইলে চাঁদের কণা
পিতা হইলেন আবদুল্লাহ রে।
নূর মোহাম্মদ (সাঃ)
নূর মোহাম্মদ (সাঃ) কামলিওয়ালা।
চাঁদ, সূর্য, গ্রহ, তারা
জ্বীন, ইনসান ফেরেশতারা
তোমার লাগিয়া সবাই
পাগিলা রে
আওলিয়া আম্বিয়া,
পাগল তোমার লাগিয়া।
গলে তলিত প্রেমের মালারে

www.pathagar.com

নূরে মোহাম্মদ (সাঃ)
নূর মোহাম্মদ (সাঃ) কামলিওয়ালা
ও মন কান্দে রে,
ও দিল কান্দে রে,
কোথায় পাইব প্রিয় নাবী রে
নূর মোহাম্মদ (সাঃ) কামলিওয়ালা।

১২১

ও মনই দোকানদার
তোমার কোথায় বাড়ি ঘর,
হাটি আইছই কত পুঁজি লইয়ারে
ও মনই দোকানদার।
ভবের হাটে আইছই রে মন
সদাই কর ছাওনি।
যাহা কিনতে আইছ্যাওরে মন
তাহা কিনছ্যাওনি।
তোমার ছেলে আর মেয়ে
আছে পথ পানে চাইয়া
কি না কি আসবে বাবা
লইরা রে
হাঁটি আইছ কত পুঁজি লইয়ারে।
মহাজনের পুঁজি যদি বসে বসে খাও
যাবার কালে ওরে মন খালি হাতে যাও
হাটের মহাজন যারা
ঢুকতে দিবে না তারা
শেষে কাঁদবি
হায় হায়ও করিয়া
সন্ধ্যা হলে বন্ধ হবে
হাটের দোকান পাট।
ওরে এক মিনিটের মধ্যে ভাঙ্গবে
শ্রী খোলাইশ হাঁট।
শেষে হবে একাকার
ও তুই সঙ্গে যাবি কার
রাধা বল্লব সঙ্গী হারা হইয়া রে
হাটে আইছ কত পুঁজি।

www.pathagar.com

১২২

সাঝের বেলায় জল ভরিতে, সখি লো
কেন বা আইলাম নদীর কূলে।
ও নদীর কূলে বলে ঘুইরা বেড়াই
কলসি ভরি আমি নয়ন জলে, সখী
কেন বা আইলাম নদীর কূলে।
যাই যখন যমুনার ঘাটে
ঢেউ দেখ্যাইয়া প্রায় চমকা উঠে
সাঁতার খেলতাছে,
আমার মনে বলে ঝাঁপ দেই জলে
ধরি বন্ধুর বইঠাখান আমি।
আর ডাকিলে বন্ধু কয়না কথা
পাষাণে ভাঙ্গিলে মাথা বন্ধু
প্রেমের বিচ্ছেদে
ওই আমি মনে করি বন্ধুর বাড়ি
যাইব নদী সাতরাইয়ারে।
কেন বা আইলাম নদীর কূলে।

১২৩

ওলো সখিনা,
কয় দিন তোর ঘাটে দেখি না।
দেখি তোর সুন্দর মাথার চুল
ও তুই করলি ক্যানে ভুল।
ঐ চুলে ক্যান স্বামীর পা মুইছা দিল না
চুল দিয়াছে পা মুছাইতে।
ঐ কর্ম ক্যান করলি না
স্বামী যদি করে অভিমান
কি দিয়া ভাঙ্গাবি
তাহার মান।
জানিস না স্বামী খুশি
গাইলে পরে গান।
ঐ রশিদ কয় বাউল রহমান
এ কি প্রেমের ছলনা
ওলো সখিনা কয়দিন
কয় দিন তোর ঘাটে দেখি না।
শুইয়া তোর স্বামীর বিছানায়
হাত খানা দিয়া তার মাথায়।
কয়দিন তারে ঘুম পাড়াইলী

www.pathagar.com

বাতাস দিয়া গায়ে।
স্বামীর জন্য দিবা রাতে
করলি কি বা বাসনা
ওলো সখিনা
কয় দিন তোর ঘাটে দেখি না।

১২৪

ওরে আসলে কিছুই জানে না ঘোরে
সব কিছুরের আশায় কলিতে।
ফকিররা করে ফকিরি যায় মানুষের বাড়ি
শুধু ওই কিছুরির আশায় ওরা ভাল বাড়ির
মাইয়া পায়না, ঘোরে সব কিছুরির আশা।
ওরা মাথায় রাখে লম্বা চুল,
গায়ে পরে লোহার শিকল।
তাতে ভাই কোকড়া পায়,
রাস্তায় পাইয়া নাড়ি ভুড়ি টাইনা
ধইর মুরিদ বানায়।
কলিতে ওরা সঙ্গে রাখে দুই চার বিধি তাতে,
হয় ফকিরি খাঁটি বিটি রে দিয়া,
হাত পা টেপাই।
আবার সেই বিটি রে, জিজ্ঞাস করি
ফকির তোমার কিবা হয়।
বাপ বলিয়া দেয় পরিচয়।
রাত্রের বেলায় যাইয়া দেখি ঘুমায়
তারা এক বিছানাই, কলিতে এই
জগতে কত ফকির ঘুইরা কলিতে।
ফকির আলাউদ্দীন কয় এই
সব কারবার তাতে হয় মুর্শিদিদের।
দরকার ধইরা তারে বয়াত পাতায়
তবে ওরে শরীয়তের
বেআইনী ধরে তারে কালেমা পড়ায়
কলিতে এ জগতে কত ফকির
ঘুইর বেড়ায় কলিতে।

১২৪

বাংলাদেশে খাঁটি মানুষ
যে জন আছে ভাই।
তাঁরে ভোট দিবেন সবাই

www.pathagar.com

তাঁরে ভোট দিবেন সবাই।
হোক না পুরুষ,
হোক না নারী।
দেখবেন তাহার
গুণ বিচারী।
কাজে কর্মে নিষ্ঠার যে,
ভোট তাকে দিবেন সবাই।
দেশের লোকের
ভালোর তরে,
মঙ্গল চিন্তা
যেজন করে।
ভোট দিবেন সকলে তারে
করবে যে দেশের ভালাই।

১২৫
দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,
ও শোনেন যত ভোটারগণ।
ফিরা আইলো দেশে আবার
সংসদ নির্বাচন ভাইয়া রে।।
সৎ নিষ্ঠাবান যোগ্য প্রার্থীরে,
ও ভাইরে মনে করবেন যাঁকে
মূল্যমান যে আপনার ভোট টা,
দিয়া দিবেন তাঁকে ভাইয়ারে।
দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় রে
ও ভাইরে কেহ না ভুলিয়া।
মনের মত লোক চিনিয়া
ভোট দিবেন হাসিয়া ভাইয়া রে।

১২৬
ঘাটে একবার আসি,
একবার যাই।
যাইয়া দেখি বন্ধু ঘাটে নাই।
সখি লো,
বন্ধু সখি
কাল নিশিথে দেখিলাম স্বপন,
সোনার বন্ধুর রূপের কিরণ।
কাজল বরণ নাগরও কানাই
বন্ধুর প্রেমের কূল মিশাইয়া
প্রেম যমুনায় ঝাঁপ খেলাইয়া,

www.pathagar.com

যাইয়া দেখি বন্ধু ঘাটে নাই।
সখি লো ওলো প্রাণ সখি,
চোখ দুটি জলে ভরা
মলিন কেন এই চেহারা
কালো বরণ নাগরও কানাই।
ও তুই ঘুরিস ক্যানে ডালে ডালে
ঘর বাড়ি ক্যান বান্ধস নাই,
যাইয়া দেখি
সখি লো প্রাণ সখি,
সোনা আমি দুগ্ধ ভরিয়া খাইলাম
মন জানে আর কেউ জানে না।
নারীর কুলে সুখের আশা নাই
তবে কোন সতী সিতা
বারে বারে বনে যায়

১২৭

হাদিস কোরআনের কথা
জানে মোর লাগে ধাঁধা।
মানুষে মরে কি ভাবে।
ওরে হজরত দেখেন,
মনে কর বুঝি জিওতে মরে।
মরে নাই সে আছে বেহুশে
জবাব দিতে না পারে
আর মাতা পিতা
কাঁনছে বসে।
মৃত্তা তো জানতে পারে
জবাব না দিতে পারে,
ওরে তিনজনে যখন
ঘরের বাহির করে,
মৃত্তা বলে কোথায় নিয়া যাও
ওযু গোসল বানাইয়া,
মৃত্তা বলে বানাও আমায়
নিয়া যাবে গোরেতে।
আর ওযু গোসল শ্যাস হইলে
কাফন ও গায়ে পড়াইল।
মৃত্তা তখন কি কথা বলে,
ওরে
তোর জানাজায় খাড়া হইল

www.pathagar.com

যত রে মুসল্লি।
তোর জানাজা শেষ হইয়া গেল
চারজনে কান্ধে কইরা
নিয়া যায় গোরস্থানে।
আর চারজনে কান্দে নিয়া
লা ইলাহা কালাম পরে।
নামাইছে গোরেও কাছে
ওরে তিনজনে ধরিয়া যখন
কবরে শোয়ায়,
মৃত্তা বলে এই তিনজনা
সঙ্গের সাথী হবে।
উপরের তাবুর পড়াইয়ে
তিনজনে উইঠা মৃত্তা কান্দে জারে জারে।
আমার নাম তালেব আলী
শোন মন সবাই বলে
ওস্তাদে বলে আমায়,
ওরে হাদিসে কোরআনের কথা
জগত তো শুনিয়াছে
জেনে তখন আইলে পারে
তওবায় উপায় কি।

১২৮

পাগল মনরাই
ডুব দিলি না বাঘ ধরিয়া।
মন রে,
মক্কা ও মদিনার ঘরে।
সোনার খুঁটি নড়ে চড়ে।
ঘরে ঘরে সিন্ধুক দেখা যায়,
সিন্ধুকের শিকলীটা
লাগাইয়াছে প্রেমের আঠা।
উঠবে যে খেলা বড় দায়
ও আমার পগলা মন রাই।
ডুব দিলি না বাঘ ধরিয়া।
মন রে শরীয়তের নাউ বানাইয়া
মারফতের বৈঠা লইয়া,
হাসান হোসেন দুইজনে নারাজ।
মা ফাতেমা ছিখল হইয়া
রাখছে নৌকা আটকাইয়া

www.pathagar.com

চাবি লইয়া আলী মোস্তফা।
আমার পাগলা মনরাই
ডুব দিলি না বাঘ ধরিয়া।
আমার পাগলা মনরাই
ডুব দিলি না বাঘ ধরিয়া।
ও মনরে সে পথ দিয়া আসা যাওয়া
সে পথ কেন নাপাক বলা
নাপাক বস্তু আছে কোন জায়গায়।
ও মনরে সে পথ দিয়া আসা যাওয়া
সে পথ ক্যানে নাপাক বলা
নাপাক বস্তু আছে কোন জায়গায়।
পাকেতে পাক বান্ধাজন
নূরেতে হয় নিরাঞ্জন,
নাপাক বস্তু আছে কোন জায়গায়।
আমার পাগলা মনরাই
ডুব দিলি না বাঘ ধরিয়া।

১২৯

জয়নাল কান্দে হালখানাতে,
ওগো ফাতেমা,
ওরে জয়নাল কান্দে হালখানাতে
সবাই বলে রব্বানা।
জয়নাল কান্দিয়া বলে
বুকেতে পাষাণ হইয়া রে
আনিবে চাচা খবর নইলানা।
তারে জয়নাল কান্দে হালখালাতে
সবাই বলে রব্বানা।
আপন হাতে গদ লিখাইয়া যায়
তোতার কাছে,
ঐ পত্র খানি নিয়ারে তোতা
চইলা গেল শহরে।
শহরের মাঝে যাইয়া
পরে বৃক্ষের ডালে রে,
সদাই বলে জয়নাল ছেলে না।
ওরে চল্লিশ হাজার লস্করে বায় না
বোঝে না মা,
ওরে কেউ বলে যাস
দেওয়া খবর শোনেন গো মেহেরবান ॥

www.pathagar.com

তোতা পাখি
মুখে তার পত্র দেখি এ
সবাই বলে জয়নাল চেনে না।
খবর শোনে হানিফ বাসা
আইল সেখানে
পত্রখানি নিয়ারে তোতা
ফাইলা দিল সামনে।
পত্র পরিয়া দেখে
জয়নালের দুঃখ লক্ষ রে
চল লম্বার যাব সেই কূলেতে।

১৩০

একটা ধূয়া বাইন্ধা যাই
ওস্তাদে মোর হয় না রাজি,
কোন সুরে বাধি ধূয়া
আমার তো মনে মানে না।
মেশিনে দিয়া বাড়া বানে
ঢেঁকি লাগে না গুড়া।
মিয়া লোক হইল কুইড়া
পাতা থাকব না।
কালকের আবাদ আইসা
দেশের লোকের অভাব হয় না।
ছোট বড়র মান্য থাকল না
কামনার জামা খোলে না।
হাতে খড়ি কম করতাছে,
লজ্জা করে না।
বড় লোকে উঠলাম লাইছে
খাপু মাইরা বইসা থাকে।
গেরস্থর পোলা,
টাকার লোভে হাল কিনেসে
টাকা দিয়া।।

১৩১

ও চুন বেশি খাইলে মুখ পুড়িয়ে যায়
কম খাইলে বুক চলে
প্রেম করিও না দুইজনার মন
সমান না হলে।

www.pathagar.com

ও সখীরে আর এক প্রেম
কইরাছিলাম তুমি আর আমি।
ওরে সে সব কথা এখন ক্যানে
লোকের মুখে শুনি রে,
লোকের মুখে শুনি
ও মন পিরিত কেউ কইব না।
ওমন পিরিত কেউ কইর না
বাজবে টানাটানি রে
প্রেম করি না দুইজনার মন
সমান না হইলে।
ও চুন বেশি খাইলে
মুখ পুড়ে যায়।
কম খাইলে বুক জ্বলে,
প্রেম কইর না দুই জনার মন
গমন না হইলে ॥

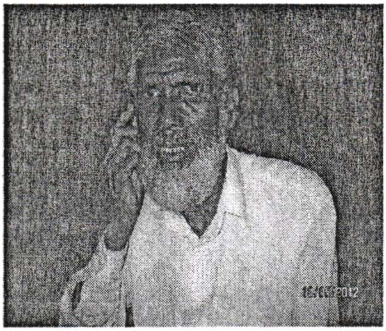

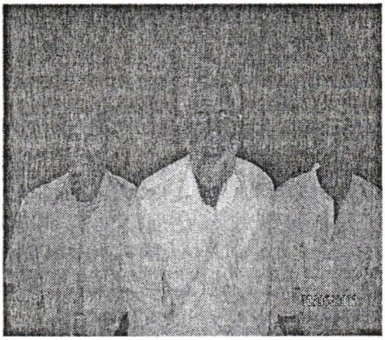

www.pathagar.com

লোকসংগীত ধারক-বাহকদের ছবি (বা থেকে ডানে মো. গোলজার হোসেন, মো. করিম আলী খান, আবদুস সবুর আলী)

তথ্যনির্দেশ :

১. শাহজাদপুরের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯।
২. পূর্বোক্ত।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. পূর্বোক্ত।
৪. পূর্বোক্ত।
৫. পূর্বোক্ত।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. পূর্বোক্ত।
৮. পূর্বোক্ত।
৯. পূর্বোক্ত।
১০. পূর্বোক্ত।
১১. পূর্বোক্ত।
১২. বাংলা পিডিয়া, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
১৩. পূর্বোক্ত ১।
১৪. পূর্বোক্ত ১।
১৫. মো. করিম আলী খান, পিতা : আফাজ আলী খান, গ্রাম : বিলারিল, পোস্ট : কায়েমপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৫৬ বৎসর, রাত : ৯.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।
১৬. পূর্বোক্ত ১।
১৭. পূর্বোক্ত ১৫।
১৮. পূর্বোক্ত ১।
১৯. পূর্বোক্ত ১৫।
২০. পূর্বোক্ত ১।
২১. মো. গোলজার হোসেন, গ্রাম : দূর্গাপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সাবেক ইউপি সদস্য, বয়স : ৬৫ বৎসর, তারিখ : ১৭.০৩.২০১২ সময় : রাত ৮.০০ টা।
২২. পূর্বোক্ত।
২৩. পূর্বোক্ত ১।
২৪. পূর্বোক্ত ১।
২৫. পূর্বোক্ত ১২।
২৬. মজনু প্রামানিক, পিতা : গহের প্রামাণিক, গ্রাম : মশিপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : গারিয়াল, বয়স : ৫৫ বৎসর, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৯.০০ টা।

www.pathagar.com

২৭. পূর্বোক্ত ১।
২৮. পূর্বোক্ত ১।
২৯. পূর্বোক্ত ১।
৩০. মো. সোনা উল্লা, পিতা : মৃত. মো. মজিবর মোল্লা, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩৫ বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১১.০০ টা।
৩১. পূর্বোক্ত ১।
৩২. মো. মানিক চান, পিতা : মো. আবদুল ওয়াহাব, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২০ বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১০.০০ টা।
৩৩. পূর্বোক্ত ১।
৩৪. পূর্বোক্ত ১।
৩৫. পূর্বোক্ত ১২।
৩৬. পূর্বোক্ত ১।
৩৭. পূর্বোক্ত ১।
৩৮. পূর্বোক্ত ১।
৩৯. জাহের উদ্দিন, গ্রাম : মশিপুর, পোস্ট : শরিষাকোল, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বৎসর।
৪০. পূর্বোক্ত।
৪১. পূর্বোক্ত।
৪২. পূর্বোক্ত।
৪৩. পূর্বোক্ত।
৪৪. পূর্বোক্ত।
৪৫. পূর্বোক্ত ২৬।
৪৬. পূর্বোক্ত ২৬।
৪৭. আজির উদ্দিন, গ্রাম : হরিরামপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বৎসর, তারিখ : ১৭.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৮.২০ টা।
৪৮. পূর্বোক্ত।
৪৯. পূর্বোক্ত ৩২।
৫০. পূর্বোক্ত ৩২।
৫১. মো. আবদুল ওয়াহাব, পিতা : মোঃ জয়নাল আবেদীন, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বৎসর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১০.৩০ টা।
৫২. পূর্বোক্ত ৩০।
৫৩. পূর্বোক্ত ৩০।
৫৪. পূর্বোক্ত ৩০।

www.pathagar.com

৫৫. মো. কাশেম আলী, গ্রাম : হরিরামাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : বৃদ্ধ কৃষক, বয়স : ৭৫ বৎসর, তারিখ : ১৭.০৩.২০১২ সময় : রাত ৮.৩০ টা।

৫৬. পূর্বোক্ত ২৬।

৫৭. পূর্বোক্ত ২৬।

৫৮. পূর্বোক্ত ২৬।

৫৯. পূর্বোক্ত ২৬।

৬০. পূর্বোক্ত ২৬।

৬১. পূর্বোক্ত ২৬।

৬২. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৩. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৪. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৫. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৬. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৭. পূর্বোক্ত ২৬।

৬৮. আব্দুস সবুর আলী বয়াতি, গ্রাম : দূর্গাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বৎসর, পেশা : কৃষিকাজ, সময় : রাত : ১০.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।

৬৯. পূর্বোক্ত।

৭০. পূর্বোক্ত ১৫।

৭১ পূর্বোক্ত ১৫।

৭২. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৩. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৪. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৫. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৬. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৭. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৮. পূর্বোক্ত ৬৮।

৭৯. পূর্বোক্ত ৬৮।

৮০. এস এম এ বারী, পিতা : মো. আবু বক্কার সরকার, গ্রাম : ব্রজবালা, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বৎসর, পেশা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

৮১. মো. ছকির উদ্দিন প্রামাণিক, পিতা-মৃত. কলিম উদ্দিন প্রামাণিক, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ বাসভবন, বয়স : ৬৮ বছর, সকাল ৯ ঘটিকা, তারিখ: ১০/০৭/২০১১ ইং।

৮২. পূর্বোক্ত।

৮৩. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

৮৪. মো. জফের আলী ফকির, পিতা-মৃত. কাদের আলী ফকির, গ্রাম : ধরইল, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ। বয়স : ৭০ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণী, সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা তারিখ : ২০/০৮/২০১১ ইং।

৮৫. পূর্বোক্ত ৮১।

৮৬. পূর্বোক্ত ৮১।

৮৭. বাউল হারুন, পিতা : মৃত. শুকুর মোহাম্মদ তালুকদার, বয়স : ৫৩ বছর, পেশা : বাউল শিল্পী ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

৮৮. পূর্বোক্ত।

৮৯. পূর্বোক্ত।

৯০. পূর্বোক্ত।

৯১. পূর্বোক্ত।

৯২. পূর্বোক্ত ৮১।

৯৩. পূর্বোক্ত ৮১।

৯৪. পূর্বোক্ত ৮১।

৯৫. আব্দুল রশিদ বাউল, পিতা : সোরহাব আলী মণ্ডল, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : বাউল শিল্পী, চকচন্ডী, আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

৯৬. পূর্বোক্ত।

৯৭. পূর্বোক্ত।

৯৮. মোসা. ফেরদৌসী পারভীন, স্বামী : আব্দুল রশিদ বাউল, ৪০ বছর, গৃহিনী, চকচণ্ডী, আটঘরিয়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

৯৯. পূর্বোক্ত।

১০০. মো. আজম আলী, পিতা মৃত. আকছেদ আলী, গ্রাম : ভট্টমাঝুরিয়া, ডাকঘর : অলিদহ, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়সঃ ৬৫ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, সময়ঃ সকাল ১০ঘটিকা, তারিখঃ১৯/০২/১১।

১০১. পূর্বোক্ত।

১০২. পূর্বোক্ত।

১০৩. পূর্বোক্ত।

১০৪. পূর্বোক্ত।

১০৫. পূর্বোক্ত।

১০৬. মো. হজরত আলী আকন্দ, পিতা মৃত. তুফান আকন্দ, গ্রাম : ধরইল, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ দোকান, সময় : সকাল ১১ঘটিকা, বয়স : ৭০বছর, তারিখ : ১০/০৩/১২।

১০৭. পূর্বোক্ত।

১০৮. পূর্বোক্ত।

১০৯. পূর্বোক্ত।

১১০. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

১১১. মোছা. হালিমা খাতুন, স্বামী : মো. আমজাদ হোসেন, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান: নিজ বাসভবন, সময় : সকাল ১১ঘটিকা, তারিখ: ২৫/০৯/১১।

১১২. বেলাল হোসেন, পিতা : মোটকা খান, মধ্যপাড়া, বহুলী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষরজ্ঞান, পেশা : লোকসংগীত শিল্পী।

১১৩. পূর্বোক্ত।

১১৪. পূর্বোক্ত।

১১৬. আব্দুস সামাদ, পিতা : ইঞ্জিল, রবুর গাঁতী, বহুলী সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : লোকসংগীত শিল্পী।

১১৭. পূর্বোক্ত।

১১৮. পূর্বোক্ত।

১১৯. ঠান্ডু মন্ডল, মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : বাউল শিল্পী।

১২০. পূর্বোক্ত।

১২১. মিলন মন্ডল, ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : বাউল শিল্পী।

১২২. পূর্বোক্ত।

১২৩. পূর্বোক্ত।

১২৪. বাউল হারুন, পিতা : মৃত. শুকুর মোহাম্মদ তালুকদার, ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৩ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : বাউল শিল্পী।

১২৫. পূর্বোক্ত।

১২৬. পূর্বোক্ত।

১২৭. পূর্বোক্ত ১০০।

১২৮. পূর্বোক্ত ১০০।

১২৯. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩০. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩১. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩২. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩৩. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩৪. পূর্বোক্ত ১০০।

১৩৫. পূর্বোক্ত ১০০।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

১. ঈদ উৎসব

বাঙালি শব্দের সাথে উৎসবের যোগসূত্র বিদ্যমান। নানা সংস্কৃতিতে আবদ্ধ বাঙালি মননে বছর জুড়েই উৎসবের আমেজ মুখরিত। সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই উৎসব। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ঈদ শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর পালন করে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের ঈদ মানে সকল মানুষ একত্রে আনন্দ, উল্লাসে মেতে ওঠা। তেমনি সারা দেশের মতো সিরাজগঞ্জেও ঈদের আনন্দ সকলের সাথে মিলে মিশে উদ্‌যাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। বছরে দু'টি ঈদ উপলক্ষে দু'টি উৎসব পালিত হয়। একটি ঈদ-উল-ফিতর অপরটি ঈদ-উল-আজহা। ধনী গরিব নির্বিশেষে সকলের সামর্থ অনুযায়ী আনন্দ স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে উভয় ঈদ পালন করে থাকে।

ঈদ-উল-ফিতর মূলত রোজার ঈদ নামেই সর্বাধিক পরিচিত। একমাস রোজা রাখার পর ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দ ছোট বড় সকলে পালন করে থাকে। রোজা শুরু হওয়ার আগে থেকেই প্রাথমিক পর্যায়ে রোজা প্রস্তুতি এবং এর কিছুদিন পর থেকেই ঈদের নানা কার্যাদি করে থাকে। এ সময় কাপড় চোপড় ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করা হয়। যার যার সামর্থ অনুযায়ী নতুন পোশাক, নতুন জিনিসপত্রাদি ক্রয় করে থাকে। ঈদের দিনে খুব সকালে সকল বাড়িতে ঈদের আমেজে মুখরিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন জায়গায় ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নারী পুরুষ উভয়ের ঈদের নামাজ আদায় করার নিয়ম আমাদের এলাকায় প্রচলিত নেই। তাই শুধুমাত্র পুরুষরাই ঈদের নামাজ আদায় করতে যায়। আর নারীরা নামাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত রোজা করে থাকে। নামাজের পরপরই সকলের সাথে কুশল বিনিময়সহ কোলাকুলি করে থাকে। কম বয়সের ছেলেমেয়েরা গুরুজনদের কদমবুচি বা পা ছুঁয়ে সালাম করে এবং তারা সালামি নিয়ে আনন্দ করে থকে। প্রত্যেক বাড়িতে সেমাই, পায়েস, ক্ষীরসহ নানা ধরনের সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীরা একে অন্যে বাড়িতে বেড়াতে আসে। আপ্যায়ন ও কুশাল বিনিময় ঘটে। এছাড়া ঈদ-উল-আজহা এ অঞ্চলে কোরবানির ঈদ হিসেবেই সর্বাধিক পরিচিত। মূলত পশুকে কোরবানির মধ্য দিয়ে নানা আয়োজনে এ ঈদের আনুষ্ঠানিকতা বিস্তার করে। অনেকে ঈদের দিনে রোজাও রাখে। কোরবানির সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে রোজা ভাঙা হয়। কোরবানী যার যার সামর্থ অনুযায়ী দিয়ে থাকে। কেউ গোরু, কেউ, ছাগল, কেউ মহিষ, কেউ বা আবার উট বা দুম্বা কোরবানি করে থকে। মূলত ধর্মীয় আনুগত্য ও বিশ্বাস থেকে এই ঈদ মুসরমানরা পালন করে আসছে। এটি ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি আনন্দ বা উৎসবে রূপ নিয়েছে।

www.pathagar.com

২. দুর্গা পূজা

হিন্দু ধর্মের সর্বপ্রধান উৎসব দুর্গা পূজা। যা বাংলাভাষী, হিন্দুধর্মের অনুসারীগণ অত্যন্ত আড়ম্বরের সাথে অংশগ্রহণ ও পালন করে। দুর্গা দেবীর নামে এই পূজা উৎসব পালিত হয় বলে দুর্গা পূজা উৎসব সমধিক পরিচিত। পৌরাণিক সূত্রমতে জানা যায়, পুরাকালে দূর্গম নামের এক অসুর দেবতার অস্তিত্ব ছিল, এই দূর্গমের অকাম ছিল সৃষ্টির সকল জীবকে বিপদ আপদের মধ্যে ঠেলে দেয়া, দূর্গতির মধ্যে ফেলা, মানুষের ক্ষতিসাধন করা। মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গেল, এমন সময় তাদের রক্ষা করতে এলেন 'মা' তিনি অসুর দেবতাকে দশহস্ত দ্বারা কৌশলে বিনাশ করলেন, উদ্ধার করলেন জগতের মানুষকে। তিনি রক্ষাকর্তা হওয়ার জন্য উদ্ধারকারীর তার নাম দিলেন "দেবী দুর্গা" অথবা "মা দুর্গা" সেই অবধি দুর্গা মানুষের দ্বারা পূজিত হতে থাকল।

উৎসব মানেই আনন্দের সহযাত্রী। উৎপত্তিগত দিক থেকে বিবেচনা করলে মূলত আদিম মানুষের একদা অবসরকালীন তার জীবিকার তথা খাবার সংগ্রহের দৈনন্দিন কাজগুলির বাস্তবানুতা অনুকরণ বা অভিনয় শুরু করে। হয়তো খাদ্য সংগ্রহের সার্বক্ষণিক চিন্তার বশে। তাদের অনুকরণগুলি সর্বদা সাফল্য লাভ করেছে, এমন কথাও আমরা বলতে পারি না। ঘটনাচক্রে একাদিক্রমে কিংবা স্বল্পকালের ব্যবধানে খাদ্য আহরণের কিছু চেষ্টায় তারা কামিয়াব হয়। এর ফলে এক ধরনের বিশ্বাস কাজ করে যা আগেকার উক্তধিব অনুকরণই তাদের সাফল্যের কারণ। আচার-অনুষ্ঠান, শারীরিক অভিনয়, আনন্দের অনুভূতি তথা তার প্রকাশ যে এক পর্যায়ে প্রবলতর রূপ পায়, তা সহজেই অনুমেয়। পৃথিবীর প্রথম উৎসবগুলির আসল জন্ম তখনই।

www.pathagar.com

শিল্প, সাহিত্য আর ঐতিহ্য নিয়ে গড়া সিরাজগঞ্জ জেলা। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন- জেলাটিকে সমৃদ্ধ করেছে তেমনি লোক ঐতিহ্যের ধারাটি সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলের মানুষের সাথে উৎসব এক যোগসূত্র বিদ্যমান। তারই ধারবাহিকতায় সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় শারদীয় দুর্গোৎসব ভিন্ন আঙ্গিকে পালিত হয়ে আসছে। দেবী দুর্গার পূজা তথা দুর্গোৎসব শুরু হয় প্রধানত আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে। সেদিন দেবীর বেবিন। তারপর পূজা চলে নবমী পর্যন্ত। সেই সঙ্গে উৎসবও। তবে উৎসবের শেষ দশমীতে। ষষ্ঠীর আগে থেকে সারা শহর জুড়ে সাজানো হয় বর্ণিল সব আলোর উজ্জ্বল শিখায়। সেই সাথে শুরু হয় আনন্দের জোয়ার। মূলত পূজা দুইদিক থেকে বিবেচিত হয়। প্রথমত ধর্মীয় অনুভূতি দ্বিতীয়ত অসাম্প্রদায়িক অনুভূতির প্রকাশ। সকল বর্ণের জনগোষ্ঠী মিলিত হয়। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় প্রত্যেকটা অলিতে-গলিতে লাইটের জমকালো সৌন্দর্য আগন্তুক ছোট বড়, ছেলে মেয়ে, বৃদ্ধসহ সকলকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দেয়। সাথে থাকে বিভিন্ন গান আর ঢাকের মধুর ধ্বনি। মাঝে মাঝে দেখা যায় মণ্ডপের পাশে তরুণদের নৃত্য আর অংশগ্রহণ সত্যিই উৎসবের আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেয়। প্রতিবারের মতো মণ্ডপের আয়োজন প্রতিটি এলাকায় আলাদা আলাদা আয়োজক কমিটি তাদের সভাপতি নির্বাচন করেন। পূজার জন্য চাঁদা তোলা হয়। এলাকা কেন্দ্রিকও হতে পারে আবার গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় তারাও চাঁদা দেওয়ার বিষয়ে আলাদা ভূমিকা রাখে। সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলায় কেন্দ্রীয় মন্দির হলো শ্রী শ্রী মহাপ্রভুর আখরা (মারয়ারী পট্টি, সিরাজগঞ্জ সদর)। যার যার এলাকায় আয়োজক কমিটি মা দূর্গাকে স্বপ্নিক সাজে সজ্জিত করে। এ সময় প্রতিটি মণ্ডপে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকে। যার কারণে অনেক রাত পর্যন্ত নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। মূলত অষ্টমী থেকেই জন সমাগম বেশি হয় যা দশমী পর্যন্ত অব্যবহৃত থাকে। এ উৎসবে পাঠা বলি দেওয়াও হয়। নবমীর দিন প্রসাদ বিতরণের আয়োজন হয় বেশ ঘটা করে। আত্মীয় স্বজনদের সেবা, দরিদ্র গরিবদের সেবার মাধ্যমে পুণ্য লাভ করাই হলো আলোচ্য অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বিভিন্ন ধরনের খাবার আর মিষ্টান্নর আয়োজন হিন্দু অনুসারীসহ মুসলমানদের বাড়িতেও দেখা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফল প্রসাদ হিসেবে দেয়া হয়। এছাড়া প্রতিদিনের পূজা অর্চনাতো রয়েছে। বিজয়া দশমীর দিনে হিন্দু রমনীদের সিঁদুর খেলা সত্যিকার অর্থেই উপভোগ্য একটি অংশ। অশ্রুমিশ্রিত অনুভূতি থাকলেও আগামী বছরে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে নিয়ে আসবে এবং কামনায় মা দুর্গাকে বিসর্জনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া হয়। পুরোহিত শেষ অংশের পূজা অর্চনা শেষে মা দুর্গাকে প্রস্তুত করা হয়। বিসর্জনের সময় সারা শহরের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। সকলে মিলে গান আর নৃত্যের তালে তালে দূর্গাকে যমুনার পাড়ে নেয়া হয় বিসর্জনের জন্য। এসময় অনেক লোকের সমাগমে ঘটে। যমুনা নদীর জলে প্রতিমা দেবীকে ডুবিয়ে বিসর্জন দেয়া হয়। ত্যাগ করে বিচ্ছেদ ঘটানো হয় মায়া মমতার বন্ধন। বিসর্জনের দিন সংযত গুরুকে প্রণাম করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের মান্য করা এবং বিনয়াবনত শিষ্টাচারের মাধ্যমে সৌহার্দ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চালানো হয়।

www.pathagar.com

দুর্গা উৎসব নিয়ে আয়োজিত হয় নানা ধরনের মেলা। যেগুলো ৭ দিন, তিন অথবা একমাসব্যাপী স্থায়ী হয়। সিরাজগঞ্জ সদরে নদীর পাড়ে এবং মণ্ডপের আশেপাশে পূজা চলাকালীন সময়ে নানা ধরনের জিনিসের পসরা দেখা যায় এবং রাসেল পার্কে নানা ধরনের মাটির জিনিসপত্রসহ মিষ্টি জাতীয় খাদ্য, খেলনাও রয়েছে এখানে অনেক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। বিশেষ করে নাগরদোলা শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেলার অংশ তাদের মনে শান্তি ও ধর্মীয় মনোভাব ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে।

দুর্গোৎসবের অন্য তাৎপর্য যাই থাক, এখন তার মূল বাণী অমঙ্গল নাশের। যে দূর্গার পূজা আমরা দেখি, তিনি অসুরবধরতা দশপ্রহরণধারিণী, রভরঙ্গিনী দুর্গা। উল্লেখ্য, রাজা সুরথ আর শ্রীরামচন্দ্র যুদ্ধকালের সিদ্ধিদায়িনী দেবী রূপেই তাঁর পূজা করেছিলেন।

বলা হয়ে থাকে, হিন্দুর বারো মাসে তেরো পার্বণ। কথাটির ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট। মাসে মাসে পর্ব বা উৎসব ছিল একান্তভাবেই কৃষিসমাজের কাজ, যারা প্রতি মাসে প্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে এবং লক্ষিত পরিবর্তন অনুযায়ী প্রতি মাসেই কৃষিকেন্দ্রিক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে, হিন্দুর সব পার্বণ বা উৎসবই মূলে ছিল কৃষিকেন্দ্রিক।

৩. চড়ক উৎসব

সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার সায়দাবাদের রাধুনি গ্রামের বড়ুই তলায় চড়ক উৎসবের আয়োজন করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে, শিব-পার্বতী কৈলাস থেকে সকলকে দেখে। তো চড়ক পূজায় শলা, ছাতির শলা পিঠে, মুখে ঢুকানো হয়। যাতে করে তার পরিবারসহ সমগ্র জীব জগতের আর্থিক, শারীরিক ও সামাজিক সব দিক দিয়ে সমৃদ্ধি লাভ হবে। সেজন্য এই এলাকায় বৈশাখ মাসের শেষ ৭ দিন এই উৎসব ও পূজা পার্বণের আয়োজন করে থাকে। এছাড়া তিন দিন ও ৫ দিন অর্থাৎ বেজোড় হতে হবে। নির্ধারিত দিনে বিশাল একটা মাঠের মধ্যে সকলে একত্রিত হয়। এই উৎসবে ছেলে মেয়ে সকলেই অংশগ্রহণ করে। এছাড়া বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রতিমূর্তি ধারণা করে পূজা করে থাকে। পূজারীরা মন্ত্র পাঠসহ নানা আয়োজন শেষ করে। যারা শলাকা বিধ করবে তাদেরও পূজা অর্চনা শেষে মূল পূজারী তাদের গালে, জিহ্বায় ও পিঠে শলাকা বিদ্ধ করে দেয় এবং মন্ত্র পাঠ করে তাতে রক্ত ঝরে না এবং শলাকার সম্মুখ ভাগে যে কোনো একটা মৌসুমী ফল দেয়া হয়। বিশেষ করে কাঁচা আম দেয়া হয়। সেটা নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে নেচে টাকা উঠানো হয়। এভাবে গজারী গাছের সাথে দড়ি বেঁধে একজন ভক্তের পিঠে শলাকা বিদ্ধ করে সাত বার ঘুরানো হয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো ঐ অর্থে কোনো রক্ত ঝরে না। এইভাবে এই উৎসব চলে দুপুর থেকে বিকাল পর্যন্ত। এই উৎসব কেন্দ্রিক মেলা হয়। এখানে নানা ধরনের মিষ্টি জাতীয় খাদ্যদ্রব্যসহ মাটির খেলনা পাওয়া যায়। এই উৎসব খুবই জনপ্রিয় এবং ভীতিকরও। তথাপি গ্রাম-গঞ্জের একেবারে নিছক উৎসব যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং থাকবে মূলত বিশ্বাসের জায়গা থেকেই।

www.pathagar.com

৪. চড়ক পূজা

শিব-পার্বতী কৈলাস থেকে সকলকে দেখে। কিভাবে সকলে তাদের পূজা অর্চনা করছে এসব। তো চড়ক পূজায় শলা, ছাতির শলা (যথাক্রমে পিঠে ও মুখে) ঢুকানো ও ঘুরা হয়। বিশ্বাস এতে মঙ্গল হবে। সেই বাকি করবে তার, তার পরিবারের ও সমগ্র জীব-জগতের। আর্থিক, শারীরিক, সামাজিক সব দিক দিয়ে। শিব-পার্বতী কথায় নির্মিত মন্ত্র দ্বারা ব্যথা ও রক্ত পড়া রোধ করা হয়। মন্ত্র বলা যায় না। মন্ত্র পড়ে জল পড়ে দিলে সেই স্থানে মন্ত্র পড়া হচ্ছে সেই স্থানের রক্ত সরে যায় এবং তখন সেখানে শলাটা ঢুকালে রক্ত পড়ে না। খোলার সময় শিবের যে মাটি বা বেলপাতা সিঁদুর থাকে তা মন্ত্র পড়ে দিতে হয়। শিব-পার্বতীর নাম ও দেবতার ধর্মের নামে দোহাই দিয়ে মন্ত্র পড়া হয়। এই মাটি বা বেলপাতার গুণে ঘা হয় না রক্ত বের হয় না এবং পরে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়। এই মন্ত্র যে কাউকে বলা যায় না। শুধু গুরু শিষ্যকে বলে যান।

এ সম্পর্কে একটা লোকপুরাণ প্রচলিত। ত্রেতা যুগের বান রাজা ছিল শিবের ভক্ত। সে শিব-পার্বতী আরাধনা করে শক্তি অর্জন করেছিল। সেই থেকে সে যা করত এবং পার্বতী তাতে বশীভূত থাকত এবং তারা তাই করত। পার্বতীতে সে শক্তি পেয়ে অহংকারী হয়ে উঠল। বান রাজা ছিলেন দৈত্যকুলের রাজা। অহংকারের জোরে সে নারায়ণ তথা কৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ বাঁধালো কৃষ্ণ হলেন ভগবান। কৃষ্ণের কাছে পরাজিত হয়। যুদ্ধে শিব-পার্বতী কৃষ্ণের পক্ষ নেয়। তখন বান রাজা পরাজিত হয়। পরাজিত হলে একটি কাঠামো তৈরি করেন যাকে বলা হয় শিবের কাঠ বা এর মধ্যে শঙ্খ চক্র গদা, পদ্ম, ত্রিশুল এর মধ্যে ত্রিশুল মাঝার গাড়ে। নিমকাঠ, বেলকাঠ এসব লাগে। নিমকাঠ না হলে বেল কাঠ, অবশ্য নিমকাঠই শ্রেষ্ঠ। প্রথমে শঙ্খ-মাথার তারপরে চক্র মানে চাকা, এরপর গদা-মানের ভীতে যে গদা ছিল সেই গদা, তারপরে পদ্ম, মানে একটা পদ্ম ফুল, এই কঠের মধ্যে খোদাই করে অঙ্কিত করা হয়। শেষে ত্রিশুল এই কাঠের মধ্যে লোহা টিন বানিয়ে ওইটা গ্যাড়া হয়, ত্রিশুল হল মহাদেবের ত্রিশুল। তার থাকে মহাদেব আর একটা বসা বলদ বা বৃষ। রেখে মহাদেবের ছবি অঙ্কিত করা হয় তার মধ্যে অর্থাৎ তার দেহটাকে গঠন হয়। শেষে ঐ গাছশুদ্ধ পূজা দেওয়া হয়। অবশেষে বানর ওইটাকে স্থাপন করে নিয়ে; নারায়ণ মানে-শঙ্খ, পদ্ম, গদাটা নরায়ণ অর্থাৎ ভবানের অংশ। আর শিবের অংশ যেখানে রেখে উনি কায়মন চিত্তে আরাধনা করে। তখন সে আরাধনা করল, শিবকে রেখে শিব-পার্বতীর যুগল পূজা করা হয় শেষের দিন।

এই পূজা ৭ বা ৫ বা ৩ দিন করা। মাসের শেষ দিন মূল পূজা হবে। সেই হিসেবে ৩ দিন যদি পূজা হয় তবে ২৮ তারিখ থেকে অনুষ্ঠান আরম্ভ হবে। ৭ দিন হলে ২৭ তারিখে। বান রাজা যে ওই কাঠের মধ্যে যে খোদাই করে রাখল শেষে ওইটাই পূজা দেন। তারপর আমাদের লোকাচারে ওইটাই প্রচার লাভ করে। ওই জন্য নাম রাখা হয়েছে যে ত্রেতা যুগে দৈত্যকূলের রাজা বান রাজা উনি নিম কাষ্ঠের মধ্যে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম এবং ত্রিশুল এবং মহাদেবের চিত্র অর্থাৎ দেহ অঙ্কিত করে, বলদসহ এটাকে অঙ্কিত করে, খোদাই করে পূজা করেন এবং শেষে শিব-পার্বতীকে উনি ধ্যান যোগে

www.pathagar.com

সন্তুষ্ট করার জন্য শিবের আরাধনা করেন। এই আরাধনা করে তিনি শক্তি পান। ভগবত মতে, কৃষ্ণের পুত্রের সাথে বান রাজার মেয়ের বিয়ে হয়। মেয়ের ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণের পুত্রকে বিয়ে করবে। কিন্তু বান রাজা রাজি ছিল না। শেষে কৃষ্ণ তাকে বান রাজার রাজ্য থেকে তুলে নিয়ে আসে। প্রথমে কৃষ্ণের পুত্র যুদ্ধে যায়। পরে কৃষ্ণ স্বয়ং সুদাসন চক্র নিয়ে গিয়ে বান রাজাকে পরাজিত করে বান রাজার মেয়েকে নিয়ে আসে। বান রাজা বিয়েতে রাজি ছিল না কারণ কৃষ্ণ রুক্সিনীকে বিয়ে করেছিল। রুক্সিনী ছিল দানব রাজার মেয়ে। সে ছোট থেকেই কৃষ্ণের পূজা আরাধনা করেছিল যাতে কৃষ্ণকে পতিরূপে পায়। তো কৃষ্ণ তাকে বিয়ের আসর থেকে রথযোগে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। তাই বান রাজা বলেছিল ও তো চোর (কৃষ্ণ)। আর কৃষ্ণের পুত্রকে বলেছিল চোরের পুত্র চোর। এরা শিবের পূজা করতে অহংকারের জন্য নয় মানব কল্যাণের জন্য। বান রাজা ছিলেন দানব তাই তার অহংকার হয়েছিল। কিন্তু মানুষের তো অহংকার করা যাবে না। কিন্তু বান রাজার কাছ থেকেই এই পূজাচার এসেছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করেন এই পূজার মাধ্যমে শিব-পার্বতীকে সন্তুষ্ট করা ও কল্যাণ আনয়ন করা সম্ভব। যাদের এ পূজার প্রতি নিষ্ঠা, আগ্রহ আছে তারা উপবাস থাকে। এতে মেয়েরাও অংশ নিতে পারে। গোটা সমাজ এ পূজায় অংশ গ্রহণ করে। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে চাল, টাকা, ফল, ডাল আনা হয়। মূল পূজার দিনের আগ পর্যন্ত নেচে গেয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষা করা হবে। শুধু ছেলেরা এতে অংশগ্রহণ করবে। সারযুক্ত গজারি গাছ। সারযুক্ত গাছ বলে এতে ঘুণ ধরে না। পূজার দিন সকালে বা আগের রাতে পানি থেকে তোলা হয়। সারা বছর পানিতেই ডুবানো থাকে। বাঁশ ও সারি ও পাকা হয়। যাতে ভেঙে না পড়ে। সাত পাক দেওয়া হয় সাধারণত। যাকে পাক দেওয়া হয় সে তার পিঠে শূল বিধানোর আগে ১০৮ বার রুদ্রাক্ষের মালা গোনা হয় অর্থাৎ পুরো মালাটা। এ সময় তার কানে কানে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে। পুরোহিত যে মন্ত্র পড়ে তা বলা যাবে না কিন্তু মালা গোনার সময় বলা হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. ফজল সরকার, পিতা : প্রবাদ সরকার, মধ্যপাড়া, বহুলী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫২, শিক্ষা : নিরক্ষর।

২. বেলাল হোসেন, পিতা : মোটকা খান, গ্রাম : মধ্যপাড়া, বহুলী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪০, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

৩. আব্দুস সামাদ, পিতা : ইঞ্জিল, গ্রাম : রবুর গাঁতী, বহুলী সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৬, শিক্ষা : নিরক্ষর।

৪. ঠান্ডু মন্ডল, গ্রাম : মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, বয়স : ৭০, শিক্ষা : নিরক্ষর।

www.pathagar.com

লোকাচার

১. আকিকা

মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ আচার হলো আকিকা। সাধারণত শিশুর জন্মের পর সাতদিন অথবা এক, দুই ও তিন মাসের মধ্যে আকিকা দেয়া হয়। ঐদিন শিশুর নামকরণ করা হয়। মূলত সন্তানের মঙ্গল কামনার জন্য আকিকা দেওয়া হয়। ছেলে ও মেয়ে শিশুদের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ছেলেদের ২টি ছাগল ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ১টি ছাগল অথবা উভয়ের জন্য একটি গরু জবাই করে আকিকা দেওয়া হয়। আকিকার অনুষ্ঠানের ছাগল ও গোরু জবাই করে মাংস বিলিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে আবার রান্না করে আত্মীয় স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে আপ্যায়ন করে থাকেন। আকিকার মাংস নবজাতকের পিতা-মাতা খেতে পারবে না, এতে সন্তানের মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিষয় জড়িত। মূলত প্রাণের বদলে প্রাণের প্রত্যাশা অনুকরণধর্মী জাদু বিশ্বাসের প্রভাবে এই আচারটি প্রচলিত। যাতে করে নবজাতকের কাছে থেকে সকল প্রকার অশুভ শক্তির হাত থেকে মুক্তি লাভ হয় মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে।

২. গায়ে হলুদ

সামাজিক জীব হিসেবে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্র। আর পরিবারে একত্রে বসবাসের সামাজিক স্বীকৃতি হলো বিবাহ। জৈব ও সাংস্কৃতিক আচরণের মিশ্রফল বিবাহের মাধ্যমে বিকাশ লাভ করে। মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে নানা আচার ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। বিবাহে শাস্ত্রীয় আচারের পাশাপাশি বিবিধ লৌকিক আচারও পালিত হয়। ইসলাম, হিন্দু, খ্রিস্টানসহ নানা ধর্মে বিবাহের শাস্ত্রীয় আচরণ বিদ্যমান। তথাপি অনেকগুলো আচার পালন করা হয় যা শুধুমাত্র শুভ ও অশুভ শক্তির প্রতি ভীতি থেকে। সিরাজগঞ্জ জেলায় বসবাসরত মানুষের বিবাহে আচার প্রথাগুলো আলোচনা করা হলো।

আচারগুলোর মধ্যে সার্বজনীন পালিত অনুষ্ঠান গায়ে হলুদ। হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিন্ন আঙ্গিককে এ আচার পালন করা হয়ে থাকে। আবার শাস্ত্রীয় ধর্মে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানকে নিষেধাজ্ঞা হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। তবুও বাঙালি সমাজব্যবস্থায় গায়ে হলুদবিহীন বিয়ে মানানসই হয় না। বিয়ের পাকা কথা ঠিক হওয়ার পর দিনক্ষণ অনুযায়ী হলুদসহ বিয়ের অন্যান্য অনুষ্ঠানে পালন করা হয়ে থাকে। বর ও কনের উভয় বাড়িতে এ আচার পালন করা হয়ে থাকে। সাধারণত এয়ো আত্মীয়রা পিঁড়ি বা পাটি সুন্দর করে সাজিয়ে থাকে। এতে অনেক রকমের আল্পনা করা হয়। এ সময় বর ও কনে নতুন পোশাক পরে থাকে। সাধারণত বর লুঙ্গি বা ধুতি আর

www.pathagar.com

কনে হলুদ শাড়ি পরে থাকে। রঙ বিরঙের ডালা সাজানো হয় বর ও কনের বাড়িতে। এতে থাকে বাঁটা হলুদ, নতুন পোশাক, পান, সুপারি, প্রশাধনী, ধান, দূর্বা, তিল, যব, সরিষা, বাঁটা মেহেদি, সিঁদুর, চন্দন, মিষ্টি, পঞ্চ প্রদীপ ইত্যাদি। গোসলের আগে বর বা কনেকে কোলে তুলে পিঁড়ি পর্যন্ত নিয়ে আসা হয়। একটি কাসা বা পিতলের কলসে অথবা মগের মধ্যে আমগাছের পাতা দিয়ে সাজানো হয়। প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন থেকে ৬জন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ বর বা কনের মাথায় প্রথম পানি দেয়। এ সময় গীত গাওয়া হয়। তারপর পরিবারের বড়দের কেউ প্রথম হলুদ মাখিয়ে দিয়ে থাকেন। হলুদ মূলত সৌন্দর্য ও অশুভ শক্তির প্রতিশেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গোসল সম্পূর্ণ করার পর ঘরে তোলা হয়। তারপর নতুন পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানকালে হলুদের আনুষ্ঠানিকতা ভিন্ন আঙ্গিকে পালন করা হয়। কনেদের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে আর বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে হলুদ দিয়ে আসে। সাধারণত বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যার সময় অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়ে থাকে। পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র ডালায় সাজিয়ে বর ও কনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। কনের বাড়িতে বরের বাড়ি থেকে আসা আমন্ত্রিত অতিথিদের মিষ্টি ও ফুল উপহার দেওয়ার মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। কনে ও বরকে আলাদা এবং একত্রেও বসানো হয়ে থাকে। এ সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই জাতীয় সকলে পোশাক পরে। বিশেষ করে হলুদ রঙের শাড়ি অথবা ছেলেরা পাঞ্জাবি পরে। হলুদ গায়ে মাখা এবং মিষ্টি মুখ করানো হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আশীর্বাদস্বরূপ টাকা অথবা উপহার দেওয়া হয়। এভাবেই নানা আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে গায়ে হলুদের পর্ব সমাপ্তি ঘটে।

৩. বউবরণ

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বউকে বরের বাড়িতে প্রথম প্রবেশে এই আচারটি পালন করা হয়। বর কনেকে নিয়ে গৃহে ফিরে এলে মা তাদের একত্রে বরণ করে ঘরে তোলেন। পাটিতে বসিয়ে ক্ষীর বা মিষ্টান্ন অথবা দুধ খায়ানো হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে বরকে এবং পরে স্ত্রীকে খাওয়ানো হয়। এতে করে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ধারণা করা হয়। অনেক সময় পালকি থেকে ঘরের দরজা পর্যন্ত কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হয়। ধান ও দূর্বা দিয়ে তিনবার করে বর ও কনেকে বরণ করে নেয়া হয়। এতে বিশ্বাস রয়েছে যে, ধান ও দূর্বা ঐশ্বর্যের প্রতীক নতুন বউ উপলক্ষ্যে তা অব্যাহত থাকবে আর তিন, পাঁচ, সাত বার করে জাদুক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এরূপ রীতি প্রচলিত।

৪. মুখে ভাত/অন্নপ্রসান

শিশুর জন্মের পর থেকে বড় হওয়া অবধি নানা ধরনের আচার পালন করা হয়। যা কেবলমাত্র শিশুর সুস্থ ও মঙ্গল কামনার নিমিত্তে পালিত আচার রীতি। তেমনি শিশুর জীবনের সাথে অন্নপ্রসান অতোপ্রতোভাবে জড়িত। সাধারণত নবজাতকের নাম রাখার রীতিকে হিন্দু সমাজে বলা হয় অন্নপ্রসান। অনেকের ধারণা ছেলেদের জন্য বিজোড় ও

www.pathagar.com

কন্যার জন্য জোড় মাসে অন্নপ্রসান করার রীতি প্রচলিত রয়েছে। এ অনুষ্ঠানেই সর্বপ্রথম শিশুর নাম রেখে মুখে অন্ন তুলে দেয়া হয়। আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথমে কয়েকটি নাম নির্বাচন করা হয়। এরপর চালুন বা কাঁসার থালায় তেলফুর্ণ দিয়াবিতে সলতে দেওয়া হয়। দিয়াবির নিচে থাকে ধান। তিন বা পাচটি নাম কাগজে লিখে দিয়াবির নিচে বসিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। যে দিয়াবির আগুন

সবচেয়ে শেষে নিভে সেই নামটি নির্বাচন করা হয়। নবজাতকের দীর্ঘজীবিতা এক্ষেত্রে বিশ্বাস হিসেবে কাজ করে। যা শিশুকে সকল প্রকার যম বা অকল্যাণকর বিষয়াদি থেকে রক্ষা করবে।

৫. বৌভাত

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে বৌভাত অন্যতম। সাধারণত বর ও কনেকে নিজগৃহে আনার পর কন্যার বাড়ি থেকে কনেকে নিজ গৃহে নেওয়া এবং বরের আত্মীয় স্বজনের জন্য এ আয়োজন করা হয়। আর্থিক সামর্থ অনুযায়ী বিয়ের পরদিন অথবা তৃতীয় দিন বরের বাড়িতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। নববধূকে আমন্ত্রিত অতিথিরা আশীর্বাদসহ উপহার সমাগ্রী দিয়ে থাকে। হিন্দু রীতিতে ঐদিন নববধূ প্রথম রান্না করে নেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকতা শেষে বর ও কনেকে কনের বাবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়।

তথ্য নির্দেশ

১. বাউল হারুন, পিতা : মৃত. শুকুর মোহাম্মদ তালুকদার ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৩, শিক্ষা : সপ্তম শ্রেণি পাস।

২. মো. করিম শেখ বয়স : ৬২ বছর, পেশা : কামার, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, রেলওয়ে কলোনী, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

৩. মো. শামসুল আলম, পিতা : মোঃ জমসের আলী শেখ, বয়স : ৩০ বছর, পেশা : কামার, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, ধীতপুর কানু, বহুলী, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

৪. মো. আল-আমীন, পিতা : মমতাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী, পেশা : কামার, ধানবান্দি, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ।

৫. রহিম পাগলা, পিতা-মৃত আষাণ মন্ডল, গ্রাম : খাদুলী, ডাকঘর : পাঙ্গাসী, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬০ বছর, স্থান : জিন্দানী মাজার শরীফ, সময় : দুপুর ১২ টা।

৬. ডশলা, পিতা : নূর মোহাম্মদ, চক মিরাকোল, বাগবাটি, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি, পেশা : ছাত্রী।

www.pathagar.com

লোকমেলা

১. কোনাবাড়ির ঐতিহাসিক স্নানের মেলা

বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনাবাড়ির ঐতিহাসিক স্নানের মেলা একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এ স্থানটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত উল্লাপড়া উপজেলাধীন দূর্গানগর ইউনিয়নের কোনাবাড়ি নামক গ্রামে অবস্থিত। এ গ্রামের পাশ দিয়ে করতোয়া নদী প্রবাহিত এবং এ নদীতেই স্নানের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নগরবাড়ি বগুড়া মহাসড়কে অবস্থিত বালসাবাড়ি বাসস্ট্যান্ড থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার পূর্বদিকে মেলার স্থানটি অবস্থিত। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অগণিত মানুষ এ মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। মেলার ইতিহাস বর্ণনা দিতে গিয়ে শ্রী নির্মল

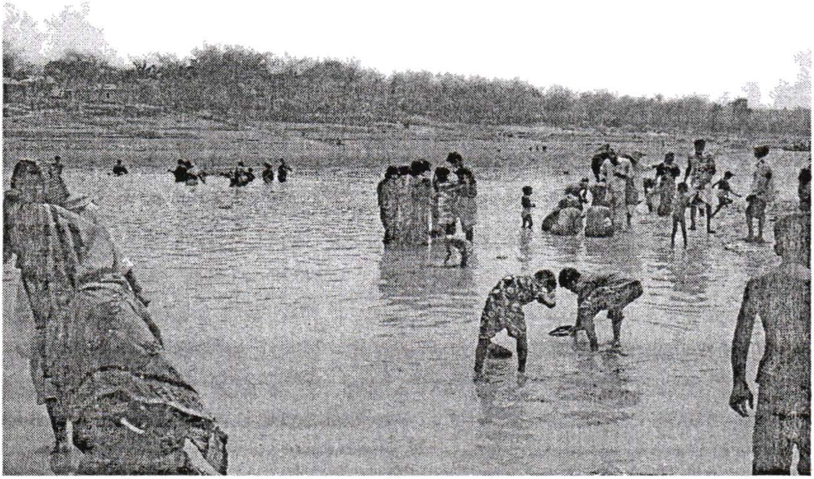

কুমার চক্রবর্তী, শ্রী নেপাল কুমার চক্রবর্তী, গুরুদাসী ও রেণুবালা বলেন, বারণীদোল উপলক্ষ্যে মধুকৃষ্ণ ত্রোয়োদশী তিথিতে প্রতিবছর দিনব্যাপী অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেলায় বিভিন্ন বর্ণ ও গোত্রের হিন্দু নারী-পুরুষ একত্রিত হয়ে নদীতে স্নান করে। তাদের ধারণা সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে নদীতে স্নান করার মাধ্যমে তাদের রোগ-শোক, দুরারোগ্য, বালা-মসিবত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা যায়। মেলায় হিন্দুদের পাশাপাশি অনেক মুসলমানকেও অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। ফুলেশ্বরী ও ক্ষীতেন চক্রবর্তীর জানা মতে দীর্ঘদিন যাবৎ এ মেলা অনষ্ঠিত হয়ে আসছে। ঠিক কতদিন পূর্ব এ মেলা শুরু হয়েছে তার সঠিক হিসাব নির্ণয় করা সম্ভব

www.pathagar.com

হয়নি। নদীর কিনারায় বিভিন্ন রঙের কাপড়ের উপর মেলায় আগত লোকজন চাল, ডাল, ডিম, টাকা-পয়সা, দান করে থাকে। দান শেষে এসব জিনিসপত্র বিশেষ করে চাল, ডাল ও ডিম দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদয়ের বিভিন্ন মন্দিরে সবাই একত্রিত হয়ে খেয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ কার প্রয়োজন যে, বিভিন্ন রঙের কাপড়ের উপর হিন্দুদের নানাপ্রকার দেবতার ছবি যেমন : গোপালভাড়, নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, গোবিন্দ, লক্ষী, সরস্বতী ও মহাদেবকে প্রদর্শন করতে দেখা গেছে।

এ স্নানের মেলায় 'পাট ঠাকুর' নামক এক প্রকার কাষ্ঠনির্মিত জিনিসকে স্নান শেষে ওপরে তুলে নানাপ্রকার জিনিসপত্র যেমন : দুধ কলা, চাল, ডাল, টাকা-পয়সা থেকে শুরু করে যে যা পারে তা দান দিয়ে থকে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এ পাট ঠাকুরটি নিম কাঠ অথবা বেল কাঠ দিয়ে তৈরি। বেশিরভাগ ঠাকুর দেখতে অত্যন্ত কালো এবং এতে নানাপ্রকার ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়। এ ঠাকুরকে সামনে রেখেই অনেকে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বাঁজিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে মেতে ওঠে। দিন শেষে সন্ধ্যার দিকে এ ঠাকুরকে নিয়ে গিয়ে পরবর্তী দিন থেকে চৈত্র মাসের ৩০ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন বাড়ি গিয়ে নানাপ্রকার জিনিসিপত্র যেমন : চাল, ডাল, আলু, ডিম, কলা, দুধ ও ডাব উঠিয়ে পরে তা পুজা ও রান্নার করে ভোগ করা হয়। এখানে আরো উল্লেখিত যে, এর সাহায্যে পরবর্তীতে চড়কের মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। এ মেলায় অনেক পুরোহিত স্নান শেষে গীতা পাঠ করে থাকে। গীতা পাঠের সাহায্যে অনেক পুরোহিত তাদের দান ও ধ্যনের সাহায্যে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা সৃষ্টিকর্তার নিকট পেশ করে থাকে। তাদের ধারণা এ স্থানটিই হলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পাপ মোচনের একটি পীঠস্থান।

স্নানের মেলায় বিভিন্ন প্রকার কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈরি সৌন্দর্যমণ্ডিত আসবাবপত্র বিক্রয় হয় যা মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ না করে পারে না। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার মিষ্টি জাতীয় খাবার যেমন : চিনি ও গুড়ের জিলাপি, রসগোল্লা, বাতাশা, ঝুড়ি, মুড়কি, সাঁচের সদাই, ভাজা, সন্দেশ ইত্যাদি পাওয়া হয়। মেলায় ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েদের রঙ বেরঙের খেলনা, বেলুন, চুড়ি, মালা, ফিতা, বাঁশি, নাক ও কানের গহনা প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। কোনাবাড়ির স্নানের মেলা আমাদের লোকসংস্কৃতির গ্রামীণ ধর্মীয় উৎসবের চিরায়েত আমেজ লালন করে চলছে।

২. বউ মেলা

মোঃ মজনু মিয়া বউ মেলার কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়া বলেন, এ মেলাটি হজরত শাহ শরীফ জিন্দানী (রহ.) এর মাজার শরিফের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। এ স্থানটি সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ গ্রামে প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম শনি ও রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, এ স্থানটিতেই হজরত শাহ শরিফ জিন্দানী (রহ.) এর নামানুসারে এক বিশাল ওরশ শরিফ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ওরশ শরিফ প্রতিবছর চৈত্র মাসের প্রথম শুক্রবারে হয়ে থাকে। এ ওরশকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান এসে ভিড় জমান। ওরশের পরবর্তী

www.pathagar.com

দুই দিন অর্থাৎ শনি ও রবিবারের বউ মেলা হয়ে থাকে। মূলত শুক্রবারের ওরশে পুরুষরা দলে দলে যোগদান করায় মহিলারা এতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। তাই ওরশের পরবর্তী দুইদিন মেয়েদের জন্য এ ধরনের মেলার ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মহিলারা এসে ভিড় করে। যার জন্য এই মেলার নামকরণ করা হয় বউ মেলা। মহিলারা এ মেলায় যোগদান করে মেলা থেকে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র যেমন : জায়নামাজ, কোরআন শরিফ, মোমবাতি, আগড়বাতি ও লাল, কালো

এবং সাদা রঙের কাপড় ক্রয় করে পীরের মাজারে মানত করে। তারা এ মানতের সাহায্যে পীর মারফত আল্লাহর নিকট তাদের বিভিন্ন প্রকার দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার কথা জানান। এখানে উল্লেখ্য যে দুই দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হলেও মূলত প্রথম দিন প্রচুর পরিমাণে মহিলারা মেলায় অংশগ্রহণ করে থাকে। অবশ্য পরের দিন মহিলাদের সংখ্যা অনেকটা কমে যায়। মাজার শরিফের মানত শেষে মেয়েরা তাদের বিভিন্ন প্রকার পছন্দের জিনিসপত্র যেমন : চুড়ি, মালা, ফিতা, হেজাপসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে থাকে। মেলার নাম বউ মেলা হলেও মহিলাদের সঙ্গে কিছু কিছু পুরুষ লোকদেরও দেখা যায়। যারা এলাকার নিকটবর্তী মহিলা তারা মূলত পায়ে হেঁটেই মেলায় চলে আসে। আর যারা একটু দূরে থেকে আসে তারা বিভিন্ন প্রকার যানবাহন যেমন : ভ্যান, রিক্সা, লসিমন, করিমন ইত্যাদির সাহায্যে মেলায় অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া যারা বেশি দূর থেকে আসে তারা যানবাহন হিসেবে বাস ব্যবহার করে থাকে। দুই দিনব্যাপী মেলার শেষ দিন বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যেই সমাপ্তি ঘটে। বাংলার ইতিহাস ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে এ বউ মেলাটি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। তাই এ স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি আমাদের সকলের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

৩. তাড়াশের ঐতিহ্যবাহী দইমেলা

সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত তাড়াশ উপজেলার ঐতিহ্যবাহী দইমেলা বৃহৎ চলনবিলের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দইমেলাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর চলনবিলের তাড়াশ, উল্লাপাড়া, বোনাইনগর ফরিদপুর, ভাঙ্গুরা, চাটমোহর ও গুরুদাসপুর উপজেলার লোকজনের এক মিলনমেলা বসে। স্থানীয়দের মতে, দইমেলার সূত্রপাত হয় প্রায় ২০০ বছর আগে। তৎকালীন চলনবিলের জমিদার রাজস্বী রায় বনমালী রায়বাহাদুর তার এক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করতে তাড়াশে এক ভোজের ব্যবস্থা করেন। জমিদারের কর্মচারীরা সরস্বতী পূজা বা শ্রীপঞ্চমীর দিনে জমিদারের বন্ধুকে দই, মিষ্টি, চিড়া, মুড়ি ও খই দিয়ে মধ্যাহ্নভোজের ব্যবস্থা করতেন। আর তখন থেকেই সরস্বতী পূজার দিনে দইমেলার আয়োজন হয় এ অঞ্চলে। কারও কারও মতে, দইয়ের গুণগত ও উৎকৃষ্টতার মানদণ্ডে জমিদার বনমালী রায়বাহাদুর ঘোষালদের মধ্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা করে উৎসাহিত করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এসময় প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও অনেকের আত্মীস্বজন বেড়াতে আসতেন তাড়াশে।

দইমেলার স্থান : সিরাজগঞ্জ জেলা শহর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে তাড়াশ উপজেলা সদর। উপজেলা দক্ষিণ পশ্চিম কোনে তাড়াশ প্রেস ক্লাব সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠে সরস্বতী পূজার দিনে দিনব্যাপী এ মেলা বসে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দইমেলায় বগুড়ার শেরপুর, নাটোরের গুরুদাসপুর, সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, তাড়াশ, উল্লাপাড়া ও রায়গঞ্জ এবং পাবনা জেলার বোনাইনগর ফরিদপুর, ভাঙ্গুরা ও চাটমোহরসহ পার্শ্ববর্তী বেশ কয়েকটি উপজেলা থেকে প্রায় ৫থেকে ৬শ ঘোষাল দই বিক্রি করতে এখানে আসেন। সিরাজগঞ্জ-বনপাড়া-নাটোর মহাসড়কের মহিষলুটি নামক স্থানে বাসে এসে অটোরিকশা বা নছিমনে প্রায় ৬ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করলেই দইমেলা। তবে সরস্বতী পূজার দিনেই এ মেলা বসে।

৪. দইমেলার পণ্যসামগ্রী

দইমেলার নাম শুনে অনেকেই ধারণা করতে পারেন যে, এখানে শুধু দই পাওয়া যায়। কথাটি মোটেও ঠিক না। সাড়া, ক্ষীর, খাসিয়ানা, ক্ষীরশাপাতসহ বিভিন্ন ধরনের দইয়ের পাশাপাশি চিড়া, মুড়ি, মুড়কিসহ চিনি ও গুড়ের তৈরি গজা, কদমা, সন্দেশ, মিষ্টি, জিলাপিসহ বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবারেরও মেলা বসে। আগে দাম সস্তা হলেও এ বছর দাম তুলনামূলক একটু বেশি। দুই কেজি দইয়ের দাম ২৫০ থেকে ৩৫০ টাকা এবং ১ কেজির দাম ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। স্থানীয়রা বলেন, সে স্বাদ এখন আর পাওয়া যায় না।

৫. দইমেলায় যারা আসেন

আগে এ দইমেলা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও আদিবাসীদের এক মিলনমেলা। চলনবিল অঞ্চলের সামান্য উপার্জনকারী কৃষক বা জেলে বছরের কোনো সময়ে দই না কিনলেও দইমেলায় অন্তত ১ কেজি হলেও কেনেন বা আত্মীয় স্বজনকে উপহার দিয়ে থাকেন। এসব অঞ্চলের আত্মীয়

www.pathagar.com

স্বজন যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পেশায় আছেন, তারাও বছরের এ দিনে তাড়াশের আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসেন দইমেলাকে উপলক্ষ্য করে। আর ঠিক তখনই দইমেলা মিলনমেলায় পরিণত হয়।

৬. দইমেলাকে ঘিরে স্থানীয়দের মন্তব্য

তাড়াশ পাইলট স্কুলের ধর্মীয় শিক্ষক অখিল কুমার রায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমরা প্রায় ৩ পুরুষ অর্থাৎ প্রায় ১৫০ বছর হলো এখানে বাস করছি। এটি একটি আঞ্চলিক মেলা হলেও এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। প্রতি বছর ৭শ থেকে ৮শ ঘোষাল প্রায় ৮থেকে ১০ হাজার মণ দই নিয়ে এসে এখানে কেনাবেচা করতেন। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে মানুষ অনেক হিসেবি হয়ে গেছে। এখন আর আগের মতো কেনাবেচা হয় না। তথাপি আমাদের অনেক আত্মীয় স্বজন দূর্গা পূজার পাশাপাশি এ দইমেলার কথা বিবেচনা করেন। প্রায় ২০০ বছর আগে এ মেলার সূত্রপাত হলেও এখনও তা ম্লান হয়ে যায়নি। দইমেলায় দই বিক্রেতা প্রফুল্ল চন্দ্র আক্ষেপ করে বলেন, এখন আর আগের মতো কেনাবেচা হয় না। আর সে স্বাদতো দূরের কথা, গুণগত মানও ঠিক রাখা দায়। দুধের দাম বেশি, তারপরও মেলায় আসি পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য।

রথযাত্রা ও রথমেলা : বাংলাদেশের পূজা পার্বণ ও উৎসবের দেশ হিসেবে পরিচিত। এখানে বার মাসে তের পার্বণের আয়োজন করা হয়। ধর্মী ও সামাজিক আচারের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে আছে লোকাচার। যা শাস্ত্রীয় বন্ধন থেকে মুক্ত। তেমনি একটি ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো রথযাত্রা তথা রথ উৎসব। সিরাজগঞ্জেও এ উৎসব ঘটা করে পালন করা হয়। এ মেলার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, পুরীতে ইন্দ্রদুম্মে রাজার সময় সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেবের রথটানা হয়। রথযাত্রা উৎসবে জগন্নাথ দেব মন্দির ছেড়ে জনগণের মধ্যে নেমে আসেন এবং গুন্তিকাগৃহে সাতদিন অবস্থান করে পুনরায় মন্দিরে ফিরে যান। হিন্দুদের বিশ্বাস রথ শ্রীকৃষ্ণ তথা জগন্নাথ দেবকে দেখলে পুনর্জন্ম হয় না। পাপ কর্মের জন্য পুনর্জন্ম হয় এবং পূর্বের কর্মফল অনুযায়ী সে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে।

আষাঢ় মাসের শুক্লা পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথযাত্রা উৎসব ও রথযাত্রা মেলা শুরু হয়। এবং নয়দিন ব্যাপি চলতি থাকে। রথ টানার পূর্বে মন্দিরে গীতা পাঠ, পদাবলী কীর্তন, অগ্নিহোত্র যঞ্চ, ভজন সন্ধ্যা, মহাপ্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক পূজা অর্চনা সম্পন্ন করা হয়। ৮ম দিনের পর ৯ম দিনে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে টেনে পূর্বের স্থানে নেয়া হয়। একে উল্টো রথ বলে। সিরাজগঞ্জ সদরে কালিবাড়ি পূজা মণ্ডপ, যুগল কিশোর মন্দির, সপ্তর্ষী সংসদ পূজা মণ্ডপ এই তিনিটি মন্দির থেকে রথযাত্রার উৎসবের আয়োজন করা হয়। কালি বাড়ির পূজা মণ্ডপের রথ যমুনা নদী সংলগ্ন অবদা অফিস বরাবর রথযাত্রা স্থায়ী করা হয় এবং ৯ম দিনে আবার পূজা মণ্ডপে নিয়ে আসা হয়। যুগল কিশোর মন্দির ও সপ্তর্ষী সংসদের পূজা মণ্ডপের রথযাত্রা মানিক চাঁদ ভবনের সামনে রাখা হয় আবার পুনরায় নিয়ে আসা হয়। এ উপলক্ষ্যে রথযাত্রা মেলা

www.pathagar.com

বসে মারড়ারী পট্টি ও কালি বাড়িতে। সিরাজগঞ্জে সবচেয়ে প্রাচীন মণ্ডপ হিসেবে রথযাত্রা দিক থেকে কালী বাড়ি পূজা মণ্ডপই প্রাচীন। রথ যাত্রার প্রাক্কালে ভাবকীর্তন, ঘোল করতলে বাদ্য উলুধ্বনির মাধ্যমে পূজা অর্চনা সম্পন্ন করা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে অনেক লোকের সমাগম হতো যা কালক্রমে মেলার রূপ গ্রহণ করে। রথ কাঠের তৈরি মঠের আকারবিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য কাঠামো। রথের নিচে কাঠের চাকা লাগানো থাকে। একতলা, দুইতলা, তিনতলা পর্যন্ত রথ তৈরি হতে পারে। রথের মাঝখানে স্থাপন করা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। রথের সাথে লম্বা দড়ি বেঁধে ভক্তবৃন্দ সারিবদ্ধভাবে রথটি এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে টেনে নিয়ে যায়। নারী পুরুষ সকলে রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তারা মাঝে মাঝে উলুধ্বনি দেয়, বাদ্যভাররা খোল করতাল বাদ্য বাজায়, কীর্তনীয়রা কীর্তন গায়। রথ যাত্রায় সবসময় নামকীর্তন গাওয়া হয়। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে আয়োজিত রথমেলা স্থান ভেদে দুদিন থেকে তিনদিন পর্যন্ত চালু থাকে। মেলায় সব ধর্মের লোকজনের অংশগ্রহণ করে থাকে।

তথ্য নির্দেশ

১. ফজল সরকার, পিতা : প্রবাদ সরকার, মধ্যপাড়া, বহুলী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫২, শিক্ষা : নিরক্ষর।

২. বেলাল হোসেন, পিতা : মোটকা খান, গ্রাম : মধ্যপাড়া, বহুলী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪০, শিক্ষা : স্বাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

৩. আব্দুস সামাদ, পিতা : ইঞ্জিল, গ্রাম : রবুর গাঁতী, বহুলী সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৬, শিক্ষা : নিরক্ষর।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

গ্রামপ্রধান অশিক্ষিত জনসাধারণ নিজেদের শরীরচর্চার জন্য এবং সর্বোপরি আনন্দ বিনোদনের জন্য বহু খেলাধুলা, ব্যায়াম ও প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। এগুলোর কিছু সংখ্যক হয়তো শুধু অঙ্গভঙ্গিমাকেন্দ্রিক। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ নিয়মকানুন অনুসরণ করে বহু খেলার উদ্ভাবন করা হয়েছে যা এখনো দেশে দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এমনকি সুসভ্য সমাজের বহু খেলাধুলাও এই সমস্ত লোক খেলাধুলা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছে। এই পর্যায়ে ফোকলোর-এর মধ্যে হাডুডু, নোন্তা, ছিবুড়ি, ডাংগুলি, কানামাছি, নৌকা বাইচ, ষাঁড়ের লড়াই এবং আরো বহু রকমের খেলাধুলার নাম করা চলে। দেশে-বিদেশে যে কত বিচিত্র রকামের লোকখেলা আছে তার বর্ণনা দিয়ে শেষ করা দুরূহ। এই সমস্ত খেলাধুলায় অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ শুধু যে অফুরান্ত আনন্দ লাভ করে তা নয়-খেলাধুলার মাধ্যমে তার বহু রকমের লোকসাহিত্যেরও সৃষ্টি করে চলছে। লোকক্রীড়া প্রচারের প্রধান বাহন দর্শনেন্দ্রীয়। তবে অনেক সময় মুখে মুখে শুনেও খেলা শিখতে দেখা যায়। বংশ পরম্পরায় খেলাধুলাগুলো যেমন দেখে শেখে তেমনি শুনেও শেখে এবং এভাবেই প্রাচীনকাল থেকে লোকক্রীড়া প্রচলন রয়েছে।

১. এক এ ঋতু খেলা

এটি একটি ছড়া নির্ভর খেলা। এই খেলায় প্রথমে একজনকে বুড়ি নির্বাচন করা হয়। নির্বাচন পদ্ধতি হলো– তিনজন শিশু একসঙ্গে হাত ধরে দুলিয়ে দুলিয়ে ছড়া কাটে–

এক, দুই, তিন বলার পর তারা এক হাতের তালুতে অন্য হাতের তালু রাখে, যদি তিনজনের তালুর ধরন একই রকম হয় তবে আবার বাটতে হয়। আর যদি দু'জনের তালুর ধরন থেকে অন্যজনের হাতের ধরন আলাদা হয় তবে সে উঠে যায়। এভাবে শেষ পর্যন্ত দু'জন অবশিষ্ট থাকে। এবং একজন এসে তাদের সাথে সাক্ষী দেয়। এইবার ওঠাজন ব্যতীত যার হাত ভিন্নরকম হয় সে চোর বা বুড়ি নির্বাচিত হয়। বুড়ি পায়ের পাতার ওপর ভর করে উপুড় হয়ে থাকে। অন্যরা সবাই ছড়া বলে বলে তার শরীরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়। লাফ দেওয়ার সময় তারা চোরের পিঠের ওপর হাত রাখে। যদি কেউ লাফ দিতে ব্যর্থ হয় তবে সে নতুন করে চোর হয়। এই খেলায় নিম্নোক্ত ছড়াটি বলা হয়–

এক-এ ঋতু
দুই-এ ডবল টু
তিন-এ ঘোড়াই চড়ি
চার-এ চার চাকা ধিন ধিন (তিন বার)
পাঁচ-এ পাঁচটি পয়সা

www.pathagar.com

ছয় এ ছিলিপ কাটা
সাত-এ মাথা ঘোরে বনবন (চার বার)
আট-এ আসেন তো দুলাভাই
বসেন তো চেয়ারে
শরবত বানাইতে
কি কি লাগে ?
সোয়া গাছের চিনি
সোয়া কেজি পানি। (এক দমে)
নয়-এ নয়টি ময়না
দশ-এ দামড়া গোরু
এগারোই এক গিরি
বারোই বারো ইঞ্চি
তেরোই তেনাছেড়া
চৌদ্দই চোয়াভাঙ্গা
পনেরই পানের বাটা
ষোলই ষষ্ঠী পূজা
সতেরই সাতের কামান
আঠারই ঠিকঠাক
উনিশে কাজি ডাকা
বিশে বিবাহ।

২. বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে খেলা

"বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে" নামক খেলাটিতেও ছড়া ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ছেলে মেয়েরা দু'জন দু'জন করে সামনা সামনি হয়ে একে অপরের হাতে হাততালি দিয়ে ছড়া

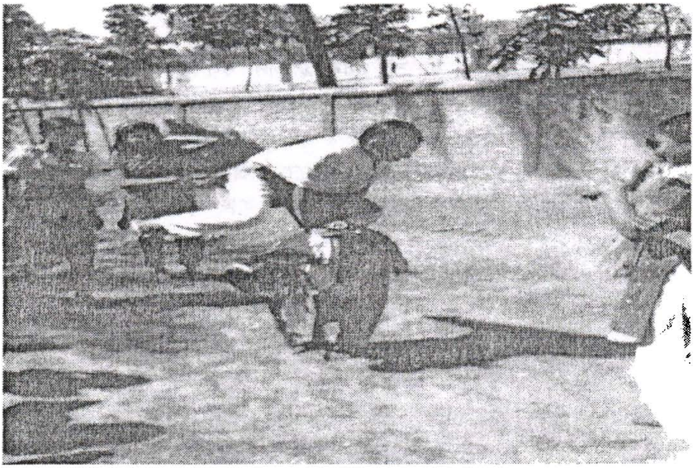

www.pathagar.com

আবৃত্তি করতে থাকে। খেলায় বিশেষ করে দু'জন বা জোড়া সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রয়োজন হয়। এই খেলার ছড়াটি হলো–

ওছি ওছা ওয়ান টু থ্রি
বাঁশের পাতা নড়ে চড়ে
সীমার কথা মনে পড়ে।
সীমাকে যদি দেখতে চাও
একটি চিঠি পাঠিয়ে দাও।
একবারই গিয়েছিলাম
ডাল ভাত খেয়েছিলাম।
ডাল হলো ঘন
আমার নাম মনো।
আমার নাম জরিনা
বল খেলতে পারি না।
আমার একটি ভাই ছিল
স্টেশনে পড়ে
তার বুদ্ধি জ্ঞান বাড়ে।
হাতে নাই পয়সা কড়ি
মনে হয় বিয়া করি।
বউ চায় কাঁচের শাড়ি
তোর মুখে এক লাথি মারি।

৩. আই অ্যাম মিতা খেলা

"আই অ্যাম মিতা" খেলাটিও একে অপরের হাতে হাততালি দিয়ে খেলা হয়। তবে এই খেলায় অভিনয়ের লক্ষণ দেখা যায়। ছড়া বলে বলে মেয়েরা অভিনয়ের মাধ্যমে তা বাস্তবে ফুটিয়ে তোলে। ছড়া বলা শেষ হলে তারা সবাই হাততালি দিয়ে অনেক মজা করে। এই খেলার ছড়াটি হলো–

আই অ্যাম মিতা
চুলে পরি ফিতা
কানে পরি দুল
ভালোবাসার ফুল।
পাশের বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলি না
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি।
তাদের বাড়ি দোতলা
করে শুধু ইশারা।
মাগো তোর পায়ে পড়ি

www.pathagar.com

বউ এনে দে খেলা করি।
বউ এর মাথায় লম্বা চুল
কোথায় পাবো গোলাপ ফুল।
গোলাপ ফুলে পুকা
জামাই বাবু বুকা।
ও জামাই নেবো না
মেয়ের বিয়ে দেবো না।
মেয়ে দেব সাজিয়ে
টাকা নেব বাজিয়ে।

৪. স্প্রিং খেলা

এই খেলাটি মূলত মেয়েরা খেলে। তারা পাটের তৈরি রশি কিংবা অন্য কোনো রশির সাহায্যে লাফিয়ে লাফিয়ে দড়ি ঘুরিয়ে এই খেলাটি খেলে থাকে। এটি মূলত একটি প্রতিযোগিতামূলক খেলা। মেয়েরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই খেলাটি খেলে থাকে। এই খেলাটিকে আবার দড়ি খেলাও বলা হয়। এই সময় তারা নিচের ছড়াটি আবৃতি করে–

টেলিফোন, টেলিফোন,
টেলিফোন টাইরা
টেলিফোন, টেলিফোন,
টেলিফোন ঘুরে না।

www.pathagar.com

৫. কানামাছি খেলা

“কানামাছি” বাংলার একটি বহুল প্রচলিত শিশুতোষ খেলা। এই খেলায় ছেলেরা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে একজনকে চোর নির্ধারণ করে। এবার চোরের চোখে কাপড় বা গামছা বেঁধে দেওয়া হয়। অন্যরা সবাই তাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে থাকে। এসময় তারা নিম্নোক্ত ছড়াটি বলে–

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছো।

চোর যদি কাউকে ধরে ফেলে তবে তারা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ছড়াটি বলে–

চোর : মামা মামা মাছ ধরেছি।
অন্যরা : কি মাছ?
চোর : বোয়াল মাছ।
অন্যরা : মাছের নাম কি?
চোর : সুমন (ধরা পড়া বালকের নাম)।

৬. ইঁদুর বিড়াল খেলা

আদিম শিকারের লক্ষণযুক্ত একটি খেলা হল “ইঁদুর বিড়াল খেলা”। এই খেলায় ছেলেমেয়েরা একজনকে ইঁদুর ও একজনকে বিড়াল নির্বাচিত করে। বিড়াল ইঁদুরকে নানাভাবে ধরতে চেষ্টা করে। এসময় অন্যরা হাত ধরে গোল হয়ে ইঁদুরকে নিরাপদ

www.pathagar.com

রাখার চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বিড়াল যদি ইঁদুরকে ধরতে সক্ষম হয় তবে খেলাটি শেষ হয়। এই খেলায় নিম্নোক্ত ছড়াটি ব্যবহৃত হয়–

সবাই : একটা বাজে টিং টিং
দুইটা বাজে টিং টিং
তিনটা বাজে টিং টিং
চারটা বাজে টিং টিং
পঁচটা বাজে টিং টিং
ছয়টা বাজে টিং টিং
বিড়াল : ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই বাড়িত আছো
অন্যরা : না, সে এখন চশমা চোখে দিয়ে পেপার পড়ছে
আর চা খাচ্ছে।
সবাই : সাতটা বাজে টিং টিং
আটটা বাজে টিং টিং
নয়টা বাজে টিং টিং
দশটা বাজে টিং টিং
এগারোটা বাজে টিং টিং
বারোটা বাজে টিং টিং
বিড়াল : ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভই বাড়িত আছো
অন্যরা : ইঁদুর তো চলে গেছে
বিড়াল : ঢুকতে পারি ?
সবাই : ঝাটার বাড়ি।

৭. পেপসি পেপসি খেলা

“পেপসি পেপসি” একটি ছড়ানির্ভর খেলা। এই খেলায় মেয়েরা একজনকে চোর নির্বাচিত করে। এরপর মাটিতে দু'দিকে দু'টি দাগ দেওয়া হয়। মাঝখানে চোর দাঁড়িয়ে থাকে। সবাই ছড়া বলে বলে নানা ভঙ্গিতে এক দাগ থেকে আর এক দাগে যায়। এরই মাঝে অনেকে চোরকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। কখনও দৌড়ে কখনও নিয়ম ভঙ্গ করে দাগ পার হয়। চোর সে সময় যদি তাকে মারতে পারে তবে সে নতুন করে চোর হয়। এই খেলার ছড়াটি হলো–

(ক) পেপসি পেপসি
(খ) মামা একটা কলা দে
(গ) শাক বুনি, শাক বুনি,
(ঘ) শাক কুটি, শাক কুটি,
(ঙ) শাক ধুই, শাক ধুই,
(চ) শাক ঘুটি, শাক ঘুটি,
(ছ) লবণ চাকি, লবণ চাকি,
(জ) অড়ং চাটি, অড়ং চাটি,

www.pathagar.com

(ঝ) কুঞ্চি কাটলাম, জিলাপি ভাজলাম,
(ঞ) ফুল তুলি, ফুল তুলি,
(ট) পুতুল নাচ, পুতুল নাচ,
(ঠ) নাচনাবুড়ি নেচে যাও,
ঘুরে ফিরে দেখে যাও।
(ড) উলা বিবির দোলা ঠ্যাং
ও বিলি তুই ডাক্তার আন।

৮. ইচিং বিচিং খেলা

ছড়ানির্ভর আরেকটি খেলা "ইচিং বিচিং"। এই খেলাটি বিশেষত মেয়েরা খেলে। দুটি মেয়ে মুখোমুখি বসে দু'জনের পায়ে পা দিয়ে তার ওপর হাতের আঙুল খাড়া করে ধরে। অন্যরা সবাই ছড়া কেটে কেটে হাতের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়। যদি পার হওয়ার সময় হাতে স্পর্শ লাগে তবে সে নতুন করে চোর হয়। এই খেলার ছড়াটি হলো–

ইচিং বিচিং চিচিং ছা
প্রজাপতি উড়ে যা।
সুই সুতা লোহার গুতা
অ্যাং ব্যাং মোষের ঠ্যাং।

www.pathagar.com

এই খেলায় মেয়েদের মাঝে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তারা এই খেলার মাধ্যমে এক অনন্য আনন্দ উপভোগ করে।

৯. ডোম ডোম খেলা

"ডোম ডোম" খেলায় অনেক খণ্ড খণ্ড ছড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। খেলা সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেকটি ছড়াই প্রয়োজন হয়। এটি মূলত একটি ছড়ানির্ভর খেলা। একটি ঘর মাটিতে একে এই খেলাটি খেলা হয়ে থাকে। এই খেলার ঘরটি নিচে দেখানো হলো–

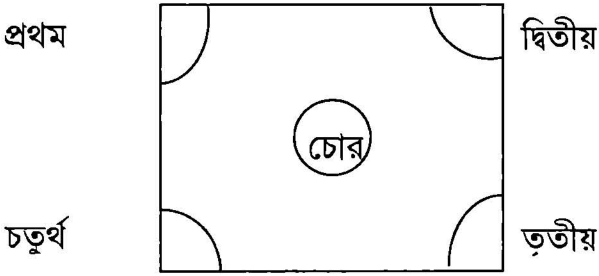

এই খেলায় পাঁচজন প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে একজনকে চোর বানানো হয়। চোর ঘরের মাঝখানে অবস্থান করে। অন্য চারজন ঘরের চার কোনো অবস্থান করে। চারজন

www.pathagar.com

একে একে এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছড়া বলে বলে ঘর প্রদক্ষিণ করে। কেউ যদি দম ফেলে বা পা মাটিতে ফেলে তবে চোর তাকে মার দেয়। তখন সে নতুন করে চোর হয়। এই খেলার ছড়াগুলো হলো–

(ক) ডোম, ডোম, ডোম
(খ) তেছপাতা, নেছপাতা
(গ) তালগাছে মোরগ ডাকে ক্‌ক, ক্‌ক, ক্‌ক
(ঘ) রাজার মেয়ে কাপড় কাচে
শান্তি সবাই দেখে যাও।
(ঙ) কচুর পাতায় কালি
তুই কি আমার শালি।
(চ) হাঁড়ির মধ্যে গোশতো
তুই কি আমার দোস্ত।
(ছ) হাঁড়ির মধ্যে মশুর
তুই কি আমার শ্বশুর।
(জ) ছোট ছোট পুতি
ছোট মালা গাঁথি।
(ঝ) বড় বড় পুতি
বড় মালা গাঁথি
(ঞ) এক তুড়ি দুই তুড়ি
সবাই মিলে মার তুড়ি।
(ট) কানা খালে পয়সা
কার-বি ?
জেসমিনের-বি
কার সাথে ?
কানা মাগির ছেলের সাথে।

১০. ছোঁয়াছুয়ি খেলা

খেলার শুরুতে চোর নির্ধারণ করা হয়। কমপক্ষে ৩ জন খেলোয়াড় লাগে। তবে বেশি খেলোয়াড় হলে খেলার আমেজ বৃদ্ধি পায়। চোর নির্ধারণ করার জন্য তিনজন করে খেলোয়াড় তাদের এক হাত করে পরস্পরের হাতের সাথে স্পর্শ করে। এরপর ১, ২, ৩ বলে হাত উল্টিয়ে একসাথে হাতের তালু প্রদর্শন করে হাতের উপরি পার্শ্ব প্রদর্শন করে। দুইজন যদি একরকম করে দেখায় এবং অন্যজন যদি ভিন্ন করে দেখায় তবে যে ভিন্ন করে দেখাচ্ছে সে উঠে যাবে। যদি সবাই একই করে দেখায় তবে কে উঠবে, পুনরায় বাটতে হবে। এভাবে শেষে যখন দুইজন থাকে তখন উঠে যাওয়া খেলোয়াড়দের একজন এসে বাটায় অংশ নেবে এই উঠে যাওয়া খেলোয়াড়দের প্রদর্শিত করে এর সাথে বাকি দুই খেলোয়াড়ের যার হাত মিলবে সে উঠে যাবে। যদি একই রকম প্রদর্শন করে তবে পুনরায় বাটবে। শেষে যে থাকবে সে চোর হবে।

www.pathagar.com

খেলার শুরুতে চোর এক নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াবে। তার খানিকটা দূরে সব খেলোয়াড়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। এরপর চোর সবাইকে তাড়াবে এবং ছোঁয়ার চেষ্টা করবে। যাকে ছোঁবে সে তখন চোর হবে এবং চোর তখন বাকি খেলোয়াড়দের সাথে যোগ দিবে। এভাবে খেলোয়াড়দের ইচ্ছামতো সময় ধরে খেলা হয়। এই খেলায় কোনো নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নেই।

১১. বরফ পানি খেলা

প্রথমে হাত বেটে চোর নির্ধারণ করতে হয়। হাত বাটা বা চোর নির্ধারণের পদ্ধতি- (ছোঁয়াছুয়ি খেলা দ্রষ্টব্য)।

খেলায় কমপক্ষে তিনজন খেলোয়াড় লাগে। খেলার শুরুতে চোর একটি স্থানে দাঁড়ায় এবং তার খানিকটা দূর দিয়ে বাকি খেলোয়াড়রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ায়। এরপর চোর সবাইকে তাড়ায় এবং ছোঁয়ার চেষ্টা করে। যাকে ছোঁয় সে বরফ হয় এবং তাকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একাধিক ব্যক্তিকে ছুলে একাধিক ব্যক্তিই স্থির হয়ে থাকবে। কেউ যদি নড়ে তবে সে চোর হয়ে যাবে এবং চোর বাকি খেলোয়াড়দের সাথে যোগ দিবে। কিন্তু বরফ হয়ে যাওয়া খেলোয়াড়কে বাকি খেলোয়াড়দের (বরফ না হওয়া) যে এসে যদি ছুঁয়ে দেয় তবে সেই খেলোয়াড় আবার পানি হয়ে যাবে অর্থাৎ আবার খেলবে ও পালাবে। একে একে সবাই যদি বরফ হয়ে যায় এবং কেউ যদি না নড়ে তবে প্রথমে যাকে বরফ করা হয়েছে সে চোর হবে। এভাবে খেলোয়াড়দের যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ খেলা চলতে থাকে।

www.pathagar.com

১২. দাদু-দাদু খেলা

এই খেলায় কমপক্ষে ৫-৬ জন লাগে। খেলার প্রথমে হাট বাটতে হয়। হাত বাটার পদ্ধতি- (ছোঁয়াছুয়ি খেলা দ্রষ্টব্য) হাত বাটাতে যে প্রথমে উঠবে সে হবে দাদু এবং যে শেষে অবশিষ্ট থাকবে সে হবে ভূত। আর বাকি খেলোয়াড়রা বা হাত বাটাতে প্রথম থেকে শেষ এর মধ্যে উঠা খেলোয়াড়রা হবে নাতি। খেলার শুরুতে দাদু একটি স্থানে বসার বা বসে থাকার অভিনয় করবে। এরপর নাতিরা আসবে এবং দাদু এবং নাতির মধ্যে কথোপকথন চলবে। কথোপকথন নিম্নরূপ :

নাতি : দাদু দাদু ফুল বাগানে যাই?

দাদু : লেখাপড়া নাই?

নাতি : আছে

এরপর সব নাতি দাদুকে বই খাতা এগিয়ে দেবার ভঙ্গি করবে এবং দাদু হাত দিয়ে রাইট চিহ্ন প্রদর্শন করবে (অভিনয়ের মাধ্যমে)। এরপর দাদু বলবে ঠিক আছে, ফুল বাগানে যাও। নাতিরা সব ফুল বাগানে যাবে এবং ফুল তোলার ভান করবে আর মুখে বলবে- ফুল তুলি, ফুল তুলি, ফুল তুলি... ফুলের বাগান কোনটা হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত থাকে এবং সেখানে ভূতরূপী খেলোয়াড় অবস্থান করে। নাতিরূপী খেলোয়াড়রা ফুল তুলি, ফুল তুলি... বলতে বলতে ভূত তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেবে। তারা খেয়ে নাতিরা পুনরায় দাদুর কাছে ফিরে আসবে এবং বলবে—

www.pathagar.com

নাতি : দাদু, দাদু, ফুল বাগানে ভূত।

দাদু : তাও, যাও।

নাতিরা আবার ফুল বাগানে যাবে এবং আবারও একই ঘটনার পুনরায় হবে। এভাবে মোট তিনবার হওয়ার পর দাদু বলবে চলতো দেখি এবং ফুল বাগানের যা তার নাতিদের সাথে দাদু ফুল বাগানে এসে ভূতের সাথে কথা বলবে–

দাদু : ওই ভূত তোর নাম কি ?

ভূত : কালা ভূত।

দাদু : খাস কি?

ভূত : মানুষ

এরপর ভূত সবাইকে তাড়া দিবে এবং প্রথমে দাদুকে ছোঁবে যতক্ষণ না দাদুকে ছোঁয়া হবে ততক্ষণ অন্য খেলোয়াড়দের ছোঁয়া যাবে না। এই খেলায় বলা হয় ভূত কর্তৃক ছুঁয়ে 'যাওয়া'। দাদুকে খাওয়ার পর একে একে বাকি খেলোয়াড়রা খেতে হবে। যাকে খাওয়া হবে সে ভূত হয়ে যাবে এবং ভূতের হয়ে বাকিদের খাওয়ার চেষ্টা করবে। সবাইকে খাওয়া হয়ে গেলে খেলা শেষ হয়ে যাবে।

তথ্য নির্দেশ

১। মোছা. নাসিমা নাসরীন, গ্রাম : চরধুবিল, ডাক : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১২ বছর পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫/০৯/২০১১ সময় : ১২.৩০ স্থান : চরধুবিল গ্রাম, থানা : সলংগা, জেলা সিরাজগঞ্জ।

২। মোছা. সীমা খাতুন, গ্রাম : চরধুবিল, ডাক : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৫/০৯/২০১১ সময় : ৩.০০ স্থান : চরধুবিল গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৩। মোছা. মৌসুমী খাতুন, গ্রাম : মালতিনগর, ডাক : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১৫ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১০ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৬/০৯/২০১১ সময় : ১০.০০ স্থান : মালতিনগর গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৪। মোছা. মুন খাতুন, গ্রাম : হারনী, ডাক : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১০ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭/০৯/২০১১ সময় : ১১.০০ স্থান : হারনী গ্রাম থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৫। মো. রাকিব হাসান, গ্রাম : হারনী, ডাক : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১৩ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬ষ্ঠ শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৭/০৯/২০১১ সময় : ০৩.০০ স্থান : হারনী গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

www.pathagar.com

৬। মো. শাওন ইসলাম, গ্রাম : বড়গোজা, ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১১ বছর, পেশা : ছাত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৪র্থ শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৮/০৯/২০১১ সময় : ১১.৩০ স্থান : বড়গোজা গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৭। মোছা. শাপলা খাতুন, গ্রাম : ধুবিল, ডাক : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১২ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ১৯/০৯/২০১১ সময় : ১.৩০ স্থান : ধুবিল গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৮। মোছা. বুলবুলি খাতুন, গ্রাম : হাটইচলা, ডাক : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১২ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২০/০৯/২০১১ সময় : ১১.৩০ স্থান : হাটইচলা গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

৯। মোছা. সপ্না খাতুন, গ্রাম : হাটইচলা, ডাক : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ১২ বছর, পেশা : ছাত্রী, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি। তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২০/০৯/২০১১ সময় : ১.১৫ স্থান : হাটইচলা গ্রাম, থানা : সলংগা, সিরাজগঞ্জ।

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

বাংলাদেশের লোকশিল্প সমৃদ্ধ ও বৈচিত্রপূর্ণ। কিছু কিছু শিল্পের ক্ষেত্রে পেশাজবী কারিগর শ্রেণি আছে, যারা বংশপরম্পরায় শিল্পকর্ম করে জীবন ধারন করে থাকেন। যেমন : তাঁতি, কামার, কুমার, জেলে, ছুতার, কর্মকার, কাঁসারি, শাঁখারি, ঘরামি, হাজাম, মালাকার, শোলাকার, ময়রা, গোয়ালা, দর্জি, রাজমিস্ত্রি, ডোম, নাপিত ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এরা নিজ নিজ পেশায় নিয়োজিত থেকে বিচিত্র শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে থাকেন।

সিরাজগঞ্জ জেলার বুক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদ-নদী। যেমন : প্রমত্ত যমুনা, করোতোয়া, হুরাসাগর, ফুলঝোর প্রভৃতি। নদীই এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মৎস্যজীবী করার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছে। তাছাড়া তাতশিল্প এনে দিয়েছে এ জেলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। কাজেই এ জেলার অধিকাংশ জনবলই তাতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে চলছে। নিম্নে এ জেলার কতিপয় পেশাজীবী গ্রুপের বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. জেলে

বাংলাদেশের অন্যতম প্রাকৃতিক লীলাকেতন সিরাজগঞ্জ। নদী নালা সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জের ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। যমুনা নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা বসতিগুলো স্বভাবতই নদীর সাথে সর্বাঙ্গে পতিবর্তনশীল। আর এরই ধারাবাহিকতায় গড়ে উঠেছে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের একাংশ। যার প্রভাব তাদের জীবন ও জীবিকায় গভীরভাবে পরিলক্ষিত হয়। এখানে রয়েছে জাইল্যা/জেলে সম্প্রদায়। যারা মূলত বংশ পরম্পরায় মাছ ধরার সাথে জড়িত। তবে চাষ ভিত্তিক মাছ চাষ বিশেষ করে তাড়াশ ও উল্লাপাড়া উপজেলায় এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে যমুনা নদীর অববাহিকায় সিরাজগঞ্জ সদর গুনের গাঁতী, খইসা গুড়া, রানী গ্রাম, আমলা পাড়া, দত্তবাড়ি এলাকায় অনেক জেলে রয়েছে। এরা সাধারণত জাল দিয়ে মাছ ধরে নদী ও জলাশয়ে। এরা বিভিন্ন ধরনের জাল ব্যবহার করে থাকে। যেমন– খড়া জাল, ঘটা, তৈরা, খেও, ধর্ম জাল, ফাঁস জাল, কারেন জাল, ট্যাটন জাল ইত্যাদি। মাছ ধরে এরা সাধারণত স্থানীয় বাজারে, হাঠে অথবা শহরের বড় বাজারে বিক্রি করে থাকে। চাষভিত্তিক মাছের যোগান বেশি হওয়ায় জেলেদের অস্তিত্ব এখন সংকটময়। চাষের মাছ বেশি হওয়ায় জেলেরা আজকাল পেশাজীবী পরনির্ভর শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। এই পেশা আজ হুমকির সম্মুখীন কেননা বংশ পরম্পরায় চলে আসায় খুব অল্প সংখ্যই এই পেশার সাথে নিয়োজিত। নতুন প্রজন্মের অনেকেই এই পেশায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে অন্যান্য পেশার তাগিদে।

www.pathagar.com

২. মিস্ত্রি/ছুতার

কাঠ দিয়ে যারা বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে আমাদের নান্দনিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করছে এরূপ শ্রেণির পেশাজীবী সম্প্রদায় হলো মিস্ত্রি/ছুতার। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে ছুতার বা কাঠ মিস্ত্রি বলা হয়। আদিকালে এই পেশায় নিয়োজিত অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বি। তবে এখন অনেক ধর্মের লোকেরাই এই পেশার দীক্ষা গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে চলছে। এই পেশায় আগের মতো তেমন লোক পাওয়া যায় না। বর্তমানে অনেকেই আছেন যাদের অধিকাংশই আধুনিক কারখানায় আসবাবপত্র তৈরি করছেন এবং এটি লাভজনকও। তাই পূর্বের ন্যায় কাঠ মিস্ত্রিরা লাঙ্গল, মই, জোয়াল, চৌচালা ও দোচালা ঘরসহ নান জিনিসপত্র তৈরি করার মতো জটিল কাজে আর ব্যস্ত হতে দেখা যায় না। ছুতাররা ঢেঁকি তৈরি করতেন। আগের দিনে তাই প্রতিটি গৃহেই ঢেঁকির ব্যবহার ছিল। বর্তমানে কলে ধান ছাটাইয়ের ফলে ঢেঁকির প্রচলন প্রায়ই উঠেই গেছে। এখন আর ঢেঁকি তৈরি হয় না বললেই চলে। আগকার দিনে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই কম-বেশি এই শ্রেণির পেশাজীবী বসবাস করতেন। কিন্তু বর্তমানে এদের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। নদী বিধৌত সিরাজগঞ্জবাসীর যোগাযোগের বাহন হিসেবে নৌকার বেশ ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন ধরনের ব্রিজ কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় এর ব্যবহার অনেকাংশ হ্রাস হয়েছে। যার ফলোশ্রুতিতে ঐসকল বাহন তৈরির কাজে জড়িত পেশাজীবীদের পেশ বদল করতে হচ্ছে। তদ্রূপ অন্যান্য পেশার প্রভাবে ছুতারদের আদি ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির পথে।

৩. গাছি বা গাছছাটুনী

সাধারণত গাছ ছাটা বা পরিস্কার করার জন্য একধরনের পেশার উদ্ভব ঘটেছে বলা হয় গাছ বা গাছছাটুনী (স্থানীয় ভাষায়)। আগে সিরাজগঞ্জ জেলার বেশির ভাগ গ্রামে এ ধরনের পেশার মানুষদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেত। তারা গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়ে গাছ পরিস্কার করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। এরা মুলত তাল ও খেজুরের রস আহরণের কাজে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু সিরাজগঞ্জ জেলায় এই সকল গাছের পরিমাণ খুব কম থাকায় এরা নারিকেল, খেজুরগাছসহ নানা ধরনের গাছ পরিস্কার করে জীবন ধারণ করে থাকেন। এক একটা নারিকেল গাছ পরিস্কার করে ৫০ থেকে ৬০ টাকা পেয়ে থাকে। তবে অনেকে নারিকেল নিতেই বেশি স্বাচছন্দ্যবোধ করে টাকার চেয়ে। তবুও সচরাচর এই পেশায় লোকের সংখ্যা অন্যান্য লোকের চেয়ে কম।

৪. রাজমিস্ত্রি

সাধারণ অর্থে যে সকল শ্রমজীবী পাকা বাড়ি-ঘর, রাস্তা ঘাট নির্মাণ কাজের সাথে সরাসরি জড়িত তাদেরকে রাজমিস্ত্রি বলা হয়ে থাকে। অনেকে বংশ পরম্পরায় এ পেশায় নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। বর্তমানে দেশে পাকা ইমারত নির্মাণের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অন্য পেশার মানুষ তাদের পেশা বদল করে এ পেশায়

www.pathagar.com

আসছে। সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় পেশাজীবী হিসেবে রাজমিস্ত্রির সংখ্যা সর্বাধিক। পূর্বে এরা শুধু দেশের পাকা ঘর-বাড়ি এবং বিভিন্ন স্থাপনা তৈরির কাজ করার কাজে ব্যস্ত থাকলেও বর্তমানে এই পেশার লোক অনেকেই রাজধানীসহ শিল্প নগরীতে ভীড় জমাচ্ছে।

৫. খুলু বা তেলি

অতীতকালে গরুর চোখ বেঁধে ঘানি ঘুরিয়ে সরষে, তিল প্রভৃতি পিষে যারা তেল বের করেন তাদেরকেই খুলু বা তেলি বলে। যারা গ্রাম বাংলা ঐতিহ্যের সাক্ষী বহন করে চলছে। এ কাজের জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে দু'জন লোক। অনেক ক্ষেত্রে গরুর বদলে মানুষ ঘানি টানে। টাকার অভাবে গরু কিনতে না পারলেই বেকল মানুষ ঘানি টানে। চোখ বাঁধা অবস্থায় গরু দীর্ঘসময় ঘানি টানতে পারে। একটানা খাটুনির ফলেই ঘানি টানার গরুকে 'কলুর বলদ' বলা হয়ে থাকে।

বর্তমানে উৎপাদিত তেলের প্রধান উপাদান হচ্ছে তিল, সরিষা। তিল ও সরিষা পিশে তা থেকে যে তেল বের হয় তার পরিমাণ খুবই কম। পরিমাণে কম হলেও এই তেলের কদর অত্যন্ত বেশি। অনেকেই দেখা যায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে বাড়িতে বাড়িতে তেল বিক্রি করে। তারপরেই দোকানে তেল সরবরাহ করতে অধিক আগ্রহী। ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী খুলু সম্প্রদায়ের মানুষ শুরু থেকেই সামাজিক বৈষম্যের মধ্যেই বেড়ে উঠেছে। তাই অতীতে যেমন সামাজিক মর্যাদা ছিল না তেমনি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার দিক দিয়ে তারা অত্যন্ত অনগ্রসর। অভাব অনটন তাদের নিত্য সঙ্গী। বর্তমানে এই পেশা প্রায় বিলুপ্তি পথে। আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং কলকারখানার সহজলভ্যতার জন্য দিন দিন এই পেশা ধ্বংসের মুখে।

৬. কাঁসারি

কাঁসা বা পিতলের সংমিশ্রনে নির্মিত দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরির সাথে জড়িত শ্রমজীবীকে কাঁসারি বলা হয়। সিরাজগঞ্জ সদরে পূর্বে এই পেশাজীবীরা তাদের কার্য পরিচালনা করতেন। তাদের নাম অনুসারে এখনো একটি এলাকাকে কাঁসারি পট্টি হিসেবে ডাকা হয়। এক সময় গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে কাসার বাসন কুসন এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বর্তমানে স্টিল, মেলামাইন ও এ্যালুমিনিয়ামের তৈজসপত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁসার ব্যবহার অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৭. তাঁতি

সিরাজগঞ্জ দেশের অন্যতম তাঁত অধ্যুষিত এলাকা। তাঁত শিল্প সিরাজগঞ্জ জেলাকে বিশ্ব দরবারে যেমনটি পরিচিত করেছে তেমনি করেছে সমৃদ্ধ। এ জেলা তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। সিরাজগঞ্জ জেলার সাথে তাঁতের নাম

www.pathagar.com

অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পেশাগতভাবে তাঁতি সম্প্রদায় অত্যন্ত প্রাচীনকাল থেকেই এই শিল্পে সম্পৃক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যারা শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি, গামছা ও অন্যান্য বস্ত্র সামগ্রী তৈরির কাজে জড়িত থাকেন তাদেরকে তাঁতি নামে অভিহিত করা হয়। এরা তাঁত যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত বস্ত্রাদি বুনন করে থাকে। বিনিময়ে তারা মুজরি পায়।

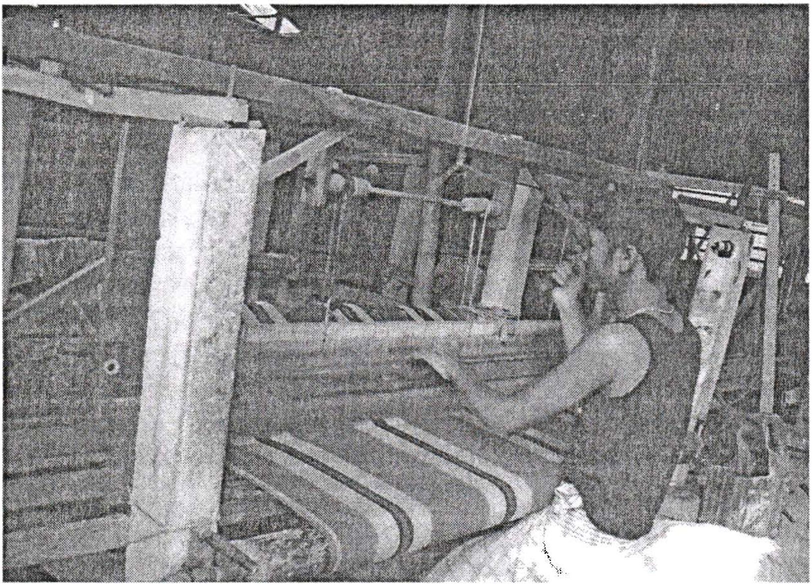

বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁত শিল্প এদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। সরকার কর্তৃক সম্পাদিত তাঁত শুমারি ২০০৩ অনুযায়ী দেশে বর্তমান ৫ লক্ষাধিক হস্তচালিত তাঁত রয়েছে তম্মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলাতে রয়েছে ১ লক্ষ ৩৫ হাজারের অধিক। তাঁতী পরিবারের সংখ্যা ১৪,৮৭০। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণসহ গ্রামীণ কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে দ্বিতীয় অবস্থানে। দেশের প্রায় ১৫ লক্ষ লোক পেশার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ শিল্পের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসা ও তন্ত্রমন্ত্র

লোকচিকিৎসা

জীবনের পরিণতি মরণে। জীব জগতের এ বিধি দুর্লঙ্ঘ শাশ্বত। জরা, মৃত্যু, শোক-দুঃখ থেকে পরিত্রাণের প্রয়াসেই ঈশ্বর চিন্তা, ধর্ম-ভাবনা। গৃহী সাধক, সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী সকলেরই সাধনার লক্ষ্য অনন্ত-অসীম জীবন-কামনা, অমরত্ব লাভ। কায় মনের সজীবতা, সুস্থতা, অমরত্বের বাসনা থেকে উদ্ভূত যোগ-ব্যায়াম নির্ভর কায়িক সাধনা তথা তান্ত্রিক সাধনা। অজেয় অজ্ঞেয় মরণ জয়ের রোগ নিরাময়ের প্রার্থনার ফসল ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক, তাবিজ-কবজ, মন্ত্র-তন্ত্র ও যাদু-টোনা। মানব সমাজ উদ্ভবের সময় থেকেই মানুষ নিজের দেহ বিকারজনিত নানাবিধ রোগ নিরাময়ের জন্য আপন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে রচনা করেছিল এক চিকিৎসাবিধি। মূলত প্রাক শাস্ত্রীয় নৈসর্গিক ও অতি প্রাকৃত ঘটনার প্রভাবজনিত প্রতিক্রিয়াই এই চিকিৎসার উৎস। তাই বলা যায় অলিখিত ঐতিহ্য নির্ভর চিকিৎসাবিধি বলেই এই চিকিৎসাবিধির নাম লোকচিকিৎসা। মূলত লোকচিকিৎসা পদ্ধতি লোক পরম্পরায় চলে আসা একটি পদ্ধতি; যে পদ্ধতি একজন আরেকজনের কাছ থেকে দেখে দেখে বা শুনে শুনে শিখেছে। এর ধারাবাহিকতা কালান্তরের ঘূর্ণিপাকে আজও প্রবাহমান।

বাংলা লোকচিকিৎসার ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Folk medicine. Folk এবং Medicine এর পৃথকভাবে সংজ্ঞা প্রদান করতে পারি এভাবে-Folk শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো লোক, গণ, জনমানব, গণমানুষ, জনসাধারণ ইত্যাদি । Folk-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নৃতাত্ত্বিক অভিধানে বলা হয়েছে "Folk in ethnology is the common people who share a basic store of old tradition."

"লোক" হলো সাধারণ মানুষের বড় একটা অংশ যারা গোষ্ঠী চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরান, চারু ও কারু শিল্পের রূপকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখে। Folk সম্পর্কে August panyella বলেন, In the expression folk art is not only the word 'art' that is difficult to understand : the word "Folk" is equally problematic."

Webster's New collegiate Dictionary তে 'Folk' এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে "The great portion of the members of a people that determines the group character and that tends to preserve its characteristics from of civilization and its customs, arts and crafts, legends traditions and Superstitions, from generation to generation."

'লোক' হলো সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ যারা গোষ্ঠী চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সভ্যতা, প্রথা, বিশ্বাস, ঐতিহ্য, পুরাণ, চারু ও কারু শিল্পের রূপকে বংশ পরম্পরায় ধরে রাখে।

www.pathagar.com

Encyclopaedia of Anthropology গ্রন্থে Folk এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে- 'A less ethnocentric and broader definition of folk would be any group of people who share at least one common factor (for example, common occupation.)'

মোট কথা- 'Folk' বা 'লোক' শব্দের অর্থ জনগণ, জনমানব, মানবগোষ্ঠী, গণমানুষ, জনসাধারণ, মনুষ্যসমাজ ইত্যাদি।

Medince এর আভিধানিক অর্থ- ঔষধ- a drug; প্রতিকার- a remedy, চিকিৎসাবিদ্যা the art of healing a medicinal.

Students' Favourite Dictionary তে Medicine এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- "drug or a substance taken internally to cure diseases."

Folkmedicine বা লোকচিকিৎসা হচ্ছে-অতি প্রাচীনকাল হতে চলে আসা সনাতন চিকিৎসাপদ্ধতি। যে পদ্ধতিতে সাধারণত লতা-পাতা, গাছ-গাছড়া, ফুল-ফল, ছাল-বাকল, শিকড়-বাকড়, আগুন-পানি, তাপ-কয়লা, ছাই-মাটি, দুধ-ঘি, তৈল-চর্বি, কীট-পতঙ্গ, জীবজন্তু, ধাতব-অধাতব পদার্থ প্রভৃতি ব্যবহার হয়ে থাকে। পাশাপাশি দোয়া-কালাম, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ, জাদু-টোনা, সিন্নি-মানত প্রভৃতি রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে বিশেষ সময়ে লোকঢংগে ব্যবহৃত চিকিৎসা পদ্ধতিকে প্রকৃতপক্ষে লোকচিকিৎসা বলে।

লোকচিকিৎসার সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে জাগ্‌গি লিখেছেন- "Folk Medicine has its own concepts about the causation of disease : Warth of Gods, evil spirits, magic, witchcraft etc. It has is own diagnostic tools and teachniques which lean heavily on divination. Treatment is based upon-removal of the causative factor through the propitiation of Gods, exorcism, counter-magic, use of charms and ameulets, and of course, administration of some harbal preparations-a perfectly rational approach in so far as it in intended to remove the basic cause."

সুপ্রাচীনকাল থেকে এদেশে চিকিৎসার দুটো পদ্ধতি চলে আসছে। একটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালব্ধ পদ্ধতি, অন্যটি লোক পরম্পরায় চলে আসা পদ্ধতি, যা দেখে দেখে শেখা এবং শুনে শুনে জানা। লোকবিদ্যার এ শেষোক্ত ধারাই লোক থেকে লোকান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবাহিত। লোকবিজ্ঞানের অভিধায় এটাই লোকচিকিৎসা নামে পরিচিত।

মোটকথা আদিকাল থেকে পর্যায়ক্রমে গুরু থেকে শিষ্যের মাধ্যমে, এক লোক অন্য লোকের কাছ থেকে দেখে দেখে কিংবা শুনে শুনে বিভিন্ন উদ্ভিদ, খনিজ, প্রাণীজ পদার্থ এবং দোয়া-কালাম, তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক প্রভৃতির দ্বারা যে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকেই লোকচিকিৎসা বলে।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসার ইতিহাস

অতিপ্রাচীনকাল থেকেই লোকচিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলন এদেশে প্রচলিত। লোকচিকিৎসার লিখিত কোনো ইতিহাস নেই। এতদ্বিষয়ক কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না। লোক পরম্পরায় বা পারিবারিক বা আত্মীয়তার সূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষাই লোকচিকিৎসকদের একমাত্র অবলম্বন। যারা এ পেশার সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই এটাকে মূল পেশা হিসেবে গ্রহণ করতেন না, এখনো করেন না। সমাজে নিজেকে জাহির করার জন্য কিংবা বাড়তি আয়ের মাধ্যম হিসেবে অন্য কাজের পাশাপাশি এ কাজটিও অনেকে করে থাকেন।

এ পেশার সাথে যারা জড়িত-তাদেরকে সাধারণত কবিরাজ, বৈদ্য, হেকিম, ওঝা, প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এ পেশার সাথে পীর-ফকির, হাজাম, দরবেশ, দাই, সাধু, সন্ন্যাসী, মসজিদের ইমাম, মোল্লা-মুন্সি, দরগা-মাজারের খাদেম ব্যক্তিগণ সরাসরিভাবে জড়িত। এ শ্রেণির লোকচিকিৎসকগণ রোগ নিরাময়ের জন্য গাছ-গাছড়া, ভেষজ ঔষধ পথ্যের পাশাপাশি তন্ত্র-মন্ত্র, দোয়া-কালাম, তাবিজ-কবচ, জাদু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, তুক-তাক ইত্যাদি পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।

লোকচিকিৎসার প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমাজের প্রায় সর্বস্তরে প্রচলিত। অতীতে এটা যেমন এদেশে ছিল, বর্তমানে তেমনটি আছে।

বর্তমান কালে যেমন বিদ্যা অর্জনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেকালে চিকিৎসাবিদ্যা অর্জনের জন্য তেমন কোনো স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৬০৬) যে শিক্ষানীতি ছিল, তার মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন-" Every boy ought to read books on morals, arithmetic, agricuture, mensuration, geometry, astronomy, physiology, household matters, the rules of government medicine, logic, the tabii, riyazi, science and history of all which may be gradually acquired."

প্রকৃতপক্ষে লোকচিকিৎসার প্রচলন কখন থেকে কিভাবে শুরু হয়েছে, তা সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে একথা সত্য যে, মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ কোনো না কোনোভাবে চিকিৎসা গ্রহণ করতো। জীবন চলার পথে বহু প্রতিকূলতার কারণে নানান দুর্ঘটনার পাশাপাশি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখে পতিত হতো। তাই দেহ ও জীবন রক্ষার জন্য মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্যাদির মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ঔষধ গ্রহণ করতো। প্রাণিজগতেও এ নিয়মের প্রতিফলন লক্ষণীয়। আমাদের চেনা-জানা অনেক প্রাণি জীবন ও দেহ রক্ষার জন্য মাটি, ধাতব অধাতব পদার্থ, গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা, শিকড়-বাকড় প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতো এবং এখনো গ্রহণ করে থাকে। যেমন 'গরচর' অজীর্ণতা হলে লবণাক্ত মাটি চেটে চেটে খেয়ে থাকে। বেজি সাপের দংশন খেয়ে বিষ পানি করার জন্য সর্পগন্ধার শিকড় ব্যবহার করে থাকে। কবুতর এটেল মাটি ভক্ষণ করে খাদ্যের রুচি বৃদ্ধি করে থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, লোকচিকিৎসা যুগ যুগ ধরে ধর্ম-কাল-স্থান ভেদে এর ব্যবহার বিভিন্ন পদ্ধতিতে হয়ে আসছে। বর্তমান

www.pathagar.com

কালেও এ চিকিৎসা পদ্ধতির দরবারে পানি পড়ার জন্য, তাবিজ-কবচ করার, ঝাড়-ফুঁক দেয়ার জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন মুরিদ-মুরিদানের লাইন ধরে অপেক্ষা করে। হঠাৎ করে শিশু পীর কিংবা মহিলা পীর কিংবা তেলেসমাতি দেখানো প্রত্যাশীদের ভিড় জমে উঠে। সাধু-সন্ন্যাসীদের আস্তানাতেও অনুরূপ অবস্থা লক্ষণীয়।

এছাড়া মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগুরুদের নিকটও তেলপড়া, পানিপড়া, সুতাপড়া, তন্ত্র-মন্ত্র, টোটকা-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ বড় আস্থার সাথে বিশ্বাস করে মানুষ এসব গ্রহণ করে থাকে। প্রাচীনকাল হতে এ অবস্থা চলে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে লোকচিকিৎসার ব্যবহার ও পেশা হিসেবে গ্রহণ লক্ষণীয়। বিশেষ করে বেদে সম্প্রদায় এ পেশার সাথে সরাসরি জড়িত। শ্রেণিবিভাজন অনুসারে এরা এ পেশার সাথে জড়িত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। সবচে বড় কথা হচ্ছে লোকচিকিৎসার ধারক ও বাহক হিসেবে কিছু মানুষ বিভিন্ন নামে ও পদবীতে এ পেশার সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। তারা হলো-কবিরাজ, হেকিম, বৈদ্য, ওঝা, মৌলবি, মুন্সি, ধন্বতরী, সন্ন্যাসী, সাধু, পীর, দরবেশ।

আমরা লোকচিকিৎসার ইতিহাসের কিছু নিদর্শন দেখতে পাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কাব্যদর্পণে। ষোল শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণিকে এ পেশার সাথে জড়িত থাকতে দেখি। এদেরকে সমাজে বৈদ্য নামে সম্বোধন করা হতো।

লোকসমাজে কিছু কিছু অসুখ-বিসুখ রয়েছে, তা নির্ণয় করতে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে কবিরাজ ও বৈদ্যেরা সফলতা দেখিয়েছে যা গর্ব করার মতোই। যেমন-ভূত, প্রেত, দেও-দানব, জিন ইত্যাদি দ্বারা অনেক সময় মানুষ আক্রান্ত হয় বলে, এক প্রকার লোকবিশ্বাস মানুষের মধ্যে কাজ করে। এ সকল অসুখ সারাতে কবিরাজেরা নানা প্রকার তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক, দোয়া-কালাম ও গাছ-গাছড়ার ঔষধ-পথ্য দিয়ে রোগীকে ক্রমে ক্রমে সারিয়ে তোলেন। এ ধরনের চিকিৎসা করতে গিয়ে কবিরাজরা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত একটানা চিকিৎসা করে থাকেন।

বলা বাহুল্য বহুকাল পূর্ব হতে লোকচিকিৎসকগণ দেশীয় গাছ-গাছড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক দ্বারা চিকিৎসা করে আসছেন। তাঁরা বিভিন্ন গাছ গাছড়ার লতা-পাতা, শিকড়-বাকড়, ছাল-বাকল, বীজ-গুল্ম দিয়ে পাঁচন, ক্বাথ, মলম ও বড়ি তৈরি করে ঝোলায় ভরে চিকিৎসা করে বেড়াতেন। রোগ নির্ণয় করে তারা এসব ঔষধ খাওয়ার জন্য রোগীকে দিতেন।

লোকচিকিৎসার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবে, সর্পবিষ সংহরণে, কুকুর ও পোকামাকড়ের দংশন যন্ত্রণা বিনাশে, অশুভ জিন-ভূতের আসর থেকে রক্ষা করতে, হাড় ভাঙা জোড়া লাগাতে, পেটের পীড়া সারাতে, শিশু ও নারীদের বিশেষ বিশেষ রোগ নিরাময়ে ওঝা ও কবিরাজদের ঔষধপথ্য ছিল নির্ভরতার প্রতীক। আজও এ সকল রোগ নিরাময়ে ওঝা ও কবিরাজের প্রভাব বিদ্যমান।

www.pathagar.com

লোকচিকিৎসার শ্রেণিবিভাগ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে লোকচিকিৎসার উদ্ভব ও প্রসার ঘটেছে। যা আমরা প্রাচীন কাল থেকে বিশ্বাস করে আসছি এবং সেই পদ্ধতিতে চিকিৎসাসেবা নিয়ে বর্তমানের দোড় গোড়ায় এসে পৌছেছি। বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসার ভিড়েও এই প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি অমলিন অবস্থায় রয়েছে। কেননা এটিকে এলাকার মানুষ বা কবিরাজরা পেশা হিসেবে নেয় না। শুধুমাত্র মানুষের সেবা করার মানসিকতা থেকেই এই চিকিৎসা করে থাকে। এই লোকচিকিৎসাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. গাছ-গাছালি দ্বারা
২. মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি
৩. ঝাড়-ফুঁক।

মোটকথা, লোকচিকিৎসা আমাদের লোকসমাজের আবহমান কালের লোকসস্কৃতির একটি অংশ। লোকসমাজের প্রতিটি স্তরে অনুসন্ধান করলে আজ লোকচিকিৎসার অস্তিত্ব মেলে। সেই অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন থানার বিভিন্ন গ্রামের লোকচিকিৎসকের কাছ থেকে সংগৃহীত কিছু চিকিৎসাপদ্ধতি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

কুকুর কামড়ানো

পদ্ধতি- ১

কুকুর কামড়ালে প্রথমে ব্যাঙ ধরে সেই ব্যাঙের প্রসাব কলার সাথে ঐ পরিবারের সবাইকে খাওয়াতে হবে। তাতে করে সবাই সুস্থ থাকবে। তবে রবিবার ছাড়া কোনো দিন চিকিৎসা করা হয় না।

পদ্ধতি- ২

রোগী আসলে প্রথমে কবিরাজ হাত চালান। তিনি সূরা ইখলাস বা সূরা ফাতিহা পড়ে হাত চালান। যদি বিষ থাকে তাহলে, হাত চলবে আর না থাকলে চলবে না। নির্ধারিত গাছের সাথে গোল মরিচের একভাগের সঙ্গে মিশিয়ে তিন রবিবার খেলে ভালো হয়। তিনি রবিবার ছাড়া ঔষধ দেন না। তিনি হাত চালানোর আগে একটি ছক তৈরি করেন। যা নিম্নরূপ :

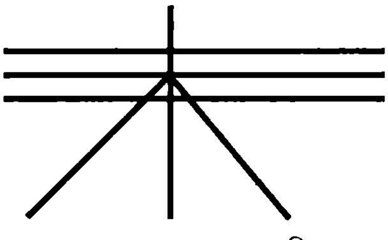

হাত চালানোর পদ্ধতি

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৩

কালো ধুতুরার শিকড় রোগীকে আদার সঙ্গে পিষে শিকড় দিয়ে তিন চাঁদে ৩ বার খাওয়ালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

তিনি মন্ত্র পড়ে হাত চালিয়ে থাকেন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ :

"হরম তালি করম তালি
চলরে হাতে চলরে কালকূট সাপের বিষ সেখানে চল
যদি হাত ডানে বায়ে যাস
দোহাই আল্লাহ্ নবীর তোর মা বাপের মাথা খাস।"

সোয়াটা গোল মরিচ, কাটালোট বা গুটি বেগুনের শিকড় মেয়ে মানুষ হলে বাম চার আঙুল ৩ ঘর এবং ছেলে হলে ডান হাতে চার আঙুল পরিমাণ পুরোটা খাওয়ালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

কুকুর কামড়ালে সূরা ইখলাস, সূরা নাস, সূরা ফালাক ৩ বার করে পড়ে হাত চালনা দেন। যদি বিষ কম/বেশি থাকে তাহলে ঔষধের পরিমাণও কম-বেশি হয়ে থাকে। কুকুরের বিষের ঔষধ চাঁদে চাঁদে খেতে হয়। খাটি ঘি, সোয়াটা গোল মরিচ আর যদি ১ মাস হয়ে যায় তাহলে সোয়া তিনটা গোলমরিচ ও গোদানি গাছের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে হয়। আর যদি ২/৩ মাস হয়ে যায় তাহলে সোয়া ৫ টা গোণ্ডা গোল মরিচ ও খাটি ঘি মিশিয়ে খেলে বিষ থাকে না। তিনি সন্ধ্যা, সকাল ও পরের দিন সন্ধ্যায় চিকিৎসা করেন।

পদ্ধতি- ৬

কাসার থাল রোগীর পিঠে লাগিয়ে আল্লাহু সামাদ ৪১ বার পড়ে ফুঁ দিলে থাল লেগে যাবে যদি বিষ থাকে। আর যদি বাচ্চা হয়ে যায় তাহলে থাল ঘুরতে ঘুরতে পড়ে যাবে।

পদ্ধতি- ৭

চিনি কলার সাথে গোদানি গাছের শিকড় খাইয়ে দিলে বিষ থাকে না। তবে ৩ মাসের বেশি হয়ে গেলে তিনি আর চিকিৎসা করেন না। আর এই ঔষধ ১/২ দিন খেতে হয়।

পদ্ধতি- ৮

তিনি সূরা ইখলাস/জাবরার গাছের শিকড় দিয়ে হাত চালান। তবে তিনি মন্ত্রও ব্যবহার করেন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ-

"হাত চলে বাইড় চলে
কুমহরিয়ার বাইন চলে
ওরে হাত তুই চল
তুই না চলিস তো তোর ভাইঞ্চ চলে
বিষ-থাকলে কুল কপাট করিস
ঈশ্বর মহাদেবের পূঁজা বা ভোঁইর দিয়ে ঠেলি।"

www.pathagar.com

এই বলে হাত চালালে বিষ যতদূর অছে ততদূর হাত চলবে। অবশ্য তখন চামারের বাড়ির তৈরি জুতা দিয়ে রোগীর মাথা হতে সম্পূর্ণ শরীরের অংশে নামাতে হয়। মন্ত্র পরে ৩/৫/৭/৯ বার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলতে হয়। এই জুতা দিয়ে ঝাড়ার সময় মন্ত্র পড়েন। মন্ত্র নিম্নরূপ–

মন্ত্র

“ঢুক্কার হুককার
হুক্কা না ফুক্কা
অমুকের গায়ের বিষ
বাড়ি ফুঁক্কা ফুঁক্কা।”

এই বলে জুতা দিয়ে বিষ ঝাড়লে ভালো হয়ে যায়। তবে বিষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আবার হাত চালাতে হয়। মন্ত্রের ভাষা এরকম হওয়ার কারণ হলো মানুষকে গালি দিলে যেমন তার খারাপ লাগে তেমনি মন্ত্র পাঠে খারাপ কথা বললে বিষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়।

সাপে কাটা

মহান আল্লাহ্‌র ১৮,০০০ প্রজাতির মধ্যে সাপ একটি প্রজাতি । সাপের একটি অনবদ্য শক্তি হলো তার কামড়ে মানুষ মরে যায়। আর এর কামড় থেকে পারিত্রাণের এবং বিষ নামানোর জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি বের হয়েছে।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ১

উপাদান

গাছের শিকড় ও মন্ত্রের মাধ্যমে সাপেকাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

পদ্ধতি

তিনি প্রথমে হাত চালিয়ে দেখেন যে, বিষ আছে কিনা? বিষ, যেহেতু ঊর্ধ্বগামী হয় সেহেতু যতদূর পর্যন্ত বিষ আছে হাত ততদূর পর্যন্ত উঠবে। বিষ নিম্নগামী করার জন্য ঈশ্বর মূলের শিকড় খাওয়ানো হয়। যদি চিবিয়ে খাওয়ার শক্তি না থাকে তাহলে রস দুধের মধ্যে দিয়ে খাওয়ানো হয়। তারপর মন্ত্র পড়ে ঝাড়-ফুক করলে বিষ নেমে যায়। আর রোগী ভালো হয়ে যায়। আর বিষ নামানোর মন্ত্র হলো-

মন্ত্র

“সাপা বলে সাপীনিরে শোন গোকুলের কথা।
পঞ্চ অবতার কৃষ্ণ জন্ম হইল কোথা?
জন্ম হইল কংস কারাগারে দৈবকীর উদরে।
বাবা মা রাখিল নাম কানাই কানাই বলে।
কানাই বলে বলাই দাদা বুদ্ধি কোন হার?
সাত সমুদ্রর পারে আছে গোরচল স্মরণ কর।
গোরচলের গরচ কৃষ্ণ পাখায় দিল ভর।
নাচিতে খেলিতে গেলেন কালীদহের উপর।

www.pathagar.com

গোরচলের হুংকারে, পাখার ঝাড়নে সাগরের জলজে শুকাইল।
বেনুতে কানু দিল টান ষোলশ গোষ্ঠীনি তারা দিল জোগান।
ওরে কালিয়া নাগ-নাগীনি বিষ যেই সাপের বিষ সেই সাপের কাছে যা।
দোহাই কামরচক কামরচখ্যা হার জিরাইগ্যা।
নাই এই বিষ বিষহরির আজ্ঞা।"

কথিত আছে, সাপের সাথে গোরচল পাখি যুদ্ধ করেছিল বহু আগে। সেই থেকে গোরচল পাখির নাম শুনলে বিষ নেমে যায় বলে ধারনা করা হয়। বিষ নামানোর আর একটি মন্ত্র হলো-

মন্ত্র

"সোনার সঙ্কীনি, গরল মনকীনি
নাগিনার বিষ পাতালে নামাবো"

চিকিৎসা পদ্ধতি- ২

রোগী আসলে প্রথমে তিনি বাঁধন খুলে দেন। তারপর তিনি পানি পড়ে দেন এবং গাছের শিকড় খাইয়ে দেন। তিনি রোগী দেখলে বুঝতে পারেন সাপে কেটেছে কিনা? তিনি সাপেকাটা রোগী ভালো করতে পারেন না। কিন্তু, রোগী-মারা গেছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

পদ্ধতি- ২.১

এক নিঃশ্বাসে সূরা ফাতিহা ১ বার সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ে উবুদ নেংড়ার গাছে ফুঁ দিয়ে একটানে উপড়িয়ে ফেলিবে। যদি শিকড় ছিড়ে যায় তাহলে মনে করতে হবে রোগী মারা গেছে আর যদি শিকড় না ছিড়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে রোগী বেঁচে আছে।

পদ্ধতি- ২.২

প্রথমে তিনি রোগী সনাক্ত করেন। হাতে লজ্জাবতীর গাছ দিয়ে হাত চালান দেন। সেই গাছের ডাল, শিকড়, পাতা রোগীকে খাওয়াতে হবে। তবে "বিসমিল্লাহ্" বলে ঔষধ খাওয়ানো যাবে না। লজ্জাবতীর ডাল, পাতা শিকড় ৫০ গ্রাম চিনিসহ বেটে আম পাতার সাথে খাওয়াতে হবে।

শর্ত

তবে শর্ত হলো জীবনের বদলে জীবন দিতে হবে। কোনো টাকা নেন না। তবে হাঁস, মুরগি, গোরু, ছাগল ইত্যাদি যেকোনো প্রকার পশু দিতে হবে।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ৩

প্রথমে তিনি হাত চালিয়ে দেখেন কতদূর বিষ উঠে গেছে। তিনি দূর্বা ঘাসের মাধ্যমে হাত চালান এবং মন্ত্র পড়েন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ

"হরম তালি করম তালি
চলরে হাত চলতে কালকূ সাপের
বিষ সেখানে চল

www.pathagar.com

যদি হাত ডানে বায়ে যাস
দোহাই আল্লাহ নবীর
তোর বাপের মাথা খাস।"

রোগীকে সাপে কামড়ালে রোগীর নামসহ কবিরাজকে কামড়ানোর স্থান বলতে হয়। সাপে কামড়ালে আই/উরচতে মহিলাদের পেটিকোটের ফিতা দিয়ে বা চুল বাঁধার ফিতা দিয়ে বাঁধতে হয়। যদি বিষধর সাপে কামড়ায় তাহলে এমনও হতে পারে বিষের যন্ত্রনায় কামড়ানোর নিচের জায়গা ফেটে যেতে পারে।

আচলি কারার নিয়ম

তিনি মন্ত্র ১ নিঃশ্বাসে পড়ে আঁচলি বা বিষ আটকিয়ে রাখেন

মন্ত্র

"ছোট গাছ, লম্বা ফেলে বীল
আইজ আছলি করলাম আমি
বিষ ঝাড়বো কাল।"

তিনবার বলে হাতে ধুলা নিয়ে নিজের অঙ্গ বধ করতে হবে। এতে রোগীর শরীর বন্ধ থাকে। তবে তার সাথে ছটফটি গাছের শিকড় ১টি নিয়ে পিষে ১ ছটাক চিনির সাথে মিশিয়ে ১ গ্লাস পানি দিয়ে খেতে হয়।

সাপ না কামড়ানোর উপায়

রাখাল পান গাছের শিকড় অল্প একটু শরীরের যেকোনো জায়গা কেটে রেখে দিতে হবে এবং পরে সেলাই করে দিতে হবে। তাতে করে আর সাপে কামড়াবে না।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ৪

চিকিৎসার উপকরণ

পয়সা, পানি, চন্দ্রমূল, গোল মরিচ ইত্যাদি।

পদ্ধতি- ৪.১

তিনি প্রথমে হাত চালিয়ে পরীক্ষা করেন। তারপর পয়সা পানি দিয়ে ভিজিয়ে মুছে নেন এবং গায়ে লাগান। যে জায়গা ঠান্ডা থাকে সেখানে বিষ থাকে না আর যে জায়গা গরম থাকে সে জায়গায় বিষ আছে বুঝতে হবে। যে জায়গা পর্যন্ত বিষ আছে সে জায়গা পর্যন্ত বাঁধতে হবে এবং বিষস্থানের বিভিন্ন অংশ কেটে বিষ রক্ত বের করে দিতে হবে। তারপর চন্দ্রমূল গাছ খাইয়ে দিতে হবে সোয়াটা গোল মরিচ দিয়ে। যদি গাছ মিষ্টি লাগে তাহলে বিষ থাকবে, সামান্য তিতা লাগলে বিষ নামতে শুরু করবে। আর বেশি তিতা লাগলেও বিষ নেমে যায়। চিকিৎসার সময় রোগীকে পানি খাওয়াতে হয় না। যদি খাওয়ানো হয় তাহলে রোগী মারা যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ৫

চিকিৎসার উপকরণ

সাপেকাটা রোগের জন্য গাছ-গাছালির শিকড়, ডালপালা ও কুরআন শরিফের সূরা।

লক্ষণ : সাপে কাটলে ঐ স্থানসহ অনেকখানি জায়গা ফুলে যাবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৫.১

কবিরাজ রোগীর গায়ে বিষ আছে কিনা তা দেখার জন্য হাত চালান আর এই হাত চালানোর জন্য সূরা ইখলাস বিসমিল্লাহ্‌র সহিত পাঠ করতে হয় অনেকবার। তারপর জিয়ালা/ জিগা গাছের ছাল ক্ষত স্থানে লাগিয়ে দিলে যদি ক্ষত স্থান জ্বলে ওঠে তাহলে বিষ আছে মনে করতে হবে। গোমা সাপ কাটলে রক্ত বের করা না গেলে ব্লেড দিয়ে কেটে লবণ লাগিয়ে দিলে রক্ত বের হয়ে যাবে। তবে বিষ নামানোর পর বাধন হঠাৎ খুলে দিলে রোগী মারা যেতে পারে। তাই-আস্তে আস্তে বাধন ছেড়ে দিতে হবে। তিনি "সূরা ফাতিহা" ও ঢোল কলমি পাতার রস খাইয়ে বিষ নষ্ট করে দেন।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ৬

চিকিৎসার উপকরণ

মন্ত্র ও গাছ গাছালি দ্বারা সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করেন।

পদ্ধতি- ৬.১

সবার আগে তিনি নতুন ব্লেড দিয়ে সাপের দাঁত তুলে নেন। দাঁত তুলে কলার পাতায় রেখে দেন। প্রথমেই তিনি বিষ বোঝার জন্য রোগীর গায়ে চিমটি কাটেন। আর তিনি চিমটি কাটলে অবশ হয়ে যায় এবং আর উপরে বিষ ওঠে না। তবে তিনি হাত চালিয়ে দেখেন বিষ কতদূর আছে যতক্ষণ বিষ থাকে ততক্ষণ তিনি হাত চালান। হাত চালনোর মন্ত্র নিম্নরূপ

হাত চালানোর মন্ত্র:

"চল চল ব্রহ্ম চল,
কে চালায় গুরু চালায়
বিষ থাকবে তো স্বর্গে উঠবি
না থাকলে তো নরকে ঢুকবি।"

এরপর তিনি বিষ বন্ধ করার মন্ত্র পাঠ করেন বিষ বন্ধ করার জন্য নিমের ডাল দিয়ে ঝাড়েন ও পানিপড়া দেন।

পানিপড়ার মন্ত্র

"আষাড় পড়িল মায়ে
মাথায় বাজে নূপুর
ঝনু ঝুনা ঝুন নূপুর বাজে
সদাই সর্বকার
কে ডাকিল, কে শুনিল
সদাই সর্বকার।"

এই মন্ত্র ৩ বার পড়ে পনিতে ফু দেন এবং এই পানি গায়ে ছিটিয়ে দেন ও কিছু অংশ খাইয়ে দেন। আর এই পানি দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। বিষরক্ত কলার পাতায় রেখে দেন। বিষ থাকলে রক্ত কালো হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

এরপর তিনি বিষ কাটানোর জন্য মন্ত্র পাঠ করেন একাধিকবার। সেই সাথে বিষহরি গাছের শিকড়, পাতা খাইয়ে দেন। বিষ কাটানোর মন্ত্র নিম্নরূপ :

বিষ কাটানোর মন্ত্র

"গুন কাটো গুন জাতি কাটো
লোহার চক্র বনে কাটে
কে কাটে গোরু কাটে
কামরচক্ষ্যা কামরু গুরুর দোহাই।"

তবে বিষ ঝাড়ার শেষ মুহূর্তে এসে সুচ দিয়ে ফুটা করে বিষ রক্ত বের করে কলার পাতায় রাখেন। আর সেই রক্ত দেখলেই বুঝতে পারেন শরীরে বিষ আছে কিনা? বিষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি হাত চালাতে থাকেন।

পালনীয়

সাপে কাটলে ক্ষতস্থানের বেশ খানিক উপরে বাঁধতে হবে। যদি মাথায় কিংবা গলায় কামড়ায় তাহলে মাথার মধ্যে যে দুটি বাতির মতো আছে তা পড়ে গেছে কিনা দেখতে হবে। আর একটি করণীয় কাজ হলো বিষ ঝাড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাঁধন খোলা যাবে না।

চিকিৎসা পদ্ধতি- ৭

প্রথমে সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ে হাত চালান দেন। তারপর একটি সূরার আয়াত ৭ বার পড়ে একবার ফুঁ দেন। এভাবে যতক্ষণ বিষ না নামে ততক্ষন ফুঁ দিতে হবে। সে সূরার আয়তটি নিম্নরূপ–

"ওয়েজান বাতাসতুন বাতাসতুন জাবক্ষারূন"

বন্ধ্যাত্ব

রোগের লক্ষণ

পুরুষের প্রসাবে ফেনা না থাকা, শুক্রাণু পাতলা হলে পুরুষের কারণে বাচ্চা হয় না। একে পুরুষ বন্ধ্যা বলে অবিহিত করা হয়। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে নিয়মিত মাসিক না হওয়া, মাসিকের রং খারাপ হওয়া ইত্যাদি কারণে মেয়েরা বন্ধ্যা হয়ে থাকে বা বাচ্চা হয় না।

পুরুষের চিকিৎসা পদ্ধতি-১

হস্তিকান পলাশ গাছ চূর্ণ , অশ্বগন্ধা, আলুগুচ্চি, তালমূল, কচি শিমুল মূল, তালমাখনা, বনকুমড়া এগুলো একত্রে চূর্ণ করে মধু এবং ঘি সহযোগে দিনে ২ বার করে ১ মাস খেলে এ রোগ ভালো হয়ে যায়।

পদ্ধতি-১.১

ওলটকম্বলের পাতা ডগা কুচি করে কেটে রাতে ভিজিয়ে সকালে মিসরিসহ ছেকে খালি পেটে ২ সপ্তাহ খেতে হবে। এছাড়া ৪-৫ ফিট শিমুল গাছের মূল ছোট করে চিনি দিয়ে খালি পেটে সকাল ও বিকালে ২ সপ্তাহে খেতে হবে।

www.pathagar.com

নারীর চিকিৎসা পদ্ধতি- ২

ওলটকম্বলের শিকড় আপাং গাছের শিকড় এবং তিনটি গোল মরিচ একত্রে বেটে মাসিক হওয়ার পরের দিন রক্ত হোলার ফুল, শোয়াটা গোল মরিচের সঙ্গে গোসলের পর কিংবা ভেজা কাপড়ে খেতে হবে। তাহলে বন্ধ্যাত্ব দূর হবে।

পদ্ধতি- ২.১

মেয়ে বন্ধ্যার জন্য কবিরাজ প্রথমেই নারীদের মাসিক নিয়মিতকরণের ঔষধ দিয়ে থাকেন। অর্জুন গাছের ছাল, ওলটকম্বল ৫-টি গোল মরিচ, অনন্তমূল গাছ চূর্ণ করে বড়ি করে সকাল ও বিকালে ৩-৪ মাস খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২.২

লাল জবাফুলের কুড়ি বাটা মধুসহ খেতে হবে। ২য় পদ্ধতি আশোক গাছে চূর্ণ মিসরিসহ আর ওলটকম্বলের ছালের শরবত খেলে বন্ধ্যাত্ব দূর হয়।

পদ্ধতি- ২.৩

অনুপম জবা গাছের কুড়ি অশোক গাছের ছালচূর্ণ ও ওলটকম্বলের ছালচূর্ণ এবং মধু একত্র করে ১ মাস খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২.৪

ওলটকম্বলের শিকড় তিনটা গোলমরিচ দিয়ে বেটে মাসিক থাকাকালীন খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২.৫

শ্রাবণ মাসের পাট গাছে সূরা নাস পড়ে ৭টি গিট দিয়ে কোমরে বেঁধে দিতে হবে। যদি বাচ্চা পেঠে আসে তাহলে পাট ফেলে দিতে হবে। তবে সূরা নাস পড়ার কৌশল আলাদা। যেমন :

"কুল আ'ওজু বিরাব্বিনান্‌ছ নাছ নাছ নাছ
মালিকিন্নাছ নাছ নাছ নাছ
ইলাহিন্নাছ নাছ নাছ নাছ
মিন শাররিল ওয়াছওয়াছিল খান্নাছ নাছ নাছ নাছ
আল্লাজী ইউওয়াবিছু ফি ছুদুরিন্নাছ নাছ নাছ নাছ
মিনাল জিন্নাতি ওয়ানাচ্ছ নাছ নাছ।"

পদ্ধতি- ২.৬

কন্টকিয়ারি, বালকাসন্ধ্যা, ভূইকুমড়া, এগুলো দিয়ে মদক তৈরি করে শিমুলের পাতা এবং মধু দিয়ে খেলে গর্ভনারী ঠিক হবে।

পদ্ধতি- ২.৭

লাল জবা কুড়িবাটা মধুসহ খেতে হবে এবং অশোক গাছের চূর্ণ মিসরি ও ওলটকম্বলের ছালের শরবত পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

জ্বর

পদ্ধতি- ১

গরইচ গাছের ডাল, নিমের ছাল, মহাতিতা, কালো মেঘ পিষে পরিমাণ মতো খালি পেটে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

চিরতার গাছ পানি দিয়ে জাল করে পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

গুলঞ্চ ভিজানো পানি পরিমাণ মতো দিনে ২ বার খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

শিউলি পাতার রস, বাসক পাতার রস পারিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

পিপুল চূর্ণ, আদা ও বেল পাতার রস দিনে ২ বার খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

পিপুল চূর্ণ, মধু ও কাবাব চিনি একত্রে পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

চিরতার ডাল রোদে শুকিয়ে গুলি করে ৩ দিন রাতে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি-৮

তিত ভেট (ভাইট), হাড়ি কাঠি, হাড়বাকস, কণ্টকিয়ারি পাতিলে পানি দিয়ে জাল দিয়ে পরিমাণমত খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি-৯

মাদারের গাছের ছাল নিয়ে সাদা ন্যাকড়া দিয়ে বাম হাতে বেঁধে দিতে হবে। রবিবারে বেঁধে মঙ্গলবারে সন্ধ্যায় ৩ রাস্তার মাথায় ফেলে দিতে হবে।

জণ্ডিস

পদ্ধতি- ১

মেষজঙীর পাতা চিবিয়ে পানি খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

আফলা জাতবেল পাতা, দুধের সর সমপরিমাণ দিয়ে বড়ি করতে হবে। কিন্তু যে বড়িটি আগে করবে সেটি আগে খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

ডরপির গাছের পাতা চূর্ণ করে দুই হাতে কছলাতে হবে এবং হাত পানিতে ভিজানো থাকবে। এভাবে যতদিন ভালো না হয়।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৪

জিগা গাছের দক্ষিণ অংশের ছাল ২০০ গ্রাম চিনি দিয়ে রাতে ভিজিয়ে সকালে গোসলের পর একটি ডাবের পানির সাথে খেতে হবে। এভাবে ২ দিন খাবে। তৃতীয় দিন ৫০ গ্রাম চিনি এবং ৫০ গ্রাম জিগার ছাল ভিজিয়ে একটি ডাবের পানির সাথে খেতে হবে। তাতে জন্ডিস রোগের উপশম হবে।

পদ্ধতি- ৫

আন্ধাসা গাছের শিকড়, পাঁচটা মিষ্টি আমের ছাল ও চুন হাত, পা, চাঁদিতে ঘসে বাসি পানি দিয়ে গোসল করলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

কাঁটা ক্ষুরার শিকড় ১ কাপ পানিতে বেটে ১দিন পর পর ৩ দিন খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

এই রোগ উপশমের জন্য ভেণ্ডা, লাল ছটপটির শিকড়, মন মরিচের শিকড়, আখের গুড় ও কালোজিরার সাথে মিশিয়ে ৩ দিন খাওয়ালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৮

ছটফটে গাছের শিকড় এবং মিঠা আম গাছের ছাল একসাথে বেটে তিনভাগ করে ১ ভাগ খাওয়াতে হবে আর ২ ভাগ শরীরে মেখে দিতে হবে। এভাবে ২১ দিন করতে হবে। এছাড়াও মালা তৈরি করে দেয়া হয় বেশি।

মালা

ছটফটে গাছের ডাল দিয়ে মালা তৈরি করে রোগীর মাথায় দেয়া হয়। এটি দেয়া হয় ৩ সপ্তাহে রবিবার করে। কবিরাজের ধারণা গাছের ধর্মের কারণেই রবিবার দেওয়া হয়। এই মালা প্রথমে মাথায় দিতে হয়। পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে দেহের নিচের দিকে নামতে থাকে। এ মালার বিশেষত্ব হলো যত শক্ত করেই বাঁধা হোক না কেন তা বড় হতেই থাকবে। মালাটি কত তাড়াতাড়ি বড় হচ্ছে এবং নিচের দিকে নামছে তার উপর নির্ভর করে রোগের মাত্রা। রোগী বেশি অসুস্থ হলে তাড়াতাড়ি মালাটি বেড়ে যাবে। মালাটি শরীর থেকে নেমে যাওয়ার পর কাদার নিচে পুতে রাখতে হবে।

পদ্ধতি- ৯

চরচরি গাছের সাদা শিকড় ৫/৬ টা প্রত্যেক দিন ওরলের পাতার সাথে বেটে গুড়ের শরবতের সথে ৩ দিনে ১ বার ১ গ্লাস পরিমাণ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ১০

শিয়ালকাটা গাছের রস বাতাসা বিংবা চিনি দিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ১১

কুণ্ডুশ্বরি, ত্রিফলা, চিরতা, বেলশুঠ, আম শুঠ, জাম শুঠ, গম ভাদুরে অর্জুন ছাল পাথর কুঁচির পাতা একত্র সিদ্ধ করে ফাইল তৈরি করে ২ চামচ করে দিনে ৩ বার ৮-১৫ দিন খেতে হবে।

www.pathagar.com

মালা

রোগীকে মালা দেয়া হয় ছটফটে গাছের শিকড় দিয়ে। আর এটি ছোট সুতা দিয়ে গেঁথে দেওয়া হয়।

আমাশয়

পদ্ধতি- ১

পিপলজানি, হালকা কাপ লবণ মিশিয়ে খাওয়ালে আমাশয় ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

তেউরিমূল চূর্ণ অল্প করে খাওয়ানোর পর গরম পানি খাওয়ালে পায়খানা শক্ত হয়।

পদ্ধতি- ৩

সোনাপাতা রাতে ভিজিয়ে রাখলে পরদিন সকালে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

বেলপাতা পিষে ১ কাপ পরিমাণ ১ সপ্তাহ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

শুকনা আদা চূর্ণ করে ১/২ চামচ গরম পানি দিয়ে বিকেলে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

থানকুনি পাতা আর জিরা পিষে ছেঁকে নিয়ে পরিমাণমতো ২ বেলা খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

কোটরার ছাল, আতৈজ, ধাইকূল, লোদ বড়কান্ত, ইন্দ্রজব, রক্ত চন্দন, নাগেশ্বর, মোথা বেলসূট একসাথে সিদ্ধ করে এর রস সকাল সন্ধ্যা ১ ছটাক পরিমাণ খেতে হবে। এর পাউডার করে খেলেও ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৮

জাম পাতার রস দুই চামচ ও মিসরিসহ খেলে ভোলো হয়।

পদ্ধতি- ৯

ওলটকম্বলের পাতা মিশিয়ে ১/২ গরম পানি ও চিনি / মিসরিসহ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ১০

জায়ফল, জয়ত্রী, ইন্দ্রজব, কর্পুর মোথা একত্র করে ১/২ রতি পরিমাণ করে বড়ি বানিয়ে খেলে ভালো হয়।

রক্ত অমাশয়

কাঁচা দূর্বার রস, ১/২ গরম ঘোলের সাথে মিশিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ১১

গন্ধ ভাদুলিয়া পাতার রস মিসরি দিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ১২

মেথি ও জিরাবাটা রস ১/২ চামচ ও ১/৩ চামচ পানি মিশিয়ে খেলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ১৩

কুটিরাজ গাছের ছাল বেটে ৩ ফোটা চুনের পানি দ্বারা মিশিয়ে দিনে ৩ বার আহারের আগে খেলে ভালো হয়।

কুষ্ঠরোগ

পদ্ধতি- ১

খদির কাঠ, দেবদারু, সোমরাজা, ত্রিফলা ইত্যাদি পিষে দিনে ২ বার করে আহারের পর খেলে ভালো হয়ে যাবে।

পদ্ধতি- ২

ছটফটির শিকড়, বড় এলাচ, কর্পুর, মুথা একত্রে বেটে চিনি দিয়ে বড়ি করে খেতে হবে। এছাড়া লাগানোর জন্য কেসুরা গাছ বেটে ক্ষত স্থানে লাগাতে হবে।

ধ্বজভঙ্গ

রোগের কারণ

প্রসাবের সাথে ক্যালসিয়াম চলে যাওয়া, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ, হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি।

পদ্ধতি- ১

খাটি মধু, আখরস ও সিদ্ধ মকরস একসাথে মিশিয়ে ১৫-২০ দিন খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২

বৃহৎ অশ্বগন্ধারিষ্ট, শুক্র সঞ্জীবন। সিদ্ধ মকরস, বৃহৎ পূর্ণচন্দ্র রস। পানিসহ চা চামচ পরিমাণ ঔষধ সকালে ও বিকালে মধুসহ খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

স্বর্ণ ভস্ম, শীশা ভস্ম, লৌহ অভ্র, প্রবাল মুক্তা, গর্ব্য দুগ্ধ, ইক্ষুরস, রাখছাল, লাক্ষা, মূলের রস, মোচর রস, মালতী ফুলের রস একত্রে বড়ি করে খেতে হবে।

লিকুরিয়া

পদ্ধতি- ১

কাটাক্ষুরের রস গুড় দিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি-২

হরিতকি বেটে কুসুম গরম করে লিঙ্গাস্থানে লাগাতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

কানজিয়া গাছের শিকড় চাল ধোয়া পানির সাথে মিশিয়ে এক কাপ করে ১৪ দিন খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৪

হরিতকী, বহেরা, আমলকি, সোনাপাতা, চিরতা, সোনামোথা, অর্জুন, জায়ফল, কালোজিরা এগুলো রোদে শুকিয়ে অর্ধচূর্ণ করে নদীর পানিতে ভিজিয়ে সিদ্ধ করে রস করে দিনে ৩ বার ২ চামচ করে খেতে হবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৫

ফকটেবরার শিকড় পিষে বড়ি করে দিনে ২ বার করে ১ মাস খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৬

বুজরচকী দানা, শ্বেত করবরীর ফুল, সম্রাজবীজ, হরিতাল, আগর করা গাছ, বঙ্গ চামবা, কাসা, অষ্টধাতু, মুক্তা ভস্ম এগুলো চূর্ণ করে লিঙ্গস্থানে প্রলেপ দিতে হবে ১-৩ মাস পর্যন্ত।

পদ্ধতি- ৭

শতমূল গাছের শিকড়, ত্রিফলা, জায়ফল, অর্জুন গাছের ছাল, গরম মসলা একত্রে বেটে দিনে ২ বার করে ১০-১২ দিন খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৮

ঘৃতকুমারি গাছের পাতা মিসরির সাথে শরবত বানিয়ে দিনে ৩ বার ৫-৭ দিন খেতে হবে।

একশিরা

পদ্ধতি- ১

চাকরলতি গাছের কিছু অংশ কেটে সুতা দিয়ে কোমরের সাথে বেধে দিতে হবে। যাতে গাছের অংশটি অণ্ডকোষে লাগে। ফলে যত তাড়াতাড়ি শুকাবে অসুখও দ্রুত কমে যাবে।

পদ্ধতি- ২

বালাইলার গাছ, ভটকার গাছের শিকড় একসাথে করে সুতা দিয়ে কোমরে বেধে দিলে একশিরা ভালো হয়ে যায়।

পদ্ধতি- ৩

আদা, চিনি, চুন, নির্বিশের বোটা বেটে লাগাতে হবে। দিনে একবার পাঁচ দিন লাগাতে হবে। তবে রবিবারে এই চিকিৎসা দেয়া হয়।

পদ্ধতি- ৪

বড়ই এর কাটা, সূর্য্যকাটা, এছাড়া বিভিন্ন কাটা একসাথে তাবিজে ভরে কোমরে বেধে দিতে হবে। এছাড়া খাটি সরিষার তেল দিয়ে মালিশ করতে হবে।

মৃগিরোগ

পদ্ধতি- ১

তালমূলী, হরিতকি অর্জুন ছাল, রক্তচন্দন, অশ্বগন্ধা একত্রে পিষে ২ চামচ করে আহারের পর খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২

৭-টি কেঁচো রস করে একবার খাওয়ালে মৃগি রোগ ভালো হয়।

www.pathagar.com

মেহ/প্রমেহ

পদ্ধতি- ১

প্রথমে রোগীর হাত দেখেই অনুমান করেন রোগীর এই রোগ হয়েছে। মেহ চিকিৎসায় লাল ছটফটে গাছের শিকড় চূর্ণ করে মধু সহযোগে রোগীকে খেতে হবে, এভাবে ৭ দিন খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

জামের বীজ শুকিয়ে চূর্ণ করে চা চামচের ১ চামচ মধু ও তিন আঙুল ঔষধ উঠিয়ে মধুর সাথে মিশিয়ে খালি পেটে সকালে এবং রাতে ৭ দিন খেলে ভালো হয়।

আধ কপালি

পদ্ধতি- ১

ওকড়া গাছের পাতা লবণ সহযোগে যে পাশে ব্যথা সে পাশে লাগাতে হবে। তাহলে ব্যথা ভালো হবে।

পদ্ধতি- ২

করলা পাতার রস করে যে পাশে ব্যথা সেই পাশে নাকের ছিদ্র দিয়ে রস টেনে নিতে হবে। এভাবে ২-৩ দিন করতে হবে।

গ্যাস্টিক/অম্লপিত্ত

পদ্ধতি-১

আমলকি রসের সাথে ঠান্ডা পানি মিশিয়ে দুপুরে ও রাতে খেতে হবে। এছাড়া কল্যান পাউডার ঠান্ডা পানি দিয়ে দিনে ২ বার খেতে হবে এবং ভাস্কর লবণ গরম পানির সাথে মিশিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

ত্রিফলা, চিরতা, গুলঞ্চ, নিমছাল, কন্টকিয়ারি, সোনা পাতা, বেলশুঠ, পটল পাতা একত্রে সিদ্ধ করে কিংবা ভিজিয়ে সকাল সন্ধ্যা এক ছটাক পরিমাণ খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

মলকির রস ও ধাতরীর রস ৪ চামচ করে দিনে ২ বার খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৪

বেলের পাতা, সোনা পাতা, চৌচিরতা, ত্রিফলা, মুথার আইঠা একত্রে আড়াই কেজি পানিতে সিদ্ধ করে ১/২ কেজি করতে হবে এবং দিনে ৩ বার ঐ ঔষধ ২ চামচ পরিমাণ খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৫

হরিতকী, বহেরা, আমলকি, রাতে পরিষ্কার পানিতে ভিজিয়ে সকালে পানিটুকু খেতে হবে। এভাবে ৭-দিন খেতে হবে।

www.pathagar.com

টিউমার

পদ্ধতি- ১

সূরা রহমানের কয়েক আয়ত পড়ে পানিতে ফু দিলে টিউমার ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

ভটকার গাছের শিকড় প্রতি রবিবারে টিউমারের উপর ঘষতে হবে। তারপর ঐ শিকড় ঘরের চালে ফেলতে হবে। তাহলে টিউমার ভালো হবে।

পেটের সমস্যা

পদ্ধতি- ১

পারা ২২ রুকু ১৭ এই আয়াতটি একখণ্ড কাগজে লিখে পেটের ওপর রাখলে আল্লাহর রহমতে ভালো হয়।

পীড়া ও অরুচি প্রশমক/ পেটের সমস্যা

পদ্ধতি- ২

গোলঞ্চ, নিমছাল, ধনিয়া জাওন, হরিতকি, জংলি হরিতকি, কন্টকিয়ারি সিদ্ধ করে দিনে ৩ বার ৪ চামচ করে খেতে হবে।

হজমশক্তি বাড়ানো

পদ্ধতি- ৩

ধনিয়া, বিটলবণ, কালোজিরা জিরা, গোল মরিচ, বড় এলাচ দারুচিনি, আম্লবেতণ পিপল, ডালিম ছাল, তালিসপত্র নাগেশ্বর ফুল, আদা সূঠ একত্রে চূর্ণ করে প্রতিদিন খাওয়ার পর ১ চামচ করে খেলে ভালো হয়।

পেটফাপা/ডাকা

পদ্ধতি- ৪

জিরা, আদা, জাওন, ধীরঙ্গ চিতামূল একত্রে মিশিয়ে দিনে ১/২ বার ১ চামচ করে খেলে ভালো হয়।

পাতলা পায়খানা

পদ্ধতি- ৫

সূরা ইয়াসিন সাতবার পরে তিনবার পেটে ফুঁ দিলে ভালো হয়।

বাতের ব্যথা

পদ্ধতি- ১

কদম গাছের ছাল, পিপল জ্যাঙ্গি, আদা, টোটার গাছ একত্রে কুসুম গরম করে ব্যথা স্থানে লাগিয়ে রোদে থাকতে হবে । এভাবে ৩ দিন লাগালে ভালো হবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ২

বিষ তারুকের শিকড় সোয়াটা গোল মরিচের সাথে বেটে কুসুম গরম পানির ভিতর রেখে ব্যথা স্থানে ঢাললে ভালো হয়ে যায়।

পদ্ধতি- ৩

বাসক ছাল, রক্তচন্দন, বালা পানিতে ভিজিয়ে বেটে তরল করে রোদে শুকিয়ে ব্যথা স্থানে দিনে ২ বার লাগাতে হবে।

পদ্ধতি- ৪

কবিরাজ ব্যথা স্থানে চাপ দিয়ে সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ে ৩ বার ফুঁ দেন। ফলে বাতের ব্যথা ভালো হয়।

কাশি

পদ্ধতি- ১

প্রতিদনি সকালে ১টি করে ডাব খেলে শুকনা কাশি ভালো হবে।

পদ্ধতি- ২

আদা শুঠ, পিপল, গোলমরিচ, দারুচিনি, বড় এলাচ, তালিশপত্র একত্রে চূর্ণ করে মধু কিংবা চিনিসহ খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

তুলসী পাতার রসের সাথে মধু মিশিয়ে খেলে কাশি ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

বাসক পাতা, পিপল, কাবাব চিনি, জায়ফল, জয়ত্রী একত্রে মিশিয়ে দিনে ২-৩ বার খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

ওলটকম্বলের ডাল ভিজিয়ে মিসরিসহ খেলে ভালো হয়।

শুক্র তারল্য

পদ্ধতি- ১

চন্দন, সারিকাদি, শুক্রাসন্থিমূল, পূর্ণচন্দ্র মূল, পূর্ণচন্দ্র রস, শিমুল মূল একত্রে করে ১ মাস দিনে ৩ বার করে খেলে রোগ ভালো হয়।

বিখাউজ

লক্ষণ : চুলকাবে, ফুলবে, আঠা আঠা ভাব হয়ে যাবে।

পদ্ধতি- ১

ধনস্থির পাখি যে গাছে বসে সেই গাছের ঐ অংশে পাখির মতো ছায়া পড়ে। তখন গাছের কাণ্ডে লোকের মতো হবে। ঐ ডাল এবং মেহেদীসহ বেটে লাগালে ভালো হবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ২

থকথকে ঘা হলে–

ছত্রিশ মাস, চিতল মাছের আঁশ, সরলের পঁচা পাতা, জামের পঁচা পাতা, আমের পঁচা পাত, কেরো ধানের বিচন, একসাথে শুকিয়ে ভেজে গুঁড়া করে ক্ষত স্থানে গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ত্যানা দিয়ে ২/৩ বার লাগালে ভালো হয়।

নিউমোনিয়া

পদ্ধতি- ১

পিপল গাছ এবং পাঁচ রকম গরমমসলা একসাথে পাটাতে পিষে রোদে শুকিয়ে বড়ি কিংবা পুরিয়া বানিয়ে দিনে ২ বার ১০-১২ দিন খেলে ভালো হয়।

চর্মরোগ

পদ্ধতি- ১

কাঁচা হলুদ সারা শরীরে মাখিয়ে দিলে শরীর দিয়ে পানি বের হবে। তখন নিমের পাতা সিদ্ধ করে গোসল করতে হবে। শরীর শুকানোর পর ঈশ্বর মূলের ডালপালা বেটে কাঁচা হলুদের সাথে লাগাতে হবে। এছাড়া বাসক পাতা বেটে প্রসাবের সাথে লাগাতে হবে। খাওয়ার জন্য ভটকার গাছের ছাল মধু দিয়ে বেটে খেতে হবে এবং পাতাটি সাদা খয়ের দিয়ে ভিজিয়ে খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২

অন্তমূল, শ্যামালতা, নিম, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন একত্রে বেটে খাওয়ার পর ৪ চামচ করে দিনে ২ বার খেতে হবে। এছাড়া চাল কুমড়ার তেল দিনে ২-৩ বার লাগাতে হবে। এই রোগ যদি বেশি মাত্রায় হয় তবে নিমপাতা সিদ্ধ কারে সেই পানি দিয়ে গোসল করতে হবে।

কানের সমস্যা

পদ্ধতি- ১

কানে পানি ঢুকলে অনেক সময় কানে কম শোনা যায়। তখন টৌটার গাছের পাতা লবণ দিয়ে বেটে কানে দিলে ভালো হয় কিংবা শুধু গাছের পাতা দিলেও ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

তুলসী পাতার রস কানে দিলেও ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

অনেক সময় কান ভার হয়ে থাকে কিংবা শব্দ শোনা যায় না। এজন্য মাদার গাছের দক্ষিণ দিকের ছাল লবণ দিয়ে বেটে কানে দিলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

কানে ব্যথার কারণে কম শুনলে কর্ণমূল কুসুম গরম করে কানে দিলে সেরে যায়।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৫

কাতলার গাছের শিকড়, একটি বাঁশের কঞ্চি মানুষ সমান কেটে নিয়ে যে পাশে ব্যথা সে অংশে শিকড়সহ ধরতে হবে। ফলে সামনের দিকে কঞ্চির কাটা অংশ জোড়া লেগে যাবে।

পদ্ধতি- ৬

লাল লজ্জাবতী এবং সাদা লজ্জাবতীর শিকড়, সাদা আকন্দের শিকড় কোমরে বেঁধে দিলে ব্যথা ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

বিছাতুর গাছের ফল পিষে রস করে কানে দিলে যন্ত্রণা কমে যায়।

এলার্জি

পদ্ধতি- ১

নিমছাল, চিরতা, গোলঞ্চ, কালমেঘ, ত্রিফলা, সিদ্ধ করে রস দিনে ৩ বার ২ চামচ করে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

নাকে কালো জিরার তেল ব্যবহার করতে হবে এবং এই তেল মধু দিয়ে খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

দারুচিনি ভিজানো পানি নিশিন্দা পাতার রস মধুর সাথে খেতে হবে তাহলে এলার্জি ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা বেটে গায়ে মাখতে হবে আর চিরতার ডাল ভিজিয়ে পানি পরিমাণ মতো খেলে ভালো হবে।

পদ্ধতি- ৫

ওলটকম্বলের ডাল রস করে পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়

স্বপ্নদোষ

পদ্ধতি- ১

কাবাব চিনি ৪/৫টি, পরিমাণ মতো দূর্বা ঘাস, কাঁটাক্ষুরার শিকড়, চাল ধোয়া ১ কাপ পানি একত্রে বেটে দিনে ১ বার খেতে হবে।

পদ্ধতি- ২

খগ্‌শা গাছের বীজ, সোনামুখি সুচের আগা ৩-টা, বড়শি ৩টা, ছটফটি গাছের মূল একটু নিয়ে তাবিজে ভরে মোম দিয়ে এটে দিতে হবে। তাবিজটি যে কোনো জায়গায় রাখলে হবে।

বহুমূত্র/ডায়াবেটিস

কারণ

যৌনক্ষমতা কমে গেলে, সুগার নেমে গেলে সাধরণত এই অসুখ হয়। এছাড়াও অনিয়মিত খাওয়া ও এ রোগের কারণ।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ১

ত্রিফলা ও কালো মেঘ পানিতে ভিজিয়ে জাল করে দিন ২/৩ বার খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

মেথি চূর্ণ করে পানি দিয়ে গুলিয়ে পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

কচি ডুমুর চিবিয়ে খালি পেটে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

জামের বীজ, আমের বীজ, চিরতা, ধাত্রী আমলকী, হরিতকী, বহেরা পিষে সমপরিমাণ ঠান্ডা পানিসহ দিনে ২ বার ২ চামচ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

তুত গাছের পাতা নিয়মিত খেলেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে।

পদ্ধতি- ৬

মিসরিগীর পাতা দিনে ৩-৪ বার ৫-৯ টি পাতা খেলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকে। ডায়াবেটিসের কারণে যে যৌন ক্ষমতা কমে যায় এই পদ্ধতিতে চললে যৌন ক্ষমতা আর নিম্নগামী হয় না। মিষ্টি ও খেতে পারবে।

চোখের সমস্যা

চোখ দিয়ে পানি পরা

পদ্ধতি- ১

সূরা কদর ৩ বার পরে পানিতে ফুঁ দিয়ে পানি ব্যবহার করলে ভালো হয়।

চোখ ওঠা

পদ্ধতি- ২

মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে ভালো হয়। মন্ত্র তিনবার পড়তে হয়। সেই নির্দিষ্ট মন্ত্রটি নিম্নরূপ

মন্ত্র

"সিতা গেল পারকূল
তাতে জন্মিল চক্ষুশূল
গোরক্ষনাথের বরে ঝাড়ে
ফেললাম অমুকের চুক্ষশূল ।"

চোখে ছানি পড়া

পদ্ধতি- ৩

দুধপড়া ও পানিপড়া দিয়ে চোখের ছানি পড়া ভালো করা যায়। তবে মন্ত্র পড়েও এর উপশম করা যায়। মন্ত্রটি নিম্নরূপ–

www.pathagar.com

মন্ত্র

"হাসনি কাদনি দুটি বহিন
কাদনিকে নিয়ে গেলাম সাত সমুদ্দর পার
হাসনিকে পাইরে দিলাম সর্ব সোনার খাট
রাস্তাতে দেখে এলাম মাসি কুসির বাসা
একটি পাহাড় পর্বত নাই
নিন্ধী খেন্দরার বাসা।"

পদ্ধতি- ৪

তুলসী পাতা ও সামান্য লবণ একসাথে রস করে ১/২ ফোঁটা পরিমাণ দিনে ১ বার চোখে দিলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

নয়ন তারা গাছের শিকড় সকালে ছানির উপর দিয়ে নাকের দিকে ১ বার টেনে দিয়ে এবং বিপরীতে ২ বার টেনে দিয়ে কাদা মাটিতে পুঁতে দিতে হবে।

দন্তরোগ

দাঁত কামড়ানো

পদ্ধতি- ১

মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে ভালো হয়। মন্ত্র নিম্নরূপ :

মন্ত্র

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম × এর আছি পোকা দূরহ খাইরাম যাইরাম।"

দাঁতের পোকা, মাড়ি ফোলা, ব্যথা, রক্ত পড়া

পদ্ধতি- ২

পঁচা সুপারি, লজ্জাবতী, খুদির কাঠ, সুপারির শিকড়, ডাব গাছের শিকড় সিদ্ধ করে ৩/৪ বার কুলি করলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

বিষতরকের গাছ, লাল মোথা, নিমের জল এগুলো দিয়ে মাজন তৈরি করে দাঁত মাজলে ভালো হয়।

দাঁতের পাইরিয়া/মাড়ি ফোল

পদ্ধতি- ৪

দুলাল বাবু গাছের একসাদানা ভিজিয়ে দাঁদের ক্ষতস্থানে অথবা মাড়ি ফোলা স্থানে লাগালে ভালো হয়।

দাঁতের পোকা

পদ্ধতি- ৫

একটা ঝাড়ুর খিলে মেয়ে হলে বাম হাতে আর ছেলে হলে ডান হাতে খিলের সাথে তুলা জড়িয়ে আঠা লাগিয়ে এর সাহায্যে পোকা স্থানে লাগিয়ে দিতে হবে। ছাইতান

www.pathagar.com

গাছের আঠা লাগানোর পর আর হাত লাগানো যাবে না তখন রোগী ঘুমিয়ে যাবে। আর সেদিন থেকে ব্যথা পুরোপুরি ভালো হয়ে যাবে।

দাঁতের ব্যথা

পদ্ধতি- ৬

পুদিনা গাছের পাতা চূর্ণ করে পাউডার করে ব্যথা স্থানে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়।

হাড় ভাঙা

পদ্ধতি- ১

কচুরী পানার শিকড়, বিছাতু গাছের শিকড়, হাড় জোরার গাছ বেটে ২-৩ দিন ভাঙা স্থানে মিল করে লাগালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

ডিমের কুসুম ও হাড়াজোড়ার গাছের মাঝখানের অংশ বেটে ভাঙা স্থানে সাবধানে কয়েকদিন বাঁধলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

প্রথমে হাড় ভেঙেছে কিনা দেখে নেন। তারপর হাড়জোরা গাছ, লজ্জাবতী গাছ, ১ টা ডিম, মধু ২৫ গ্রাম, কাবাব চিনি ২৫ গ্রাম মিশিয়ে যে স্থানে ভেঙে গেছে সেই স্থানে লেপন করে দিতে হবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে হাড় জোড়া লেগে যাবে। তবে ৭ দিন সাবধানে চলাচল করতে হবে এবং টক জিনিস খাওয়া যাবে না।

পদ্ধতি- ৪

ছানছি গাছের শিকড় আর সোয়া ২১ গোণ্ডা গোল মরিচ, কালো মুরগির ডিমের সাদা অংশ একসাথে বেটে ভাঙা স্থানে উপরে কদমের পাতা দিয়ে বেঁধে ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে।

পদ্ধতি- ৫

হাড় ভেঙে গেলে টেনে ছেদ করে দেন। তার পর অর্জুন ছাল ৫০ গ্রাম রসুন কোয়া চূর্ণ করে গরম করে ঠান্ডা হলে ক্ষত স্থানে বেঁধে দিতে হবে। এইভাবে ১/২ দিন বাঁধতে হবে। যদি ভালো না হয় তাহলে নুনি দিয়ে ম্যাসেজ করতে হবে।

পদ্ধতি- ৬

হার জোড়া লাগানোর জন্য বাঁশ দিয়ে হাড়জোরা গাছের পাতা পিষে লাগিয়ে বেঁধে দিলে কয়েকদিনে ভালো হয়।

হাঁপানি

পদ্ধতি- ১

কফ ওঠার জন্য কাঁচা হলুদ ও পাথর কুচির পাতা রস করে সকালে খেতে হবে।]

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ২

বাসক পাতার রস, পিপল চূর্ণ ১০০ গ্রাম চিনির সঙ্গে মিশিয়ে জাল দিতে হবে। জাল দিয়ে কমে গেলে ৪০০ গ্রাম চিনি মেশাতে হবে। সকাল ও রাতে আহারের পর ২ চামচ করে খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৩

ব্যাঙের কলিজা (কাঁচা), লডজিরা গাছের শিকড় একত্র করে গুলি (গোল) করে দিনে ২ বার ৩ সপ্তাহ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

চিনি কলা, আকন্দ গাছের শিকড় অল্প পরিমাণ প্রতিদিন পরিমাণ মতো বাসি পেঠে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস ৬৬ বার পড়ে ৬৬ বার ফুঁ দিলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

মন্ত্র ৩ বার পড়ে ৩ বার ফুঁ দেন।

মন্ত্র

"সাত সমুদ্দুর পরে
শ্বেত শিমুলের গাছে
ক্ষুদ খায় চালে বাছে
কাটা খায় মাছ কাছে।"

পদ্ধতি- ৭

ছটফটিয়া, লজ্জাবতী, ডাকাইতা পঙ্খিরাজ, মনীরাজ, কাল নাগীনা এগুলোর শিকড় অল্প করে কেটে তাবিজ আকারে গলায় বেঁধে দিলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৮

ওল গাছের ফলের বীজ আর সোয়াটা গোলমরিচ এক সাথে বেটে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৯

মুদ্রা শঙ্খ চূর্ণ ও ঘি ফ্যাট করে মলম তৈরি করে লাগালে ভালো হয়। অথবা শিয়ালের রক্ত মাখলে ভালো হয়।

ব্রণ, মেছতা, দাগ

পদ্ধতি- ১

চন্দন কাঠ চূর্ণ করে কাঁচা হলুদ ১ চামচ, দুর্বার রস ১ চামচ, কর্পূর ১ গ্রাম, মিশিয়ে মুখে লাগাতে হবে। দিনে ২ বার ১ ঘন্টা করে।

পদ্ধতি- ২

কাঁচা হলুদ, শঙ্খ চূর্ণ, হাতি শূরা গাছ কেটে মলম তৈরি করে দিনে ২/৩ বার লাগালে ভালো হয়। ২/৩ মাস এভাবে করতে হবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৩

সোহাগা, লেবুর রস, মধু, অর্জুন ছাল গুড়া করে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেছতা ভালো হয়।

দাদ

কারণ

অপরিষ্কার জায়গায় সাধারণত দাদা হয়।

পদ্ধতি- ১

বাদর লাঠি গাছের পাতা বেটে পান্তা ভাতের পানির সাথে মিশিয়ে লাগালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

কারেন গাছের পাতা দাদের স্থানে চুলকিয়ে ঘসে দিলে ঘা হয়ে যাবে। আর ঘা হলে নারিকেল তেল দিলে ভালো হয়।

পাইলস/অর্শ্ব

পদ্ধতি- ১

ফিটকিরি ভিজিয়ে চূর্ণ করে পাউডার করে আঙুলে থুথু নিয়ে লাগাতে হবে। যদি পরিমাণে বেশি হয় তবে ব্যথা হতে পারে।

পদ্ধতি- ২

সোনাপাতা, হরিতকী, বহেরা আমলকী, বেলশুট ভিজিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

আপা গাছের শিকড় পান দিয়ে ২ বেলা খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

ভেড়ার লোম পুটলি করে সেক দিলে উপকার হয়।

পদ্ধতি- ৫

কাতলা গাছের শিকড় ও খড়ি মাছ পিষে রবিবার রাতে সকালে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

রসুনের ১ কোয়া প্রতিদিন দুপুরে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

কানা বামুজ এর মাথা, গোমার দণ্ডকলস মিশিয়ে গুলি করে দিনে ২ বার ১ মাস খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৮

ডালিম গাছের কুড়ি বেটে সামান্য গুড়ের সাতে সকালে বাসি পেটে দিনে ৩ বার ৩ দিন খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৯

পাইলস এ ব্যথা থাকলে কাঁচা পেঁপের রস বাতাসার সাথে খেলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

চর্বি কমানো

পদ্ধতি- ১

তুতগাছের পাতা প্রতিদিন ২/৩ টা করে চিবিয়ে খেলে চর্বি কমে যায়।

পদ্ধতি- ২

বেগুন পুড়ে লবণ দিয়ে চটকিয়ে খেলে আর কড়া করে রাতে রুটি খেলে ভালো হয়।

খুশকি

পদ্ধতি- ১

রিঠা ফল ভিজিয়ে মাথায় ব্যবহার করলে খুশকি দূর হয়।

পদ্ধতি- ২

কালোজিরার তেল নিয়মিত ব্যবহার করলে খুশকি থাকে না এবং মাথা ব্যথাও সেরে যায়।

সর্দি

পদ্ধতি- ১

শিউলি পাতার রস, কালো মেঘের রস মধু দিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

তুলসী পাতার রস ও মধু দিনে ২ বার খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

কালোজিরার তেল ও মধু মিশিয়ে পরিমাণ মতো খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

মধু আদার রস ১ চামচ পরিমাণ মিশিয়ে কুসুম গরম পানি দিয়ে খেলে ভালো হয়।

ব্যথা

মাথা ব্যথা

পদ্ধতি- ১

কালোজিরার তেল ড্রপ দিয়ে দুই ফোটা করে নাকে দিলে ব্যথা ভালো হয়ে যায়।

পদ্ধতি- ২

নিসিন্দা ও দারুচিনি পিষে কপালে লাগালে মাথা ব্যথা ভালো হয়।

বুকের ব্যথা

পদ্ধতি- ৩

অর্জুন ছালের চূর্ণ গরম দুধের সাথে ১/২ চামচ চিনি মিশিয়ে সকালে খেলে সুস্থ থাকা যায়। এভাবে ৩ মাস খেলে ভালো হয়। তবে অর্জুন ছাল রাতে ভিজিয়ে সকালে খেলে বেশি উপকার হয়।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ৪

সূরা ইখলাস ৩ বার পড়ে ফুঁ দিলে মাথা ব্যথা ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

সোনা ছাল, পারুল ছাল, গাম্বার ছাল, কণ্টকিয়ারি, শালপানি গোলঞ্চ, আদা শুঠ, পিপল কাটকী, দেবদারু, পূর্ণনোভা সিদ্ধ করে ১ ছটাক পরিমাণ খেলে ভালো হয়।

গলা ব্যথা

পদ্ধতি-৬

কালোজিরার তেল নাক দিয়ে টানতে হবে এবং গলায় মাখতে হবে। আদা ও বেল পাতার রস ২ চামচ ও মধু ১ চামচ মিশিয়ে খেলে ভালো।

পুরাতন ব্যথা

পদ্ধতি- ৭

শতমূল, ঈশ্বরমূল অনন্তমূল, জাফরান বেটে এগুলোর সাথে পারদ মিশিয়ে প্রলেপ দিতে হবে এবং, ব্যথার জায়গায় হাত দিয়ে মালিশ করতে হবে।

পদ্ধতি- ৮

হরিতকী, চৈচিরতা, জাওন, বহেরা, ধনিয়া, অর্জুন ছাল একসাথে সিদ্ধকরে পানি কমিয়ে ফাইল করে পরিমাণমতো দিনে ২ বার খেতে হবে যত দিন ব্যথা ভালো না হয়।

হাত/পা ব্যথ্যা

পদ্ধতি- ৯

সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পড়ে ৩ বার করে ফুঁ দিলে ভালো হয়।

পেট ব্যথা

পদ্ধতি- ১০

পাথর কুচির পাতা সামান্য পরিমাণ লবণ দিয়ে চিবিয়ে খেলে ভালো হয়। দিনে ২ বার খেতে হবে। যদি এতে না হয় আদা ও সামান্য লবণ চিবিয়ে খেলে ভালো হয়।

রক্তবন্ধ

পদ্ধতি- ১

মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলে ভালো হয়। মন্ত্র নিম্নরূপ-

মন্ত্র

"কাল মুরগির লাল টোপ
রক্ত পড়ে ফোট ফোটর
চাঁন সূর্য্য দুই ভাই
কাটা ঘা ফুকাইতে যাই
নাই লোহ নাই পুঁজ

www.pathagar.com

কাটা ঘায়ে মুখ বুজক
দোহাই আল্লাহর।"

এই বলে সূর্যের দিকে হাঘুরা ধরে মন্ত্র ৩ বার বলে যেখানে কেটে গেছে সেখানে ঠেকাতে হবে। তারপর ছোট করে কোপ দিতে হবে।

পদ্ধতি- ২

কাঁচা হলুদ এবং ঘৃতকুমারীর পাতা মিশিয়ে পচন স্থানে লাগালে ভালো হয়। ঘা পরিষ্কার করার জন্য ঘৃতকুমারীর লাল পাতা রস করে গরম পানির সাথে নিমের পাতাসহ পরিষ্কার করে দিনে ৩ বার ১৫ দিন লাগালে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

গাঁদা পাতা পিষে/দূর্বার রস দিলে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

পদ্ধতি- ৪

তেলাকুচার পাতার রস ও গোবরের গোঠা একসঙ্গে করে ফেলে চুল দিয়ে ঘষে দিলে ভালো হয়। এভাবে দিনে তিন বার করে।

প্রসাবের যন্ত্রণা

পদ্ধতি- ১

কাঁটা ক্ষুরার শিকড় রস করে মিসরিসহ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ২

আপাং গাছের শিকড় রস করে মিসরিসহ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৩

বেলের পাতার রস, স্থল পদ্ম ভিজানো পানি খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৪

ওলটকম্বল ডাটা ভিজানো পানি খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৫

গোক্ষরনাথ কলাই ভিজানো পানি ১/২ কাপ পরিমাণ খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৬

বরুণ ছাল, কাশিবিয়ানা, গোক্ষুর কাটা, মাস কালাই আদাশুঠ, তারমূলি, একত্রে সিদ্ধ করে পানি মিশিয়ে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৭

ডুমুরের রস খেলে ভালো হয়।

প্যারালাইসিস

পদ্ধতি- ১

কদম, পিপল জঙ্গী, আঁদা, কুলকুহুলি একাসাথে বেঁটে লাগাতে হবে।

www.pathagar.com

পদ্ধতি- ২

গ্লিসারিন আর পরিমাণ মতো পটাশ মাখিয়ে দিয়ে পেটাতে হবে। তবে সেক দেয়ার প্রয়োজন নাই।

পদ্ধতি- ৩

কুলকুলি গাছের শিকড়, চিরতা গাছের শিকড়, শুলকুমার গাছের শিকড় একত্রে বেটে কুসুম গরম করে যে স্থান অবশ হয়েছে সেই জায়গায় লাগিয়ে দিতে হবে। দিনে ২ বার। এরপর সূরা ফাতিহা পশ্চিম মুখে বসে নামাজ পড়ে সামনে পানি নিয়ে ফুঁ দিলে আর সেটি ব্যবহার করলে ভালে হয়। এছাড়াও সূরা নাস, সূরা ফালাক, সূরা ইখলাস পড়ে ফুঁ দিলেও ভালো হয়। তবে এর সাথে দুধের ননীও লাগাতে হয়।

পদ্ধতি- ৪

এ পর্যায়ে প্রথমেই মন্ত্র পরেন আর ফুঁ দেন। মন্ত্রটি নিম্নরূপ

মন্ত্র

"খোদা তুহি আগে গফুর রহীম
কেবা সাথে তুই আয় সামিউল আলীম
কোরআনে পয়দা জমিন ও আসমান
কিয়া কুচ্ছে মজুদ সারা জাহান
তু কাদির হায়, জোসসা পাল থেক কার
তুহি রিজিক দিতাহে স্বর্ণ গোকারীক
তু খালেক, তু রাজ্জাক রওফুব রহীম
কাররা লোই শেড়কো ফেস।"

এই মন্ত্র অনেকবার পড়েন আর ফুঁ দেন যতক্ষণ যত দিন না ভালো হয়।"

যৌনরোগ

সহবাসে স্থায়ীত্বের জন্য

কারণ

শারীরিক দুর্বলতার কারণে এটা হয়।

পদ্ধতি- ১

তালমাখানা, তাল মিসরি দিয়ে চূর্ণ করে ভিজিয়ে গরম দুধ দিয়ে খেলে স্থায়ীত্ব বাড়ে।

অতিরিক্ত রজ

পদ্ধতি- ২

সিদ্ধমকর ধস, গাঁদা ফুলের পাতর সাথে মধুসহ খেতে হয়। দূর্বাঘাস, সানিতাগল রস, দেহকুটজা, আমলকী ভেজানো পানির সাথে মুধ দিয়ে খেলে ভালো হয়।

পুরুষত্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি

পদ্ধতি- ৩

লডজিরা, গমার দণ্ড কলায়, আফলা শিমুল চূর্ণ করে গুলি করে দিনে ২ বার করে ৩ মাস খেতে হবে।

www.pathagar.com

গণরিয়া

পদ্ধতি- ৪

শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন, বালা লোদ, অশক ছাল, শ্যামলতা অনন্তমূল, ধাই ফুল এই গাছের ডালপালা ১ মাস কলসের মধ্যে ঢেকে রাখতে হয়। তারপর সেই ঔষধ দিনে ২ বার করে ১ মাস খেলে গণরিয়া ভালো হয়।

পুরুষত্ব শক্তি বৃদ্ধি

পদ্ধতি- ৫

৭ টি বিছাতু গাছের শিকড় ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে পেচিয়ে রেখে দিতে হবে। রাতে ভাত খাওয়ার পর নিজের খাবারে কিছু ভাত পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন সকালে ১টি শিকড় ভালোভাবে ধুয়ে বেটে বাসি পেটে যে পান্তা করা হয়েছে সেই পান্তা শুধু পানির সাথে মিশিয়ে ৭ দিন খেতে হবে।

পুরুষত্ব অর্জন

পদ্ধতি- ৬

ওলটকম্বলের পাতা ও শিকড় কুচি কুচি করে কেটে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ছেঁকে খেতে হবে। সাথে পরিমাণ মতো মিসরি/চিনি মেশাতে হবে। এভাবে ২ সপ্তাহ খেতে হবে।

পদ্ধতি- ৭

৪/৫ ফুট শিমুল গাছের শিকড় ১ ইঞ্চি করে কেটে চিনি দিয়ে ২ সপ্তাহ প্রতিদিন সকালে ও বিকালে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৮

তেজবলের পাতা ও শিকড় সামান্য পরিমাণ আদাসহ মিসরির সঙ্গে বেটে ৪/৫ দিন খালি পেটে খেলে ভালো হয়।

পদ্ধতি- ৯

কুখতরী গাছের শিকড়, শিমুল মূল ওলটকম্বলের ডাটা সবগুলো ১ পোয়া পানিতে ভিজিয়ে রেখে পরদিন সকালে বাসি পেটে ১ সপ্তাহ খেলে ভালো হয়। এই ঔষধ খাওয়ার সময় স্ত্রীর কাছে যাওয়া যাবে না।

প্রমেহ

পদ্ধতি- ১০

কালোজিরা, ছোট এলাচ, তাল মিসরি এক সাথে মিশিয়ে ২ সপ্তাহ খেলে ভালো হয়।

শ্বেত প্রদাহ

পদ্ধতি- ১১

বকর গাছ, আশোক ছাল, দারু হরিদ্রা, গন্ধারী, বেয়ার ফুল এগুলো চূর্ণ করে ১ সপ্তাহ দিনে ২ বার খেলে ভালো হয়।

www.pathagar.com

সহবাসে অনীহা

কারণ

রাত জাগা, অতিরিক্ত মসলা জাতীয় খাবার গ্রহণ, অধিক চিন্তার কারণ অনিয়মের কারণে এটা হয়। ৭০ বছর বয়সের নিচে এ রোগকে বলা হয় বাজিকরণ। অতিরিক্ত হস্তমৈথুন এর কারণেও এটা হতে পারে।

পদ্ধতি- ১২

অশ্বগন্ধ, তালমূল, হরিতকী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, অর্জুন ছাল, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন এগুলো পানিতে মিশিয়ে ২ চামচ করে খেলে ভালো হয়।

শরীরে অতিরিক্ত শক্তির বর্ধনকরণ মন্ত্র

সরস্বতী বন্দনে নিবারণ করণে,
গজমতী হার দেন মা সরস্বতী বিদ্যার ভার,
বিদ্যা দিয়ে মা মন করো স্থির,
ধীরে ধীরে বানাও মা সবার পণ্ডিত,
মহিষের শুড়া চার পায়,
ষোল খুর অন্ধকারে ধায় তিন বিনা ধায় রক্তপদে ধীরে,
চারজন দুষ্ট নারী মহিষের শুড়া বলে।

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে কোনো ব্যক্তি যে কোনো কাজে হাত দিলে তার কাজের মধ্যে প্রচুর শক্তির সঞ্চার হবে এবং তিনি যেকোনো স্বাভাবিক লোকের চেয়ে ৪-৫ জন লোকের সমান শক্তি নিয়ে কাজ করতে পারবে।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালো করার মন্ত্র

ফুল পড়েন ফুলেরশ্বরী
নামে দেবী কামেশ্বরী
নামে ফুল আপনার পায়
ফুল পরা মারলাম অমুকের গায়,
দেখিলে তোরে না দেখিলে মরে
ধেয়ে এসে দুইচরণ ধরে পড়ে
বড় বায়ে দুইচরণ
বায়ে বায়ে লোহার শিকল
আমার এ মন্ত্র যদি লরিস
ঈশ্বর মহাদেবের যটা ছিরে ভূমে পরিশ।

ব্যাখ্যা : একই বৃন্তে দুটি ফুলকে হাতে নিয়ে উপরিউক্ত মন্ত্র পড়ে ফুলে ফুঁক দিলে মন্ত্রটি কার্যকরী হবে।

ছেলে/মেয়ে বশীকরণ মন্ত্র

নজরে নজরে বন্দী চার নজরে বান্দি
নজর করে দেখ না মোরে আমারে না দেখিলে তোরে

www.pathagar.com

মরবিরে তুই পরান ফেটে।
হাত ছাড় পাত ছাড়
ছাড় লোহার শিকল
আমার এ মন্ত্র যদি লরিস
দোহাই লাগে কামরূপ কামাক্ষা কালির মস্তক ফুটিস।

ব্যাখ্যা : ছেলে অথবা মেয়ে কথা বলার সময় উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে একে অপরের দিকে তাকালেই তা কার্যকরী হবে।

দাঁত ব্যথা নিরাময় করার মন্ত্র

আদ ব্যথা দাত ব্যথা
সুলতান কোহিনু কথা
যদি করিস দাঁতের ব্যথা
দোহাই লাগে কামরূপ কামাক্ষা কালির খাস মাথা।

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তির যদি দাঁতে ব্যথা অনুভূত হয় তাহলে উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে মুখে ফুঁ দিলে সেই ব্যক্তির দাঁতের ব্যথা নিরাময় হবে।

গলার কাটা বের করার মন্ত্র

ফাঅল এজাবেলা গাতিল হলকুম।

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে কারো গলায় যদি কাটা ফোঁটে তাহলে গলা নেড়ে নেড়ে মন্ত্রটি পাঠ করলে গলা থেকে কাঁটা বের হয়ে যাবে।

কোনো মেয়ে যদি রাজি না হয় তাকে রাজি করানোর মন্ত্র

প্রদীপে রহিয়া তেল মিটিমিটি জ্বলে
মুখে দিলে সেই তেল রত্নসম জ্বলে।
নরসিংহ রায় তুমি কোথায় আছো
তোমার মন্ত্র বিহনে সেথায় থোয়াহো
নরসিংহ রায় বলে ভয়কি তোমার
মহিষির মধ্য বলো ভয় কি তোমার
অমকের কুগজ্ঞান ছাড়াইয়া সুখে
তিলিসপটি দেও যদি অমকের মুখে
বশ্যতা হয়ে সে থাকে চিরকাল
আমাকে ভজনা না করে কাঠাকো যে কাল।
আমার এ মন্ত্র যদি লরিস
দোহাই লাগে শ্মাশান কালিকার বামপথ কাটিস।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : প্রভাতে বিছানাতে বসে হাতের তালুতে তিন ফোঁটা তেল নিতে হবে। তারপর একটু তেল নিয়ে তিন বার মন্ত্র পড়তে হবে এবং মুখে মাখতে হবে, তাহলে উপরিউক্ত মন্ত্রটি কার্যকরী হবে।

কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর ভাত না খায় তবে স্ত্রীকে বশীকরণ মন্ত্র

সমুদ্রে বালি স্বর্গ লাগে তালি
কাছে দিলে পাও লাগে জলে দিলে মাছ লাগে
আমার এ লবণ পড়া খেলে ফন্নি ফন্নার পাছে লাগে।

ব্যাখ্যা : যদি কোনো স্ত্রী লোক যদি কোনো পুরুষ লোকের ভাত খেতে না চায় তাহলে বাজারে লবণ বিক্রিতা যিনি পূর্ব অথবা উত্তর দিকে বসে লবণ বিক্রি করে তার নিকট থেকে লবণ ক্রয় করে তা মন্ত্রের মাধ্যমে পড়ে মুড়ি অথবা চানাচুরের মধ্যে মিশিয়ে দিলে তা কার্যকরী হবে।

কাউকে বান মারিলে তা থেকে মুক্তির পথ

আল্লাহর নাম আন আল্লাহর নাম বান
আল্লাহর নাম তীর
আল্লাহর নাম তমাল
এই চার হরফে বান কুগজ্ঞান
কেটে করিলাম খানখান
আমার এ মন্ত্র যদি ছুটিস
দোহাই লাগে আল্লার মোহাম্মদের মস্তক ফুটিস।

ব্যাখ্যা : যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে বান মারে তাহলে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ঐ পানি পান করলে বান থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

ছুরির ধার বন্ধ করার মন্ত্র

আয়তাল কুরসি বন্ধন কোরআন
তামা কাসা লোহাকে কেওয়ার
তোম তোম তোম মনি তোম
হুমকার ব্রহ্মাতে নৌরাকার
এ আলী এ আলী, আল্লা লাগে তালা নবী লাগে ধন্দ
মোহাম্মাদে কালমা দিয়া ছুরি করিলাম বন্ধ।
আমার এই মন্ত্র যদি ছুটিস
দোহাই লাগে আল্লাহ মোহাম্মাদের মস্তক ফুঁটিস।

ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে কোনো একটি ছুরির এক পাশ থেকে আঙুল টানতে টানতে অপর পাশ গিয়ে শেষ করলেও ঐ ধারালো ছুরিটি দিয়ে আর কোনো কিছু কর্তন করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

শরীর বন্ধ করার মন্ত্র

বন্ধ বন্ধ মহাবন্ধ চৌদিকে রামচন্দ
লক্ষণকে সামনে রেখে শরীর করলাম বন্ধ।
আমার এ মন্ত্র যদি ছুটিস
দোহাই লাগে কামরূপ কামাক্ষা মস্তক ফুটিস।

ব্যাখ্যা : কোনো ব্যক্তি যদি অন্ধকার রাতে কোথায়ও একা একা যেতে ভয় পায় তাহলে সেই ব্যক্তি যদি উপরিউক্ত মন্ত্রটি পড়ে বুকে ফুঁক দিয়ে বাইরে বের হয় তাহলে তার আর কোনো ভয় থাকবে না।

তথ্য নির্দেশ

১. শ্রী চৈতন্য হালদার, গ্রাম : শাওপাড়া, পো : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৩/১০/২০১১ সময় : সকাল ১০.০০।
২. মো. মোজাম্মেল হক, গ্রাম : আমশড়া, পো : আমশড়া, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬০ বছর, পেশা : কবিরাজ ও কৃষিকাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৪/১০/২০১১ সময় : সকাল ১১.৩০।
৩. মো. লোকমান হোসেন, গ্রাম : আমশড়া, পো : আমশড়া, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৪/১০/২০১১ সময় : বিকাল ৩.২০।
৪. শ্রী ঝড়ু রাজুয়ার, গ্রাম : ধুবিল (কালিবাড়ি), পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : জেলে ও কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৫/১০/২০১১ সময় : সকাল ৯.১০।
৫. মো. হোসেন আলী, গ্রাম : ধুবিল মেহমানশাহী, পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স :৭০ বছর, পেশা : কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৭ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৬/১০/২০১১ সময় : বিকাল ৯.১০।
৬. মো. আয়নাল হক, গ্রাম : মালতিনগর, পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : কবিরাজ, শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্বাক্ষর জ্ঞান, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ০৭/১০/২০১১ সময় : সকাল ১০.৩০।
৭. মোছা. হালিমা খাতুন, স্বামী : মো. আমজাদ হোসেন, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, স্থান : নিজ বাসভবন, সময় : সকাল ১১.০০, তারিখ : ২৫/০৯/২০১১।
৮. মো. হারুন রশিদ সরকার, পিতা মৃত. ইব্রাহীম সরকার, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ দোকান, বয়স : ৭৫ বছর, তারিখ : ২৫/০১/১২, সময় : রাত ৮.০০।

www.pathagar.com

ধাঁধা

লোকসংস্কৃতির বুদ্ধিদীপ্ত আরেকটি শাখা হলো 'ধাঁধা'। কেউ কেউ একে বলে 'হেঁয়ালি'। শব্দটির বুৎপত্তি ঘটেছে সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' থেকে। ধাঁধা উত্তরবঙ্গের কোনো কোনো এলাকায় ছিল্কা-ছুটকি-চুটকি, শিল্লক, শোলক নামেও পরিচিত। প্রহেলিকার আভিধানিক অর্থ কূট প্রশ্ন। ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর লোকসাহিত্য লোকজীবনের দর্পনস্বরূপ। লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ ধাঁধাও তাই। ধাঁধা লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা হলেও এর মধ্যে সমাজ বাস্তবতার বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র চিত্রণের প্রতিফলন ঘটেছে বিভিন্নভাবে। এর মাধ্যমে লোকসমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্রও ফুটে উঠেছে। একারণে অবশ্য ধাঁধাকে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানও বলা হয়। আসলে জীবনের প্রতিমুহূর্তে মানুষকে যে সংঘাতের কিংবা সমন্বয়ের মুখোমুখি হতে হয়, সমাজ জীবন তাকে আত্মস্থ করেই ঋদ্ধ হয়। মূলত ধাঁধার রূপকাররা সমাজের নির্মম বাস্তবতাকে নিখুঁতভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস খুঁজে পেয়েছে ধাঁধার মাধ্যমে। দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বায়নের অত্যাধুনিকতায় লোকসাহিত্যের রূপগত কিছু কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন নীরবে ঘটে চলেছে ঠিকই তবে এর প্রবাহ থেমে নেই। বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, দেশাচার, লোকাচার, লোকবিশ্বাস, সংস্কার, নাচগান, খেলাধুলা, খাদ্যাখাদ্য থেকে শুরু করে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সবকিছুর উপর তীক্ষ্ম সন্ধানী চোখ থাকে লোকসংস্কৃতির। স্বাভাবিকভাবে লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট অঙ্গ ধাঁধাতে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। লোকসমাজের বিচিত্র দৃশ্যাবলি অদ্ভুত এবং মর্মস্পর্শী বাস্তবতা উঠে এসেছে বাংলা ধাঁধায়। মন্দ বা ভালোর বিতর্কে না জড়িয়ে একেকটি সময়ের বাস্তবতাকে ধাঁধায় রূপকাররা ঠাঁই দিয়েছেন সযত্নে। বাংলা ধাঁধার উপরিতলের ছাইটুকু সরিয়ে অন্তরের সামাজিক আগুনের আঁচ পাওয়া সুকঠিন নয় বাংলা ধাঁধার বিশেষত্ব এখানেই। এ কারণেই জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার্য দ্রব্যসমূহকে তারা বেমালুম ধাঁধার মাধ্যমে চালিয়ে দিয়ে আনন্দ লাভ ও গর্ববোধ করেছে। যেহেতু ধাঁধা লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম শাখা। সেজন্য এর উপকরণাদি সাধারণ লোক সমাজ থেকে গৃহীত হয়েছে। তাই ধাঁধায় আমাদের কথা, সমাজের মানুষের কথা, আচার উপকরণ, সমস্যা, আনন্দ ও স্ফূর্তি সবই এসেছে স্বাভাবিকভাবে, স্বাভাবিক গতিতে সাহিত্যের অন্য ধারার মতই। অন্যভাবে বলা যায়, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ধাঁধা একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মূলত লোকায়ত জনমানসের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রশ্নের আকারে লিপিবদ্ধ করে। সিরাজগঞ্জ জেলায় ধাঁধাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় "মানে ধরা"। শিশু, কিশোর ও বড়দের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া সামাজিক জীবনে আনন্দঘন পরিবেশে রঙ্গ-রসিকতা, ব্যঙ্গ-c কৌতুকের মধ্য দিয়ে ধাঁধা উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

আগের দিনে বৈবাহিক অনুষ্ঠানে বরের মেধা পরীক্ষার জন্য কনে পক্ষের মেয়েরা ধাঁধা জাতীয় অনেক প্রশ্ন করত। এখন আর সেই রীতি নেই। তবে কিশোর-কিশোরীরা অনেক সময়ই নিজেদের মধ্যে ধাঁধা যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি এবং জয়-পরাজয়ের মধ্য দিয়ে অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করে থাকে। এ অঞ্চলে এখনও ধাঁধার যুদ্ধ হতে দেখা যায়। ধাঁধার জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। লোক মুখেমুখেই এর বিস্তার ঘটে থাকে। ধাঁধাকে লোকসংস্কৃতির রসসমৃদ্ধ ধারা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অপেক্ষা লোকধাঁধা যে জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সিরাজগঞ্জ জেলায় প্রচলিত বুদ্ধিদীপ্ত ধাঁধাগুলো তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

নিম্নে অত্র অঞ্চলে বহুল প্রচলিত কতিপয় ধাঁধা উল্লেখ করা হলো–

১. ঝাড়ের মধ্যে থাইক্যা বাড়ালো টিয়া, লাল টুপিটা মাথায় দিয়া।
 উত্তর :কলার থোর (মোচা)।

২. ঝোড়ের মধ্যে কালো গাই, প্যাট কাইটা দুধ খাই।
 উত্তর : মৌমাছির চাক/মাচা।

৩. আল্লার কি সৃষ্টি, লাঠি ভরা মিষ্টি ।
 উত্তর : আখ, কুসুল।

৪. আল্লার কি কাম, এক ঘরে এক খাম।
 উত্তর : ছাতা।

৫. আল্লার কি কুদরত লাঠির ভিতর সরবত।
 উত্তর : আখ, কুসুল।

৬. এই যে গ্যাল ঐ যে আইলো।
 উত্তর : চোখ।

৭. ফুচকি পাড়ে ফুচকি পাড়ে, ধর‍্যা আইন্যা আছার মারে।
 উত্তর : নাকের হিথ বা শ্লেষ্মা ।

৮. উপরে ডগমগ ভিতরে গু।
 উত্তর : মাকাল ফল।

৯. চোচা আছে তার বোটা নাই।
 উত্তর : ডিম।

১০. মুঠে আটে কুঠিতে আটে না।
 উত্তর : ছাতা।

১১. একটুক আড়্যা (এঁড়ে) যায় জঙ্গল ফাইর‍্যা।
 উত্তর : উকুন।

১২. উপরে চাপ ভিতরে চাপ, তার ভিতরে কলকল্যা সাপ ।
 উত্তর : জিহ্বা।

১৩. দুই মার প্যাটে এক সন্তান থাকে।
 উত্তর : দরজা।

www.pathagar.com

১৪. দিয়া হোয় উইঠা খসায়।
উত্তর : দরজার ছিটকানি বা হুড়কা।

১৫. উসি উসি উসি, ভিতরে গেলে খুশি।
উত্তর : চুড়ি।

১৬. শুতে গেলে করতে হয়।
উত্তর : বিছানা।

১৭. শুতে গেলে দিতে হয়।
উত্তর : দরজার ছিটকানি বা হুড়কা।

১৮. টিপির ভর সয় না, আছার দিলে ভাঙ্গে না।
উত্তর : ভাত।

১৯. স্বামী আছে যতদিন, দিতে হবে ততদিন।
উত্তর : শিথির সিঁদুর।

২০. কে আগে যেতে পারে, কে আগে আসতে পারে।
উত্তর : চোখ।

২১. উড়লো চিল শুখালো বিল, সোনার কৌটা রূপার খিল।
উত্তর : শামুক ও ঝিনুক।

২২. ইল বিল শুকাইয়া গ্যালো, মাটির নিচে পানি রইলো।
উত্তর : শামুক ও ঝিনুক।

২৩. ইল বিল শুকাইয়া গ্যালো, গাছের আগায় পানি রইলো।
উত্তর : ডাব।

২৪. ডাব না খাইলে কি হয়?
উত্তর : নারিকেল।

২৫. আকাশ থাইক্যা পড়লো কুরহা, কুরহা কয় আমার বাল উপড়া।
উত্তর : তাল।

২৬. তিন মাথা এক মুখ।
উত্তর : চুলা।

২৭. চারদিকে বাল, মাঝখানে লাল।
উত্তর : শিথির সিঁদুর।

২৮. খাওয়ার সময় খায়, হাগবার সময় চিল্লায়।
উত্তর : বন্দুক।

২৯. চারপাশে আইল, মাঝখানে কাইল।
উত্তর : সুপারী।

৩০. বছরে আসে মাসে যায়, দিনে রাধে রাতে খায়।
উত্তর : রোজা।

www.pathagar.com

৩১. এক বুড়ি হাটে যায়, গালে মুখে চড় খায়।
উত্তর : মাটির হাঁড়ি-পাতিল।

৩২. লাল গরু বন খায়, পানি দিলে নিভে যায়।
উত্তর : চুলার আগুন।

৩৩. হাতুর বাটাল বাইশখান, চোরে নিল তিনখান, বাকি থাকে কয়খান।
উত্তর : একটিও না।

৩৪. গোল, চ্যাপ্টা সাদা বরণ, তিন জনের এক সাথে মরণ।
উত্তর : পান, সুপারি ও চুন।

৩৫. হাত আছে মাথা নাই, প্যাট আছে ভুঁড়ি নাই।
উত্তর : জামা।

৩৬. তুই থাকিস জলে আমি থাকি ডালে, দুইজনের দেখা হবে মরণের কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ।

৩৭. কই যাস রে খসখাসনী, চুপ কর রে দুল-দুলানী
গারস্থরা শুনতে পেলে তোকেও খাবে আমাকেও খাবে।
উত্তর : কই মাছ ও বেগুন।

৩৮. আকাশ থেকে পড়লো খুড়ি, খুড়ি কয় এখানেই ঘুরি।
উত্তর : যাতা।

৩৯. বন থাইক্যা বাড়ালো মোটা, মোটার গা কাঁটা কাঁটা।
উত্তর : কাঁঠাল।

৪০. পড়লে ফাটে না, লোহা ছাড়া কাটে না।
উত্তর : সুপারী।

৪১. আছে ফল দেশে নাই, খায় ফল খোসা নাই।
উত্তর : শিলা।

৪২. হাত নাই পাও নাই, তরতরায়া যায়।
উত্তর : স্রোত।

৪৩. হাত নাই পাও নাই, ধরে খাইবার আসে।
উত্তর : শীত।

৪৪. একগাছ দড়ি, গোছাতে গোছাতে মরি।
উত্তর : রাস্তা।

৪৫. আকাশ থাইক্যা পড়লো খুড়ি, হাত পাও তার কুকড়ি কুকড়ি।
উত্তর : গোবর।

৪৬. আকাশ থাইক্যা পড়লো দুড়া, হাত পাও তার মুড়ামুড়া।
উত্তর : শিলা।

৪৭. কাটলে বড় হয়, চাচলে মোট হয়।
উত্তর : কূপ বা কুয়া।

www.pathagar.com

৪৮. মাটির দোনা কাঠের গাই, প্যাট কাইট্যা দুধ খাই।
উত্তর : খেজুরের রস।

৪৯. দিলে খায় না, না দিলে খায়।
উত্তর : টোনা।

৫০. চার হাঁড়ি মধু পুড়া, বিনা ঢাকনায় উপুর করা।
উত্তর : গাভীর ওলান।

৫১. সবুজ বুড়া হাটে যায়, যে দ্যাখে সে চিমটি দেয়।
উত্তর : লাউ-কুমড়া।

৫২. একটু খানে ঘরে, চুনকাম করে।
উত্তর : ডিম।

৫৩. ঘর আছে দুয়ার নাই, মানুষ আছে কথা নাই।
উত্তর : কবর।

৫৪. একহাত গাছটা, ফল ধরে পাঁচটা।
উত্তর : হাতের আঙুল।

৫৫. দিন রাত পড়ে থাকে, লাথি দিলে কাজ করে।
উত্তর : ঢেকি।

৫৬. যত কাটে তত বাড়ে।
উত্তর : পুকুর।

৫৭. আল্লার কি কারবারি, এক গাছে তিন তরকারি।
উত্তর : কলা, কাদাল ও মোচা।

৫৮. আল্লার কি মেহেরবাণী, এক বোতলে দুই পানি।
উত্তর : ডিম।

৫৯. চোচা আছে বোটা তার নাই।
উত্তর : ডিম।

৬০. ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে বর।
উত্তর : মশারি।

৬১. ইট ঘুঘুর পিট টান, কোন ঘুঘুর তিন কান।
উত্তর : মাটির চুলা।

৬২. ইট ঘুঘুর পিট টান, কোন ঘুঘুর চার কান।
উত্তর : চৌচালা ঘর।

৬৩. কাল কচু জলে ভাসে, হাড় নাই তার মাংস আছে।
উত্তর : জোঁক।

৬৪. মুখ আছে তার মাথা নাই, পেট আছে তার পা নাই।
উত্তর : বোতল।

www.pathagar.com

৬৫. এক উঠানে দুইভাই, কারো সাথে দেখা নাই।
উত্তর : চোখ।

৬৬. বাতাসে পাতা নড়ে, মাটির নিচে ডিম পাড়ে।
উত্তর : আদা।

৬৭. এক থাল সুপারি, গুনতে পারে না ব্যাপারি।
উত্তর : আকাশের তারা।

৬৮. হাইট্যা ভরা সুপারি, গুনতে পারে না ব্যাপারি।
উত্তর : আকাশের তারা।

৬৯. কালো গাছের তলে, কালো হরিণ চলে।
উত্তর : উকুন।

৭০. ছোট্ট একটা ঘরে অনেক মাথা ধরে।
উত্তর : দিয়াশলাই।

৭১. পানিতে জন্ম পানিতে বাস, পানিতে দিলে সর্বনাশ।
উত্তর : লবণ বা নুন।

৭২. পাটখড়িতে জড়া খরা, গাঙ্গে অধিবাস, ফুল হয়না ফল হয় না, তোলে বারো মাস।
উত্তর : পান।

৭৩. দাদা দেয় একবার, দিদি দেয় বারবার।
উত্তর : সিঁদুর।

৭৪. ছোট্ট একটি গাছে, লাল বউটি নাচে।
উত্তর : মরিচ।

৭৫. টানলে কমে।
উত্তর : সিগারেট।

৭৬. ঘরের মধ্যি ঘর, তার ভিতরে বাস করে পরমেশ্বর।
উত্তর : মশারি।

৭৭. বছরে আসে, বছরে যায়, দিনে খায়না, রাতে খায়।
উত্তর : রোজা।

৭৮. মাটির নীচ থাইক্যা আইলো বুড়ি, বুড়ি বড় সুন্দরি।
উত্তর : রসুন।

৭৯. চার মুদে বেত কাঁটা, মধ্যে সুতা লাল ব্যাটা।
উত্তর : আনারস।

৮০. নাই মুখ নাই মাতা, টিপ দিলি কয় কতা।
উত্তর : রেডিও।

৮১. চার অক্ষরে নাম যার, দেশটা গেলেন দিয়ে, প্রথম দু'অক্ষর বাদ দিলে, বিয়ে করতে চলে।
উত্তর : মুজিবর এবং বর।

www.pathagar.com

৮২. এক থাল সুপারি, গুনতে পারে কোন ব্যাপারি ॥
উত্তর : আকাশের তাঁরা।

৮৩. জন্মে সাদা কর্মে কালো, গলায় লোহার হার, উড়িয়া গিলে আহার ধরে, লম্বা লেজটি তাহার।
উত্তর : জাল।

৮৪. দিলি বাড়ে, না দিলি কমে
উত্তর : শিক্ষা।

৮৫. দুই কূলে জাল ফেলে এককুড়ি দুই ছেলে, মাছ যদি জালে আসে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে
উত্তর : ফুটবল খেলা।

৮৬. শুতে গেলে দিতি হয়, না দিলি ক্ষতি হয়।
উত্তর : দরজা।

৮৭. তিন ছয়, তিন নয়, তিন আঠারো কত হয়?
উত্তর : ৯৯।

৮৮. থাকলি ভালো হয়, পেলে ভালো নয়।
উত্তর : লজ্জা।

৮৯. তিন জানোয়ারের তেইশ কান, মানে জানলে খাবেন পান, না জানলে মানে, হাত দিবেন না পানে।
উত্তর : রাবণের বিশ কান, ছাগলের দুই কান এবং শামুকের এক কান।

৯০. এক মায়ের দুই ভাই, কারো সাথে কারো দেখা নাই।
উত্তর : চোখ।

৯১. কাঁচাতে মানিক ফল সর্ব লোকে খায়, পাকলে মানিক ফল গড়াগড়ি খায়।
উত্তর : ডমুর ফল।

৯২. নিবিড় অরণ্যে বাস চার পা ধারী, মনুষ্য আনিলো যারে বুদ্ধি বলে ধরি, বায়ুসম বেগবান যদি ভালো হয়, কি নাম তাহার বল, লোকে কিবা কয়।
উত্তর : ঘোড়া।

৯৩. তিন অক্ষরে নাম তার বনেতে বাস করে, শেষের অক্ষর বাদ দিলি মানুষের ক্ষতি করে।
উত্তর : বানর ও বান।

৯৪. তেল চুকচুক্ ভাটাই মোড়ল, বিনা দাড়ে বাচ্ছে সাগর, মরে গেলি শ্মশানে যায়, হিন্দু মুসলিম সকলেই খায় ॥
উত্তর : চুন।

৯৫. জিহ্বায় যে টুপি পড়ে, নাম তার বলব না, সাদা মাঠে চড়াও তারে, মানা সে করবে না, মাঝে মাঝে খেতে দিও, কালো কিছু জল, একটু ভেবে উত্তর দিও, ভুল হবে না ফল।
উত্তর : কলম।

www.pathagar.com

৯৬. জ্বলে চলে ছোয় না জল।
উত্তর : জোনাকী।

৯৭. সারা বিল শুকায়ে গেল, গাছের আগায় জল।
উত্তর : নারিকেল।

৯৮. আমরা পাঁচটি ভাই, যা পাই মিলিমিশে খাই।
উত্তর : হাতের পাঁচ আঙ্গুল।

৯৯. এই মাটি চৌ-চির, এর মাঝে মহাবীর।
উত্তর : ইঁদুর।

১০০. উড়ে এলো জঙ্গি, জুড়ে পরলো বিল, সোনারো ঢাকনি তার, রুপারো খিল।
উত্তর : বৃষ্টি।

১০১. এক পুকুরে দুই রকম পানি।
উত্তর : ডিম।

১০২. আটে আর চাটে।
উত্তর : শামুক।

১০৩. ইলে বিলে চিতল মাছ, মধ্যি বিলে লতা, কোন শহরে দেখে এলাম, ফলের আগায় পাতা।
উত্তর : আনারস।

১০৪. চারদিকে বাল মাঝখানে খাল।
উত্তর : চোখ।

১০৫. আশায় আশায়, আশাতন কাইয়ারগুয়া শুইরা আঁধা টন, ঠক দিয়া দেখি ফুকরায়ণ।
উত্তর : তুলা।

১০৬. ইদুক্কা পানি কই বুরবুর করে, কোন ব্যাটার সাধ আছে জাল ফালাইবার পারে।
উত্তর : হুক্কা

১০৭. উতের মিহা বইশা, লে মারলাম কইশা। গাছের ফল গাছে থাকল বোটা আইল খাইসা।
উত্তর : তালা চাবি

১০৮. আমার একটা ছাগল আছে, বটের পাতা খায়। মেম্বার আইশা কুরদ দিলে বুরুত কইরা যায়।
উত্তর : হুন্ডা

১০৯. চারি মরা বেতের কাঁটা, মধে আছে সাহেবের বেটা।
উত্তর : আনারস

১১০. ঐ পাড়ার রইসা। ঠ্যাল মারল কইসা, গাছের ফল গাছে থাক বোটা আইল খইসা।
উত্তর : তালা চাবি/ভাড়ে করে জিনিস বিক্রয়

www.pathagar.com

১১১. আকাশ আছে তার তারা নাই। জঙ্গল তার বাম নেই, পানি আছে তার মাদু নাই।
উত্তর : ডাব

১১২. উঁই যে যায়, উঁই যে আইসে।
উত্তর : চোখ

১১৩. ঢোলে টোলে, লাঙ দিয়া আইসে কোলো।
উত্তর : কলসি

১১৪. এক গাছ দড়ি গোছাতে গোছাতে মরি।
উত্তর : রাস্তা

১১৫. এক দুক্কা পাখি, দুধ দিয়া ভাত খায়, ফেইছাত পাজ দিলে, আকাশ পায়।
উত্তর : ঢেঁকি

১১৬. আড়ার মধ্যে পোড়া, খাইটা কালো গাইয়ের দুধ মিঠা।
উত্তর : মৌমাছি

১১৭. দশ জন ধরে, একজন করে। এমন কইরা করে, রক্ত বাইর কইরা ছাড়ে।
উত্তর : পান

১১৮. বত্রিশটো তেঁতুল গাছ, একটা পাতা। পিছলা ঘাটা একটা পাগার।
উত্তর : দাঁত, জিহ্বা, গলা, পেট।

১১৯. এক তালা জঙ্গল, দুই তালা আলো। তিন তালা গর্ত, চার তালা শক্ত।
উত্তর : চুল, চোখ, নাক, দাঁত

১২০. ধার নাই চিবিট কাটে।
উত্তর : গুয়ার ফুঁটা

১২১. নদী নালা শুকিয়ে গেল, গাছের আগায় পানি রই।
উত্তর : নারিকেল

১২২. পাঁচ চাকর তুলে দিল, বত্রিশ ছেলের ঘারে, দূরে ছিল জাসী বুড়ি, টেনে নিল তারে।
উত্তর : ভাত খাওয়া

১২৩. নয়তো দূরে এই তো কাছে, বন্ধু সে সাথে আসে, রৌদ্রে গেলে চলে পাছে প্রদীপ শিখায় সদাই নাচে।
উত্তর : ছায়া

১২৪. আকুল সমুদ্র মেরু জল তাতে নাই, রাশি রাশি স্থল ভাগে ঘরবাড়ি নাই।
উত্তর : মানচিত্র

১২৫. নাক চোখ হাতে আছে, আর কিছু নাই, চোখে চোখে রাখি তাকে। ভালো দেখি তাই।
উত্তর : চশমা

১২৬. আইল বারবার, যায় পিছনের দিকে ঠেস দিলে, আকাশের দিকে চায়।
উত্তর : সুঁই

www.pathagar.com

১২৭. আখাদ্য বস্ত্র লোকে খাদ্য নামে যায়, বস্ত্র লোকের, সামনে খেলে বড় লজ্জা পায়।
উত্তর : আছাড়

১২৮. দুই অক্ষরের নাম যার সর্বলোকে খায়, উল্টালে অক্ষর দুটিতে জাতির নাম হয়।
উত্তর : গম

১২৯. দুই অক্ষরের নাম যার সর্বলোকে খায়, প্রথম অক্ষর বাদ দিলে কুকুর ডাকা হয়।
উত্তর : ছাতু

১৩০. আমি থাকি খালে-বিলে। তুমি থাক জলে, দেখা হবে দু'জনে মরণ কালে।
উত্তর : মাছ ও মরিচ

১৩১. বাঘের মতো লাফ দেয় কুকুর হয়ে বসে, পানির বুকে ছেড়ে দিলে আরশোলা হয়ে ভাসে।
উত্তর : ব্যাঙ

১৩২. ইটির উপর ভিটি পাথরের মত আইল, মাঠ নইলো ছয় মাস আছে, ছাওয়াল হইল কাল।
উত্তর : কচ্ছপ

১৩৩. গবীর গোড়ে দ্বীপ জ্বেলনা, ফুল দিও না কেউ ভুলে, সামা পোকাড় না পোড়ে পা দাগা না পায় বুলবুলি।
উত্তর : কবরস্থানে বাতি দিও না, ভুলে কেউ ফুল দিও না, এর অর্থ কবরে ফুল, বাতি কিছু দেওয়া যাবে না।

১৩৪. আকাশেতে ঝিকিমিকি, পাতালেতে হাঁস। কোনো দিন দেখি নাই, এক কুরাইলা বাঁশ।
উত্তর : শাপলা ফুল

১৩৫. One Two Man ধাপুর ধুপুর, One Man হেলানি
উত্তর : ঢেঁকি

১৩৬. Some bamboo খাঁড়া খাঁড়া, Some bamboo অ্যাড়া বেড়া।
উত্তর : বাগা টোপা

১৩৭. দিতি কালে কশাকশি, দিবার পারলে খুব খুশি।
উত্তর : চুরি

১৩৮. আড়াই মধ্যে কি ? পাখি কয় টু
উত্তর : গুটু

১৩৯. বকের গু, কাঠের গুঁড়া কি ?
উত্তর : বগুড়া

১৪০. ময়মসল্লা মহিষের শিং?
উত্তর : ময়মনসিংহ

১৪১. গরু ওঠ ওঠ, লেঙ্গুর ধইরা টান।
উত্তর : উঠান

www.pathagar.com

১৪২. আকাশের আব, মাটির দুল। মা কয় খা, বাবা কয় লেখ।
উত্তর : আবদুল খালেক

১৪৩. দাদা খায় পান, দাদী খায় চুন?
উত্তর : পাচুন

১৪৪. হাইসালের ছাই, কানের দুল?
উত্তর : ছাইদুল

১৪৫. জঙ্গল আছে, তার বাঘ নাই। পানি আছে তার মাছ নেই, আকাশ আছে তার তারা নেই।
উত্তর : নারিকেল

১৫০. তেল চুপ চুপ পাতা। ফলের উপর কাঁটা, পাকলে হয় মধুর মত, বিচি গোটা গোটা।
উত্তর : কাঁঠাল

১৫১. হাত আছে তার পা নেই, পেট আছে তার ভুরি নেই।
উত্তর : শার্ট

১৫২. মাঠ থেকে আসল সাহেব, কোর্ট প্যান্ট পরে। কোর্ট প্যান্ট খুলতে গেলে, চোখের কান্দা ঝরে।
উত্তর : পেঁয়াজ

১৫৩. খ্যাত ধলা বেছন কালো। খেতের নাম বাহাদূর, চইলা গেল বহুদূর।
উত্তর : খাতা ও কলম

১৫৪. নগে যায় নগে আইসে। আটে যাইয়া, গুড়ি খাইয়া আছে।
উত্তর : ঢোল

১৫৫. লোগে যায় লোগে আসে। হাটে যায়, পেট ভাইরা আসে।
উত্তর : তেলের বোতল

১৫৬. চিত কলসি উপরে দণ্ড, তাহার পাতা খণ্ড খণ্ড, যদি হয় ফুল লক্ষ টাকার মূল।
উত্তর : মানকচু

১৫৭. দুলা ভাই দুলা ভাই, সিক্সে এ পড়েন। কোন গাছের পাতা নাই, ঠিক করে বলেন।
উত্তর : আলোক লতা/স্বর্ণলতা

১৫৮. ইচ কেচি বিচ কিচি, না চোচা পাই বিচি।
উত্তর : লবণ

১৫৯. আগা ঝুন আগা ঝুন, গোড়া মোটা। এই মানে যে না কয়া পারবো, তার বাপ চোব্বা।
উত্তর :ঝাঁটা

১৬০. কাঁচা তুপ তুপ, পাকা সিঁন্দুর। এই মানে যে পারবো না, তার বাপ বুড়া ইন্দুর।
উত্তর : মাটির পাতিল

www.pathagar.com

১৬১. আকাশ থ্যাইকা পড়ল বাটি, ধার্য গেল ইন্দু বাড়ি, ইন্দুরা কয় ধর ধর। আটু পানি থরথর।

উত্তর : তেলের পিঠা

১৬২. আড়ার মধ্যে মেন্দি গাছ, পা দিলি সর্বনাশ।

উত্তর : গু

১৬৩. এক গেলাসে দুই নমুনার পানি। যে কইবার না পাড়ব, তার জামাই আমি।

উত্তর : ডিম

১৬৪. চোঁচা আছে বোটা নাই।

উত্তর : ডিম

১৬৫. চার মোরা টিনের বেড়া। কোন দিয়া যামু, কামার পাড়া।

উত্তর : ডিম

১৬৬. দিলে ফাঁক করে, না দিলে রাগ করে।

উত্তর : ফকিরের ঝোলা

১৬৭. আছাড় দিলে ভাঙ্গে না, লোহা ছাড়া কাটে না।

উত্তর : সুপারি

১৬৮. খালি ফুট্টা যায়, না খালি ফোলে।

উত্তর : মাথার চুল

১৬৯. আমার একটা পাখি আছে, আল্লাউদ্দিন নাম। ফুরদ কইরা হাই গা দিলি, এক টাকা দাম।

উত্তর : ম্যাচ

১৭০. আমার একটা পাখি আছে, দুধ দিয়া ভাত খায়। বড় বড় গাছের সাথে, টিপ খেলাইবার যায়।

উত্তর :কুঁড়াল

১৭১. এক ছাগলের তিন মাথা, সে খায় রাজ্যের পাতা।

উত্তর : চুলা

১৭২. খাল বিলে পানি নাই, ঢ্যাল খেতে পানি।

উত্তর :শামুক

১৭৩. আড়ার মধ্যে বিয়াইছে গাই, সাতবার কইরা দেখবার যাই।

উত্তর : ধিয়াল

১৭৪ মামারা আন্দে-বাড়ে, মামারা খায়। আমরা গেলি পরে, ঘড়ে দরজা দেয়।

উত্তর : শামুক

১৭৫. জামাই দেয় একদিন, বউ দেয় প্রতিদিন।

উত্তর : সিঁদুর

১৭৬. স্বামী আছে যত দিন, দিতে পারবে তত দিন।

উত্তর : সিঁদুর

www.pathagar.com

১৭৭. ইদুক্কা ছ্যারা, হোলডো খাড়া।
উত্তর : নোটা/বদনা

১৭৮. পাঁচ জোয়ালে ধরে, বত্রিশ জোয়ানে পারে, এ বুড়ার ব্যর্থ একলাই ঠেইলা ঘরে তোলো।
উত্তর : খাওয়া

১৭৯. ওরা ওরা উনি, তিন ভাই বুনি, মাথাত দেয় বোঝা, গুয়াত দেয় খোঁচা।
উত্তর : হাইসাল, চুল

১৮০. এক ছাগালের তিন মাথা, হে খায় রাজ্যের মাথা।
উত্তর : হাইসাল/চুলা

১৮১. বৃক্ষতে ধরে মুড়ি, পেরে হইল খই, দেখতে দেখতে লেজ বাড়াইল, আবার হয়ে রই।
উত্তর : সাজনা

১৮২. কামাড়ের ছাড় যার, বাঠার ছাড় পা। লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়, কিনা আন তা।
উত্তর : কাঁঠাল

১৮৩. দিয়া শয়, উইঠা খোলো।
উত্তর : দরজা

১৮৪. পাঁচ জোয়ানে ধরে, বত্রিশ জোয়ানে করে। এমন সবাই করে, রক্ত তুইলা মারে।
উত্তর : পান

১৮৫. চাঁইবার গেলাম যা, তারাই দিব তা। দিব দ্যোহা দিল না, না দিলি দিল নি।
উত্তর : লাঙ্গল

১৮৬. ফকিরের ব্যাটা ঘোরে বাড়ি বাড়ি, চার মাথা বার ঠ্যাং। আছে কোন বাড়ি।
উত্তর : গাই পানাইনা/গরু দোয়ান

১৮৭. নদীর কূলে মরিচ গাছ, টোকা দিলে সর্বনাশ।
উত্তর : ম্যাচ

নিম্নে সংগৃহীত ধাঁধাগুলো উল্লেখপূর্বক এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলোঃ

১৮৮

পাটখড়িতে জড়া খরা, গাঙ্গে অধিবাস,
ফুল হয়না ফল হয় না, তোলে বারো মাস।

উত্তরঃ পান।

ব্যাখ্যা : উল্লেখিত ধাঁধাটিতে শধুমাত্র উত্তরের আশায় যে ছন্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা নয়। যদিও ধাঁধাটির উত্তর পান তথাপি এই ধাঁধার মাধ্যমে পানের জীবনচক্র ও তার সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছে লোকসমাজের মানুষ। এছাড়াও এখানে পান যে সারা মাসব্যাপী উৎপন্ন করা হয় সে বিষয়টিকেও খুব সুন্দরভাবে ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামীণ সহজ সরল সাধারণ মানুষকে পান সম্পর্কে একটি সাম্যক ধারণা দান করাই এই ধাঁধার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

১৮৯

দাদা দেয় একবার দিদি,
দিদি দেয় বারবার।

উত্তর: সিঁদুর।

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধার মাধ্যমে হিন্দু সম্প্রদায়ে সিঁদুরের যে সম্মান তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। কারণ হিন্দু সম্প্রদায়ে বিয়ের সময় প্রথমবার স্বামী স্ত্রীকে সিঁদুর পরায়। আর পরবর্তীতে হিন্দু রমনীরা স্বামীর মঙ্গলার্থে সেই সিঁদুর স্বামীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বার বার ব্যবহার করে। আর এই ধাঁধায় যে শেষ ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে তা শুধুমাত্র পাঠক সমাজের মনোরঞ্জনের তাগিদে।

১৯০

ছোট্ট একটি গাছে,
লাল বউটি নাচে।

উত্তর: মরিচ।

ব্যাখ্যা: লাল মরিচ আর লাল বউয়ের মাঝে একটা স্বাদৃশ্য আছে। সেই সাদৃশ্যটি হলো নতুন বউ যখন বাড়িতে আসে তখন তার পরনে লাল শাড়িটি বেশি শোভা পায়। আর মরিচকে নতুন বউয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে এ কারণে যে, লাল মরিচের ঝাঁজ আর নতুন বউয়ের ঝাঁজ এর মধ্যে একটা বিশাল মিল আছে। এ কারণে উক্ত ধাঁধাটির মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজের নতুন বউয়ের আচরণকে খুব ব্যঙ্গাত্মকভাবে প্রকাশ করেছেন লোককবি।

১৯১

টানলে কমে।

উত্তর: সিগারেট।

ব্যাখ্যা : এই ধাঁধায় সিগারেটের ক্ষতিকর দিকটি ছন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ সিগারেট খেলে যে মানুষের ক্ষতি হয় এবং আয়ু কমে যায় তা উক্ত ধাঁধায় প্রকাশ করা হয়েছে রূপকের মাধ্যমে। সিগারেট জ্বালিয়ে তা টানতে হয় এবং পুড়ে গিয়ে তা ক্রমান্বয়ে ছোট হতে থাকে। এইভাবে সিগারেটের প্রতি টানে মানুষের আয়ু ছোট হতে থাকে তথা কমে যায়। মূলত এই বিষয়টি উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

www.pathagar.com

১৯২

ঘরের মধ্যি ঘর,
তার ভিতরে বাস করে পরমেশ্বর।

উত্তরঃ মশারি।

ব্যাখ্যা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বাস করতে গেলে তাদের প্রয়োজন নিরাপত্তার। যার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো ঘর। আর মশা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ মশারি ব্যবহার করে যার আকৃতি হয় ঘরের মতো। অর্থ্যাৎ ঘরের ভিতর আর একটি ঘর তৈরি হয়। আর মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বসত করে তাই মশারির ভিতরে যে মানুষটি শুয়ে থাকে লোককবি তাকে অনেক সম্মান করে পরমেশ্বরের সাথে তুলনা করেছেন। অর্থাৎ মানুষ যে, সৃষ্টির সেরা জীব এই ধাঁধাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই।

১৯৩

বছরে আসে বছরে যায়,
দিনে খায় না রাতে খায়।

উত্তরঃ রোজা।

ব্যাখ্যা : মুসলমানদের সবচেয়ে মূল্যবান এবং ফজিলতের একটি মাস হলো রমজান মাস। এই মাসে প্রতিটি মুসলমান নর-নারী আল্লার সন্তুষ্টি লাভের আশায় রোজা করে। সরাদিন অনাহারে থাকার পর সুর্যাস্তের সময় ইফতারির মাধ্যমে খাওয়া দাওয়া শুরু হয়। এই বিষয়টিকে যদিও বা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে তথাপিও এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্যে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৪

মাটির নীচ থাইক্যা আইলো বুড়ী
বুড়ী বড় সুন্দরী।

উত্তরঃ রসুন।

ব্যাখ্যা : যৌবনবতী সুন্দরী নারীর লালিত্য মাধুরী, লীলায়িত চাপল্য চিরস্থায়ী নয়, বয়োক্রমে সে বয়োবৃদ্ধা হয়। আমাদের সমাজে বৃদ্ধা রমনীর উপমায় অনেক ধাঁধা ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গের জেলা সিরাজগঞ্জ জেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। এ অঞ্চলের লোকদের কল্পনাতে চারিত্রজ্ঞানের যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। এখানে যৌবনোন্মত্তা নারীর সৌন্দর্যাভিলাসিত জীবনোচ্ছ্বাস নেই, আছে স্থূল হাস্য কৌতুকপ্রিয়তা

১৯৫

চার মুদে বেত কাঁটা
মধ্যে সুতা লাল ব্যাটা।

উত্তরঃ আনারস।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : পুত্রসন্তান কামনা যে কোনো দম্পতির একমাত্র কাম্য। আমরা তৎকালীন সমাজের একটি চিত্র উল্লেখ করে বলতে পারি, কোনো গর্ভবতী মা কন্যা সন্তান প্রসব করলে তাকে অনেক ভৎসনা সহ্য করতে হতো। এমনকি সমাজের হাত থেকে রক্ষা পেতে সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করত। এই মানসিকতা এখনও বর্তমান মানব সমাজে বিদ্যমান। তাইতো আমাদের সমাজে পুত্র সন্তান কামনাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে কিছু ধাঁধা, যেখানে তার রূপগৌরব, বীর্যবত্তা, সৌহার্দ্যপ্রীতি প্রভৃতি গুণ বাস্তব চিন্তা থেকে গৃহীত হয়েছে।

১৯৬

নাই মুখ নাই মাতা,
টিপ দিলি কয় কতা।

উত্তর: রেডিও।

ব্যাখ্যা : আদিকালের শ্রেষ্ট বিনোদনের উপকরণ হিসেবে বেতার/রেডিও যন্ত্রের ভূমিকা অত্যাধিক। এখনো গ্রামাঞ্চলে রেডিওকেই বিনোদনের একমাত্র উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন আসতে পারে যে এখানে কোনো মানুষও নেই আবার এর কোনো মুখও নেই তাহলে এই যন্ত্রটি কীভাবে কথা বলতে পারে। মূলত এই ধাঁধার মাধ্যমে প্রযুক্তির ক্ষমতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯৭

চার অক্ষরে নাম যার,
দেশটা গেলেন দিয়ে
প্রথম দু'অক্ষর বাদ দিলে
বিয়ে করতে চলে।

উত্তর: মুজিবর এবং বর।

ব্যাখ্যা : আমাদের এই দেশ স্বাধীন হওয়ার পিছনে যে মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উক্ত ধাঁধাটির মাধ্যমে লোককবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এবং তার নামের পূর্বের দুটি অক্ষর বাদ দিলে থাকে বর আর সকল পুরুষেই একদিন বর বেশে বিয়ে করতে যান। আর বর বেশে বিয়ে করতে যাওয়া মানে জীবনের নুতুন এক অধ্যায় শুরু করা যেমনটি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালিকে সঠিক নেতৃত্ব দানের মাধ্যমে।

১৯৮

এক থাল সুপারি
গুনতে পারে কোন ব্যাপারী॥

উত্তর: আকাশের তাঁরা।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : ধাঁধায় একদিকে উচ্চবিত্তশ্রেণি এবং অন্য দিকে নিম্নবিত্ত বা সাধারণশ্রেণির জনগণ সমাজে বিদ্যমান। এদের বেশি ভাগই সরাসরি না হলেও কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। আসলে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ তাইতো ধাঁধার মধ্যে আমরা কৃষক সমাজ ও তার উৎপাদিত পণ্যের পরিচয় বেশি করে লাভ করে থাকি। এছাড়াও উক্ত ধাঁধায় সমাজের ব্যবসা-বানিজ্যের চিত্রও ফুটে উঠেছে।

১৯৯

জন্মে সাদা কর্মে কালো
গলায় লোহার হার
উড়িয়া গিলে আহার ধরে
লম্বা লেজটি তাহার।

উত্তর: জাল।

ব্যাখ্যা : মাছ শিকারের জন্য শ্রেষ্ট উপকরণ হলো জাল। এই ধাঁধাটির মাধ্যমে সুতাজাতীয় জিনিসের স্থায়িত্ব বাড়ানোর জন্য যে, 'গাব' ব্যবহার করা হয় সে কথা বলা হয়েছে। আর 'গাব' ব্যবহার করলে সুতার রং কালো হয় এই বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

২০০

দিলি বাড়ে, না দিলি কমে

উত্তর: শিক্ষা।

ব্যাখ্যা : শিক্ষা হলো মানুষের শ্রেষ্ট সম্পদ। এই শিক্ষা মানুষ যখন বিলিয়ে দেয় তখন তার কোনো প্রকার ঘাটতির সৃষ্টি হয় না। কারণ শিক্ষা এমন একটি জিনিস যা চর্চার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে। আর যদি কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি তার জ্ঞানের আলোকে নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে তাহলে কখনোই তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করে না। এ জন্যই উক্ত ধাঁধায় বলা হয়েছে দিলে বাড়ে না দিলে কমে।

২০১

দুই কূলে জাল ফেলে এককুড়ি দুই ছেলে
মাছ যদি জালে আসে কেউ কাঁদে, কেউ হাসে

উত্তর: ফুটবল খেলা।

ব্যাখ্যা : গ্রাম বাংলার পল্লীজীবনে ফুটবল খেলা এক ধরনের নেশাও বটে। তবে একে নেশা না বলে আমোদ প্রমোদের উপকরণ বলাই শ্রেয়। এই ধরনের খেলা পল্লী বাংলার ছেলেদের অপূর্ব আনন্দ দান করে। সেই ফুটবল খেলাকে নিয়েও লোককবি সুন্দর ধাঁধা রচনা করেন।

www.pathagar.com

২০২

শুতে গেলে দিতি হয়

না দিলি ক্ষতি হয়।

উত্তরঃ দরজা।

ব্যাখ্যাঃ ঘরে শোয়ার সময় দরজা দেওয়ার কথা ধাঁধাটিতে উল্লেখ করা আছে। এবং দরজা না দিলে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ ঘুমালে অচেতন হয়ে পড়ে, তার বাহ্যিক কোনো জ্ঞান থাকে না। এমতাবস্থায় ঘরের ভিতরের মালামাল চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ বিষয়টি লোকধাঁধার মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে খুব সুন্দরভাবে। মূলত লোকসমাজের অভিজ্ঞতার কথাটি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে।

২০৩

তিন ছয়, তিন নয়

তিন আঠারো কত হয়?

উত্তরঃ ৯৯।

ব্যাখ্যা : তিন ছয়, তিন নয় তিন আঠারো এক সাথে যোগ করলে ৯৯ হবে। এটি হলো ধাঁধার আক্ষরিক অর্থ। কিন্তু উক্ত ধাঁধাটির মাধ্যমে লোককবিগণ লোক সমাজকে গণিত শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করেছেন।

২০৪

থাকলি ভালো হয়,

পেলে ভালো নয়।

উত্তরঃ লজ্জা।

ব্যাখ্যা : মানুষের মানবীয় চরিত্রের মধ্যে অন্যতম লজ্জা। লজ্জা না থাকলে মানুষকে অনেক ধরনের অসুবিধায় পড়তে হয়। যেমন লজ্জা আছে বলেই হয়তো মানুষ আজও পোষাক পড়ে। আবার লজ্জা মানুষের এক ধরনের জড়তা। যার কারণে মানুষকে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে হয়। তাই উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে একটি নীতি কথাকে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, লজ্জা যতটুকু থাকা দরকার ঠিক ততটুকুই থাকতে হবে। কিন্তু লজ্জা যদি কোনো প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে তাহলে তা থাকা যাবে না।

২০৫

তিন জানোয়ারের তেইশ কান

মানে জানলে খাবেন পান

না জানলে মানে

হাত দিবেন না পানে।

উত্তরঃ রাবণের বিশ কান, ছাগলের দুই কান এবং শামুকের এক কান।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : উক্ত ধাঁধাটি সাধারণত বিয়ে বাড়িতে পান দিয়ে বর যাত্রীদের বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার জন্য ধরা হয়। যদি ধাঁধাটির উত্তর বরযাত্রীরা দিতে পারে তাহলে তাদেরকে পান খাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। মূলত বুদ্ধিমত্তা পরিচয় করার জন্য উক্ত ধাঁধাটি ধরা হয়। এই ধাঁধাটিতে তিন জানোয়ারের তেইশ কানের কথা বলা হয়েছে যা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করা হয়। এই বিষয়টি ধাঁধার একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে বলে মনে হয়।

২০৬

এক মায়ের দুই ভাই,
কারো সাথে কারো দেখা নাই।

উত্তর: চোখ।

ব্যাখ্যা : চোখ মানুষের কপালের ঠিক নিচে খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। কিন্তু কেউ কাউকে দেখতে পায় না। এটি হলো ধাঁধার আক্ষরিক অনুবাদ। কিন্তু ধাঁধাটিকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তবে দেখতে পাব যে, এখানে মায়ের সাথে মায়ের ভাইয়ের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক কিংবা যৌথ পরিবার ভেঙ্গে যখন একান্নবর্তী পরিবারে পরিণত হয় তখন তাদের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হয় সে বিষয়টিকে রূপকের মাধ্যমে ধাঁধাটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

২০৭

কাঁচাতে মানিক ফল সর্বলোকে খায়
পাকলে মানিক ফল
গড়াগড়ি খায় ।

উত্তর: ডুমুর ফল।

ব্যাখ্যা : ডুমুর ফল কাঁচা অবস্থায় রান্না করে খাওয়া হয় আর পাঁকলে এই ফল খাওয়া যায় না। এটি হলো এই ধাঁধার আক্ষরিক ভাবার্থ, এর ভিতরে যে সামাজিক দিকটি লুকিয়ে আছে বলে আমি মনে করি সেটি হলো আমাদের সমাজে তরুণ এবং বৃদ্ধদের অবস্থাকে এই ধাঁধার মাধ্যমে রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। মূল বিষয়টি হচ্ছে তরুণরা সমাজে সব সময়ই চাহিদাসম্পন্ন হয়ে থাকে পক্ষান্তরে যখন মানুষ বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যায় তখন ধীরে ধীরে তার গ্রহণযোগ্যতা কমতে থাকে। ঠিক যেন ডুমুরের ফলের মতো। কাঁচা অবস্থায় সবার কাছে ডুমুরের ফলের চাহিদা থাকে কিন্তু আস্তে আস্তে যখন পাঁকতে থাকে তখন এর চাহিদা কমতে থাকে।

২০৮

নিবিড় অরণ্যে বাস চার পা ধারী
মনুষ্য আনিলো যারে বুদ্ধি বলে ধরি

www.pathagar.com

বায়ুসম বেগবান যদি ভালো হয়
কি নাম তাহার বল, লোকে কিবা কয়।

উত্তরঃ ঘোড়া।

ব্যাখ্যা : ঘোড়া বন্য প্রাণি ও তীব্র গতিসম্পন্ন জীব। মানুষ তাকে বন থেকে এনে কিভাবে পোষ মানিয়েছে তার সূক্ষ্ম উদাহরণ উক্ত ধাঁধায় ফুটে উঠেছে।

২০৯

তিন অক্ষরে নাম তার বনেতে বাস করে
শেষের অক্ষর বাদ দিলি মানুষের ক্ষতি করে।

উত্তরঃ বানর ও বান।

ব্যাখ্যা : প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে আতি সাধারণ একটি দুর্যোগ হলো বন্যা যা মানুষের জান-মালের অনেক ক্ষতি সাধন করে। উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে বানরের আবাসস্থল এবং বন্যা যে মানুষের জন্য ক্ষতিকর সে বিষয়টিকে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

২১০

তেল চুকচুক ভাটাই মোড়ল
বিনা দাড়ে বাচ্ছে সাগর
মরে গেলি শ্মশানে যায়
হিন্দু মুসলিম সকলেই খায়॥

উত্তরঃ চুন।

ব্যাখ্যা : এখানে পানের উপকরণ চুন প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে। সাগরের ঝিনুক পুড়িয়ে চুন তৈরি করা হয়। মানুষ মরে গেলে শ্মশানে চুন নিয়ে যেতে হয়। এছাড়াও হিন্দু মুসলিম সকলেই পানের সাথে চুন খায়।

২১১

জিহ্বায় যে টুপি পড়ে
নাম তার বলব না।
সাদা মাঠে চড়াও তারে
মানা সে করবে না।
মাঝে মাঝে খেতে দিও
কালো কিছু জল।
একটু ভেবে উত্তর দিও
ভুল হবে না ফল।

উত্তরঃ কলম।

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হয়ে ব্যতিক্রম নয়। এই ধাঁধায় যে বিষয়টিকে স্থান দেওয়া হয়েছে

www.pathagar.com

সেটি হলো লেখার উপকরণ কলম। আগেরকার দিনে যে কলম ব্যবহার করা হতো তাতে দোয়াতের কালি ব্যবহার করা হতো। এই বিষয়গুলোকেই মূলত এই ধাঁধায় স্থান দেয়া হয়েছে।

২১২

জ্বলে চলে ছোয় না জল।

উত্তর: জোনাকী।

ব্যাখ্যা : আমাদের গ্রামের পথঘাটে অন্ধকার রাতে চলাচলে যে পোকাটি সবচেয়ে বেশি উপকার করে সেটি হলো জোঁনাকী। জোঁনাকী পোকা নিজের দেহের আলো জ্বালিয়ে চলে। আর তার মাধ্যমে রাস্তাঘাট আলোকিত হয়। ঝড় বৃষ্টি যাই হোক তার আলো জ্বলতে কোনো প্রকার বিপত্তির সৃষ্টি হয় না। এজন্য উক্ত ধাঁধায় জলের প্রভাবে যে জোঁনাকীর জ্বলা বন্ধ থাকে না সেই বিষয়টিকেই ব্যক্ত করা হয়েছে।

২১৩

সারা বিল শুকায়ে গেল
গাছের আগায় জল।

উত্তর: নারিকেল।

ব্যাখ্যা : নারিকেল সম্পর্কে সুন্দর সুন্দর ধাঁধা শোনা যায়। নারিকেলের ভিতরে যে পানি থাকে তা খেলে অনেকটা পানির পিপাসা কমে যায়। তাই তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অনেকে নারিকেলের পানির আশ্রয়ও নিয়ে থাকে। কারণ নারিকেল পানির একটা আধার হিসেবে কাজ করে। এজন্যই লোকধাঁধার মাধ্যমে লোককবি নারিকেলের বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

২১৪

আমরা পাঁচটি ভাই,
যা পাই মিলিমিশে খাই।

উত্তর: হাতের পাঁচ আঙ্গুল।

ব্যাখ্যা : এখানে হাতের আঙ্গুলকে নির্দেশ করা হয়েছে। মানুষের এক হাতে পাঁচটি আঙ্গুল থাকে। মানুষ যখন খাবার খায় তখন কোনো আঙ্গুলকে বাদ দিয়ে খাওয়া কখনো সম্ভব হয় না। এজন্য উক্ত ধাঁধায় হাতের আঙ্গুলের প্রসঙ্গকে উল্লেখ- হয়েছে। মূলত এটিকে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গমূলক ধাঁধা বলা যায়।

২১৫

এই মাটি চৌ-চির
এর মাঝে মহাবীর।

উত্তর: ইঁদু

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : এখানে ইঁদুরের বাসস্থান ও স্বভাবটির কথা লোককবি পরিহাসের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন।

২১৬

উড়ে এলো জঙ্গি
জুড়ে পরলো বিল
সোনারো ঢাকনি তার
রূপারো খিল।

উত্তর: বৃষ্টি।

ব্যাখ্যা : চাষের জন্য যেমন প্রয়োজন রৌদ্রের, তেমনি বৃষ্টিরও প্রয়োজন আছে। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কৃষক জমিতে চাষ শুরু করে দেয়। ফসল যেন কৃষকের কাছে সোনা, রুপার মতো। মূলত একারণেই এখানে বৃষ্টিকে সোনা ও রুপার সাথে তুলনা কা হয়েছে।

২১৭

এক পুকুরে দুই রকম পানি।

উত্তর: ডিম।

ব্যাখ্যা : উক্ত ধাঁধার মাধ্যমে আল্লাহর সুনিপুণ কারুকাজের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আল্লাহ চাইলেই যে, যে কোনো কিছু করতে পারেন তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রকাশ পেয়েছে ধাঁধাটির মাধ্যমে।

২১৮

আটে আর চাটে।

উত্তর: শামুক।

ব্যাখ্যা : শামুক খুব চালাক একটি প্রাণি। এই প্রাণি যখন হাটে তখন সে আহার করে। এর ম্যাধমে পল্লী কবি সমাজের ধূর্ত লোকদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে। তারা এতো চালাক যে যখন তারা চলাফেরা করে তখন তারা সব সময় লাভের আশা করে। আর এই কাজটি করে সম্পূর্ণ লোক চক্ষুর আড়ালে। আর এই বিষয়টি রূপকের মাধ্যমে শকাশ পেয়েছে ধাঁধাটিতে।

২১৯

ইলে বিলে চিতল মাছ
মধ্যি বিলে লতা
কোন শহরে দেখে এলাম
ফলের আগায় পাতা।

উত্তর: আনারস।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা : প্রকৃতি সব সময় তার নিজস্ব ধারায় চলতে থাকে। মাঝে মাঝে প্রকৃতি মানুষকে অবাক করে দেওয়ার জন্য ব্যতিক্রম কিছু উপহার দেয়। যেমনটি ঘটেছে আনারস ফলের বেলায়। একমাত্র এই ফলের মাথায় পাতা থাকে। অন্য কোনো ফলের মাথায় সচারচার পাতা থাকে না। প্রকৃতির এই ভিন্নতাটিও লোকীকবিদের দৃষ্টি এড়ায়নি। যা লোককবিরা উক্ত ধাঁধাটির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

২২০

এক চিন্তায় চিন্তিত আমি নদীবয় কিনা বয়
আরেক চিন্তায় চিন্তিত বনের পশু কাহা গিয়া রয়
হাড় খেলাম মাংস খেলাম ভঙ্গ করলাম কায়া
এমন জন্তুর সঙ্গে করেছিলাম প্রেম
মরিয়া যায় তবু না ছাড়ে দয়া।

ব্যাখ্যা : কোনো এক নদীর পাড়ে একটি বট গাছ ছিল। উক্ত বট গাছে প্রচুর পাখি বসে বিশ্রাম নিতো। পাখিগুলো একসময়ে পায়খানা করে ওই বট গাছের সব পাতার রং নষ্ট করে দিয়েছিল। হঠাৎ একদিন নদী ভাঙ্গনের ফলে বট গাছটি ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে গাছটি চিন্তিত হয়ে ভাবছে যে, আমি নদীর মধ্যে পড়ে গেলে হয়তো নদীর স্রোত প্রবাহিত হতে বাধাগ্রস্থ হবে, আর যদি নদীতে পড়েই যাই তাহলে পাখিগুলোর কি অবস্থা হবে? বট গাছটির এরূপ কথা শুনে পাখিগুলো আক্ষেপ করে বলে সে মারা যাবার উপক্রম হলেও মায়া ছাড়তে পারিনি।

২২১

ছাড়িয়া মুখের গ্রাস যে অবোধ জন
চেষ্টা করে অন্য দ্রব্য করিতে গ্রহণ
পয়লা মুখের গ্রাস যেজন হারায়
পরে ছাই তারপরে পরে অপকার।

ব্যাখ্যা : একদিন একটি কাক মুখে এক টুকরো মাংস নিয়ে গাছের ওপর বসেছিল। ঐ গাছের নিচে এক ধূর্ত শৃগাল বসে কাকটিকে বলছিল কাক তোমার গায়ের রং কত সুন্দর, নাজানি তোমার কণ্ঠ কত সুন্দর। তুমি আমাকে একটা গান শুনাও অনেকবার বলার পর কাকটি একটি গান গাইতে লাগল। যেই কাকটি গান লাগলো সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ থেকে মাংসের টুকরোটি মাটিতে পড়ে গেল। টুকরোটি মাটিতে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত শৃগালটি মাংসের টুকরোটি নিয়ে সে এক নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিল। ইতোমধ্যে একটি মাছ নদী লাফালাফি করছিল। মাছটি দেখে শৃগালের খুব লোভ হলো, তাই রেখেই মাছটি ধরার জন্য এগিয়ে গেল। যেই শৃগালটি মাছটি ধর সঙ্গে সঙ্গে মাছটি লাফ দিয়ে পানির মধ্যে চলে গেল। ইত

www.pathagar.com

যাওয়া মাংসের টুকরোটি দেখে আকাশে উড্ডীয়মান চিল এসে মাংসের টুকরোটি নিয়ে আকাশে উড়ে যায়। ফলে ধূর্ত শৃগালটি একদিকে মাংসের টুকরো এবং অপরদিকে মাছ উভয়টিই হারাল।

২২২

বয়সকালে হয় দুই শিং
বৃদ্ধকালে হয় ক্ষয়
শেষকালে দুই শিং
দুই শিংই আবার হয়।

উত্তরঃ চন্দ্র।

ব্যাখ্যা : আকাশে যখন প্রথম চন্দ্র উদিত হয় তখন তাকে দেখতে দুই শিং এর মতো মনে হয়। এটি যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে তখন তাকে আর শিং এর মতো দেখা যায় না। অতঃপর যখন চন্দ্র ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে তখন এক সময় আবার একে দুই শিং এর মতো দেখা যায়।

২২৩

হাড় দিয়া মস্তক সেদ্ধ চাম পাইরা বসো
এ তিন কথার মানে কয়া বাড়ির মধ্যে এসো
ফকিরের ব্যাটা আচ্ছা
গোয়া দিয়া বাড়ায় বাচ্চা
মুখ দিয়া বাড়ায় ছাও
এ তিন কথার মানে কয়া পান্তা কয়টি খাও।

ব্যাখ্যা : জনৈক ফকির কোনো এক বাড়িতে সামান্য খাবার চাইলে ঐ বাড়ির এক মহিলা ফকিরকে বলে হাড় দিয়া মস্তক সেদ্ধ অর্থাৎ পাট গাছের সোলা দিয়া পাটের শাক সিদ্ধ করা হয়েছে, চাম পাইরা বসো অর্থাৎ পাট দিয়ে মাদুর তৈরি করে তা বাড়ির মধ্যে বিছিয়ে রেখেছে ফকিরকে বসতে দিতে। অতঃপর মহিলাটি একটি প্লেটে কিছু পান্তা ভাত নিয়ে এসে ফকিরকে বললো গোয়া দিয়া বাড়ায় বাচ্চা অর্থাৎ কলাগাছের চারা, মুখ দিয়া বাড়ায় ছাও অর্থাৎ কলা। তখন ফকির বুঝতে পারলো মহিলার হাতে কলা আছে। অবশ্য মহিলাটি কলাটি লুকিয়ে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত ফকির কলা দিয়ে পান্তা ভাত খায়।

২২৪

কহিলে কহা নাহি যায়
কহিনা কথা আপ্ত রং এর দোষে

www.pathagar.com

এই সমস্ত কথার অর্থ বুঝবে যে
দানা পওনা করিবে সে
কহিলে মা মার খায়
না কহিলে বাপ কুত্তা খায়।

ব্যাখ্যা : এক লোকের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা সে গরুর মাংস খাবে। তাই সে হাট থেকে গরুর মাংস নিয়ে এসে স্ত্রীকে মজা করে রান্না করতে বলে। লোকটি গোসল করতে যায় এবং তার স্ত্রী মাংসগুলো ধৌত করে রান্নাঘরে রেখে মসলা আনতে গেলে এসে দেখতে পায় সবগুলো মাংস বাড়ির কুকুর খেয়ে ফেলেছে। তাই সে উপায় না পেয়ে ঐ কুকুরের একটি বাচ্চাকে ধরে নিয়ে তা রান্না করে। মহিলার যাবতীয় কর্মকাণ্ড তার ছেলে অপর ঘর থেকে দেখতে পায়। যাহোক লোকটি গোসল করে এসে স্ত্রীকে মাংসের কথা বললে সে ঐ কুকুরের বাচ্চাটির মাংস এনে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি উপরোক্ত কথাগুলো বারবার বলতে থাকে। তখন এক পর্যায়ে বাবা ছেলেকে বিস্তারিত সব বলতে বললে ছেলেটি বাবাকে বলে, আমি আপনাকে সব বলল। কিন্তু শর্ত হলো আপনি আমার মাকে কিছু বলতে পারবেন না। বাবা ছেলেটির শর্ত মেনে নিলে সে বিস্তারিত সব বাবার কাছে বলে। ছেলেটি বলে আপনি যে মাংস নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদের বাড়ির কুকুরটি খেয়ে ফেলেছিল, মা তাই আপনার ভয়ে ঐ কুকুরের বাচ্চার মাংস রান্না করেছে। এখন যদি আমি আপনাকে বলি তাহলে আপনি মাকে মারবেন, অপরদিকে যদি না বলি তাহলে আপনি কুকুরের মাংস খেয়ে ফেলবেন। তাই আমি এক উভয় সংকটে পড়ে যাই।

২২৫

কলমের মাঝে রয় কালি কিন্তু নয়
খুলনায় গেলে পাবে তার পরিচয়।

ব্যাখ্যা : কলমের মাঝের অক্ষর ল, অপরদিকে খুলনার মাঝের অক্ষর ল। অতএব এর সঠিক জবাব হবে ল।

২২৬

তালগাছে সোলের পোনা সোল শিয়ালেক খায়
নয় লক্ষ হাতী ঘোড়া কাউয়া লিয়া যায়
কি বলবো ভাই আশ্চর্য কথা ব্যাঙেও চিড়া খায়
মায়ের বিয়ে হওয়ার আগে তার ঝি লায়ার খেতে যায়।

ব্যাখ্যা : নদীর ধারে একটি তালগাছ ছিল। ঢেউয়ে গাছটি এক সময় নদীতে পরে যায়। ঐসময় একটি শৃগাল মরে নদীতে ভাসতে ভাসতে এক সময় ঐ তালগাছের ডালের সাথে লেগে যায়। অতঃপর সোল মাছ পোনা উঠিয়ে ভাসতে ভাসতে ঐ তালগাছের

www.pathagar.com

সাথে লেগে থাকা মৃত শৃগালকে খেতে থাকে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের খাতায় ৯ লক্ষ হাতী ও ঘোড়ার অংক করেছিল। ঐ খাতা এক মটকার দোকানদারের নিকট বিক্রি করলে দোকানদার তাতে মটকা বিক্রি করে এক ব্যক্তির কাছে। লোকটি মটকা খাওয়ার পর এর কিছু অংশ ঐ কাগজে লেগে থাকা অবস্থায় মাটিতে ফেলে দিলে তা কাক নিয়া যায়। একটি পুকুর ঘাটে এক ব্যক্তি নৌকায় বসে চিড়া খাচ্ছিল। খেতে খেতে হঠাৎ করে ঐ ব্যক্তির মুখ থেকে কিছু চিড়া পানিতে পড়ে যাচ্ছে এবং ঐ চিড়া ধরে ধরে ব্যাঙ খাচ্ছে যা লোকটি দেখছে। জনৈক ব্যক্তি ঘারে করে একটি কলা গাছের চারা রোপন করতে নিয়ে যাচ্ছে, এসময় অপর ব্যক্তি তাকে বলছিল ওটি কি ? তখন ব্যক্তিটি বলে কলা গাছের চারা যার মা পরিপূর্ণতা পাবার আগেই সে রোপিত হতে যাচ্ছে।

২২৭

দুই কাছার সমানে ভাঙ্গে সেই হলো গাং
সাত গাং সাতড়ে আসে সেই হলো নাং
বিনা চাওয়ায় কর্জ দেয় সেই আমার পড়শি
লাজে লোহা কহর হলে তার নাম রাখে বর্শী।

ব্যাখ্যা : চোখ, যার দুই পার্শ্ব সমানে ভেঙ্গে যায় এবং চোখের মধ্যে অনেক পানি রয়েছে। জোক যা অনেক পানি সাতড়ে এসে মানুষের অজান্তেই রক্ত খেয়ে নেমে যায়। হাইলার আগুন, কোনো ব্যক্তি তার হুক্কা ধরানোর জন্য আগুনের প্রয়োজন মনে করে এক বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, এসময় লোকটি দেখতে পায় ঐ বাড়ির উঠানে হাইলা লাগানো আছে তাই সেখান থেকে সে আগুন নিয়ে আসে কাউকে না বলেই। কারণ আগুন নিতে কাউকে বলতে হয় না। বর্শীও না টর্শীও না লাজে লোহা কহর হয়।

২২৮

নতুন খাই না পুরান খাই
পথ দেখা দেন ঐ পাড়া যাই
অ দিয়া আমরা খাটা রান্ধা খাই
হাতে আছে বড় ভাই
নামা দিয়া দেখেন কত ক্ষাই।

ব্যাখ্যা : এক ব্যক্তি তার পুত্রকে নতুন বিয়ে করানোর পর পুত্রবধুকে দিয়ে শাশুড়ি ধান পা দেয়াচ্ছিল। এসময় এক ভিক্ষুক এসে ভিক্ষা চাইলে পুত্রবধু বলে নতুন খাই না পুরান খাই অর্থাৎ আমি এ বাড়ীর নতুন মেয়ে, আপনি তাই পুরাতন কারো কাছে ভিক্ষা চান। তখন ভিক্ষুক বুঝতে পেরে ঐ পাড়া যাবার রাস্তার খোঁজ নিচ্ছিল নতুন বিবাহিত মেয়ের কাছে। তখন পুত্রবধু ভিক্ষুককে বলে অ দিয়া আমরা খাটা রান্ধা খাই অর্থাৎ এমন রাস্তা দিয়া যান যে রাস্তায় একটি তেতুল গাছ আছে। এরপর ভিক্ষুক ঐ পাড়া দিয়া ঘুরে এসে আবারও ঐ পুত্রবধুর বাড়ির কাছে এসে এক বিরাট পুকুর দেখতে পেল

www.pathagar.com

এবং তাকে ভিক্ষুক জিজ্ঞাসা করল এ পুকুরে পানি কত? তখন পুত্রবধু বলে হাতে আছে বড় ভাই নামা দিয়া দেখেন কত খাই অর্থাৎ ঐ পুকুরে কত পানি আছে তা বোঝার জন্য আপনার হাতে যে লাঠিটি আছে তা ব্যবহার করুন।

২২৯

ধান লারো ও জুবুতী আথলে দিয়া পাও
পাগলার ব্যাটা হাটে যায় কিবা সদাই চাও
বনের বনপাতা আকাশের গোটা
হস্তীর দাত গোয়ালের ভাড় আনিও কিনা
আরও মিনসে দাঁড়ি আনিও কিনা।

ব্যাখ্যা : এক পুত্রবধু ধান পা দিচ্ছিল এমন সময় শ্বশুড় হাটে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলে পুত্রবধুকে বলে তোমার জন্য কি সদাই আনব? উত্তরে পুত্রবধু বলে, বনের বনপাতা অর্থাৎ পান, আকাশের গোটা অর্থাৎ সুপারী, হস্তীর দাঁত অর্থাৎ মূলা, গোয়ালের ভাড় অর্থাৎ চুন এবং মিনসে দাঁড়ি অর্থাৎ চিংড়ি মাছ আমার জন্য নিয়ে আসবেন।

২৩০

বাঘের মতো হামকি দেয়
কুকুরের মতো বসে
পাথর হয়ে পাতালে যায়
সোলা হয়ে ভাসে।

উত্তর : ব্যাঙ।

২৩১

আছিলাম জয়ারাম হয়াগেলাম জয়া
কেউ যায় ঘাড় ঝেমটি দিয়া
কেউ যায় পাত ডেওয়াইয়া
আমি দূষি না আমার কর্ম দূষি
আম থুয়া আমের আঠি চুষি
বেগরার বাড়ি খাসির গোস্ত
তা থুয়া আইসা কইয়ের কান চুষি।

ব্যাখ্যা : এক ব্যক্তির ৫টি সুদর্শনা কন্যা সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেককে সুদর্শন ছেলের সাথে বিয়ে দিলেও বড় মেয়েকে যে ছেলের সাথে বিয়ে দিয়েছিল সে দেখতে তত সুন্দর ছিল না। তাই উক্ত ব্যক্তি শুধু বড় জামাইকে বাদ রেখে অন্য জামাইকে বাড়িতে নিয়ে এসে ভালো খাবার পরিবেশনের ব্যবস্থা করে। শ্বশুড়বাড়ির কাছেই বড় জামাইয়ের একটি ধানক্ষেত ছিল। সে ধানক্ষেত দেখার উদ্দেশ্যে রওনা দিলে শ্বশুড়বাড়ির নিকটে এসে দেখতে পেলো বাড়িতে মহাধুমধাম চলছে। তাই সে বাড়ির

www.pathagar.com

মধ্যে গেলে সব জামাইকে দেখতে পেলো। শ্বশুড় এবং শাশুড়িসহ অন্যান্য জামাইরা এবং শালিকারা তাকে খাবার খেতে বসতে বলে। দুই দিকে ২ জন করে অর্থাৎ দুইজন জামাই ডান পাশে ও দুইজনকে বাম পাশে রেখে তাকে মাঝখানে রাখা হলো।

এমতাবস্থায় এক শালিকা খাবার পরিবেশন করার সময় ডান পাশের দুইজনকে খাবার দেবার পর বড় জামাইকে খাবার না দিয়ে অপর দুই জামাইকে খাবার দেয়। অবশেষে সব খাবারের অবশিষ্ট অংশ বড় জামাইকে দেয়া হয়। এভাবে সে দুঃখ করে বলতে থাকে আমি হলাম বড় জামাই আমার আদর বেশি থাকার কথা হলেও বাস্তবে তা ছিল না। আমাকে তাই কেউ কেউ দেখে ঘাড় ঝেমটি দিয়া যায় এবং খাবার পরিবেশনের সময় পাত ডেওয়াইয়া অন্যকে খাবার দেয়া হয়। আমি যখন জমি দেখতে আসি তখন ওয়াজেদ বেগের বাড়ি খাসির মাংস দিয়ে ভাত খেতে বললেও তা না খেয়ে শ্বশুড় বাড়ি এসে সবাই কই মাছ দিয়ে ভাত খেলেও আমি কইয়ের কান চুষে চুষে সময় কাটাচ্ছি।

২৩২

ঘন প্যাচালে ঘন প্যাচালে যোগীর হারালো খ্যাতা
ভেড়ার ঢিপে কাটা গেলো শৃগালের মাথা
বৈকুণ্ঠ কপালে পড়িয়া পায় সোনা
একজনের ম্যাদানী খাবার খ্যায়া মরলো ৭ জনা
পরের কান্না কানবান যায়া কাটা গেলো লাক
এ তিন বক্কর বোঝাবো কাক।

ব্যাখ্যা : এক যোগী পোটলায় একটি কাঁথা বেধে কোনো এক গ্রামে গিয়ে কিছু লোকজনকে দরবারে বসিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাচ্ছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে তার কাঁথার পোটলাটি হারিয়ে যায়। জঙ্গলের পাশে দু'টি ভেড়া বাধা ছিল এবং জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটি শৃগাল দেখতে পেলো ঐ ভেড়া দুটি প্রচণ্ডবেগে লড়াই করছে বা একে অপরকে ঢিপ দিচ্ছে। শৃগাল তখন ভাবছে যদি তাদের একটিবারের মতো ঢিপ নষ্ট করে দেওয়া যায় তাহলে দুজনকেই খাওয়া যাবে। এ উদ্দেশ্যে উভয়ের যুদ্ধের সময় শৃগালটি মাথা প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গেই দুই ভেড়ার ঢিপে শৃগালের মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এক ব্যক্তি মারা যাবার সময় ৪ পুত্র সন্তানকে বলে বড় জমির কোণে সোনা পুতে রাখা আছে। তাই ঐ ব্যক্তি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ৪ পুত্র জমির চার কোণ খনন করতে থাকে কিন্তু কেউ কোনো সোনার সন্ধান পায়নি। অথচ তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ করে ধীরে ধীরে ধনী হতে থাকে। ফলে অন্য ভাইয়েরা বুঝতে পারে সেই হয়তো সোনা পেয়েছে।

জনৈক ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে ৭ জন ডাকাতের অনৈতিক সম্পর্ক ছিল। সে বনে কাঠ কাটত। তাই ৭ জন ডাকাত স্ত্রীলোকটিকে বলে তুমি বুদ্ধি করে তোমার স্বামীকে মেরে ফেললেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাই স্ত্রী তার স্বামী কাঠ কেটে বাড়িতে এলে অন্য বাড়ি থেকে চিড়া এনে পরের দিন সকালে কাঠ কাটতে যাবার সময় চিড়ার

www.pathagar.com

মধ্যে বিষ মাখিয়ে স্বামীকে দেয়। স্বামী বনের মধ্যে একটি গাছের সঙ্গে চিড়ার পোটলাটি বেধে রেখে গোসল করতে যায়। ইতোমধ্যে ৭ জন ডাকাত ঐ গাছের নিকট দিয়ে যাবার সময় ঐ চিড়ার পোটলাটি দেখতে পায় এবং ৭ জন মিলে তা খায় ও সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

এক ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে স্ত্রীকে বেদম প্রহার করে এবং ঐ ব্যক্তি হাল নিয়ে জমিতে যায়। কিছু সময় পর এক মহিলা ফকির ঐ বাড়িতে ভিক্ষা করতে এলে স্ত্রীর কান্না দেখে এগিয়ে যায়। তখন স্ত্রীলোকটি ফকিন্নির নিকট বলে যদি তুমি আমার বাবার বাড়ি গিয়ে আমাকে যে প্রহার করেছেন তা অবগত করে আসো তাহলে আমি তোমাকে কিছু ভিক্ষা দিব। তখন ফকিন্নি বলে আমিতো আপনার বাবার বাড়ি চিনি না। তাই স্ত্রীলোক বলে তাহলে আমার পোশাক পড়ে তুমি এখানে বসে মুখ ঢেকে কান্নাকাটি করবা। আর আমি বাবার বাড়ি থেকে ফিরে এসেই তোমার সারাদিনের যে চাউল পেতা তা দিয়ে দিবো।

ফকিন্নি তাই স্ত্রীলোকটির পোশাক পড়ে মুখ ঢেকে কানতে লাগল। উক্ত ব্যক্তিটি বাড়িতে গণ্ডগোল করে যাবার পর আর বাড়িতে না এসে পাশের বাড়ির এক লোককে বলল, তুমি তোমার ভাবিকে বলবা যেন দুপুরের খাবার আমার জন্য পাঠায়। এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তিকে খাবার আনতে বলা হয়েছিল সে ব্যক্তিটি ভুক্তভোগী ব্যক্তির জমির পাশদিয়ে হেটে যাচ্ছিল। কিন্তু লোকটি এসে দেখল স্ত্রীলোকটি কানতেই আছে, সে তাকে কয়েকবার বলার পরও তার কান্না থামেনি। তাই সে গিয়ে লোকটিকে বলল আপনার স্ত্রীতো এখনও কানতেই আছে। সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখল তার স্ত্রী সত্য সত্যিই কানছে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির মধ্যে থেকে একটি কাস্তে নিয়ে এসে পিছন থেকে মুখের নিচ দিক থেকে ওপর দিকে কাস্তে দিয়ে আঘাত করলে তার নাক কেটে যায় এবং সে দেখতে পেলো ঐ মহিলাটি তার স্ত্রী নয় সে একজন ফকিন্নি। এসময় তাই ফকিন্নি দুঃখ করে বলতে থাকে পরের কান্না কানতে গিয়ে তার নাক কাটা গেল।

এক রাস্তা দিয়ে ৩ জন লোক হেটে যাচ্ছিল। এমন সময় ১জন লোক তাদেরকে দেখে সালাম দেয়। অতপর ৩ জনের প্রত্যেকেই বলে যে আমাকে সালাম দিয়েছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ৩ জনের মধ্যে ১ জনের ছিল মুখে দাড়ি, ১ জন আলখাল্লা ধরনের জামা পড়েছিল এবং অপরজন ছিল সর্বাধিক বয়স্ক। ৩ জনের বিতর্কের একপর্যায়ে জনৈক ব্যক্তি এসে হাজির হয় এবং সে ৩ জনের কাহিনি বিস্তারিত শুনতে পায়। তাই উক্ত ব্যক্তি ৩ জনের সমস্যার সমাধানকল্পে যে ব্যক্তিটি তাদের সালাম দিয়েছিল তাকে নিয়ে আসা হয় এবং বলা হয় আপনি ৩ জনের মধ্যে কাকে সালাম জানিয়েছেন? তখন লোকটি পরিস্থিতি বুঝে বলে এ ৩ জনের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি বব্বর আমি তাকে সালাম দিয়েছি। একথা বলেই সে দ্রুত চলে যায়। এ পর্যায়ে আবারও ৩ জন বলতে থাকে আমি সবচেয়ে বেশি বব্বর তাই আমাকেই সালাম দিয়েছে। এভাবে তারা সকলেই এক বড় ধরনের বিতর্কে অবতীর্ণ হয়। তখন মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিটি দুঃখ করে বলতে থাকে দেখছি এ ৩ জনই বব্বর। আমি এখন বোঝাব কাকে।

www.pathagar.com

ধাঁধায় ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ

কুরাইলা বাঁশ	:	যে বাঁশের এক গাইট
দিতি	:	দিতে
কশাকশি	:	আটষাট
লেনসুর	:	লেজ
হাইসাল	:	চুলা
খ্যাত	:	ক্ষেত বা জমি
ধলা	:	সাদা
নগে	:	এসে
ভাইরা	:	ভরে
চোঁচা	:	খোসা
আগা	:	অগ্রভাগ
চোক্কা	:	চিকন
ইন্দুর	:	ইঁদুর
থ্যাইকা	:	থেকে
ইন্দু	:	হিন্দু
আটু	:	হাঁটু
আড়ার	:	বনের
গু	:	পায়খানা
মোরা	:	দিকে
খেলাইবার	:	খেলতে
বিয়াইছে	:	প্রসব করা
আন্দে	:	রান্না করে
মারমু	:	মারবো
বাইদানী	:	বেঁদে
জোয়ানে	:	যুবক ছেলে
বুনি	:	বোন
দ্যাহা	:	দেখে
উতের নিহা	:	উত্তর দিকে
বইশা	:	বসে
কইশা	:	কষে
খইসা	:	খসে
চারি মরা	:	চারদিকে
দুক্কা	:	একটু/ছোট
ফেইছাত	:	লেজে
পিছলা	:	পিচ্ছিল
পাগার	:	পুকুর
ঠেস	:	ঠেলা
ছাওয়াল	:	ছেলে

www.pathagar.com

তথ্য নির্দেশ

১. মো. হারুন রশিদ সরকার, পিতা : মৃত ইব্রাহীম সরকার, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ দোকান, বয়স : ৭৫ বছর, তারিখ : ২৫/০১/১২, সময় : রাত ৮ ঘটিকা।

২. মোছা. আনোয়ারা খাতুন, স্বামী : মৃত রমজান আলী, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বছর, পেশা : গৃহিণী।

৩. মো. আমজাদ আলী মন্ডল, পিতা : মৃত মেছের আলী মন্ডল, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : কৃষক।

৪. মো. জহুরুল ইসলাম, পিতা : হাজী তোরাপ উদ্দিন সরকার, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : চাকুরি।

৫. জাহের উদ্দিন, গ্রাম : মশিপুর, পোস্ট : শরিষাকোল, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বছর।

৬. আজির উদ্দিন, গ্রাম : হরিরামপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, তারিখ : ১২.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৭.২০ টা।

৭. মো. মানিক চান, পিতা : মোঃ আবদুল ওয়াহাব, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১১.০০ টা।

৮. মো. আবদুল ওয়াহাব, পিতা : মোঃ জয়নাল আবেদীন, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৬.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১১.৩০ টা।

৯. মো. সোনা উল্লা, পিতা : মৃত মোঃ মজিবর মোলা, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি। ১৭.০৩.২০১২ সময় : বেলা ১১.৩০ টা।

১০. মো. গোলজার হোসেন, গ্রাম : দূর্গাপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সাবেক ইউপি সদস্য, বয়স : ৬৫ বছর, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২ সময় : রাত ৮.০০ টা।

১১. মো. কাশেম আলী, গ্রাম : হরিরামাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : কৃষি কাজ, বয়স : ৭৫ বছর, তারিখ : ১৮.০৩.২০১২ সময় : রাত ৯.৩০ টা।

১২. মজনু প্রামাণিক, পিতা : গহের প্রামাণিক, গ্রাম : মশিপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : গারিয়াল, বয়স : ৫৫ বছর, তারিখ : ২০.০৩.২০১২ সময় : সন্ধ্যা ৮.০০ টা।

www.pathagar.com

১৩. মো. করিম আলী খান, পিতা : আফাজ আলী খান, গ্রাম : বিলারিল, পোস্ট : কায়েমপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৫৬ বছর, সময় : রাত ৭.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।

১৪. আব্দুস সবুর আলী বয়াতি, গ্রাম : দূর্গাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কৃষিকাজ, সময় : রাত : ৮.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।

১৫. এস এম এ বারী, পিতা : মো. আবু বক্কার সরকার, গ্রাম : ব্রজবালা, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৬. শায়ান সরোয়ার অহন, পিতা : মো. গোলাম সরোয়ার, গ্রাম : ব্রজবালা, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, সংগ্রহের তারিখ : ১৩.০১.২০১৩।

১৭. শাহজাদপুরের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯।

১৮. মো. আশরাফ খন্দকার, গ্রাম: ধুবিল মেহমানশাহী, পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, পেশা : কৃষি, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, তারিখ : ০২.০৯.২০১১ইং, সময় : বিকাল ৩.০০।

১৯. মো. নজরুল ইসলাম, গ্রাম : হারনী, পো : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৭ বছর, পেশা : মুদি দোকানদার, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৮ম শ্রেণি, তারিখ : ০৩.০৯.২০১১ইং, সময় : সকাল ১০.০০।

২০. মো. আমিনুর ইসলাম, গ্রাম : হারন, পো : ঘুরকা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪২ বছর, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ০৩.০৯.২০১১ইং, সময় : দুপুর ১২.১৫।

২১. মো. রতন মল্লিক, গ্রাম : ধুবিল মেহমানশাহী, পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩১ বছর, পেশা : ভ্যানচালক, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, তারিখ : ০৪.০৯.২০১১ইং, সময় : সকাল ০৮.০০।

২২. মো. হাফিজুর রহমান, গ্রাম : কাটারমহল, পো : ধুবিল, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩৬ বছর, পেশা : ব্যবসা, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৩য় শ্রেণি, তারিখ : ০৪.০৯.২০১১ইং, সময় : ১১.৩০।

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

গ্রামে সাধারণ মানুষের মেধা ও জ্ঞানের ফসল হচ্ছে 'প্রবাদ'। পদ্য অথবা গদ্যাকারে প্রবাদের প্রকাশ ঘটতে পারে। সামাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জীবনের অতি মূল্যবান দিকগুলো অল্প কথায় ব্যক্ত করে। এতে চাতুর্য অপেক্ষা মেধার দিকটাই প্রাধান্য পায়। প্রবাদ ব্যবহৃত হয় কথার ছলে। সমাজে অধিক চাতুর্যকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। এর প্রমাণ–'অধিক চালাকের গলায় দড়ি' কথায়। কোনো কাজের শুরুতে ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বলতে শোনা যায় 'বিসমিল্লায় গলদ'। পরামর্শস্বরূপ উচ্চারিত হয়– 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। কাজ যথা সময়ে না করার ফলে যে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল থেকে বঞ্চিত হতে হয় সে সময় বলা হয়–'সময়ের এক ফোড়, অসময়ের দশ ফোড়' অথবা 'দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না'। ভালোমন্দ কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলে থাকে–'যেমন কর্ম তেমন ফল'। ক্ষমতা লাভের প্রত্যাশায় মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে শোনা যায়–'যে লঙ্কায় যায়, সে রাবণ হয়'। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর উদ্দেশ্যে বলতে শোনা যায়–'এক মাঘে শীত যায় না'। এরপরও যদি দেখা যায় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর পক্ষে কেউ ওকালতী করছে তখনই বলে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'। অপরাধের পরও উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করার ঘটনায় বলা হয়– ' চোরের মায়ের বড় গলা' অথবা 'চোরের সাক্ষী গাটকাটা'। সমাজের দৃষ্টিতে সৎ-অসৎ মানুষের বিচারের বাণী উচ্চারিত হয়–'সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'।

এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক চিন্তা করতে গিয়ে সমাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যত্র-তত্র যেসব প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে থাকেন শাহজাদপুর অঞ্চলের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও তা লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চল যে প্রবাদগুলি অহরহ শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো হলো–

১. ধরে মাছ না ছোঁয় পানি;
২. তেলের মাথায় তেল ঘষে;
৩. হায়রে মন তুই যে কেমন;
৪. মাছের তেলে মাছ ভাজা;
৫. নদীর জল ঘোলাও ভালো, জাতের মেয়ে কালোও ভালো;
৬. কয়লা ধুলে কি ময়লা যায় না;
৭. সতী মেয়ের খোপা অসতী মেয়ের চোপা;
৮. গাঙ দেখলে মোত আসে, নাঙ দেখলে হাস আসে;
৯. ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়;
১০. আসমানের চাঁদ হাতে পাওয়া;
১১. অতি দর্পে হত লঙ্কা;
১২. আপনি বাঁচলে বাপের নাম;

www.pathagar.com

১৩. আঙুল ফুলে কলাগাছ;
১৪. নিজে ভালো তো জগৎ ভালো;
১৫. উলুবনে মুক্তো ছাড়ানো;
১৬. শিয়াল বনে বাঘ রাজা;
১৭. ভেড়ার মধ্যে বাছুর পরামাণিক;
১৮. কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী;
১৯. কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা;
২০. কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটা;
২১. কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ;
২২. কানা গরু বামানকে দান;
২৩. উড়ো খই গোবিন্দয় নমো;
২৪. ঘুঘু দেখছো ঘুঘুর ফাঁদ দেখোনি;
২৫. ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো;
২৬. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল;
২৭. গরজ বড় বালাই;
২৮. চেনা বামনের পৈতা লাগে না;
২৯. জলে কুমির ডাঙ্গার বাঘ;
৩০. দশের লাঠি একের বোঝা;
৩১. ফ্যালো কড়ি মাখো তেল;
৩২. ব্যাল পাকলে কাকের কি;
৩৩. নাজতে না জানলে উঠান বাঁকা;
৩৪. প্যাটে খেলে পিঠে সয়;
৩৫. পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়;
৩৬. নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো;
৩৭. দুষ্টু গরুর চেয়ে খালি গোয়াল ভালো;
৩৮. ধরি মাছ না ছুঁই পানি;
৩৯. সাপের পাঁচ পা দেখা;
৪০. শক্তের ভক্ত নরমের যম;
৪১. যত গর্জে তত বর্ষে না;
৪২. যত ফরফরাইলো তত আইগলো না;
৪৩. মরা আত্তি লাখ ট্যাহা;
৪৪. হস্তার তিন অবস্থা;
৪৫. হাক দিয়ে মাছ ঢাহা;
৪৬. যমন কুকুর তমন মুগুর;
৪৭. অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করি;
৪৮. অনভ্যাসে বিদ্যা রাশ;
৪৯. কৃপনের ধন ঘুনে খায়;

www.pathagar.com

৫০. লাভের ঘু পিঁপড়ায় খায়;
৫১. অভাবে স্বভাব নষ্ট;
৫২. অতি লোভে তাতী নষ্ট;
৫৩. অন্ধের হাতী দেখা;
৫৪. গরীবের ঘোড়ার রোগ;
৫৫. রসুনে রসুনে এ্যাক, পেঁয়াজের ফ্যারকাটানি দ্যাখ;
৫৬. কঙ্কালের আবার বগলে পশম;
৫৭. অকম্যা নাপিতের ধামা ভরা খুদ;
৫৮. আম না পেয়ে আটি চোষা;
৫৯. আপন চড়কায় তেল দাও;
৬০. আঙ্গুর ফল টক;
৬১. আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবর নেওয়া;
৬২. অতি শাসনের মুরগী বাওআণ্ডা পাড়ে;
৬৩. তল দিয়া যায় তল দিয়া আসে, লাড়ার আগুন ধবধবায়া জ্বলে;
৬৪. আশি আর গুণানী, হব ভাই হোমানী;
৬৫. আদর দিয়া মাথা খাওয়া;
৬৬. নিজে হোয়ার জাগা পায় না, শঙ্করের মাক ডাকে;
৬৭. উড়ে এস জুড়ে বসা;
৬৮. এক হাতে তালি বাজে না;
৬৯. এক ঢিলে দুই পাখি মারা;
৭০. ওজন বুঝে মুনাই চাঁছা;
৭১. গরীবের কতা বাসী হলে কামে লাগে
৭২. কাঙালের কথা বাসী হলে কাজে লাগে;
৭৩. গাছে তুলে মই সরানো;
৭৪. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো;
৭৫. গাছে কাঁঠাল গোফে তেল;
৭৬. ভাঙ্গা পা খালে পড়ে;
৭৭. ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি;
৭৮. ঝিকে মেরে বউকে শেখানো;
৭৯. গরম ভাতে নুন জোটে না, পান্তা ভাতে ঘি;
৮০. তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠা;
৮১. দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা;
৮২. পুরানো চাল ভাতে বাড়ে;
৮৩. বারো হাত বাঙ্গির তোরো হাত বিচি;
৮৪. বারো মাসে তেরো পার্বণ;
৮৫. বানরের গলায় মুক্তর হার;
৮৬. বুক ফোটে তো মুখ ফোটে না;

www.pathagar.com

৮৭. ভাত ছিটালে কাকের অভাব হয় না;
৮৮. যত দোষ নন্দ ঘোষ;
৮৯. মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত;
৯০. মায়ের কাছে মামার বাড়ির গল্প;
৯১. মায়ের কাছে মাশির গপ্প;
৯২. ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগে না;
৯৩. যাহা বায়ান্ন তাহা তেপান্ন;
৯৪. উনিশ নয় বিশ, ষোল বিশ নয়;
৯৫. যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা;
৯৬. সুখে থাকতে ভুতে কিলায়;
৯৭. সুই হয়ে ঢোকা, ফাল হয়ে বাড়োনো;
৯৮. সাত রাজার ধন এক মাণিক;
৯৯. যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা;
১০০. ভণ্ড তপস্বে;
১০১. যায় দিন ভালো, আসে দিন মন্দ;
১০২. তীর্থের কাক;
১০৩. বুদ্ধির ঢেকি;
১০৪. মরার উপর খাড়ার ঘা;
১০৫. মুখে মধু অন্তরে বিষ;
১০৬. সুখের পায়রা;
১০৭. যে যেমন ধায়, সে তেমন পায়;
১০৮. যার মাথা তার ব্যথা;
১০৯. যেমন যা তেমন তা;
১১০. দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন;
১১১. ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান বানে;
১১২. যে গরু দুধ দেয় তার লাথিও ভালো লাগে;
১১৩. সরার কাছে থাকলে সরার বাও লাগে, চন্দনের কাছে থাকলে চন্দনের বাও লাগে;
১১৪. ভাজা মাছ উল্টায়ে খাওয়া না জানা।
১১৫. রথ দেখে কলা ব্যাচা;
১১৬. অল্প ট্যাহা যার ঘ্যাঘা বাগুন তার;
১১৭. নুন আনতে পান্তা ফুরায়;
১১৮. উপরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট;
১১৯. গাই বাছুরে মিল থাকলে দুধের অভাব হয় না।
১২০. কাতি গেল আগুন, আইলে বুড়া হো.........।
১২১. মাঘে বাঘ মরে, চৈত্রে গোরাস্তা হালের গরু বেঁচে চাদর কেনে।
১২২. কাতি বাঁধ গাতি আশ্বিন গাও করে শীন শীন পৌষে শীতে তুষ করে মাঘে বানের বাঘ মারে।

www.pathagar.com

১২৩. আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ।
১২৪. আক্কেল নয় হয় নাই নব্বইয়ে হইব।
১২৫. দুধে ধওয়া তুলসী পাতা।
১২৬. চারি মোড়া ফিট ফাট, ভেতরে সদর ঘাট।
১২৭. না বয় কালু কালা ঔজে আমার গলার মেলা।
১২৮. ধন দিয়া বাঘ মারব।
১২৯. না পায় নাতি ভাতার নাতি দেয় গাঙ্গে ছাড়ার।
১৩০. আমার আর সেই দিন নাই হাতা মোড়ে দিয়া হাগতে যাই।
১৩১. ভাতের উপর ব্যাঙ বান্দি কিলায় ঠ্যাং আমার চিতার কি দুঃখ।
১৩২. বড় নৌকা স্যাপটা ছোট নৌকা এক নৌকা।
১৩৩. বেহুলা তুই লক্ষীনদর পূর্বের কথা মনে কর।
১৩৪. কুঞ্চি ঐ পাড় না গু খাইছিলা।
১৩৫. শেয়াল ডাকে পাথরে রগ কাটে পাজরে, শেয়াল ডাকে জঙ্গলে রগ কাটি পাজরে।
১৩৬. কয় দিনকার বৈরাগী ভাতের কয় অন্ন।
১৩৭. উড়তে জানলে, পোষ-মানায় ভাল।
১৩৮. ঝিনাই দিয়া সমুদ্র সেঁচা।
১৩৯. যার মনে যা ফাল দিয়ে উঠে তাই।
১৪০. ভাসুর বিলাও মানি, মাছা ধইরাও টানি, মানলে তলে গাছ, না মানলে বলে গাছ।
১৪১. ছাইবার নাই যত, বইবার আছে তত।
১৪২. এমনি নাচানি বুড়ি, তার উপর ঢোলের বাড়ি।
১৪৩. ভাত দিয়া শাক ঢাকা
১৪৪. পঁচা শামুকে পা কাঁটা
১৪৫. কাঁচা কলা পাকা করা।
১৪৬. বৃক্ষের নাম কি ফলেই পরিচয়।
১৪৭. গোয়ালার দই দিয়া মণ্ডলের সালাম।
১৪৮. গোয়ালে গরু নাই মানিক পীরের ভয় নাই।
১৪৯. টাকা দিয়ে খাব দই, গোয়ালনী আমার কিসের সই।
১৫০. ম্যান ম্যান করে কলশা নারে, ঔ তো বাঘে মানুষ ধরে।
১৫১. সবতে ভদ্রলোক আধিকলে চারা, তাকে দিও গোয়াল ঘরে বাসা।
১৫২. পাইনা রা পান বেঁচে, কাইমারা ধান বেঁচে। বান্দি দাসি কথা কইব, তাকে দিব কান।
১৫৩. মনে করছে বাপের মাল, তাড়াতাড়ি ভইরা ফ্যালা।
১৫৪. গেরস্তের গরু, চোরে দড়ি পাঁকায়।
১৫৫. নাইরে নাউ যাইব, মহাজনের মাল বাইব, ভাগি বুঝির কি হইব।
১৫৬. গোয়ালে গরু নাই, মানিক চোরের ভাত নাই।

www.pathagar.com

১৫৭. গঙ্গার পানি ফোঙ্গার মধ্যে যায়।
১৫৮. আক্কেলের নাম চাষা, গোয়াল ঘরে তার বাসা।
১৫৯. উটানী নাই ফুটানী আছে, ভিতর বাড়ি নাই, বার বাড়ি আছে।

এমনি ধরনের আরো অসংখ্য প্রবাদ এ অঞ্চলের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করলে সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান তথ্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

প্রবাদে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ

ঝিনাই : ঝিঁনুক
গাঙ : নদী
ফ্যারকা : ফাঁকা
টানী : টেনে
ম্যান ম্যান : নরম স্বভাব
কলশা : কলসি
পাইনা : পান বেচে যারা তাদের বলা হয়
কাইমারা : যারা ধান বেচে
ভইরা : ভরে
ফ্যালা : ফেলানো
আত্তি : হাতী
উটনী : পুঁজি নাই
ফুটানী : ঢং আছে
ছাইবার : ছাড়বে/ছাড়া
বইবার : বইতে/বহন করা
ভাসুর বিলা : ভাসুরকে
মাজা : কোমর
চারি মোড়া : চারদিকে
ভাতার : স্বামী
মোড়া : নিয়ে
হাগতে : পায়খানায়
কুঞ্চি : বাঁশের শাখা প্রশাখা বিশেষ
ব্যাল : বেল
প্যাট : পেট
হোয়া : শোয়া বা শুয়ে থাকা

তথ্য নির্দেশ

১. মো. হারুন রশিদ সরকার, পিতা মৃত ইব্রাহীম সরকার, গ্রাম : চেংটিয়া, ডাকঘর : ধরইল হাট, উপজেলা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, স্থান : নিজ দোকান, বয়স : '৭৫ বছর, তারিখ : ২১/০১/১২, সময় : রাত ৯ ঘটিকা।

www.pathagar.com

২. মোছা. আনোয়ারা খাতুন, স্বামী মৃত রমজান আলী, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বছর, পেশা : গৃহিণী।
৩. মো. আমজাদ আলী মন্ডল, পিতা : মৃত মেছের আলী মন্ডল, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬৫ বছর, পেশা : কৃষক।
৪. মো. জহুরুল ইসলাম (বচ্চু), পিতা : হাজী তোরাপ উদ্দিন সরকার, গ্রাম : ব্রজবালা কুঠির পাড়া, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৪৫ বছর, পেশা : ব্যবসায়ী।
৫. জাহের উদ্দিন, গ্রাম : মশিপুর, পোস্ট : শরিষাকোল, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৬২ বছর।
৬. আজির উদ্দিন, গ্রাম : হরিরামপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, তারিখ : ১২.০৩.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৭.২০ টা।
৭. মো. মানিক চান, পিতা : মোঃ আবদুল ওয়াহাব, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : অষ্টম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি।
৮. মো. আবদুল ওয়াহাব, পিতা : মো. জয়নাল আবেদীন, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি।
৯. মো. সোনা উল্লা, পিতা : মৃত. মো. মজিবর মোলা, গ্রাম : ইসলামপুর, পোস্ট : বালসাবাড়ি, থানা : উল্লাপাড়া, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩৫ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা : নবম শ্রেণি পাশ। পেশা : তাঁতি।
১০. মো. গোলজার হোসেন, গ্রাম : দূর্গাপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সাবেক ইউপি সদস্য, বয়স : ৬৫ বছর।
১১. মো. কাশেম আলী, গ্রাম : হরিরামাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : কৃষি কাজ, বয়স : ৭৫ বছর।
১২. মজনু প্রামাণিক, পিতা : গহের প্রামাণিক, গ্রাম : মশিপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : গারিয়াল, বয়স : ৫৫ বছর।
১৩. মো. করিম আলী খান, পিতা : আফাজ আলী খান, গ্রাম : বিলারিল, পোস্ট : কায়েমপুর, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, পেশা : কৃষিকাজ, বয়স : ৫৬ বছর।
১৪. আব্দুস সবুর আলী বয়াতি, গ্রাম : দূর্গাপুর, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর, পেশা : কৃষিকাজ, সময় : রাত : ৭.৩০, স্থান : হরিরামপুর বাজার।
১৫. এস এম এ বারী, পিতা : মোঃ আবু বক্কার সরকার, গ্রাম : ব্রজবালা, পোস্ট : তালগাছি, থানা : শাহজাদপুর, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, পেশা : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।
১৬. শাহজাদপুরের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, বিশ্বসাহিত্য ভবন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০০৯।

www.pathagar.com

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

বিশ্বাস আর ক্রিয়া অনুষ্ঠানের সংমিশ্রিত রূপ হলো লোকাচার। অদৃশ্য কোনো বস্তুর অস্তিত্বের ফল স্বরূপ শুভ, অশুভ বোধ থেকেই মূলত লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের উদ্ভব। যেহেতু এ সকল বিষয়গুলো মানুষের মনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, তাই সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শুধুমাত্র যে গ্রামের/গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এরূপ প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা গেলেও শহরের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিদ্যমান। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তারা বলছে যে এ গুলো আগের দিনের মানুষ বেশি পালন করতো, কিন্তু তাদের অসচেতন বা সহজাত অবস্থা থেকেই এ সকল আচার আচরণ আত্মস্থ করছে এবং তা পালন করছে। নিম্নে লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও বিবিধ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো–

মানত

যে নারীর সন্তান হয় না কিংবা সন্তান বেঁচে থাকে না, সেই সকল নারীরা মানত করে থাকে। মুসলমান সমাজে বিভিন্ন পীর ফকিরের কাছে যায় পানিপড়া, তাবিজ-কবচ ইত্যাদি নিয়ে থাকে। আবার অনেক সময় টাকা, কয়েকজন ফকিরকে খাওয়ানো অথবা রোজা রাখা হয়। একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া, না পাওয়ার উপর মানত নির্ভর করে না, তা অবশ্যই পালনীয়। স্থানীয় লোকজন মানতকে বলে মানসিত।

হিন্দু সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ভিন্নতর। মূলত সন্তান না হওয়া কিংবা সন্তানের অসুস্থ হলে বাবা-মা উভয়ে মানত করে থাকে কিন্তু দেখা যায় যে, মা এই সকল আচারগুলো বেশি পালন করে থাকে। মূলত সেদিন মানত কার্য সম্পাদন করা হবে সেই দিন নারী/মাকে উপবাস থাকতে হয়। কালিকে পাঠা বলি দিতে হয়। এক্ষেত্রে লগ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকালে উঠে গোসল করে পূজা দেয়া হয়। তারপর মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যে খাসিকে বলি দিয়ে দেয়া হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এসকল কাজ সম্পূর্ণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নারী/মা কিছুই মুখে দিবে না। এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে মানত করা যায় কিন্তু সে ক্ষেত্রেও নারীকে ও তার সাথে সাথে উপবাস থাকতেই হবে। এজন্য দেখা গেছে নারীরাই বেশি পালন করে থাকে।

গর্ভে সন্তান আসার পর যদি কেউ পুত্র সন্তান চায় তবে তাকে কঠোর নিয়ম মানতে হয়। বিশেষ করে তাবিচ-কবজ নিতে হয়, এছাড়া দোয়া ও নামাজ পড়তে হয়।[১]

পঞ্চামৃত

প্রথম গর্ভবতীর বেলায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। মূলত পাঁচ মাসে এ লোকাচারটি পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে পাঁচ পোয়া দুধ, পাঁচ ছটাক চিনি ও এক মুঠো চাল দিয়ে

www.pathagar.com

মিষ্টি (পায়েশ) রান্না করা হয়। সেই দিন যে রান্না করবে তাকে অবশ্যই পাক পবিত্র হতে হবে। যার সন্তান হয় না কিংবা যার সন্তান মারা গেছে এরূপ নারী রান্না করতে পারে না। এতে অশুভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রান্নার যাবতীয় উপকরণ অবশ্যই নতুন হতে হবে। মিষ্টি রান্না হওয়ার পর সেটা বড় একটা কাঁসার থালে রাখতে হবে, যদি মিষ্টি ঢেলে রাখার পর ঠান্ডা হওয়ার পর যদি ফেঁটে যায়, তবে তার মেয়ে সন্তান হবে। এরপর প্রসূতিকে নতুন কাপড় পরিয়ে আসনে বসতে দেয়া হয়। তার সামনে আম্রপলব ঘট, ধান, দূর্বা, ইত্যাদি জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো হয়। এরপর পাঁচ জন আয়ো ও একটি ছেলে ও মেয়ে সন্তান তার পাশে থাকে। প্রথমে পাঁচটি ধান ও দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে ঐ ছোট ছেলে ও মেয়ে তিনবার করে মিষ্টি প্রসূতির মুখে তুলে দিবে। পর্যায়ক্রমে আয়োরা প্রসূতিকে খাবার তুলে দিবে এবং নিজেরা খাবে। একেবারে শেষে খানার এক পাশে মিষ্টান্ন রাখা হয়। সেটি আবার পানি ঢেলে দিয়ে খাসের উপর ফেলতে হয়, এতে বিশ্বাস প্রসূতির সন্তান হতে কষ্ট হবে না। এরপর একটি কাঠা বা সবার নিচে শিল ও মুস্‌কা (প্রদীপ) হলুদ মিশ্রিত কাপড় দিয়ে পেঁচানো থাকে, প্রসূতিকে বলা হয় কোনটি নিবে, যদি সে একটি কাঠার মধ্যে শিলে উঠায় তবে তার ছেলে হবে। এজন্য বেশিরভাগ গর্ভবতী নারীর আশা তার যেন পুত্র সন্তান হয়। এরপর গর্ভবতী মাকে লবঙ্গ, আদা, এলাচ দিয়ে পান খেতে দেয়া হয়, মুখ লাল হলে সন্তানের ঠোঁটও লাল হবে। সবিভক্ষণের আগে পর্যন্ত প্রসূতিকে উপবাস থাকতে হয় এবং ভাত খাওয়া যায় না। এছাড়া সাত মাসে সবিভক্ষণ ও নয় মাসে নয়াশা পালন করা হয়।[২]

নয়াশা

অবশ্যই সাধ দিতে হবে। রবিবার ও বৃহস্পতিবার শুক্রবারে এই অনুষ্ঠান করা হয়। এটাকে ঘরের সাধ বলা হয়। সেই দিন মা সাধ রান্না করে লুচি কিংবা মুড়ি দিয়ে প্রসূতিকে খেতে দেয়। সাধ (মিষ্টি/পায়েশ) রান্না করার পর একবারে কাঁসার থালায় ঢালতে হবে, এতে সন্তান প্রসব হতে কোনো অসুবিধা/কষ্ট কম হয়।[৩]

আজান দেওয়া

সন্তান প্রসব হওয়ার পর আজান দেয়া হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে তিনবার করে জোরে আজান দেয়া হয়। আর মেয়ে শিশুর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আকামত দেয়া হয়। হিন্দু পরিবারে ছেলে হয়ে পাঁচ বার ও মেয়েদের ক্ষেত্রে তিনবার উলু ধ্বনি দেয়া হয়।

কন্যা সন্তান হবার পর একটা লোকাচার পালন করা হয়, সেটি হলো প্রতিবেশীর বাড়িতে পান ও মিষ্টি দেয়া হয়। পান হলো যৌনতার প্রতীক।[৪]

আঁতুড় ঘরের আচার

যে ঘরে গর্ভবতী সন্তান প্রসব করে সে ঘরকে আঁচি ঘর (আঁতুর ঘর) বলে। আঁতুর ঘরে শিশুর নাড়ি কাটা হয় এবং শিশুর নিরাপত্তার জন্য নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এ ঘরে মা ও শিশুকে অতি যত্নে রাখা হয়। প্রসূতি ও নবজাতকের উপর যাতে ভূত, প্রেত, রোগব্যাধি ও ডাইনি প্রকৃতির মন্দ লোকের নজর না পড়ে, সেজন্য বিভিন্ন লোকাচার পালন করা হয়। যেমন তুষ জ্বালিয়ে ধোয়া করে রাখা হয়, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে রাখা হয়,

www.pathagar.com

হলুদ, লোহা, ম্যাচ রেখে দেয়া হয়। আবার অনেক সময় আঁতুড় ঘরে দরজায় বেতের কিংবা কাঁটা দিয়ে দেয়া হয়, বিশ্বাস করা হয়- মা বাইরে গেলে তার সাথে লোহা ও আগুন নিতে হয়। কেউ বাইরে থেকে ঘরে ঢুকলে আগুনে হাত পা সেঁকে ঘরে প্রবেশ করতে হয়। সন্তানের ছয় দিন সেদিন রাতে তার মাথার কাছে খাতা-কলম রাখা হয়, বিশ্বাস করা হয় সেদিন তার ভাগ্য লেখা হয়। সেইদিন সারারাত মা সন্তানের পাশে জেগে থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ওই লোকাচার প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে ছয় দিনে ষষ্ঠী হয়। সেইদিন কুলার মধ্যে ধান, কালো ও লাল সুতা, প্রদীপ, ১৬টি কলা, মাটির ঘট, আমেশ্বর, সোনার অলংকার দেয়া হয়। দুটি মাটির পুতুল তৈরি করে সিঁদুর দিয়ে কুলার মধ্যে রাখা হয়। সেইদিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় যাকে আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় কামানী দেয়া। সেই দিন প্রসূতি মাকে ছয় তরকারি দিয়ে সবজি খেতে দিতে হয়। হিন্দুদের মধ্যে নয় দিনে, ২০দিনে এবং ছেলে হলে ৩০ দিনে ও মেয়ে হলে ৩১ দিনে কামানী দিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়। সেই দিন প্রথম প্রসূতি পাক পবিত্র হয়ে পূজা করে থাকে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পাঁচ দিনে, সাত দিনে, দশ দিনে, বিশ দিন ও ৪০ দিনে কামানী দেয়া হয়। সেই দিন প্রসূতিকে আঁতুড় ঘর থেকে ঘরে তোলা হয়। যদি পুত্র সন্তান হয় তবে ৬ দিন আঁতুড় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয়।[৫]

মুখে ভাত

এই লোকাচারটি মূলত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পালন করা হয়। পাঁচ মাসে, সাত মাসে ও এগারো মাসে এ আচারটি পালন করা হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে পাঁচ মাসে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সাত মাসে অন্নপ্রসন করে থাকে। সেই সকাল থেকে বাবা ও মাকে উপবাস থাকতে হয়। সেইদিন পিঁড়ির উপর বসিয়ে তেল, হলুদ দিয়ে স্নান করে দেয়। পোশাক পরিয়ে মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান হয় দুপুরে। ধান দূর্বা দিয়ে আশীবাদ করে উলু ধ্বনি দেয়া হয়। সর্বপ্রথম মুখে ভাত দেয় জেঠা বা কাকা কিংবা দাদু। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বড় জ্যেষ্ঠ কোনো পুরুষ আশীর্বাদ করে। মুখে অন্ন তুলে দেয়। এরপর পর্যায়ক্রমে সকল আত্মীয় স্বজন সন্তানকে টাকা, উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। সেইদিন নিরামিষ খাওয়া হয়। আবার পরের দিন হয় মামার বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়। যা পূর্বের দিনের মতোই আয়োজন করা হয়।[৬]

মইল্যা ভাঙ্গা

শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নাড়ি কাটার আগেই কান ফুটো করে দেয়া হয়। এতে পরপর যদি সন্তান মারা যায় তখন এই আচারটি পালন করা হয়। নারী ও পুরুষের উভয় মধ্যে এই লোকাচার এখনও প্রচলিত। সাধারণত সন্তানকে খুঁত করে দিলে দৈব শক্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এজন্য সন্তান মারা যায় না।[৭]

পাত্র-পাত্রী নির্বাচন

হিন্দু মুসলিমদের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের সময় বরপক্ষ মেয়ের বাড়িতে এসে কন্যা দেখে যায়। যেখানে বিভিন্ন ধরনের দেখা শোনার পর পনের টাকা ঠিক হয়। বিশেষ করে হিন্দু রীতি-নীতিতে। তারপর আশীর্বাদ করা হয় পান, মিষ্টি এবং সঙ্গে সোনার

www.pathagar.com

আংটি দেয়া হয়। এভাবে পাকা কথা দিয়ে আসা হয়। মুলসমানের পর্দানশীল ও হিন্দুদের মধ্যে নম্র, ভদ্র নারীকে প্রাধান্য দেয়া হয়।[৮]

গায়ে হলুদ

বাংলার হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে সকল পরিবারের বিবাহে গায়ে হলুদ দেয়া হয়। ছেলে মেয়ে উভয় পরিবারে এ লোকাচারটি পালন করা হয়। কণের বাড়িতে সাধারণত হলুদের আয়োজন করা হয়। প্রথমে আয়োরা পিঁড়িতে সাজিয়ে হলুদ, টাকা, দূর্বা, কুলা বা চালুন তৈরি করে। তারপর বর অথবা কন্যার নানী, দাদী কিংবা দুলাভাই সম্পর্কিত স্বজন কোলে করে পিঁড়িতে বসায়। তারপর আয়োরা হলুদ মাখিয়ে গোসল করে দেয়া হয়। এরপর বিকেল বেলায় হলুদ সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে সর্বপ্রথম ছেলে অথরা মেয়েকে পিতা, দাদা অথবা নানা তুল্য ব্যক্তিবর্গ প্রথমে হলুদ দেয়, তারপর পর্যায়ক্রমে সকলে হলুদ দেয়। হলুদ লোকাচারটি শেষ হওয়ার পর বিয়ের তিনদিন পর্যন্ত ঐ পাটিতে বসে থাকতে হয়। কোনো অবিবাহিত কন্যা ঐ পাটিতে বসাকে অলক্ষণ বলে মনে করে। অনেক সময় মেয়ের বাড়ি থেকে পুত্রের বাড়িতে এবং পুত্রের বাড়ি থেকে মেয়ের বাড়িতে হলুদ দিতে আসে। তখন পান ও মিষ্টি অবশ্যই আনতে হয়। এভাবে গয়ে হলুদ লোকাচারটি পালিত হয়।[৯]

বিবাহ

বিবাহের স্থায়িত্ব এবং ভাঙন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্রমাগত অধিকহারে নগরায়ণ এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত প্রথা ও মূল্যবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়। বেশির ভাগ পুরুষ ৩৫ বছর এবং মহিলা ২৫ বছর বয়সের আগেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আইসিডিডিআরবি-এর ১৯৯৬ সালের এক উপাত্তে জানা যায় বাংলাদেশে ১৪ বছর বয়সের পূর্বে বিয়ের ঘটনা একেবারে নেই বললেই চলে। এই জনসংখ্যাকে নিয়মিত জনমিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল। এদেশের গ্রামে মেয়েদের গড় বিয়ের বয়স ১৯৭৫ সালে ১৬.৬ বছর থেকে ১৯৯২ সালে ২০.৮ বছরে উন্নীত হয়েছে। এই পরিসংখ্যান বাংলাদেশে বিয়ের বয়স বৃদ্ধির একটি প্রবণতা নির্দেশ করে। এর ফলে যুবকরা অধিক হারে লেখাপড়া এবং শ্রমবাজারে প্রবেশসহ পারিবারিক আওতার বাইরের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। ক্রমাগত অর্থনৈতিক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ছেলের পিতারা অপ্রাপ্তবয়স্ক বা নাবালিকা বধূ ঘরে আনার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। বরং তারা এখন প্রাপ্তবয়স্ক বা সাবালিকা বধূ ঘরে আনতে বেশি আগ্রহী, যাতে করে তারা কোনোরকম বিলম্ব না করেই সাংসারিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারে।

মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের মধ্যে প্রথাগত বিয়ের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে : ১. ছেলে পক্ষ বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করবে; ২. বিবাহ সাধারণত কনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে এবং ৩. পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন বা বর-কনের পরিচিতজনেরা বিবাহের আয়োজন করবে। মুসলিম ও হিন্দু বিয়ের মধ্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। মুসলমানদের মধ্যে বরের অথবা তার পরিবার কর্তৃক নির্দিষ্ট শর্তে কনেকে মোহর বা নির্ধারিত পরিমাণ টাকা অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। কাবিননামায়

www.pathagar.com

স্পষ্টভাবে মোহরের অঙ্ক লেখা থাকে। মোহর নির্ধারণের সময় কনেপক্ষ সাধারণত বড় ধরনের অঙ্ক দাবি করে। আর এই দাবির ক্ষেত্রে কনের অন্যান্য বিবাহিতা বোন বা আত্মীয়াদের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে বরপক্ষ নির্ধারণী ভূমিকা পালন করে থাকে। মোহরের অঙ্ককে সাধারণত দুইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে- নগদ ও বাকি। নগদ হিসেবে ঘোষিত অঙ্ক সাধারণত বরপক্ষ কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত স্বর্ণালঙ্কারের মূল্যবাবদ পরিশোধকৃত বলে ধরা হয়। বাকি অংশ পরবর্তীতে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পরিশোধ করতে হয়। হিন্দু বিবাহে বর কনের পিতাকে পণ দেয়। পণের ক্ষেত্রে বিয়ের সময় পুরো টাকা পরিশোধ করতে হয়।

মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ বা নিকাহ একটি চুক্তি। সন্তানের জন্মদান ও তাদের বৈধতা প্রদানই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। সুস্থ মনের যে কোন মুসলমান ১৮ বছর পূর্ণ হলে সাবালকত্ব অর্জন বা বয়োপ্রাপ্ত হবার পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে। বাংলাদেশে নিয়মিত জন্ম নিবন্ধনের অনুপস্থিতিতে সরকার অনুমোদিত কাজীর নিকট বিয়ে নিবন্ধের সময় বর কনের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর লেখার রীতি প্রচলিত আছে। বিবাহ নিবন্ধন আইনের চোখে অবশ্য পালনীয়। কিন্তু জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয়। সামান্য ফি প্রদানের মাধ্যমে একজন বাংলাদেশী যে কোনো সময় জন্মের সনদপত্র নিতে পারে।

মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে একজন মওলানা বিবাহ পড়ান এবং কাজী তা রেজিস্ট্রি করেন। অনেক সময় কাজী মাওলানার দায়িত্বও পালন করে থাকেন। মাওলানা পাত্রীর মতামত গ্রহণের জন্য একজন ব্যক্তিকে উকিল হিসেবে নিযুক্ত করেন। উকিল পাত্রীর আত্মীয় ও বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তির সম্মুখে তার মত শোনেন। হিন্দু বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানাদি একজন পুরোহিত দ্বারা সম্পন্ন করা হয়। হিন্দু বিবাহ একটি ধর্মীয় আচার বা আধ্যাত্মিক বিষয় এবং এজন্য কোন আনুষ্ঠানিক লিখিতরূপের প্রয়োজন পড়ে না।

হিন্দু বিবাহ উৎসবের ৬টি অঙ্গ আছে। সেগুলি ৪ দিনে অনুষ্ঠিত হয় : ১. গায়ে হলুদ : বিবাহ আরম্ভের শুভদিনের প্রাক্কালে শরীরে হলুদ মাখানো হয়; ২. বিবাহ বা সম্প্রদান বা সম্পূর্ণ দান : প্রথম দিনে শুভক্ষণে (সাধারণত মধ্যরাতের পর) সম্পন্ন হয়; ৩. বাসি বিবাহ : দ্বিতীয় দিন সকালে করা হয়; ৪. উত্তর বিবাহ : দ্বিতীয় দিনে হয়; ৫. পাক স্পর্শ বা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর রান্না করা খাবার গ্রহণ : বিবাহের তৃতীয় দিনে করা হয়; ৬. পুনর্বিবাহ : তৃতীয় দিনে অথবা কনের যদি বিয়ের পূর্বে প্রথম ঋতুস্রাব না হয় তাহলে তার প্রথম ঋতুস্রাবের পর অনুষ্ঠিত হয়। এতসব অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে একটি নতুন পরিবারের সৃষ্টি হয়।

উপর্যুক্ত ৬টি উপকরণের মধ্যে ২টি পরিবর্তিত আকারে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত। এ দুটি হচ্ছে বিবাহের পূর্বে শরীরে হলুদ মাখানো (গায়ে হলুদ) হয় এবং কোনোপ্রকার শুভদিনের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রথম দিনে বিয়ের কাজ সম্পন্ন হয়। অবশ্য বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের নানা বিধান এবং প্রচলিত প্রথার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর বংশ ও পরিবারের একজন সদস্য হয়ে যায়। বিয়ের পূর্বপর্যন্ত কন্যা পিতার বংশের সদস্য থাকে। বিবাহ ও আত্মীয়তা কর্পোরেট গ্রুপ সংগঠনের মতো। এখানে প্রচলিত মনোভাব ও প্রত্যাশা, বিভিন্ন দ্রব্য বিনিময়-অধিকার, সম্পত্তি ও জ্ঞান সঞ্চালন ইত্যাদি হয়ে থাকে। বিয়ের পর একজন মুসলমান মহিলা দ্বৈতগোষ্ঠী সদস্যপদ অর্জন করে। যদিও সে এবং তার সন্তানরা যৌথগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে পিতার গৃহে গমনের সময় উপহার পেয়ে থাকে। সে তার পিতৃগোষ্ঠীতে উত্তরাধিকার ও আশ্রয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে। হিন্দু মহিলার বিয়ের পর পিতৃগোষ্ঠীর সদস্যপদ থাকে না। স্বামীর গৃহে আসার পর সে স্বামীর গোষ্ঠীর সদস্য হয়ে যায়। বাংলাদেশে বিবাহ সম্পর্ক প্রায়শই গ্রামের বাইরে হয়ে থাকে। কারণ এর ফলে নতুন নতুন মানুষ আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়। বিবাহের দ্বারা বৃহৎ আত্মীয় সৃষ্টির মাধ্যমে কোনো পরিবার সামাজিক ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। যদি কোন প্রভাবশালী পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে পরিবারের সদস্যরা গর্বের সঙ্গে তা উল্লেখ করে থাকে এবং অন্যান্য গ্রামবাসীর চোখে তাদের মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পায়।

যদিও যৌতুক আদান-প্রদান আইনত নিষিদ্ধ তবু মুসলিম বিবাহ ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ প্রথা। বর বা তার অভিভাবকগণ যৌতুক দাবি করে থাকে। পূর্বে হিন্দুদের মধ্যে পণের বিয়ে বা কনে ক্রয়ের প্রচলন ছিল। গত কয়েক দশকে পণের বিয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তার স্থান দখল করেছে বর কর্তৃক মোটা অঙ্কের যৌতুকের দাবি। এক দশক আগেও কিছু কিছু হিন্দু পরিবারে আরেক ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল যাকে দানের বিয়ে বলা হতো। দানের বিয়েতে কনের পিতা বিয়ের সব খরচ বহন করত এবং ছেলের পক্ষ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করত না। কিন্তু এখন হিন্দু বিবাহে যৌতুক দাবির প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে প্রায় সব বিয়ের পূর্বেই বরের পক্ষ থেকে একটি যৌতুকের চাহিদাপত্র কন্যার পিতার কাছে পাঠানো হয়। এ ধরনের দাবি অনেক সময় কন্যার পিতাকে ঋণগ্রস্ত করে। মেয়ে যদি দেখতে সুন্দরী হয় তাহলে দাবির পরিমাণ কম হয়। ছেলের ক্ষেত্রে তার আয়ের উৎস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতীতে যখন পণের বিয়ে প্রচলিত ছিল, তখন জেলে, কুমার, পাটিয়াল, গোয়ালা পরিবারের কনেদের তাদের স্ব স্ব ঐতিহ্যগত পেশায় কৌশলগত দক্ষতার কারণে পণের পরিমাণ বেশি ছিল। তখন পণের বিবাহ অনুষ্ঠান সাধারণত বরের পিতার বাড়িতে অনুষ্ঠিত হতো। কনের মূল্য এবং বিবাহের অন্যান্য খরচ বহনের দায়-দায়িত্ব ছিল বরের পিতার।

সাধারণত কনেকে পণের টাকা, উপহার, কাপড়-চোপড় ও গহনাপত্র পরিশোধ করে প্রকৃত বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য বরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো। বর্তমানে, বরকে কনের পিতাকে টাকা দিতে হয় এবং বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা কনের পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু বিয়ে কনের পিতার আর্থিক অনটনের কারণে বরের পিত্রালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ ধরনের বিবাহকে আক্ষরিক অর্থে 'তোলা' বিয়ে বলে।

www.pathagar.com

অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিভাবকরাই বিবাহ নির্ধারণ করেন এবং পাত্রীর সঙ্গে প্রায় সময় কোনো আলোচনাই করা হয় না। বর নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার বয়স, পারিবরিক অবস্থা, আর্থিক ভিত্তি, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। তবে কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারিবারিক আয়-উপার্জনের শর্তটির চেয়ে তার সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও বয়সই বেশি প্রাধান্য পায়।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে কিছু নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ নিষেধাজ্ঞা কেউ অন্যথা করলে তাকে সমাজ থেকে বহিষ্কারের সম্ভাবনা থাকে। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে বিয়ের নিষেধাজ্ঞা আছে। একজন ব্যক্তি; ১. তার মা বা দাদি-নানি বা বংশের এ ধরনের ঊর্ধ্বগামী সদস্য; ২. তার কন্যা, নাতনি বা বংশের এ ধরনের নিম্নগামী প্রজন্ম; ৩. তার আপন অথবা সৎ বোন; ৪. তার ভাতিজি/ ভাগ্নী অথবা তাদের কন্যা অথবা বংশের এ ধরনের নিম্নগামী প্রজন্মের সদস্য; ৫. চাচী/ মামী অথবা তাদের মা অথবা বংশের এ ধরনের ঊর্ধ্বগামী প্রজন্মের সদস্য। হিন্দুদের মধ্যে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা রীতি প্রচলিত।

হিন্দুর মধ্যে আত্মীয়স্বজনের বিবাহ-সংক্রান্ত বিধি অনুসারে কোনো ব্যক্তি তার পিতৃপরিবারের কোনো সদস্য, মায়ের অথবা মায়ের চাচাতো বোনের সন্তান, পিতার বোনের সন্তান, পিতার চাচাতো বোনের সন্তানকে বিয়ে করতে পারবে না। সকল বর্ণের মধ্যেই চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ বিশেষভাবে অনুৎসাহিত করা হয়, এমনকি তাদের মধ্যে দুই-তিন পুরুষের ব্যবধান থাকলেও।

মুসলমান বিবাহ আইন অনুসারে, একজন ব্যক্তি সমান্তরাল চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো, ভাইবোনকে বিবাহ করতে পারে। সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হয় না।

স্ত্রী যতদিন পর্যন্ত দাম্পত্য জীবনযাপনে সক্ষম থাকবে, স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে স্বীকৃত আদেশ প্রতিপালন করবে ততদিন স্বামী তার ভরণপোষণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। তবে সে তার স্ত্রীর ভরণপোষণ করবে না যদি স্ত্রী নিজেই স্বামীকে অস্বীকার করে বা অন্যভাবে অবাধ্য হয়। নগদ মোহরানা প্রদানের ক্ষেত্রে বা স্বামীর নিষ্ঠুরতার কারণে যদি স্ত্রী স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে তাহলে এ ধরনের ঘটনা যুক্তিসঙ্গত বলে ধরে নেওয়া হয়। স্বামীরা প্রায়শই স্ত্রীর নিকট থেকে সার্বক্ষণিক বাধ্যতা দাবি করে থাকে এবং স্ত্রীর নিজস্ব কোনো মতামত বিবেচনায় না এনে তার ওপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী সর্বদাই কর্তৃত্বকারী ব্যক্তি। স্ত্রী স্বামীকে ধর্মীয় দায়িত্ব হিসেবে শ্রদ্ধা, বিনয় ও সেবা প্রদান করে।

কিছু কিছু বিয়ে যাকে ঘরজামাই বলে, সেক্ষেত্রে বর স্থায়িভাবে শ্বশুর বাড়িতে চলে এসে বসবাস করে। মুসলমানদের মধ্যে এটা দেখা যায় তবে খুব বেশি নয়। হিন্দুদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহ খুবই বিরল ঘটনা। ঘরজামাই-এর স্ত্রী যদি সন্তানাদি জন্মাবার আগেই মারা যায় তাহলে জামাইকে তার আসল বাড়িতে ফিরে যেতে হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শ্বশুর তাকে তাদের পরিবারের সদস্য হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবারের মধ্যে থেকে তার পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করে।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সালে সংশোধিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে একজন বিবাহিত পুরুষ স্ত্রীর লিখিত অনুমতি সাপেক্ষে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে। তবে এ আইন সর্বদা মান্য করা হয় না। কেননা শরিয়া আইন অনুযায়ী একজন মুসলমান পুরুষ ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে।

হিন্দুদের ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো আইনগত সুযোগ না থাকলেও বনিবনা না হলে স্বামী-স্ত্রী আলাদা হয়ে যেতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তালাকের মাধ্যমে। যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থমনের পুরুষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে ইচ্ছে করলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদ মৌখিকভাবে অথবা লিখিত হতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের লিখিত দলিলকে তালাকনামা বলে। কাবিননামায় যদি কনেকে তালাক প্রদানের অধিকার দেওয়া হয় তাহলে সে নিজে স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছেদ নিতে পারে। বিবাহ বিচ্ছেদের কয়েকটি কারণ রয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বামী কর্তৃক দ্বিতীয় বিয়ে, সন্তান জন্মদানে অপারগতা, যৌতুক পরিশোধ না করা, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের হাতে স্ত্রীর নির্যাতন প্রভৃতি।

বিবাহ বিচ্ছেদের পর বেশির ভাগ মহিলাই তাদের পিতামাতার বাড়িতে চলে যায় এবং তাদের পোষ্য হিসেবে জীবনযাপন করে। তদুপরি পুনর্বিবাহের বিধান থাকলেও তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য পুনরায় পাত্র পাওয়া দুরূহ হয়ে ওঠে।

কোনো বিচ্ছেদপ্রাপ্ত স্বামী-স্ত্রী পুনরায় মিলিত হতে চাইলে স্ত্রীকে স্বামীর দূর সম্পর্কের বয়স্ক কারো সঙ্গে বা অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হয়। এ ধরনের বিয়েতে সেই মহিলা তিনমাস তিন দিন পর তালাক পায় এবং পুনরায় তার পূর্বের স্বামীকে বিয়ে করতে পারে। স্থানীয়ভাবে এ ধরনের বিয়েকে হিল্লা বিয়ে বলে। প্রকৃতপক্ষে, এই ব্যবস্থা দ্বারা স্ত্রী ও স্বামীকে বিবাহ-বিচ্ছেদে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং যে কোন দাম্পত্য সংকট নিরসনে বিচ্ছেদের পরিবর্তে পারস্পরিক সমঝোতা বা ভিন্নতর উপায় গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে থাকে।[১০]

কন্যা সম্পাদন

বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলে বরকে অন্দর মহলে আনা হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে বর এবং কনেকে পাটির উপর কিংবা আসনে বসানো হয়। কন্যার দাদী, নানী ও ভাবি সম্পর্কের আত্মীয়রা প্রথমে দুধ খাওয়ায় সেটা অবশ্যই পুরুষ আগে খাবে এবং পরে কনে খাবে। মিষ্টি কিংবা মিষ্টান্ন খাওয়ানো হয়। আবার কন্যাকে বরের বামপাশে বসানো হয়। কন্যার হাত বরের হাতে কন্যা মিষ্টি খায়। তার পিতা কন্যাকে জামাতার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করে।[১১]

কন্যা বিদায়

কন্যা যখন বিবাহের পর প্রথম পিতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুর বাড়ি যাত্রা করে; তার পূর্বে এই আচার পালন করে। হিন্দু বিবাহে প্রথম স্বামী গৃহে যাত্রার প্রাক্কালে কনে ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় নেমেই মাথার উপর দিয়ে ইঁদুরের মাটি ও কিছু চাল মায়ের আঁচলে

www.pathagar.com

ফেলে দিয়ে বলে, "এতদিন যা খেয়ে ছিলাম, সব দিয়ে গেলা"। এভাবে বিদায় পর্ব সমাপ্তি ঘটে।[১২]

কালরাত্রি

বিবাহের দ্বিতীয় দিনের রাত্রিকে কালরাত বলা হয়। এই রাত্রে নববধূর মধ্যে দেখাশোনা হয় না। লোকবিশ্বাস, এই রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখাশোনা হলে বধূর জীবনে দূর্ভোগ নেমে আসে।

বধূবরণ

কনের বাড়িতে যেমন বর বরণ করা হয়, তেমনি বধূবরণ করেন। বিয়ে করে বর স্বগৃহে ফিরে এলে প্রথমে বর বধূকে বরণ করে নিতে হয়। মুসলিম রীতি অনুসারে ছেলের বাড়িতে বধূবরণ করার সময় চিনি বা মিষ্টি তুলে দিয়ে বরণ করা হয়। বর বধূ যে ঘরে থাকবে সে ঘরের দরজা পর্যন্ত লাল কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তার উপর সুপারী, পান ও ছোট মাটির সরা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অগ্রসর হওয়ার সময় বরকে নিচু হয়ে পান, সুপারী ও মাটির সরা তুলে নিতে হয়। এটি এক ধরনের লোকবিশ্বাস যে, বর যেন কন্যাকে নিজ ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত বিপদ আপদ অতিক্রম করতে পারে। মা তারপর বরকে ডান হাতের ও কনেকে বা হাতের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকানো হয়। মা ঘরের কোণায় রক্ষিত একটা ডোল দেখিয়ে ছেলের বউকে জিজ্ঞেস করেন, বলত মা ডোলের মধ্যে কি? কনে ডোল দেখে এসে বলে, ধান। মা বলে উঠেন, "তোমার ঘরে হোক ধানের বান? তারপর ঘরে প্রবেশের মুখে রক্ষিত চাল ও ঘট স্পর্শ করে আলতার মধ্যে পা ডুবিয়ে লক্ষ্মী ঘরে প্রবেশ করে। যদি আলতার রাঙানো পার প্রতিচ্ছবি যদি স্পষ্ট হয়, তবে সে ভাগ্যবতী হিসেবে ধরা হয়।[১৩]

বরবরণ

হিন্দু ও মুসলমান বিবাহে বর বরণের প্রথা আছে। মুসলমান রীতি অনুসারে ছেলেকে বরণ করে দাদা বা নানা অথবা বয়জ্যেষ্ঠ কোন পুরুষ ছেলেকে/বরকে সোনার গহণা দিয়ে বরণ করে। হিন্দুদের ক্ষেত্রে প্রথমে কন্যার বাবা এবং পরে কন্যার মা অন্তঃপুরে জামাতাকে বরণ করেন। এ সময় গৃহ প্রবেশ করার আগে কন্যার ছোট ভাই বোন টাকা আদায় করে। সে সময় মিষ্টি, শরবত জাতীয় খাদ্য খেতে দেয়া হয়। তারপর আসনে বসতে দেয়া হয়।

বরবরণ করা হয় বরের গৃহে সেটি প্রথম বরণ। বরের নিজ গৃহে সাধারণত ভাবি সম্পর্কের আত্মীয়রা বর বরণ করেন। গোসলের পর বরকে পিঁড়ির উপর বসিয়ে বরণ কুলা (দূর্বা, তেল, হলুদ, মাটির প্রদীপ, কলসি (ঘট), হাঁড়ি রাখা হয়) তার মুখের সামনে ডান দিকে থেকে বাম দিকে তিনবার চক্রাকারে ঘুরানো হয়। এ অনেকটা হিন্দুর প্রতিমার সামনে পুরোহিত কর্তৃক ধূপধূনায় আরতি করার মতো। অনেক সময় খালি হাতে ধান, দূর্বা পানাদি দিয়ে হাতের কল্পন ও মুদ্রার ভঙ্গিতে উক্ত প্রকারে ঘুরানো হয়। ভঙ্গিটি সহজসাধ্য নয় বলে অভিজ্ঞ গ্রাম বধূকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়। সাধারণত দাদী সম্পর্কে বয়সী মহিলা এ ভূমিকা পালন করেন।[১৫]

www.pathagar.com

স্বামী ও স্ত্রীর মৃত্যু

মুসলমান সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী জীবিত থাকলে তাকে কিছু আচার পালন করতে হয়, এগুলোর মধ্যে তার পরিহিত গহনা ও রঙিন কাপড় খুলে নেয়া হয়। সেই স্থলে সাদা রঙের কাপড় পরানো হয়। বিশেষ কারণ ব্যতীত সে (স্ত্রী) বাড়ির বাহিরে যেতে পারবে না চল্লিশ দিন। অন্যদিকে একজন পুরুষ তিন দিনের পরে বাহিরে যেতে তো পারে এবং বিয়েও করতে পারে। যদি কোনো মহিলা মারা যায় তবে তার একেবারে নিকট আত্মীয় তার খাট ধরতে পারে। নারীর মৃত্যু হলে খুব তাড়াতাড়ি কবর খোড়ার কথা বলা হয়। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো আচার নেই।

লোকবিশ্বাস

আমাদের সমাজে লোকাচারের পাশাপাশি লোকবিশ্বাস অনেকটা জায়গা করে নিয়েছে। এর সুফল বা কুফল যাই থাকুক না কেন মানুষ এটাকে অকাট্ট প্রমাণ্য দলিল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষের মধ্যে এরকম কিছু লোকবিশ্বসের বিবরণ দেওয়া হলো :

১. গর্ভবতী অবস্থায় কাউকে কাঁটা আম দিতে নেই, তাহলে মেয়ে সন্তান হয়।
২. মেয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোনার গয়না স্পর্শ করলে সে সৌভাগ্যবতী হয়।
৩. স্বপ্নে সাপ দেখলে তার ছেলে সন্তান হয়, যদি সাপটি লাল হয় তবে ছেলে আর যদি কালো হয় তবে মেয়ে সন্তান হয়।
৪. সকালে বন্ধ্যা নারীর মুখ দেখলে, ঐদিন কানো কাজ সুফল হয় না।
৫. সোম, মঙ্গল এবং বুধবার রাতে পেটে সন্তান এলে পুত্র এবং যুগ্ম দিনে কন্যা হবে।
৬. অমাবস্যায় গর্ভে সন্তান এলে পুত্র এবং পূর্ণিমায় কন্যা হয়।
৭. পেটের উপর দিয়ে চিল উড়ে গেলে তার সন্তান হবে না। যদি চিলটা ফিরে আসে তবে সন্তান হবে।
৮. খাওয়া ফল খেলে মেয়ে সন্তান হবে।
৯. কানো মেয়ের উপর উল্কা গেলে তার আর সন্তান হয় না।
১০. স্বপ্নে সোনা দেখলে তার অবশ্যই ছেলে সন্তান হবে।
১১. আঁতুড় ঘরে ছয়দিন প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়, বিশেষ করে ছেলে হলে। এরূপ বিশ্বাস আছে মেয়ে হলে চৌদ্দ হাত মাটি নিচের দিকে দেবে যায়। আর ছেলে সন্তান হলে চৌদ্দ হাত মাটি উপরে উঠে যায়। মেয়েরা পরের বাড়ি যায় বলে, আর ছেলেরা সারা জীবন বাড়িতে থাকে।
১২. কানো প্রসূতির প্রথম সন্তান ছেলে হলে তাকে সৌভাগ্যবতী হিসেবে নেয়, এরূপ বিশ্বাস আছে।
১৩. হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে, যার সঙ্গে যার জোড় বাঁধা তার সঙ্গে তার বিবাহ হবে।

www.pathagar.com

১৪. ছেলের বাবা যদি ছেলের বিবাহে যায় তাহলে তার পুত্রবধূর লজ্জা শরম কম হয়।
১৫. বাড়িতে কানো পরিচিত ব্যক্তি এলে অন্তত কিছু সময়ের জন্য তাকে বসতে হয়, নইলে বাড়ির মেয়েদের বিয়ে হয় না।
১৬. বিবাহের দিন কনের মাকে উপবাস কনের থাকতে হয়। বিশ্বাস কনের মা যত শুকোবেন, কনে ততই সুখী হয় শ্বশুর বাড়িতে।
১৭. কুমারী মেয়েদের তুলসী গাছে জল দিতে নেই। দিলে অকালে বিধবা হয়।
১৮. বিবাহিত নারী সিঁদুর ও শাখা না পরলে সেটা স্বামীর জন্য অমঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
১৯. মুসলমান নারী গায়ে গহনা না পরলে বিশেষ করে নাক ফুল দীর্ঘদিন খুলে রাখলে স্বামীর অমঙ্গল হয়।
২০. পুরুষের আগে যদি স্ত্রী মারা যায় তবে সে স্ত্রী ভাগ্যবতী হয়।
২১. অবিবাহিত নারী মারা গেলে বিশেষ করে হিন্দু রমণীদের মধ্যে সাজিয়ে সৎকার করা হয়। এতে মঙ্গলজনক হবে।
২২. বাচ্চা হওয়ার চল্লিশ দিন পর্যন্ত, আঁশ যুক্ত মাছ খাওয়া যাবে না।
২৩. চল্লিশ দিনে কামানী দেয়ার সময় ঘসি (ঘুটে) দিয়ে জ্বাল দেয়া যাবে না।
২৪. ভর দুপুরে/সন্ধ্যার সময় বাচ্চা নিয়ে বের হওয়া যাবে না কারণ ভূত পেতের ভয় আছে।
২৫. ভরা কলসি বাচ্চার মায়ের নেওয়া যাবে না নেওয়ার সময় বুকে কাপড় দিয়ে নিতে হবে না হলে বাচ্চার শরীর অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে।
২৬. বাচ্চা মাকে বুকে কাপড় দিয়ে দরজা দিতে হয় না হলে দরজার বাতাস লাগলে বাচ্চা অসুস্থ হয়।
২৭. অমাবশ্যার রাতে বাচ্চার মাকে আসর ওয়াক্তের সময় ঘরে উঠতে হয়। এরূপ বিশ্বাস আছে।
২৮. অমাবশ্যার রাতে ভেড়ার মাংস দিয়ে রুটি খেলে শরীর অসুস্থ হয় না।

তথ্য নির্দেশ

১. আকলিমা খাতুন, স্বামী : মো. রসূল আলী, ধীতপুর কানু, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি।
২. পূর্বোক্ত।
৩. পূর্বোক্ত।
৪. পূর্বোক্ত।
৫. সিরাজুল মুনিরা, পিতা : মতিউর আহসান, কালিয়া হরিপুর, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৭০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : বি এস (সম্মান)।
৬. পূর্বোক্ত।
৭. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

৮. রেবা, গুণের গাঁতী, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণি, পেশা : গৃহিনী।
৯. মিনা রাণী, শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ বয়স : ২৬ বছর, পেশা : গৃহিনী।
১০. বাংলা পিডিয়া, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা।
১১. মো. ময়ান আলী, পিতা : মৃত. জয়ান শেখ, পাঙ্গাসী, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫০ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর, পেশা : কৃষক।
১২. পূর্বোক্ত।
১৩. পূর্বোক্ত।
১৪. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

প্রযুক্তি হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যবহার। আমরা জানি, বিজ্ঞানের বিকাশ আধুনিক যুগে ঘটেছে। আর প্রযুক্তির ব্যবহার বিজ্ঞানের সাফল্যকে ত্বরান্বিত করেছে। কিন্তু কৃষি সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই লোকপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়েছে গ্রামের সাধারণ নিরক্ষর মানুষ। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তার জীবনযাপনকে সহজসাধ্য করার জন্যে তাদের পরিবেশকে পরিবর্তিত করার জন্যে নানা কৌশল প্রয়োগ করেছে যা লোকপ্রযুক্তি হিসেবে বিবেচ্য। কৃষিক্ষেত্রে লাঙলের ফাল, মই এবং মাছ ধরার বাঁশের তৈরি বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের পাশাপাশি মৃৎশিল্প আবিস্কারেও লোকপ্রযুক্তি ক্রিয়াশীল। ধান ভানার জন্য ঢেঁকি তৈরি ও স্থাপন প্রযুক্তিগত দক্ষতারই পরিচায়ক।

১. কটিখড়া বা ধর্মজাল

এটি খেয়াজাল অপেক্ষা কিছুটা ভিন্নাকৃতির। এর গঠন-প্রকৃতি অনেকটা ছাতার অনুরূপ। ছত্রাকৃতির চারটি বংশখণ্ডের অগ্রভাগে জালটি বেঁধে দেওয়া হয়। এই বংশখণ্ড চারটির গোড়ালির দিক একটি জায়গায় যুক্ত থাকে, যেমনটি যুক্ত থাকে ছাতার শলাকাগুলো। এর সঙ্গে আরেকটি লম্বাকৃতির বংশ খণ্ড বাঁধা হয় যেটি থাকে মৎস্য শিকারির হাতে ধরা। মৎস্য শিকারি ইচ্ছা মতো তার হাতে ধারা বংশখণ্ডের সাহায্যে জালটিকে পানিতে ডুবিয়ে রাখতে এবং কিছু সময় পর পর পানির ওপরে টেনে উঠিয়ে থাকে। এর ফলে অনেক সময় চলমান মাছের ঝাঁক জালে আটকা পড়ে।[১]

২. খলসুন/খালুই

এটিও তৈরি হয় বাঁশের সাহায্যে। এর আকৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট। এর তলার ভাগ চারকোণাকৃতির কিন্তু ওপরের দিক গোলাকার। উল্লেখ্য যে, বাংলার লোকসমাজে পেশাজীবী যে শ্রেণির মানুষ কুলো, চালুন তৈরি করে থাকে তারাই সাধারণত ঝাঁকা ও খালু তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যে, গভীর সমুদ্রে যারা মৎস্য শিকার করে থাকে তারা আজ আর দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকপ্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়। আমাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় দেশের অভ্যন্তরভাগের মিঠাপানির মৎস্য শিকারের প্রযুক্তিগত জ্ঞানের পরিচয় উপস্থাপন করা। এ কারণে গভীর সমুদ্রে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মৎস্য শিকারের প্রযুক্তির বিষয়টি আলোচনা বহির্ভূত রাখা শ্রেয় মনে হয়েছে।[২]

৩. সড়কা/হোঁচা

এর গঠন প্রকৃতি অনেকটাই ক্ষুদ্রাকৃতি সেঁউতির অনুরূপ। এটি দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট পরিমিত হয়ে থাকে। সড়কার মধ্যে কিছু গাছের ডাল পেতে পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হয়।

www.pathagar.com

মাছ ডালপালার মধ্যে ঢুকে আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে অবস্থান করে। মাঝে মাঝে সড়কা জলাশয়ের ওপরে উঠালে কিছু মাছ ধরা পড়ে।[৩]

৪. পলো

অগভীর পানিতে দৃশ্যমান এমনকি অদৃশ্যমান মাছ শিকারের উত্তম হাতিয়ার হচ্ছে পলো। পলো তৈরি হয় বাঁশের চিকন-চিকন শলাকার সাহায্যে। এর আকৃতি গোলাকার এবং ওপরের দিকে অনেকটাই কলসীর গলার অনুরূপ।

৫. হাত ন্যাংলা

ধান থেকে ময়লা পরিষ্কার, খড় টেনে সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে, এমনকি মাটি আলগা করার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়।

বাঁশ = পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ ফিট

কাঠ = দেড় ফিট

৬ টি বাঁশের খিলই থাকবে বেশিও না কমও না

খিল = ছয় থেকে সাড়ে ছয় ইঞ্চি লম্বা

কাঠের খণ্ডের মাঝখানে ছিদ্র থাকে তাতে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বাঁশ ঢোকানো হয়।

আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি ব্যাসের বাঁশ ব্যবহৃত হয়

কাষ্ঠল অংশ কাঠমিস্ত্রী বানায়, বাঁশের খিল এবং বাঁশ দণ্ড, লোকসমাজ নিজেই তৈরি করে।[৪]

৬. চারী

মাটির তৈরি বড় পাত্র। এতে মূলত ধান ভেজানো হয়। সিদ্ধ করার আগে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. ছেনি/মেনি

অনেকটা কাঁচির মত দেখতে কিন্তু লোহার অংশে খাচকাটা নেই। এটি সমান কাঠে আর লোহা দ্বারা নির্মিত। ক্ষেতে নিরানী দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৮. কাড়াইল

একটি লম্বা চিকন বাঁশকে এক পাশে রেখে কেটে নেওয়া হয়। কঞ্চি যেদিকে অবনত থাকবে বাঁশের অংশও সেদিকে থাকবে। কঞ্চিকে ৪-৬ ইঞ্চি লম্বা রেখে দেওয়া হয়। তখন বাঁশ এবং কঞ্চির সংযোগস্থল অনেকটা ইংরেজি 'V' শব্দের মতো হয়। কাড়াইল-এর বাঁশটি লম্বায় প্রায় ৪-৬ ফিট লম্বা। বাঁশের ব্যাস ২.৫-৩ ইঞ্চি। ধান গাছ থেকে খড় সংগৃহীত হয়/খড় ছড়িয়ে দিতে বা জড়ো করতে কাড়াইল ব্যবহৃত হয়।[৫]

৯. হারপাট/সারপাট

সারপাট তৈরি করতে লাগে ৪-৫ ফিট। বাঁশ ও অর্ধবৃত্তাকার একটি কাঠের চাকতি/খণ্ড। এই কাঠের চাকতির পুরুত্ব/ঘনত্ব/প্রস্থ এক থেকে দেড় ইঞ্চি। সাধারণত আম, জাম,

www.pathagar.com

সারি, গজারি, শালসহ নানা ধরনের কাঠ দিয়ে তা তৈরি হয়। বর্তমানে আম কাঠ দিয়ে তৈরির প্রবণতাই বেশি। এর কারণ এই কাঠ হালকা হয়, ফলে কাজে সুবিধা হয়। কাঠের চাকতির লম্বা/দৈর্ঘ্য ১০-১১ ইঞ্চি। সারপাটের কাঠের অংশের নিচের দিকে কাজের সুবিধার্থে ঢালু রাখা হয় (অন্য পাশের থেকে)। ধান স্তূপ করতে, ধান শুকানোর জন্য ধান ছড়িয়ে দিতে সারপাট ব্যবহৃত হয়। বাঁশ নিজেরাই সংগ্রহ করে, এই সারপাট কাঠমিস্ত্রী দিয়ে বানিয়ে নেয়া হয়।[৬]

১০. গবরের প্রলেপ দেওয়া

ধান রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রথমে উঠানে গোবর দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয় এবং শুকানো হয়, তার পর ধান কেন্দ্রিক কাজ করা হয়। এতে মাটি থেকে কম ধূলা উঠে সাথে সাথে ধূলার জন্য অনেক সময় ধান উঠাতে বেশ সময় লাগে, তা পরিষ্কার করে। তাই এটি এক ধরনের প্রযুক্তি রূপে সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষজন ব্যবহার করে থাকে।

১১. লোক ফিল্টার

গ্রাম অঞ্চলের অনেক বাড়িতে এক ধরনের প্রযুক্তি দেখা যায় যা পানি শুদ্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তা হলো লোক ফিল্টার। অসামঞ্জস্য হলেও লোক দ্বারা নির্মিত এই ফিল্টার তৈরি করতে উপকরণ হিসেবে লাগে বড় মাটির কলস আর একটা (স্থানীয় ভাষায়) কাদা। প্রথমে কলসের মধ্যে অনেকগুলো স্তর থাকে এর মধ্যে পানি, ইটের খোয়া, প্লাস্টিকের বস্তা, বালি এ উপকরণগুলো দিয়ে তিন থেকে চারটা প্রলেপ দেয়া হয়। তারপর কলসের তলদেশে ফুটা করা হয় এবং সর্বশেষ স্তরে পাতলা কাপড়/ছাঁকনা দেয়া হয় পানি নির্গম করা হয় বড় কাদাতে বা কলসে এতে করে আবরণের হাত থেকে পুরোপুরি পরিষ্কার পানি পাওয়া যায়।[৭]

১২. ঘসি

গোবরকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্রক্রিয়া বা উপাদানকে বলে ঘসি। এটি গোবর দ্বারা নির্মিত এবং এটি রোদে শুকিয়ে তারপর ব্যবহার করা হয়।

১৩. জলকান্দা

এটি মাটি দ্বারা নির্মিত। এতে মূলত অন্যান্য পোকামাকড় থেকে খাবারকে রক্ষা করার জন্য পানি দিয়ে উপরে পাতিল রাখা হয়।

১৪. টোপা (ট্যাবারি)

বাঁশ দ্বারা নির্মিত এক ধরনের প্রযুক্তি হলো টোপা (ট্যাবারি)। এটি গৃহস্থলে ব্যবহৃত হয়। মূলত বাঁশের চিকন চিকন শলাকা দ্বারা এক ধরনের ঢিপির আকৃতিতে এটা নির্মাণ করা হয়। মাঝে মাঝে ফাঁকা রাখা হয় কেননা মুরগি বা এ জাতীয় কোনো প্রাণী রাখলে তা দেখা যায়। গ্রাম-গঞ্জে এই প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়।[৮]

১৫. কাকতাড়ুয়া

জমিতে যখন ধান পেকে যায় তখন নানা প্রকার পাখির উপদ্রব ঘটতে থাকে। এই উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতির জন্য বাঁশ, খড় অথবা ছন দিয়ে মানুষের আকৃতি বিশিষ্ট

www.pathagar.com

একেকটি মূর্তি গঠন করে জমির বিভিন্ন স্থানে খুঁটির সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এর ফলে পাখিদের মনে এক প্রকার মনুষ্যভীতি গড়ে ওঠে। পাখির উপদ্রব অনেকটাই কমে যায়। এছাড়া এই মূর্তি স্থাপনের পেছনে কিছু লোকবিশ্বাসও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অনেক কৃষকই বিশ্বাস করে এ ধরনের মূর্তি স্থাপনের ফলে জমি প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা ফসল বিনষ্টকারী মন্ত্র-তন্ত্রের প্রভাব থেকে রক্ষা পায়।[৯]

তথ্য নির্দেশ

১. শ্রী রতন চন্দ্র পাল, পিতা : মৃত রাখাল চন্দ্র পাল, গ্রাম : বড়গোজা (পালপাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৫, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২১-০৮-২০১১ সময় : সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

২. শ্রী সুজিৎ কুমার পাল, পিতা : পরেশচন্দ্র পাল, গ্রাম : বড়গোজা (পালপাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩০, শিক্ষা: নিরক্ষর, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৭-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ২.০৫ ঘটিকা।

৩. শ্রী কালিপদ পাল, পিতা : মৃত গিরিশচন্দ্র পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫৭, শিক্ষা : ৩য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২২-০৮-২০১১ সময় : সকাল ১১.১৫ ঘটিকা।

৪. সুশান্ত কুমার পাল, পিতা : মৃত জতিন্দ্রনাথ পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৫২, শিক্ষা : ২য় শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ১২.১৪ ঘটিকা।

৫. শ্রী জয়দেব চন্দ্র পাল, পিতা : শ্রী সুবল চন্দ্র পাল, গ্রাম : সলংগা মধ্যপাড়া (দশানি পাড়া), ডাক : সলংগা, থানা : সলংগা, জেলা : সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩০, শিক্ষা : ৫ম শ্রেণি, তথ্য সংগ্রহের তারিখ : ২৪-০৮-২০১১ সময় : দুপুর ০১.৩৫ ঘটিকা।

৬. নিতাই চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়সঃ ৬২, শিক্ষা : ৭ম শ্রেণি।

৭. গৌতম চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, ভদ্রঘাট, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ৩২, শিক্ষা : এস এস সি।

৮. দিলীপ চন্দ্র পাল, গ্রাম : পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২৮, শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণি পাস।

৯. মীনা রাণী, গ্রাম : পালপাড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বয়স : ২৬, শিক্ষা : ষষ্ঠ শ্রেণি পাস।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হলো, **বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা**। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ - Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে বাংলা একাডেমি Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context-big setting, small setting), পরিবেশনা (performance), অর্থানুসন্ধান (meaning), কাজ (function) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোরকে আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চায়।